১ম ভাগ। { বৈশাখ, ১৩০৭ সাল। } ১ম সংখ্যা।

ওঁ

আমাদের চতুর্থ বৎসর।

ভগবানের কৃপায় পন্থার তৃতীয় বৎসর উত্তীর্ণ হইল; পন্থা এখন চারি বৎসরের শিশু। আমাদের পন্থা এখন অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে মা মা বলিতে শিখিয়াছে; শুনিতে পাই যে আমাদের এই শিশুর সেই অর্দ্ধস্ফুট মা মা ধ্বনি শুনিতে অনেকেই নাকি ভালবাসেন; পন্থা অনেকের কাছেই আদৃত হইয়াছে ইহা আমাদের বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আমাদের এই আহ্লাদের কথা পন্থার জননীকে জানাইব; আমাদের আহ্লাদের উপর খুলিয়া সেই দেবীর চরণ ধোয়াইয়া দিব, [illegible] আমাদিগকে তাঁহার স্নেহরসে অভিষিক্ত করিবেন।

পন্থার জননী কে তাহা কি তোমরা জান? ঐ দেখ মা একটি চারি বৎসরের উলঙ্গ শিশু মাটিতে দাঁড়াইয়া ধূলা খেলা করিতেছে, মাটি থেকে ধূলা লইয়া ছোট হাতের ছোট মুষ্টি মধ্যে ধরিতেছে আর উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে আর আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছে মা মা, আমার মা, আমার মা, ঐ আমার মা ঐ আমার মা ঐ আমার মা। ঐ দেখনা, চিৎসরোবরে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, শিশুর খেলা দেখিয়া হাসিতেছেন এবং "আয় কোলে আয়" বলিয়া মাঝে মাঝে হাত বাড়াইতেছেন। উনিই আমাদের পন্থার জননী। উঁহার নাম পরাবিদ্যা। দেখ দেখ, স্নেহভরে জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধার ঝরিয়া শুভ্রবসন সিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এস আমরা মাকে গান শুনাই।

ঝিঝিট—একতালা।

শ্বেত বরণা, শ্বেত বসনা, নাদ স্বরূপা বাক্‌বাদিনী।
বেদ বেদান্ত সাংখ্য নিহিত পরশিবতত্বভাষিনী॥
শ্বেত কমলে রাঙ্গা শ্রীচরণ, তারি পাশে অলি করে মধুপান,
শ্বেত রক্তে কৃষ্ণ অপূর্ব্ব মিলন, ত্রিগুণ মিলন কারিণী॥
ক্ষীণ মধ্য কটি গুরুভার শ্রোণি, ললিতাঙ্গ বপু পীনোন্নতস্তনী।
ক্ষীণাঙ্গী সুঠাম, সৌষ্টব গঠন, অধরে সুহাস হাসিনী॥

মনে হচ্চে যে মা যেন গান শুনে বল্‌চেন যে "তোরা কি চাস।" এ কথার এখন কি জবাব দিব বল দেখি মা যখন তাঁর প্রিয় সন্তান আনন্দময় আনন্দ ভৈরবকে শিশুরূপে আমাদের সাক্ষাতে দাঁড় করাইয়া বলিয়া দিতেছেন যে এই বালকই তোমাদের পন্থা তখন চাইবার জিনিস যে আর কিছু আছে এমত আর মনে হচ্চে না। চারি বৎসরের উলঙ্গ শিশুর ন্যায় শিশুভাবাপন্ন হইয়া, সংসারের খেলাকে ধূলি খেলা জ্ঞান করিয়া, এই ধূলি খেলা করিতে করিতে, মনের আনন্দে মা মা বলিয়া নাচিতে পারাই আনন্দময় প্রদর্শিত পন্থা। মা, আমরা কি চাই জিজ্ঞাসা করিতেছ আমরা এই চাই যে এই পন্থা যেন আমরা কখনও ভুলি না। ওঁ॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডব-গীতা

বা

প্রপন্ন-গীতা

(পাণ্ডব-কৃতা)

(১)

পাণ্ডব কহিলেন :—

প্রহ্লাদনারদপরাশরপুণ্ডরীক—
ব্যাসাম্বরীষশুকশৌনকভীষ্মদাল্ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুনবশিষ্ঠবিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ স্মরামি॥

প্রহ্লাদ, নারদ, পুণ্ডরীক, পরাশর,
অম্বরীষ, শুকদেব, ব্যাস ঋষিবর,
অর্জ্জুন, বশিষ্ঠ, রুক্মাঙ্গদ, বিভীষণ,
ভীষ্ম, দাল্ভ্য, শৌনকাদি, পুণ্যময়-গণ ;—
"হরি ! হরি !" করি যাঁরা হইয়া তন্ময়
চতুর্দ্দিক্ হেরেছিল সব হরিময়,
সেই সেই হরিভক্ত সবারি চরণে
ভক্তিভরে নমস্কার করি এক মনে।

(২)

লোমহর্ষণ কহিলেন :—

ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি যুধিষ্ঠিরকীর্ত্তনেন
পাপং প্রনশ্যতি বৃকোদরকীর্ত্তনেন।
শত্রু র্বিনশ্যতি ধনঞ্জয়কীর্ত্তনেন
মাদ্রীসুতৌ কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ॥

যুধিষ্ঠির-পুণ্য-কথা যে করে কীর্ত্তন,
নিশ্চয় হইবে তার ধর্ম্মের বর্দ্ধন।

নিষ্পাপ ভীষ্মের কথা কেহ যদি কয়,
পাপ তাপ যত কিছু হয় তার ক্ষয়।
মহাবীর অর্জ্জুনের কথা মুখে যার,
এ সংসারে শত্রু তার নাহি থাকে আর।
সহদেব-নকুলের কথা যেই বলে,
কোন কিছু রোগ তার না রয় ভূতলে।

(৩)

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজং
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলং
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥

নারায়ণ-পাদপদ্মে করি নমস্কার,
নারায়ণে আরাধন করি অনিবার,
নারায়ণ-সুনির্ম্মল-নাম লই মুখে,
নারায়ণ-নিত্য-তত্ত্ব সদা ভাবি সুখে।

(৪)

ব্রহ্মা কহিলেন :—
যে মানবা বিগতরাগপরাবরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষচেতনাস্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥

বিষয়-বাসনা যত সমস্ত ছাড়িয়া,
হিতাহিত যাহা কিছু বিচার করিয়া,
দেবদেব নারায়ণে স্মরে যেই জন,
তার মত পুণ্যবান্ কে রয় কথন?
যত কিছু পাপ তার সব হয় ক্ষয়,
যথার্থ চৈতন্য আসি মনে তার রয়।

না লয় মানব-জন্ম সেই পুণ্যবান্,
করিতে না হয় তারে মাতৃ স্তন্য-পান !

(৫)

ইন্দ্র কহিলেন :—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচোরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥

এ জগতে যত চোর রহে বিদ্যমান,
নরোত্তম নারায়ণ সবারি প্রধান।
একবার তার নাম মনে পড়ে যার,
বহু-জন্মার্জ্জিত পাপ কেড়ে লয় তার !

(৬)

যুধিষ্ঠির কহিলেন :—

মেঘশ্যামং পীতকৌশেয়বাসং
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈকনাথম্ ॥

শ্যামতনু পীতাম্বর শ্রীবৎস-আশ্রয়,
কৌস্তুভ-রতন-ধারী তুমি পুণ্যময়,
কমল-বিশাল-নেত্র সর্ব্ব লোক-পতি,
তোমার চরণে হরি ! করি হে প্রণতি !

(৭)

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসঃ
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদেন্দুবিম্বৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥

স্বর্গে বাস করি, কিবা মর্ত্ত্যে বাস করি,
নরকে বা করি বাস দীর্ঘকাল ধরি,
যেখানে যেরূপ ভাবে থাকি না যখন,
এই ভিক্ষা চাই, ওহে নরক-নাশন ;
শরচ্চন্দ্র যার কাছে না লাগে কখন,
ম'লেও না ভুলি যেন সে তব চরণ !

(৮)

ভীমসেন কহিলেন :—

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা
বিষাণকোট্যাখিলবিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা
স মে স্বয়ম্ভু র্ভগবান্ প্রসীদতু ॥

স্থাবর-জঙ্গম-যুত এই ভূমণ্ডল
জলমধ্যে মগ্ন যবে ছিল অবিরল,
চিত্রিত-ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি বরাহ হইয়া
ধরিলেন যিনি দন্তে তখনি তুলিয়া,
বৈকুণ্ঠ-বিহারী সেই দেব নারায়ণ,
মোর প্রতি যেন সদা তুষ্ট হ'য়ে রন্ !

(৯)

অর্জ্জুন কহিলেন :—

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমব্যয়ং
বিভুং প্রভুং ভাবিতবিশ্বভাবনম্।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিচারকারকং
হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥

অচিন্ত্য অব্যক্ত যিনি অনন্ত অব্যয়,
বিভু প্রভু বিশ্ব-সৃষ্টি-ভাবনা-তন্ময়,

ত্রৈলোক্য-বিচার-পতি মহাত্মার গতি,
সেই শ্রীহরির পদে সঁপিলাম মতি।

(১০)

নকুল কহিলেন :—

যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবন্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥

কর্ম্মদোষে যদি করি নরকে গমন,
কিম্বা যদি কাল-পাশে হয় বা বন্ধন,
যদি মোর পরমাত্মা সংসারে আসিয়া
জন্ম লয় কীট পক্ষী পতঙ্গ হইয়া,
তাহ'লে তোমার যেন হৃৎপদ্মে ধরি,
একমাত্র তোমাতেই ভক্তি রয় হরি!

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

পৌরাণিক কথা।

ধ্রুব চরিত্র।

রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির পুত্র উত্তম এবং সুনীতির পুত্র ধ্রুব। রাজা উত্তমকে কোলে লইয়াছেন দেখিয়া বালক ধ্রুবও কোলে যাইবার উদ্যমকরিল। বিমাতা সুরুচি ঈর্ষাপরবশ হইয়া গর্ব্ব-সহকারে বলিতে লাগিল—"বৎস, তুমি রাজার আসনে উঠিবার যোগ্য নও। যে-হেতু তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই। যদি দুর্ল্লভ মনোরথ পূরণের ইচ্ছা থাকে, যদি একান্ত রাজাসনে বসিবার কামনা থাকে, তবে পুরুষের আরাধনা কর। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে।"

বিমাতার বাক্যস্বরে বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধে রোদন করিতে করিতে ধ্রুব মাতার নিকট উপনীত হইলেন। সপত্নীর আচরণ শুনিয়া সুনীতি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগি-লেন—"বৎস, আমারই দোষ সত্য। আমিই দুর্ভাগ্য, তাই আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার এই অপমান। কিন্তু মনের ভাব ত্যাগ কর। সুরুচি বিমাতা হইলেও মাতার তুল্য। তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর। যদি উত্তমের ন্যায় রাজাসন পাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে সেই অধোক্ষজের পাদপদ্ম আরাধনা কর। নান্যং ততঃ পদ্মপলাশ লোচনা

দুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।

যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীত পদ্ময়া

শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া॥

সেই পদ্মপলাশ লোচন ভিন্ন তোমার দুঃখ দুর করিবার জন্য আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা। পদ্মরূপ দীপ হস্তে লইয়া লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাদি দেবতার সহিত তাঁহার অন্বেষণ করেন।"

মা, তুমি সুনীতি নামের সার্থকতা করিলে। তুমি ক্রোধ পরবশ হইয়া সপ-ত্নীর সহিত কলহ করিতে উদ্যত হইলেনা। রাজার উপর গঞ্জনা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইল না। সকল দোষ তুমি আপনার উপরেই লইলে।

"যাদৃক্‌ফলং তাত পরেষু যংস্থা।
ভুঙ্‌ক্তে জনো বং পরদুঃখদস্তৎ।"

বৎস ধ্রুব পরের অপরাধ মনে লইবেনা। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে সেই দুঃখ নিজে ভোগ করে। জননীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিলে। যাহা সার উপদেশ তাই তুমি পুত্রকে দিলে। ভারতের জননীগণ, তোমরা সুনীতির নীতি কেননা অনুসরণ কর ?

আর ধ্রুব ? পাঁচবৎসরের বালক ধ্রুব। সে কিরূপে পুরুষের আরাধনা করিবে ? ধ্রুব নিজে একথা একবারও ভাবিলেন না। জননীর উপদেশ পাইবা মাত্র, তিনি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প যে তিনি পুরুষের আরাধনা করিবেন। কেমনে করিবেন, সে কথা ভাবিতে তাহার অবসর হইল না।

সে ভাবনা ধ্রুবের হইল না বটে। কিন্তু যাহার হইবার কথা তাহার হইল। মনের তীব্র বাসনা হওয়া চাই। তুমি আর্ত্ত হও, কি জিজ্ঞাসু হও, কি অর্থার্থী হও, কি জ্ঞানী হও—তুমি সকাম কি অকাম জানিবার আবশ্যক নাই; মনের তীব্র আবেগে একবার উপাসনার পথে ছুটিয়া বাহির হও অমনি গুরু সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

ধ্রুব সকাম। ধ্রুব আর্ত্ত ও অর্থার্থী। কিন্তু হৃদয়ের কাতরতায় ও অর্থের অন্বেষণে তিনি অনন্যমনাঃ। তিনি "পদ্মপলাশলোচন কোথায়" বলিয়া অজ্ঞাত বাহ্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। অমনি করুণহৃদয় নারদ, জগৎগুরু নারদ, তাঁহার হাত ধরিলেন। দেবর্ষি দেখিলেন, যে কল্পের প্রথম অবস্থা। এখনও জীবের উপাসনা তত্ত্ব বুঝিবার সময় হয় নাই। এখন প্রবৃত্তি মার্গে চলিবার সময়। প্রবৃত্তি মার্গে কলুষিত জীব নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিবে এবং তাহার পর উপাসনার পথ অবলম্বন করিবে। ধ্রুবের চিত্ত এখনও প্রবৃত্তি কলুষিত নহে। তথাপি তাহার সকামতা আছে। সে উচ্চ পদবীর অন্বেষণ করে। তাই নারদ বলিলেন— নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং চাপি পুত্রক।

হে পুত্র, তুমি শিশু। তোমার এখন মানও নাই, অবমানও নাই। মাতার উপদেশে যাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য তুমি উত্তমপরায়ণ, তিনি অত্যন্ত দুরারাধ্য।

মুনয়ঃ পদবীং যস্ত নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ।
ন বিদু র্মৃগয়ন্তোহপি তীব্রযোগসমাধিনা॥

অনেক জন্মে নিষ্কামতা ও তীব্রযোগ সমাধি দ্বারা মুনিগণ তাঁহার পদবী অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন না।

অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে॥

এই জন্য বলিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার নির্ব্বন্ধ এখন নিষ্ফল। যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে, তখন তুমি যত্ন করিও।

ধ্রুব বলিলেন, গুরুদেব, জ্ঞান ও শান্তির কথা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমার হৃদয়ে কামনা অত্যন্ত বলবতী। এখন আমাকে সেই উপায় বলিয়া দেন, যাহাতে আমি ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারি, যে পদ আমার পিতা কেন অন্যেও লাভ করিতে পারে নাই।

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্ম মে।
ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্॥

নারদ বলিলেন, যদি তুমি একান্ত নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন সেই উৎকৃষ্ট পথ। তুমি ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা কর। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র জপ কর। নারদ ধ্রুবকে আরাধনার সম্পূর্ণ পদ্ধতি বলিয়া দিলেন।

কঠোর তপস্যা দ্বারা ধ্রুব ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি একে একে বহির্জগৎ হইতে মন আকর্ষণ করিলেন এবং একাগ্রমনে হৃদয় মধ্যে ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর সহিত তন্ময়তা হওয়াতে, ধ্রুবের শ্বাসরোধ দ্বারা ত্রৈলোক্যের শ্বাসরোধ হইল। লোকপালেরা ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না। উত্তানপাদের পুত্র আমাতে সঙ্গতাত্মা হইয়াছে। তাই সকলের প্রাণ নিরোধ হইয়াছে।

ভগবান্ ধ্রুবের সন্নিহিত হইয়া তাহার হৃদয় মধ্য হইতে আপনার রূপ আকর্ষণ করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া ধ্রুব যেমন নেত্র উন্মীলিত করিলেন, অমনি দেখিলেন যে তাঁহার পদ্মপলাশলোচন হৃদয়ের বাহিরে আসিয়া সম্মুখে

আবির্ভূত। ধ্রুব তখন আত্মহারা। সাধনের ফল লাভ করিয়া সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা সাধকেই জানে। ধ্রুবের আনন্দ আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব। আনন্দের ধারা উৎসের ন্যায় স্তুতির স্রোতে প্রবাহিত হইল।

ধ্রুব যাহা চাহিলেন তাহাই পাইলেন।

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্য বালক।
তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত॥
নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্‌ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি।
যত্র গ্রহর্ক্ষ তারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্॥
মেধ্যাং গোচক্রবৎস্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্।
ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ সত্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥

আমরা প্রবৃত্তির পঙ্কে পঙ্কিল। আমাদের মন জন্মজন্মার্জ্জিত মলে অভিষিক্ত। আমরা সকাম ভাবে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে স্বর্গের উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিনা। কিন্তু ধ্রুব সকাম হইলেও বাসনার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার স্বর্গ স্বর্গের উচ্চতম স্থান। ধ্রুব ত্রিভুবনের উচ্চতম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু ত্রিভুবন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। মহর্লোকাদি নিষ্কাম কর্ম্মের বিপাক।

"ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ।"

মহাত্মা ধ্রুব তাঁহার সকাম ভক্তিতে বড় প্রসন্ন হইলেন না। আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া তিনি বলিলেন।

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যাম্মানো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিকধনঃ॥

যিনি স্বারাজ্য দিতে পারেন, তাঁহার নিকট মূঢ়তা প্রযুক্ত আমি মান ভিক্ষা করিলাম! ছি! ছি! দরিদ্র যেমন রাজার নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা যাচ্ঞা করে আমি তাহাই করিলাম।

ধ্রুব চরিত্রে ভক্তির এই প্রথম বিকাশ। প্রহ্লাদ চরিত্রে ভক্তির মধ্যম বিকাশ। প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ পরদুঃখকাতর। সকামতা ও স্বার্থপরতার সীমা তিনি অতিদূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যা
স্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখ চেতস ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥

হে ভগবন্, দুরত্যয় ভববৈতরণী পার হইবার জন্য আমি কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নই। তোমার বীর্য্যগায়নরূপ মহামৃতে আমার চিত্ত মগ্ন। অতএব আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়বশ হইয়া মায়াসুখের জন্য বৃথা ভার বহন করে, সেই সকল ভগবৎ বিমুখ বিমূঢ় লোকের জন্যই আমার চিন্তা।

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

হে দেব, মুনিরা প্রায় নিজেরই মুক্তির কামনা করেন। তাঁহারা মৌন হইয়া বিজনে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা পরের জন্য জীবন সঙ্কল্প করেন না। কিন্তু এই সকল কাতর অসুর বালকগণকে ত্যাগ করিয়া আমি একক মুক্তি লাভের ইচ্ছা করিনা। তোমা বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্য গতি দেখিতে পাইনা।

প্রহ্লাদ নিষ্কাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার তন্ময়তা হয় নাই। তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া আত্মহারা হন্ নাই।

গোপীরা নিষ্কাম ও শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়। তাঁহাদের আত্মজ্ঞান ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহাদের সকল চেষ্টাই কৃষ্ণময়। গোপীদিগের মধ্যে ভক্তির অন্ত্য বিকাস।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পিণ্ডদেহ।

সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে গেলে, ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহের পার্থক্য সবিশেষ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য কারণ সাধনার অধিকাংশ কার্য্য পিণ্ডদেহ অবলম্বনে সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের পিণ্ডদেহ সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাদানে গঠিত; এই পিণ্ডদেহের আকার স্থূলদেহেরই অনুরূপ, উহার অণু সকল ভাণ্ডদেহ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ভাণ্ডদেহের বাহিরে চারিদিকে প্রায় এক হাত দেড় হাত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সূক্ষ্মানুভূতি তীক্ষ্ণ হইলে এই পিণ্ডদেহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে এই পিণ্ডদেহকে সঙ্কুচিত করা যায় এবং স্বাভাবিক উহার যত বিস্তার তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত করিতে পারা যায়। পিণ্ডদেহ যখন সংকুঞ্চিত হয়, তখন দেহের মধ্যে বামকুক্ষিতে যে প্লীহা-যন্ত্র আছে উহাই উহার আধার স্থান হইয়া থাকে। উহা তখন উক্ত আধারে অধোমুখ লিঙ্গাকারে অবস্থিতি করে। এই অধোমুখ লিঙ্গের বর্ণ কাল বেগুনের মত ভায়লেট। তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইষ্টদেবতা সাধনার যে সমস্ত প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে উহার মধ্যে ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া একটি প্রধান অঙ্গ; এই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া এই সঙ্কুচিত পিণ্ডদেহ আশ্রয়েই সাধিত হয়। তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রে এই সঙ্কুচিত পিণ্ডদেহকে কোথাও সংকোচ শরীর নাম দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ অধোমুখ লিঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কি মানবের সপ্তরূপের প্রথম নামকরণ কালে পিণ্ডদেহকে লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে লিঙ্গ শরীর বলা হয় তাহা পিণ্ডদেহ হইতে ভিন্ন, সেই জন্য নামের গণ্ডগোল হইবার আশঙ্কায় পরাবিদ্যার্থী সমিতি এই পিণ্ডদেহের ইংরাজি নাম দিয়াছেন—(Etheric double)

মানবের সপ্তরূপ মধ্যে এই দ্বিতীয় রূপটিকে পিণ্ডদেহ বলিয়া অভিহিত করিতে আমরা উদ্দিষ্ট হইয়াছি। সূক্ষ্ম মহাভূত সকল পিণ্ডীকৃত হইয়া এই দেহ গঠিত হয়; মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কালে জীব এই সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাদানে গঠিত দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াই গর্ভে প্রবেশ করে; কালাভিমানী দেবতাগণ এই পিণ্ডীকরণ ক্রিয়ার কর্ত্তা। জীবের কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে অংশ ফলোন্মুখী হইয়াছে, উক্ত

দেবতাগণ জীবের সেই কর্ম্মটুকু অবলম্বন করিয়া সেই সেই কর্ম্মের অনুযায়ী পিণ্ডদেহ গঠন করেন; জীব তখন কালশক্তি প্রভাবে সেই দেহে আকৃষ্ট হইয়া, পিতৃ শরীরে প্রবেশ করে এবং অবশেষে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া তথায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মোটামুটি রকমে বুঝিতে গেলে আমাদের স্থূলদেহের পিতৃজ অংশই পিণ্ডরূপ এবং মাতৃজ অংশ যাহা ঐ পিণ্ডের আধার তাহাই ভাণ্ডরূপ।

মানুষ মরিয়া গেলে তাহার পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহের সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ভাণ্ডদেহটি তখন শব হইয়া পড়িয়া থাকে। মৃত্যুর পর প্রাণ পদার্থ অতি অল্পক্ষণ পিণ্ডদেহে সংযুক্ত থাকিয়া উহাও শেষে বিশ্বপ্রাণে মিলিত হইয়া যায়। তখন পিণ্ডদেহও শবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দুইটি শবেরই কণা সকল তখন শিথিল হইয়া বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ভাণ্ডদেহটি পোড়াইয়া ফেলিলে উহার কণা সকল ভস্ম ও বাষ্প রূপে পরিণত হয়; মাটি তখন মাটিতে মিশিয়া যায়, জল জলে, বায়ু বায়ুতে এবং আকাশ আকাশে মিশিয়া যায়। ভাণ্ডদেহটি যদি না পোড়াইয়া ফেলিয়া অমনি ফেলিয়া রাখা যায় তবে উহা পচিতে আরম্ভ করে এবং রোগ-জনক বীজ সকল উহা আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে; সেই জন্য মৃত্যুর পর ভাণ্ডদেহটি পোড়াইয়া ফেলাই মঙ্গল জনক। পিণ্ডদেহও যখন শব হইয়া পড়ে, প্রাণ শক্তির ক্রিয়া যখন উহাতে আর থাকে না তখন উহাও পচিতে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ উহার কণা সকল বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে এবং মনুষ্যের পক্ষে অনিষ্টকারী জীবাণু সকল উহা আশ্রয় করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইজন্য মৃত্যুর পর এই পিণ্ডদেহটিও যত শীঘ্র মহাভূত পঞ্চে লয় করিয়া ফেলিতে পারা যায় ততই উহা মানবের পক্ষে মঙ্গল জনক। হিন্দুরা যে প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতব্যক্তির পিণ্ডদেহের লয় সাধন করিয়া থাকেন উহার নাম সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদেহের সহিত তাহার পুত্রের পিণ্ডদেহের একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে সেই জন্য পুত্রই এই সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়ায় প্রথম অধিকারী। তণ্ডুল, গোধুম, যব, ইত্যাদি ওষধি-জাত কোন দ্রব্যকে আধার করিয়া ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্র শক্তি বলে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডশরীরকে সংকুচিত করিয়া সেই আধার ন্যাস করতঃ, উক্ত পিণ্ড, চন্দ্রলোক-বাসী পিতৃগণের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করাই সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া। উক্ত পিণ্ড এই-রূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই পিতৃপুরুষ মুখ নিঃসৃত অগ্নি উহাতে সংযুক্ত

হইয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। পাঠকগণ কোন সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকিয়া এই ক্রিয়ার অন্যান্য অংশ আলোচনা করিয়া লইবেন।

সাধনার সময় সাধক তাঁহার পিণ্ড দেহটিকে সংকুচিত করিয়া, বামকুক্ষিতে উহাকে ধারণ করিয়া, কুণ্ডলিনী মুখ নিঃসৃত অগ্নিশিখা সংস্পর্শে উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিলে খানিক ধূম উত্থিত হয়। উহার পর সর্পরূপা কুণ্ডলিনী সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করেন এবং সেই ধূমটি আপন পুচ্ছদ্বারা আকর্ষণ করিয়া সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করাইয়া দেন। ঐ ধূমের পার্থিব অংশ তখন মূলাধার পদ্মের পাপড়িগুলিতে মিলিত (absorbed) হইয়া যায়। তখন ধূপ ধূনার গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভরিয়া যায়। কুণ্ডলিনী তখন স্বাধিষ্ঠান পদ্মে উঠেন, ধূমটিও তাঁহার পুচ্ছ ধরিয়া সেই পদ্মে গিয়া উঠে; তখন ঐ ধূমের জলীয় অংশ ঐ পদ্মের পাপড়িতে মিলিত হইয়া যায়; রসনেন্দ্রিয় তখন মধুর রসাস্বাদন অনুভব করে। তাহার পর কুণ্ডলিনী মণিপুর চক্রে গমন করেন; ধূমের রেখাটিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুচ্ছ ধরিয়া তথায় উত্থিত হয়, সেই খানে ঐ ধূমের আগ্নেয়াংশ সেই পদ্মের পাপড়িতে লয় হইয়া যায়; দর্শনেন্দ্রিয় তখন দিব্য জ্যোতি দর্শন করিতে থাকে। তাহার পর কুণ্ডলিনী ধূমের রেখাটি লইয়া অনাহত চক্রে উঠেন সেইখানে ধূমের বায়বীয় অংশ লয় প্রাপ্ত হয়; এবং সাধক স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে থাকেন, তাহার পর বিশুদ্ধাখ্য চক্রে ধূম সহ কুণ্ডলিনী উত্থিত হইলে ধূমের আকাশ তত্ত্ব সেইখানে লয় হয় সাধক দিব্য শব্দ সকল শুনিতে থাকেন। এইবারে কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করেন, শব্দ অহংকার তত্ত্বে লীন হয় সাধক নাদ স্বরূপ বিরাম সুখ অনুভব করেন। এই আজ্ঞাচক্রের পারে বিন্দু স্থল এই নাদ বিন্দুর রহস্য পরম রহস্য। ষট্‌চক্র ভেদ হইলে এই বিন্দুনিঃসৃত একটি নির্ঝর ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিতে থাকে; হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। সেই আনন্দের সঙ্গে আনন্দস্বরূপ ইষ্টদেবতা হৃদয়ে দেখা দেন ও সাধকের পূজা গ্রহণ করেন। পিণ্ডদেহের এই দহন শোধন ও প্লাবন ক্রিয়ার নাম ভূতশুদ্ধি। সাধনার পথে এই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াই প্রথম ও প্রধান। সুতরাং পিণ্ডদেহের রহস্যটি ভাল করিয়া বুঝা সাধক মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

মানবীয় সপ্তরূপ।

তৃতীয় রূপ-প্রাণ বা জীব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা। ৭ম অঃ। ৫ম শ্লো।

হে মহাবাহো, এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীব স্বরূপ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে জানিবে, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

আমাদের প্রবন্ধের লিখিত তৃতীয় তত্ত্বই এই প্রাণ বা জীব নামে অভিহিত। পৃথিবী ও তদ্স্থিত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক, সমস্ত পদার্থ, এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান মহান্ ও অতি প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ও পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্তই এই অনন্ত, অসীম, অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনশীল এই জীবন সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছে। এই অসীম অনন্ত বিস্তৃত জীবন সমুদ্রকেই জীবভূতা প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত এই এক জীবন স্বরূপা প্রকৃতিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া স্থিত আছে। এই অপরিসীম, অনন্ত প্রাণ হইতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্বই বল আর কোন এক ইন্দ্রিয়ই বল অথবা তদস্থিত কোন জীবাণু বা পরমাণুই বল, সমস্তই এই অসীম, অনন্ত প্রাণ পারাবার হইতে কিছু না কিছু প্রাণ গ্রহণ করতঃ প্রাণী বলিয়া জীবিত আছে। একটুক্রা স্পঞ্জ (sponge) অতি কোমল ও সর্ব্ব শরীর সূক্ষ্ম ছিদ্রে পরিপূর্ণ। মনে কর, এই স্পঞ্জ টুক্রা সমুদ্র মধ্যে জলে মজ্জিত করা হইল; তখন স্পঞ্জের ছিদ্র সমূহের দ্বারা জল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত স্পঞ্জটিকে জলপূর্ণ ও জলময় করিয়া ফেলিল; এই স্পঞ্জের প্রত্যেক অংশেই জল; ইহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সমুদ্রের জল প্রবাহিত, অথচ তদাতিরিক্ত স্পঞ্জের বাহিরে আবার প্রকাণ্ড সমুদ্র জলের পৃথক সত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইরূপ যদিও ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্তই এই অনন্ত প্রাণ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছে, তথাপি যাহারা যে পরিমাণে যতটুকু প্রাণকে আপন দেহমধ্যে আকর্ষণ করিয়া ধারণ করতঃ জীবিত আছে, সেই অংশটুকুকেই তাহাদের স্ব স্ব প্রাণ বলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে দ্বিতীয়তত্ব বা পিণ্ডদেহই প্রাণ এবং ভাণ্ডদেহের মধ্যে সেতু স্বরূপ। এই সূক্ষ্ম পিণ্ডদেহ অবলম্বনেই দেহে প্রাণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানে ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সংক্রামক পীড়াদিতে ক্ষুদ্র জীবাণুর আবিষ্কার করিয়া থাকেন ও বলেন যে এই জীবাণু সমূহই সংক্রামক পীড়ার কারণ এবং তাহাদের আবির্ভাবেই পীড়া উৎপন্ন এবং ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে তাহারা সমর্থ নহেন; কিন্তু বলিতে কি, তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, পরন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ।

পরাবিদ্যা বলেন, পঞ্চভূতাত্মক স্থাবর জঙ্গমাদি, বায়ু, অগ্নি, জল, এই সমস্তের মধ্যেই প্রাণ বিরাজিত। এই সংসারে নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলিয়া কোন বস্তু নাই। পঞ্চভূতাত্মক যাবতীয় পদার্থই ক্ষুদ্র জীবাণুগণ দ্বারা গঠিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সকল জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, এই শেষোক্ত ক্ষুদ্রজীবাণুগণ তাহাদের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎগুলিকেই অণুবীক্ষণে যেন হস্তির কাছে ক্ষুদ্র কীটাণু বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের অভ্যন্তরে আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতি ক্ষুদ্র জলন্ত, সজীব জীবাণু বা অণুপ্রাণীগণ বিদ্যমান আছে, তাহারাই জীবাণুদিগকে নিয়মিত ও চালিত করিয়া থাকে, এবং তাহাদের অনুশাসন ও কর্ত্তৃত্বাধীনে জীবাণুগণ তাহাদের পরস্পরের কোষ সমূহ গঠন করিতে সমর্থ হয়। এই জলন্ত, সজীব অণুপ্রাণীগণও সেই এক অসীম অনন্ত প্রাণের অতি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ, এবং এই অসীম অনন্ত, আকারশূন্য, নিত্য চির বিদ্যমান এক মাত্র প্রাণ হইতেই এই প্রাণময় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

প্রাণোহি ভগবানশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ ॥

অর্থাৎ, প্রাণই ভগবান মহেশ্বর, প্রাণই ভগবান বিষ্ণু এবং প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা। প্রাণই এই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালকে ধারণ করিয়া আছে, অধিক কি, সমস্ত বিশ্বকেই প্রাণময় বলিয়া জানিবে।

যেমন ঘট মধ্যে আকাশ দৃষ্ট হয়, ঘট ভগ্ন হইলেও সেই আকাশ নষ্ট হয় না, সেইরূপ জীবিতকাল পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ অবস্থান করে, মৃত্যুর পর দেহই নাশ

পায়, জীবের প্রাণ সেই প্রাণময়ের মহাপ্রাণে গিয়া বিলীন হয়, কিন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। প্রাণ দেহগত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও পিণ্ডদেহে মাত্র চতুর্দ্দশটি নির্দ্দিষ্ট স্থান উক্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই এই স্থানে প্রাণের ক্রিয়া বিশেষ শক্তি সম্পন্ন। স্থান বিশেষে এবং অবস্থাভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত এই চতুর্দ্দশ বায়ু নামে প্রাণ অভিহিত। তন্মধ্যে প্রাণের স্থান হৃদয়ে, অপানের স্থান গুহ্যদেশে, সমানের স্থান নাভিদেশে, উদানের স্থান কণ্ঠে এবং ব্যান সর্ব্বশরীর ব্যাপ।

প্রাণের এই কেন্দ্র স্থান সমূহ ভাণ্ডদেহে অবস্থিত নহে, তাহারা পিণ্ডদেহে অবস্থিত এবং তথা হইতে ভাণ্ডদেহের সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল হয়।

[ক্রমশঃ]

যুগল সেবক

পবিত্রতা।

পরম ভাগবৎ দেবর্ষি নারদ ভগবানের অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষে তিনি একদা দ্বারাবতীতে গিয়া উপনীত হইলেন। নানা কথা আলাপন ও বিবিধ প্রসঙ্গের পর, নারদ শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! জগতের যত কিছু নর নারী সকলেই ভক্তিভরে আপনার ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু এই ভূভারতে এমন কেহ আছেন কি, যাহাকে আপনিও ভজনা করিয়া থাকেন?" নারদ এই কথা বলিলে পর, ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "নারদ! সত্য বটে, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, জগতের যাবতীয় লোকই এক রকমে না এক রকমে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু আমারও ভজনার পাত্র আছে, আমি এ জগতে ছয়জনাকে ভজনা করিয়া থাকি।" এই কথা শুনিয়া নারদ বড়ই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বটে! যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা, যিনি জগতের আদি ও মূল

কারণ, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বর, যিনি অনাদি অনন্ত, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প, যিনি স্থূল হইতেও স্থূলতম এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জগতে আর কেহ নাই, যিনি কেবল লীলাবশতঃ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আবার ভজনার পাত্র কে হইতে পারে ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া নারদ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বিশেষ উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! যাঁহারা আপনারও ভজনার পাত্র, তাঁহারা কে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল-বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করুন।"

শ্রীভগবান বলিলেন,

"মিষ্টান্নদাতা তরুণাগ্নি হোতা
বেদান্তগশ্চন্দ্র সহস্র দর্শী
মাসোপবাসী পতিব্রতাপি
ষড়্‌জীব লোকে মম পূজনীয়াঃ॥"

"মিষ্টান্নদাতা, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্যক্তি, এক সহস্র চন্দ্র (পূর্ণচন্দ্র) দর্শী অর্থাৎ ভীমরথী, * মাসোপবাসী, † এবং পতিব্রতা সতী, এই ছয়জনাকে আমি ভজনা করিয়া থাকি।"

পতিব্রতা সতীকে আর্য্য সনাতনধর্ম্ম এইরূপ সর্ব্বোচ্চ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাস্তবিকও সতীনারী ভগবানেরও ভজনার পাত্রী। সতীকে তিনি বড় ভাল বাসেন। তিনি নির্ব্বিকার হইলেও সতীর ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয়; গুণাতীত হইলেও সতীর দুঃখ বিমোচনে সতত সচেষ্ট হইয়া তিনি যত কিছু অসামান্য ও অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকেন। শোকসলিলে নিপতিতা হইয়া, মর্ম্ম যাতনায় অধীরা হইয়া সতী যদি ভক্তিভরে কাতর প্রাণে তাঁহাকে একবার স্মরণ করে, তবে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না; সতীর ভক্তিডোরের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা-

* ভীমরথী—৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিবস জীবীকে ভীমরথী কহে; লোকের বিশ্বাস ভীমরথী হইলে যমের দাওয়া থাকে না।

† মাসোপবাসী—একাদশী আদি করিয়া মাসে মাসে যে সকল উপবাসের বিধি আছে, তাহা পালনকারী।

কল্পতরু হরি অনতিবিলম্বে তাহার শোকতাপ অপনোদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিমল আনন্দ ও শান্তিবিধান করিয়া থাকেন।

আদর্শ পতিব্রতা নারী সমাজের ও পরিবারের ভূষণস্বরূপ। তাঁহার হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ ও সুনির্ম্মল জ্যোতির আভায় অপর সকলের হৃদয় উদ্ভাসিত ও প্রতিফলিত হয়। রূপলাবণ্যবতী নারী মনপ্রাণবিমোহনকারিণী। সতী নারীর পবিত্রতার সঙ্গে যদি সৌন্দর্য্যের ও রূপলাবণ্যের একত্র সমাবেশ হয়, তবে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়। এইরূপ সৌভাগ্যবতী ও সুলক্ষণযুক্তা নারী মানব সমাজের জ্যোতিমান্ মধ্যমণি স্বরূপা; যেরূপ নয়নানন্দদায়িনী, তদ্রূপ হৃদয় পবিত্রকারিণী ও শান্তিবিধায়িনী। বীরহৃদয় ও সৎসাহসী পুরুষ এইরূপ আদর্শ রমণীর প্রতি প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। দুর্ব্বল, ভীরু, ক্ষুদ্রচেতা কাপুরুষেরাই রমণীদিগের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

অপোগণ্ড শিশু স্বাভাবিক ক্ষুৎপিপাসার বেগ সহ্য করিতে পারে না। যাবৎকাল না তাহার চরিতার্থতা সম্পাদিত হইয়াছে, তাবৎকাল যাতনায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। সেইরূপ চারুশীলা, সুহাসিনী রমণীর অধর-প্রান্তে মৃদু-মধুর-হাসির-রেখা, অপাঙ্গ দৃষ্টি ও বিলোল কটাক্ষ দেখিলে স্বতঃই পুরুষের মনে দারুণ কামভাবের উদ্দীপনা হইয়া থাকে। যদি সুশিক্ষা দ্বারা তাহার রুচি মার্জ্জিত ও চরিত্র সুগঠিত না হইয়া থাকে, তবে সে কামরিপুকে দমন করিতে অসমর্থ হয়; তাহার বিশুদ্ধ অধ্যাত্মভাব প্রবল পরাক্রান্ত জঘন্য পশুভাবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। তৎপর রমণী তাহার রূপজমোহে পুরুষকে বিমুগ্ধ করিতে পারিল বলিয়া, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; পুরুষ স্বীয় দৌর্ব্বল্য দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। যদি নিজের পুরুষত্ব বজায় রাখিতে চাও, তবে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হয়, তাহার ক্রম অভ্যাস কর। তেজবীর্য্যসম্পন্ন হইতে হইলে, ইহাদের অপব্যয় ও অপব্যবহার না করিয়া সুদৃঢ় ধৃতিশক্তি দ্বারা প্রভূত যত্ন সহকারে তাহাদিগকে ধারণ করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই মনে পশুভাবের ঘনান্ধকারের ছায়া অপনোদিত হইয়া, তাহার স্থানে দেবভাবের সুবিমল ও সুস্নিগ্ধ জ্যোতির আভা প্রতিভাত হইবে।

যদি নারীজাতির প্রীতি ও ভালবাসা পাইতে চাও, তবে নারী বিশেষের

প্রতি আসক্ত হইও না, নারীবিশেষের মন আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইও না, নারীবিশেষকে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে তৎপর হইও না। যাহা দুর্লভ, তাহা পাইবার জন্যই রমণীগণ সদাসর্ব্বদা লালায়িত, যাহা সুলভ তাহার জন্যে তাহাদের বড় একটা আসক্তি ও একাগ্রতা থাকে না।

রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যদি মনে কুবাসনার উদ্রেক হয়, তবে জানিবে তোমার মন পবিত্র হয় নাই। অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেও যদি তাহার মুখপানে চাইলে মনে কামভাব উদ্দীপ্ত না হয়; যদি অবস্থা ও স্থল-বিশেষে কোন রমণীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, কোনটির প্রতি পবিত্র প্রীতি ও বিশুদ্ধ ভালবাসা এবং কোনটির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে জানিবে যে তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তুমি দুর্গম ধর্ম্মপথে পদার্পণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে স্বভাব বিশুদ্ধ ও হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে কি না, ইহাই তাহার বিশেষ এবং একমাত্র পরীক্ষার স্থল।

কায়িক, বাচিক, মানসিক ও অধ্যাত্মভাব সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূরণ, বিকাশ ও পরিণতির জন্যে, এক কথায়, মানব জীবনের পূর্ণ ঔৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে, তাহাকে যে কাম রাগ বিবর্জ্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এমন নহে। যে আজীবন বাসনাশূন্য, বিবেকবুদ্ধিবিহীন, সে নিতান্ত অপদার্থ। এইরূপ নিরেট মূর্খ, জড়বুদ্ধি ভরতকে আপামর সাধারণে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বাসনা বা ইন্দ্রিয়শক্তি জীবমাত্রেরই সাধারণ প্রবৃত্তি। দেহ ধারণ করিলেই অল্লাধিক পরিমাণে ভোগতৃষ্ণায় আসক্ত হইতে হয়। প্রাণী জগতের ন্যায় মনুষ্য-মাত্রই এই সকল বাসনাজালে জড়িত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে মানুষে ও পশুতে কোন ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা মত্তমাতঙ্গরূপ মনকে দমন করা, অভ্যাসের দ্বারা দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমশঃ স্ববশে আনাই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব; অন্যান্য প্রাণীগণ হইতে ইহাই তাহার বিশেষত্ব। যে কামের বশীভূত, বাসনার দাস, সে প্রকৃত মনুষ্য নামের অযোগ্য, সে মানবদেহধারী পশু বই আর কিছুই নহে।

আহার নিদ্রা মৈথুন ইহা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যদি কেহ মনে করেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে ঘরকন্না করিব, কেবল আত্মসুখেই রত থাকিব, পরের জন্যে ভাবিবার কোন আবশ্যকতা নাই, স্ত্রীকে ভাল ভাল

অলঙ্কার দিব, পুত্র কন্যাকে সুন্দর সুন্দর পোষাক পরাব এবং নিজে আহারে বিহারে সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত থাকিব, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা যথাসম্ভব উদর পূরণ ও রসনার তৃপ্তিসাধন করিব, ইহাই আমার জীবনের চরমসুখ, ইহা ব্যতীত আমি অপর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না ;" এইরূপ মনে করিয়া যদি কেহ তাহাতেই সদাকাল নিমজ্জিত ও মত্ত থাকে, এবং তাহা লাভ হইলেই যদি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে থাকুক, ক্ষতি কি ? "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং" মরণান্তে তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ বিচ্ছেদশোকে বিলাপ করিবে, বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অদর্শনে কয়েকদিনমাত্র আক্ষেপ করিবে, বলিবে, "আহা ! লোকটা মন্দ ছিল না।" স্ত্রীপুত্রাদি যথাসময়ে তাহার যথাযোগ্য ঔর্দ্ধদৈহিক সংকার সম্পাদন করিবে। এই মাত্রই এইখানেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া চিরদিনের মত যবনিকা পতিত হইয়া গেল। যতই দিন যাইতে থাকিবে, লোকে ততই তাহাকে ক্রমশঃ ভুলিতে থাকিবে,পরে তাহার সম্বন্ধে আর কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্তও করিবে না।

কিন্তু যদি কাহারও মানবজীবনের মহৎ ও চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে, যদি কেহ পুনঃ পুনঃ অসংখ্য জন্ম মরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে অভিলাষী হন, যদি তাহার অদৃষ্টের অধীশ্বর হইতে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহার মনকে বশে আনিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি স্বীয় মনের প্রবৃত্তি কয়েকটাকে দমন করিতে না পারিলে, তবে সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় ও প্রবল নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জকে স্ববশে আনিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? যদি জন্মমরণের অতীত হইয়া দেবত্ব ও অমৃতত্ব লাভ করিতে প্রয়াসী হও, তবে এই সকল শক্তি নিচয়কে বশীভূত করিতেই হইবে। মনকে বশীভূত কর, ইন্দ্রিয়দিগকে দমন কর, অনায়াসে তাহারা বশীভূত হইবে। আত্মবশ কর, তাহা হইলেই জগৎ বশ হইবে। ইহা করিতে গিয়া পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, পরিবার পরিজনকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে বনে গমন করিতে হইবে, তাহা নহে, ইহাতে বরং ঘোর প্রত্যবায় আছে।

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

স্বীয় অধ্যয়ন, পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিপালন

কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য তীর্থ-যাত্রা করিলে, সেই তীর্থ নরকের কারণই হইয়া থাকে।

যদি কেহ সংসার সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, বীতরাগ বশতঃ পিতা মাতা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব ভারের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া, তাহাদিগকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া ধর্ম্মলাভের জন্য বনে গমন করে, তবে তাহার আদৌ ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে না; কারণ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানই লাভ হয় নাই; সে ভীরু ও কাপুরুষ। ধর্ম্মজীবন লাভ করা যেমন ভগবানের বিধান, পরিবার প্রতিপালন করা সেই ভগবানেরই বিধান; এই শেষোক্ত বিধানটী এতদুভয়ের মধ্যে মুখ্যতর; তাহার সম্যক্ প্রতিপালন না করিলে, ইহা পূর্ব্বোক্তটী লাভের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

যিনি চির কৌমার্য্য ব্রতধারী, যাঁহার কোনরূপ সংসার বন্ধন নাই, যিনি প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত, আত্মচিন্তা ব্যতীত কাহারও জন্যে যাঁহাকে কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় না, তাঁহার আত্মোন্নতির জন্য অধ্যয়ন ও ধ্যানোপাসনার সুযোগ অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। তিনি বিষয় বাসনা পরিশূন্য হইয়া, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একান্তে বস বাস করিতেছেন; অপর কাহারও অভাব অভিযোগের জন্য, শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার জন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতে হয় না; তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বার্থপর বলিতে হইবে; বিশেষতঃ সংসারের কোলাহলের বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় সমাজের অনুকূল প্রতিকূল চিন্তাস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও স্ফূরণ হওয়ার সুবিধা থাকে না; কাজেই নানারূপ প্রলোভন প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার লাভ হয় না। কিন্তু যিনি নানারূপ প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহার এই সকল প্রলোভনের প্রবল আক্রমণ প্রশমন করিতে গিয়া অনবরত মানসিক শক্তি সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃই তাঁহাদের মনের বল প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সাংসারিক কঠোর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সদাকাল নিযুক্ত থাকাতে পূর্ব্বোক্ত সংসারত্যাগী কুমার ব্রতধারীর ন্যায় তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির ততদূর সুবিধা থাকিবে না বটে, কিন্তু দেহান্তরে স্বীয় কর্ম্মবশে তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন অধ্যাত্ম

জ্ঞান লাভের জন্য ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন, তখন তিনি প্রকৃত সংযমী বলিয়া গণ্য হইবেন। এবং সেই মহাপথের সোপান গুলি দ্রুতপাদবিক্ষেপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন। যে সদাকাল পাশব শৃঙ্খলে বাঁধা, সে বন্ধন মুক্ত না হইলে অধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারে না। যে জীব স্বীয় পাশববৃত্তির দাস, সে অপরকে ধর্ম্মপথে পরিচালন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য। অবিরাম ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শারীরিক স্নায়ুমণ্ডল দৃঢ় ও বলিষ্ট হয়, সেইরূপ অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি (Will power) প্রবলা হয়। এই জন্যই মনকে দৃঢ় ও সবল করার জন্য সংসারিক প্রলোভনের এত প্রয়োজন।

যাঁহার মনে বেগবতী বাসনা বিদ্যমান, অথচ যিনি বিশেষ দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত সেই প্রবল বাসনার বেগ প্রশমিত করিয়া শান্তিলাভ করেন, তিনি ধীরাগ্রগণ্য, তাঁহার মত বীর পুরুষ আর কেহ নাই। সংসারে জীবের মনে যত কিছু প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে, তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা ও স্ত্রীসহবাস সুখ প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলা। যিনি এই দুর্দ্দমনীয় আসক্তিকে সম্যকরূপে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি মর্ত্তলোকে বসতি করিয়াই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

মানব হৃদয়কে পৌত্তলিক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা বহিঃসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু মানবাত্মাই প্রকৃত উপাসক, যে হেতু ইহা নশ্বর বাহ্যিক রূপলাবণ্যে ভুলেনা, ইহা স্থির সৌন্দর্য্যের আধারভূত, অপক্ষয় শূন্য আদর্শের পক্ষপাতী, সচ্চিদানন্দের উপাসক। পিতৃ পুরুষের পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পুত্রোৎপাদনের জন্য পুরুষ আত্মার সহিত রমণী হৃদয়ের যে সম্মিলন ইহাই প্রকৃত উদ্বাহ পদ বাচ্য।

কেবল ইন্দ্রিয় লালসা বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করার জন্য স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগ কখনই উদ্বাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। এই উদ্দেশ্যে সম্মীলিত স্ত্রী পুরুষ পশু অপেক্ষাও অধম; কারণ পশু পক্ষীর সন্তানোৎপাদিকা শক্তির ব্যবহার সময় বিশেষে নির্দ্দিষ্ট আছে, অপব্যবহার নাই, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা থাকায়, তাহারা কামান্ধ হইয়া অধিকাংশ স্থলেই এই শক্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনবল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে।

বিবাহ, দশ সংস্কারের এক প্রধান সংস্কার। সংস্কার অর্থে শুদ্ধি, নির্ম্মলীকরণ;

যদ্বারা দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল থাকিতে পারে, তাহাই সংস্কার। বিবাহ সংস্কারের সুমহান্ আদর্শ যতদিন সমাজে বর্ত্তমান ছিল, যত-কাল পর্য্যন্ত লোক প্রাগুক্ত ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া পরম মাঙ্গল্য উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিত, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার সুখশান্তিময় ফল ও সমাজ উপভোগ করিত, বিধির অলঙ্ঘ্য নিয়মের অপ্রতিহত প্রভাবে এবং কালমাহাত্ম্যে সমাজ হইতে, লোকের মন হইতে, বিবাহের সেই আদর্শ ধর্ম্মভাব, পরম পবিত্র সেই অধ্যাত্মভাব, সেই মহৎ উদ্দেশ্য বহুদিন যাবৎ চলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল লোক বাহ্য চাকচক্যে ভুলিয়া রূপজমোহে বিমুগ্ধ হইয়াই বিবাহজালে জড়িত হইয়া থাকে; তাই সমাজ হইতে পারিবারিক সুখশান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

স্বামী স্ত্রীতে নানারূপ মতভেদ থাকিতে পারে, পরস্পরের আশক্তি ও রুচির পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পরের একত্র সহবাসে এই প্রভেদ ও পার্থক্য দূরীভূত হইয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে সমতা সংস্থাপিত হইতে পারে। অতি ভয়ঙ্কর যে কালসর্প, তাহাকেও সখের খাতিরে পোষণ করিয়া অভ্যাস বশতঃ লোকে তাহাতে আসক্ত হয়, আর দৈবাধীন বশতঃ স্ত্রী পুরুষের মনে প্রথম প্রথম একে অন্যের প্রতি অসন্তোষ ও অপ্রীতির ভাব থাকিলেও বহু-কাল একত্রবাসের পর, সময়ে কি তাহা সংশোধিত ও অপনোদিত হইতে পারে না?

যদি পুরুষ স্ত্রীকে তাহার একমাত্র ভোগ্য বস্তু ও সেবাদাসী বলিয়া মনে করে, এবং কালাকাল বিবেচনা না করিয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্ব পরিচালনে স্বীয় পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে সদাকাল বাধ্য করে, তবে অনতিবিলম্বেই তাহার মনোবৃত্তিনিচয় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যে স্ত্রীসম্ভোগের জন্য সে কামের প্ররোচনায় সর্ব্বদা উন্মত্ত ও উত্তেজিত থাকিত, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা প্রযুক্ত অচিরে সে তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে, কালে সেই ইন্দ্রিয় সুখ ও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে। স্ত্রীর প্রতি তাহার পূর্ব্বা-নুরাগ ও পূর্ব্বাশক্তির হ্রাস হইয়া আসিলে সে স্ত্রীকে তাহার গলগ্রহ বলিয়া মনে করে। এবং স্ত্রীও তাহাকে অন্তঃসার বিহীন কাপুরুষ বলিয়া আন্তরিক অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দাম্পত্য প্রণয়ের প্রীতি ও সুখ চিরদিনের

মতন তাহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং শোক তাপ, দুঃখ দুর্দ্দশা, এমন কি বিচ্ছেদেও অপমৃত্যুই সেই পরিণয়ের বিষময় পরিণাম ফল হইয়া থাকে।

বলা সোজা, কিন্তু করা শক্ত। উপদেশ দিতে অনেকেই পটু, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে কয় জনা সমর্থ? এইরূপ উপদেষ্টা বহুতর মিলে, যাহারা অবিশ্রান্ত বলিয়া বেড়ায়, "সাবধান! মনকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল কর, স্ত্রীলোকের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইওনা, অনুপম-রূপলাবণ্যবতী-ললনা তোমার দৃষ্টি পথের পথিক হইলেও তাহার রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইওনা, যাহাতে মনের কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনা জাগরিত না হয়, তৎপ্রতি সচেষ্ট ও সবিশেষ সাবধান থাকিবে। পরস্ত্রী দর্শনে যদি মনে কামানল উদ্দীপ্ত হয়, তবে তাহাকে মানসিক ব্যভিচার বলে, ইহা ভয়ানক পাপ! সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিবর্জ্জনীয়। ইত্যাকার উপদেশের আজকাল অভাব নাই, ইহা শুনিতেও বেশ শুনায়, বলিতেও বেশ লাগে, কিন্তু কাজের বেলা করিয়া উঠা যে কত কঠিন ব্যাপার, ইহাতে কাহারও মুখে স্ফুরেনা! কি জানি, পাছে কেহ অসমর্থ ও অনাধিকারী ভাবে, এই মনে ভয়!

শত্রুকে প্রবল বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই, তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্মে সর্ব্বদা সাবহিত, শশঙ্কিত ও সচকিত থাকিতে হয়; তাহা হইলে পরাজয়ের আশঙ্কা অতি অল্পই থাকে। আর যদি সামান্য বোধে তাহাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা যায়, তবে শত্রু আমাদের অসাবধানতা বশতঃ অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষিতভাবে প্রবল আক্রমণ করিয়া যুগপৎ আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলে। শত্রুকে সামান্য বোধে অবজ্ঞা করা নিতান্ত অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য। অন্তরে বাহিরে, জ্ঞাত অজ্ঞাত, আমাদের যত শত্রু আছে, তন্মধ্যে কামই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ শত্রু। এই দুর্দ্ধর্ষ, দুরাশদ ও দুরতিক্রম্য কামরিপুর দমন করা কার্য্যকে, যে সহজ ও অল্লায়াস সাধ্য বলিয়া মনে করে, তাহাকে বিশ্বাস করিও না, সে ভণ্ড ও মিথ্যাচার। জপতপাদি যত কিছু কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধনা আছে, তন্মধ্যে কামরিপুদমন সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধন; বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে! "কিসে এই বহ্বায়াস সাধ্য সাধনায় সফলকাম হওয়া যায়?"

"দৈব সম্পদ অর্জ্জন কর, আসুর সম্পদ বর্জ্জন কর! তবেই এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে।"

দৈব সম্পদই এই শত্রুকে সমূলে সংহার করার অমোঘাস্ত্র। এই অস্ত্র পরিচালনায় অভ্যস্ত হইলে, তাহার অব্যর্থ সন্ধানে অচিরেই ইহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞান যোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জবম্॥ ১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ লোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহোনাতি মানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়া সুরীমতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবী মভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫॥

১৬শঃ অঃ গীতা।

"অভয়, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়েনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, অধ্যাপন, শরীরসংযম, সরল স্বভাব, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ক্রোধরাহিত্য, স্বার্থ-ত্যাগ, (কর্ম্মফলে স্পৃহা শূন্যতা), শান্তি. (চিত্তোপরতি), পরোক্ষে পরদোষ অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, লোকলজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, জিঘাংসারাহিত্য, অনভিমানতা, এই গুলিকে দৈব সম্পদ বলা হইয়া থাকে।"

দম্ভ (ধর্ম্মধ্বজীত্ব), দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকতা, এই গুলি আসুর সম্পদ নামে খ্যাত।

দৈব সম্পদ মুক্তির এবং আসুর সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ।

এই দৈব সম্পদ লাভ হইলেই আত্মসংযমী হওয়া যায়; আত্ম সংযমনই পবিত্রত; পবিত্রতাই দেবত্ব—নির্ব্বিকারত্ব ও অমৃতত্ব! ইহাই জীবের পরিণাম।

শ্রীসুদর্শন দাস।

ওঁ

প্রণব, ছবি ও গান।

সঙ্গীত আলাপ।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥"

গীতা ৯ম অঃ।

"অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগত ব্যাপিয়া আছি। সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, ভূত-সকলও আমাতেও অবস্থিত নহে। আমি ভূত-ধারক ও ভূত-পালক; তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি।"

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগের" এইটি সমস্যা। গায়ক এই সমস্যার প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত তানপুরা বাঁধেন। মহাজ্ঞানী অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন যে "তিনি" ও "তুমি" এক। আমি বুঝিতেছি তাঁহার এক অংশ বুঝি আমাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা লইয়াই পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের যত গোল। বিশ্ব-ব্যাপী মহা আনন্দময় সুর মহাদেবের তানপুরায় অবিচ্ছেদে ধ্বনিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি নিজে যে বেসুরা, সে সুর কি করিয়া বুঝিব? এইজন্য প্রথমতঃ তানপুরার একটি ছোট রকমের সুর বাঁধিতে হয়। তানপুরার মধ্যে ছোট রকমের একটি ওঁকার ধ্বনিত হয়, কিন্তু অস্ফুট হইলেও, তাহা যথার্থ প্রণবের অনুরূপ। এ তানপুরা গুরু বাঁধিয়া দেন। যখন শৈশবে বাল্যসখাগণ সহ গোলদিঘীর বাপীতটে বসিয়া গান করিতাম, তখন মনে এই ধারণা ছিল যে আমার সাতটী সুরই বুঝি প্রকৃত সুরের অনুরূপ। যেমন শ্রোতা, তেমনি গায়ক! তখন তানপুরার সুর কানে বাজে নাই। ভাবিতাম তানপুরার সুর ত মস্তিষ্কে আছেই, তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া বৃথা আড়ম্বর কেন? শিশুর ক্ষুদ্র ভ্রম ও যাহা, জ্ঞানীর বৃহৎ ভ্রম ও কেবল তাহারই বিস্তার মাত্র। নিজের সুর তান-

পুরার সুরের সঙ্গে যুক্ত না করিলে, আমি কি করিয়া বুঝিব যে সুরের জ্ঞান আমার হয় নাই; সুর থাকিয়াও যে আমার কাছে নাই?

তানপুরার সুর আমার অজ্ঞাতে নিয়তই ভিতরে বাজিতেছে। তাহাতে আমার কি লাভ হইল? সে সুর একবার শ্রবণ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রজ্ঞা-কর্ণে সে সুরের সহিত আমার নিজের সুরের পার্থক্য বিচার করিয়া ধীরে ধীরে তন্ময় না হইলে, সুরের চৈতন্য ত হয় না! ইহাই দ্বৈত অবস্থা। যেমন নিরাশ কবি জগতে আনন্দ বিতরণে অশক্ত হইয়া, সমালোচনার কূটতর্কে শ্রোতার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া থাকেন, তেমন আমরাও সুরজ বিমল আনন্দ ভোগ না করিয়া "অদ্বৈত" এবং "দ্বৈতাদ্বৈত" জ্ঞানের তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। গায়ক হওয়া এবং সঙ্গীতের সমালোচনা করা—আকাশ পাতাল প্রভেদ। এইজন্য গোলযোগে সঙ্গীত সুসিদ্ধ হয় না। "সুর আমাতেই আছে" ইহা কেবল তানসেনের ওস্তাদের মত একটা গায়ক বলিলে, শোভা পায়, কিন্তু গর্দ্দভের শোভা পায় না। যদি তোমাতেই সুর থাকে, তবে তুমি নিজে বেসুরা কেন? এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেক যুগ চলিয়া যাইবে; অনেক সঙ্গীত-সমিতি এবং অনেক গায়কের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে। তাই, মনে রাখিও জগতে আমাকে "তোমার" করিতে পারি, তোমাকে "আমার" করিতে পারি কই? সে শক্তি আমার এখনও হয় নাই। যদি মনে কখনও তদ্বিপরীত ধারণা হইয়া থাকে, তবে তাহা অহঙ্কার বই আর কিছুই নয়।

বড় কঠিন সমস্যা! যোগমায়া জীবের জ্ঞানের বহির্ভূত। যেমন তোমার ক্ষেত্ররূপ দেহের মধ্যে কতিপয় বেসুরা রাগিণী, তেমনি সেই মহাশূন্যব্যাপী সুরের মধ্যে ষোড়শ সহস্র রাগিণী। জ্ঞানে যুক্ত হও, ভক্তিতে যুক্ত হও, কর্ম্মে যুক্ত হও, তোমার বেসুরা রাগিণী প্রকৃত সুরে পরিণত হইবে। ইহা নিশ্চয় যে "তুমি" নিজের চেষ্টায় যুক্ত না হইলেও বহু মন্বন্তরে বিবর্ত্তন স্রোতে যুক্তের অবস্থায় নীত হইবে? কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কি ভাল? অনাহত-ভেরী ত সর্ব্বদাই হৃদয় হইতে কর্ণকুহরে বাজিতেছে, তবে শুনিয়া সুখী হই না কেন?

এই বিরাট সুরের মধ্যে আমার বেসুরা সুর একটী শুক্তিবৎ মহাসমুদ্রে বিরাজ করিতেছে। যেমন মহাবায়ু আকাশ প্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, সংসার

ক্ষেত্রে নানা উপাধিতে আহত হইয়া নানাবর্ণের রাগ উৎপাদন করে, তেমনি আমার সুরও ছয়টী পর্দায় আহত হইয়া, নানা ভাবে আমাকে আলোড়িত করে; কিন্তু এ পর্দাগুলি সুরে বাঁধা কই! আমার এই দেহস্থিত কোষাণু (Cells) জন্মে, মরে এবং পেশীর (Tissue) পরিবর্ত্তন ঘটায়। তাহাদের তুলনায় আমার জীবন অসীম; অথচ তাহারা যুক্ত হইয়াও আমাতে নাই। আমার বিরাট দেহের ভাব তাহারা বুঝিবে কি করিয়া? আমি যখন গান করি, তাহারা বিলোড়িত হইয়া রক্তের প্রবাহ মধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং সেই স্পন্দন হৃদয় চক্র হইতে কর্ণমূলে গিয়া Organs of Corti সৃষ্টি করে। দেখ কি করিয়া কোষাণু একস্থানে মৃত হইয়া, দেহের অন্যস্থানে জন্মগ্রহণ করে। "ফুল ভেসে যায় গঙ্গাজলে!" যেমন আমার দেহের সহিত দেহস্থ কোষাণুর সম্বন্ধ, তেমনি বিরাট দেহের সহিত তোমার আমার সম্বন্ধ। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে জীব, জীবের মধ্যে মানব,—ইহা কেবল মহাসূত্রের নানা গ্রন্থি। আমার যেমন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নানা অবস্থা হইতেছে, অথচ আমার "আমিত্ব ভাব" * জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিতেছে; যেমন আমার শরীরে কোষাণুর (Cells) জন্ম মৃত্যু প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হইতেছে, কিন্তু "আমি" তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি;—অথচ কোষাণুগুলি আমারই জীবনে জীবিত, সেই বিরাট সম্বন্ধে আমরাও তদ্রূপ। তবে আমাদের স্পর্দ্ধার বিষয় এই, আমরা সেই বিরাট দেহের হৃদয় ও মস্তিষ্কের স্থান প্রাপ্ত হইতেছি। "আমার জ্ঞান আছে" "আমার ভক্তি আছে" ইত্যাদি কল্পনা করিয়া এই জীবনটা কাটাইব সন্দেহ নাই; তবে ফল এই একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে একটা tissue ছাড়িয়া অন্য tissue বর্দ্ধন করিব মাত্র। ভাই, কতকাল এ লাফালাফি করিবে? একটু সুরে যুক্ত হইয়া পরিশ্রম করিলেই ঐ বিশ্বদেহে একটা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিতে পার। জাননা কি যে তোমার করুণস্বর স্বর্গ পর্য্যন্ত যায়? যেমন ক্ষুধাতুর হইলে শরীরস্থ কোষাণু উদরকে জানায়, উদর মস্তিষ্ককে জানায়, মস্তিষ্ক হৃদয়কে জানায় এবং এই আন্দোলনে "আমি" যুক্ত হই, সেই-

---

* "Belief in the reality of Self is indeed a belief which no hypothesis enables us to escape········ mind" H, Spencers 1st. Princip: Ch III

রূপ আমাদের করুণস্বরে তিনি যুক্ত হন। তাঁহার ক্ষুধা—প্রেম, ভক্তি। আমার হইলেই, তাঁহার হইবে ; এবং তাঁহাকে ক্ষুধাতুর অবস্থা জানাইবার উপায় আছে। যেমন তোমার শরীরে স্নায়ুমণ্ডলী সেইরূপ বিশ্বমাঝে তাঁহার বিরাট দেহে স্নায়ু প্রবাহ অজ্ঞাত ভাবে বিরাজ করিতেছে। উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মুক্ত কাল্পনিক মহাপুরুষগণ এক একটী Ganglia কিংবা Reflex Centre এর স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পঞ্চভূতাত্মক কোষাসুর আর্ত্তনাদ Reflex Centre ভেদ করিয়া আমাদিগকে যদ্রূপ ব্যথিত করে, তেমনি আমাদিগের প্রেম ভক্তি নানা চক্র ভেদ করিয়া, তাঁহার হৃদয় দ্রব করিয়া, আমাদিগকে সিক্ত করে। এ আবির খেলা ; এ ৩৷৷০ মাত্রার হোলির গান বৃন্দাবনে নাকি কে বুঝিয়া ছিল।

ভাই এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও। আমি যে তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহার চরণপ্রান্তে অবস্থিত, এই জ্ঞান মানবের পিতৃদত্ত ধন। তিনি আমাতে আছেন, ও আমি একজন ; তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র অতএব আমি মরিয়া গেলে তিনি অন্য ফুলে উড়িয়া গিয়া বসিলেন—এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানই সর্ব্বনাশের মূল। যদি আলাপ শুনিতে চাও, তবে ছোট ছোট সুর ও ছোট ছোট তালে প্রথমে অবতীর্ণ হও। ব্রহ্মার দিনরাত্রি, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, পুনর্জন্ম কর্ম্মফল, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ, দেবযান পিতৃযান এবং শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়া পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত শাস্ত্রের অন্তর্গত। একটু গাহিলেই সব বুঝিতে পারিবে কিন্তু প্রথমেই রাগিনীর চর্চ্চা না করিয়া রাগের চর্চ্চা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

তানপুরা গায়কের অমূল্য ধন। এইজন্য গায়ক তানপুরাটীকে অতি যত্নে রাখেন। যোগী যেমন রেচক পুরক কুম্ভকে সিদ্ধ হইলে ওঁকারধ্বনির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন সেই প্রকার গায়কও তানপুরা বাঁধিতে শিখিলে ছোটখাট একটি প্রণবের রাজ্য আবিষ্কার করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে সেই সুরে মনোযোগ করিলেই, প্রতি চক্রোত্থিত ধ্বনি শ্রবণ করা যায়। বাস্তবিক কেবল খরজের * তার হইতে গান্ধার প্রতিধ্বনিত হয়,

---

* তানপুরায় ৪টী তার থাকে মাত্র। ২টী সুর, একটী পঞ্চম ও একটী খাদের সুর। অর্থাৎ উদারার সা হইতে পঞ্চম এবং পঞ্চম হইতে মুদারার সা (জুড়ী) সুতরাং তানপুরায় একটী গ্রাম কিংবা Scale মাত্র থাকে।

পঞ্চম হইতে রেখাব প্রতিধ্বনি হয়, এবং তাহাদেরই সংমিশ্রণে অন্য কয়টী সুর শুনা যায়। প্রথম তরঙ্গ দ্বিতীয় তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঘাত প্রতিঘাত হইলে আবার নূতন কেন্দ্রে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। * পাঠকদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণার্থ প্রপঞ্চসার, লঘুসত্ব, শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে এই সুরের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

"কারণ-বিন্দু মূলাধারে বায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শব্দরূপে বিকশিত হয়; সুতরাং কারণবিন্দু কার্য্য বিন্দু হইল। (রহস্যাগম) যে ধ্বনি মূলাধারে উত্থিত হয় তাহা পরা, তৎপরে যাহা স্বাধিষ্ঠানে উপনীত হয় তাহা পশ্যন্তি। হৃদয় চক্রে উপস্থিত হইলে তাহার নাম মধ্যম (মা)। বিশুদ্ধ চক্রে উপনীত হইলে তাহার নাম বৈখরি। (লঘুসত্ব)" ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মুদারার স্থান। হৃদয় হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত উদারা এবং কণ্ঠ হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত তারা। তানপুরার ধ্বনি হৃদয় হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত স্থান লইয়াই ক্রীড়া করে।

ইহার মর্ম্ম পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাঁহাদের তানপুরা বাঁধিয়া দিবার উপযুক্ত ওস্তাদ নাই, তাঁহারা সেতার হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া সুর চর্চ্চা করেন। একভাবে ইহা মন্দ নয়। যে ভাবেই সুর চর্চ্চা করুন না কেন, কেবল সুরের উপর লক্ষ্য রাখিলেই হইল। এই জন্যই গায়কবৃন্দ সুর জমাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন।

একটা রাগিণী লইয়া বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলে আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পূরবী রাগিণী অনেকেই ভাল বাসেন। পূরবী সায়ং কালীন রাগিণী †। সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেই, সন্ধ্যার ছায়া জগতে পতিত হয়। পৃথিবীর একস্থানে আমি বসিয়া আছি, দেখিতে২ তথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল কেন? পৃথিবীর বিরাটদেহ আবর্ত্তিত হইয়া আমাকে সূর্য্যালোক হইতে বহুদূরে অপসৃত করিল। পৃথিবীর আবর্ত্তন (Rotation on Axis) আমার কাল স্বরূপ। যে সকল জীবের কর্ম্ম দিবসে শেষ হয়, তাহারা সন্ধ্যাগমে ঘুমাইয়া পড়ে। মানবের

---

* বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এ সম্বন্ধে পরে বক্তব্য রহিল।

† ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দেহ।

অবস্থা কিছু উচ্চতর। সন্ধ্যা হইলেও, তাহার নিস্তার নাই। তাহারা এই দেহ লইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ প্রথম যাম, কেহবা দ্বিতীয় যাম এবং যাহাদের প্রবৃত্তিনিচয় সবল তাহারা সারানিশি জাগরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যদেবত অস্ত যান নাই; পৃথিবী অস্তাচলে গিয়াছে, এবং তুমি তোমার কর্ম্মের ফলে রসাতলে গিয়াছ; তুমি সূর্য্যদেবের দোষ দেও কেন? প্রজ্ঞা চক্ষে একটু চাহিয়া দেখ—তোমার জীবন সূর্য্য কোথায়। তোমার দেহের একভাগ পশু পক্ষীর যোনি, একভাগ বৃক্ষলতাদির যোনি, একভাগ মানব যোনি ও তৃতীয়ার্দ্ধভাগ মানসপুত্রের আত্মা—ইহারই মধ্যে তোমার যত কর্ম্ম। এ কর্ম্মের রাগিনী কি?

প্রকৃতি তোমাকে কি দেখাইতেছে? ঊর্দ্ধে হেমাভ (Orange) মধ্যে হেমাভযুক্ত নীল (Purple) তন্নিম্নে অস্তগামী সূর্য্যের ঘোর সিন্দুরবর্ণ। সর্ব্বোচ্চে সান্ধ্য-ছায়া-সিক্ত গগনের নীলাভা। সূর্য্য অস্ত গেলেই স্তরে স্তরে ঐ বর্ণগুলি অস্ত যাইবে; ক্রমে জীবনসৈকতে গাঢ়তর অন্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হইবে। তুমি মানব, তুমি গৃহাধিষ্ঠাত্রী হেমবরণীর মুখপদ্ম স্মরণ করিয়া সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেল। এক পদ্ম গেল, অন্য পদ্ম ফুটিল। সূর্য্য গেল, চন্দ্র আসিল। ইহাই জগতের খেলা—

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বেদান্তের ঈশ্বর।

আর্য্য ঋষিরা জগৎকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। জাগ্রদ্ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদা যে জগতের সাক্ষাৎ পাইতেছি সেই স্থূল জগৎ। স্থূল দেহের সহযোগে এই স্থূল জগৎ আমাদের অনুভবের বিষয় হইতেছে। সূক্ষ্ম জগতের অনুভবের উপযোগী আমাদের সূক্ষ্ম দেহ আছে। স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন আমরা এই সূক্ষ্ম জগতের অনুভব করি। কদাচ সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী গন্ধর্ব্ব পিশাচাদির সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ

জগৎ আরও সূক্ষ্ম। সে জগতের অনুভবের উপযোগী কারণ দেহ অধিকাংশ মনুষ্য শরীরে এখনও সুব্যক্ত হয় নাই। সেই জন্য সুষুপ্তি অবস্থায় কেহ কেহ কদাচ এই কারণ জগতের অনুভব করিতে পারে। আর সাধনাবলে কদাচিৎ ঐ জগতের অধিবাসী দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করে।

মনুষ্যকে এক হিসাবে জগৎত্রয়েরই অধিবাসী বলা যায়। জগতের স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য অনুসারে, অনুভবের কারণ দেহেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেমন স্থল পথে ভ্রমণ করিতে হইলে মনুষ্য শকটের ব্যবহার করে; জল পথে ভ্রমণ করিতে হইলে তাহাকে নৌকার সাহায্য লইতে হয়; আর আকাশ পথে বিচরণ করিতে হইলে ব্যোমযানের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ জীব যখন স্থূল জগতে বিচরণ করে তখন সে স্থূল দেহের ব্যবহার করে; যখন সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে তখন সে সূক্ষ্ম দেহের বিনিযোগ করে; এবং যখন কারণ জগতে বিচরণ করে তখন তাহাকে কারণ দেহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যেমন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটি জগৎ তেমনি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মানবের এই তিন অবস্থা ও স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ।

সম্বিৎ (Consciousness) যখন জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল দেহে অবস্থান করেন, তখন বেদান্ত দর্শনের মতে তাঁহার পারিভাষিক নাম 'বিশ্ব'। যখন স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'তৈজস'। এবং যখন সুষুপ্তি অবস্থায় কারণ দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'প্রাজ্ঞ'। সম্বিৎ এক ও অদ্বিতীয়, কেবল উপাধিভেদে তাঁহার নামান্তর মাত্র। এই সম্বিৎই ব্রহ্ম। স্থূল উপাধিতে তাঁহার নাম বিশ্ব, সূক্ষ্ম উপাধিতে তাঁহার নাম তৈজস এবং কারণ উপাধিতে তাঁহার নাম প্রাজ্ঞ।

ইহা গেল ব্যষ্টির কথা। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ব্যক্তিগত (Individual) দেহ লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয়। জগতে কিন্তু সমস্ত ব্যষ্টি মিলিয়া একটা সমষ্টি আছে। সেই সমষ্টির দিক হইতে দেখিলে কিরূপ হয়? ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বৃক্ষের সমষ্টি বন; অতএব বৃক্ষ ব্যষ্টি, বন সমষ্টি। এইরূপ জলের সমষ্টি জলাশয়; অতএব জল ব্যষ্টি, জলাশয় সমষ্টি। এ উপমায় কথাটা বড় স্পষ্ট হয় না। কারণ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের অথবা

অন্য হইতে স্বতন্ত্র অন্যাশয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিতে পারি। এবং তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে—ব্যষ্টির রূপকাদর্শ (Idealisation) মাত্র নহে। সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে সে দৃষ্টান্তটা কোষাণুর (Cell) দৃষ্টান্ত। কোষাণু সমষ্টি মিলিয়া স্থূল শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। অথচ কোষাণু সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব কোষাণু হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এ বিষয়ে জৈবতত্ত্ব বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এইরূপ।

The cells composing an organism are regarded as individual units and each with a distinct life and function of its own * * Every cell of the great coloney of cells composing the organism of every animal and plant has thus its special work to perform-the work consisting in the extraction from its immediate environment of those materials which are necessary for its own growth and nutrition. But this work is entirely subservient to and indeed is solely performed for the ultimate nutrition and building up of the whole organism of which each individual cell forms a very small but yet necessary unit.

যেমন কোষাণুর সমষ্টিতে এক একটি শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে—এইরূপ সমস্ত ব্যষ্টি স্থূল দেহের সমষ্টি মিলিয়া বিরাট, সমস্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্ম দেহের সমষ্টি লইয়া হিরণ্যগর্ভ এবং সমস্ত ব্যষ্টি কারণ দেহের সমষ্টি মিশিয়া বেদান্তোক্ত ঈশ্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভগবানকে শরীরী বলা হইল না। ইহার ভাবার্থ এই যে যখন ভগবান স্থূল জগতে ক্রিয়া করেন তখন স্থূল উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় বিরাট; যখন তিনি সূক্ষ্ম জগতে ক্রিয়া করেন তখন সূক্ষ্ম উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় হিরণ্যগর্ভ এবং যখন তিনি কারণ জগতে ক্রিয়া করেন, তখন কারণ উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় ঈশ্বর। অর্থাৎ স্থূল জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয় জীব পুঞ্জের স্থূল দেহ সমষ্টি। সূক্ষ্ম জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের

করণ হয় জীব পুঞ্জের সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টি ; আর কারণ জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয় জীব পুঞ্জের কারণ দেহ সমষ্টি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধারণ জীবে কারণ দেহ বড় পরিস্ফুট হয় নাই। কারণ দেহের পূর্ণ পরিণতি জীবন্মুক্ত পুরুষে। বস্তুতঃ মুক্ত জীবের কারণ দেহ সমষ্টি লইয়াই ঈশ্বরের কারণ শরীর। তাঁহারা প্রত্যেকে যেন ভগবানের কারণ শরীরের এক একটি কোষাণু (Cell)। যেমন স্থূল দেহের কেন্দ্র হৃদয় হইতে নানাদিকে প্রবাহিত ধমনী সমূহ দিয়া জীব শরীরে রক্ত সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ বিশ্ব দেহের কেন্দ্র স্বরূপ ভগবান হইতে ধমনী স্থানীয় মুক্ত পুরুষগণের কারণ দেহ সহযোগে জগন্ময় তাঁহার করুণারাশি বিতরিত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যাহা কিছু আছে সমস্তই ভগবানে নিবেদন করেন। তাহার ফল এইরূপ হয় যে যেমন সুস্থ স্থূল দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থূল দেহের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবন্মুক্ত পুরুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া এবং জগদ্ ব্যাপার কার্য্যে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ মিশাইয়া দিয়া ভগবানের প্রতিভূ স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারাই ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাঁহাদের কারণ শরীর সমষ্টিরূপ উপাধি যোগেই বেদান্তের ঈশ্বরের কারণ দেহ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(১)

চট্টা-মহেশতলার প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে আকড়া ষ্টেশনের সন্নিকটে জিঞ্জিরা, জগন্নাথ নগর, কানখুলী সাতঘরা প্রভৃতি নামে একটী গ্রাম পুঞ্জ আছে। এই সকল গ্রামে কলিকাতা হইতে জলপথে যাইতে হইলে আকড়া বারুদখানায় নামিয়া এবং রেলে যাইতে হইলে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বজ্‌বজ্ ব্র্যাঞ্চের সন্তোষপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। উক্ত গ্রাম সমূহের মাঝামাঝি স্থল

নিবাসী দেদার মোল্লা নামক জনৈক মুসলমানের বিংশতিবর্ষ দেশীয়া একটী কন্যার আজ কয়েক বৎসর হইতে স্বভাবের কিছু ব্যত্যয় দেখা যায়। তাহার প্রথম স্বামী গত হইলে আবদুল হক নামক আর একজন লোকের সহিত তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। কিন্তু সে স্বামীগৃহে অবস্থান কালে সময়ে সময়ে কোথায় চলিয়া যায়, কেহ তাহা স্থির করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে কখন বলে—দিল্লী গিয়াছিলাম, কখন বলে রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, কখনও বলে সিঙ্গাপুর গিয়াছিলাম—এই সকল কথার প্রমাণার্থ তত্তদ্দেশের গল্পাদি করে, কিম্বা কখনও তদ্দেশজাত বৃক্ষ বিশেষের পত্রাদি লোকসমক্ষে প্রদর্শন করে! কখনও বা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে স্বামীকে বলে—"আমাকে একটী স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই ঘরে থাকিব; কিন্তু বৃহস্পতি ও শুক্রবারে তুমি আমার নিকটে থাকিতে পাইবে না।" মুসলমান মহিলার এই সকল কথায়, ব্যবহারে ও আচরণে সকলে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করে। তাহাতে সে শ্বশুর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে পলাইয়া আইসে।

পিত্রালয়ে আসিয়াও তাহার সেই ব্যবহার। বিশেষতঃ বৃহস্পতি ও শুক্রবার হইলেই সে নির্জ্জনে থাকে, নয়ত কোথাও উধাও হইয়া যায়। এই জন্য তাহাকে উক্ত দিবসদ্বয়ে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেও সে গৃহমধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু প্রতি সপ্তাহের এই দুই দিনের অন্যতরে (সচরাচর শুক্রবারে) তাহার কিছু কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে। এই টাকা তাহার পিতামাতা পায় বলিয়া সাধারণে বলিতে পারে না—যে কত টাকা সে নিশ্চয় পায়—পিতা মাতাও অবশ্য এই অর্থাগমের সংবাদ প্রকাশ করিতে সম্মত নহে। ফলতঃ ৫।১০ পাঁচ কি দশ টাকা, খাবার, সুগন্ধিদ্রব্য প্রভৃতি সে প্রতি শুক্রবারে পায়। কে দেয়, কোথা হইতে আইসে,—কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। রমণী চাবিবন্ধ রুদ্ধগৃহে থাকিলেও উক্তরূপ পদার্থ সকল তাহার শয্যা বা ঘর হইতে পাওয়া যায়। এই সকল ঘটনায় কেহ কেহ তাহাকে জীনে আশ্রয় করিয়াছে অনুমান করিলেও, রমণী যুবতী ও সুন্দরী বলিয়া অধিকাংশ লোকে মন্দ কথাই বলে।

বিগত ১লা বৈশাখ শুক্রবার যুবতীর পিতা তাহাকে বিস্তর অনুযোগ ও তিরস্কার করিয়া বলে,—"কেন মা, তুমি এই সব কাজগুলো কর? তোমার

জন্ত দেখ, দেশে আমার মুখ দেখান ভার, নানা লোকে নানা কথা কয়, কত লোকে কত বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করে,—এসকল ব্যবহার গুলা কি ভাল? তোমার বয়স ও জ্ঞান হইয়াছে—দেখ, তোমার জন্ত আমার সমাজচ্যুত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছে!—বুড়া বাপকে কেন আর এ কষ্টগুলা দিচ্চ?" ইহাতে যুবতী উত্তর করে, "তোমরা আমার ব্যবহারে কি মন্দ কার্য্য দেখিতেছ? আমি ত কোনই অন্তায় বা কুকার্য্য করি নাই! আচ্ছা, আমি কল্য সকলকে দেখাইব,—আমার কিরূপ ব্যবহার।"

পরদিন ২রা বৈশাখ, শনিবার, প্রাতে রমণী আবার নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সমস্ত গ্রাম অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্রমে বেলা ৯টা বাজিল; তখনও তাহার এক ভ্রাতা এক উদ্যান মধ্যে অন্বেষণ করিতেছে,—এমন সময় ঊর্দ্ধদেশ হইতে তাহার কর্ণে এক আওয়াজ আসিল,—"তোমরা কাহাকে খুঁজিতেছ? আমি এই এখানে আছি।" এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। অবশেষে ঊর্দ্ধে বৃক্ষাদির উপর নজর করিলে দেখিতে পাইল—অত্যুচ্চ, বহুকালের পুরাতন, গগনস্পর্শী এক নারিকেল বৃক্ষের পত্রোপরি (বাল্‌তোর) সম্পূর্ণ নিরবলম্বভাবে সুখে শয়ন করিয়া আছে—"তাহার সেই ভগ্নী!!" তদ্রূপ উচ্চ নারিকেল গাছ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; বয়োধিক্যপ্রযুক্ত গাছের পাতাগুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র একটী বাল্‌তোর উপরে রমণী স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া আছে—উন্মুক্ত কেশদাম পত্র পার্শ্ব দিয়া শূন্যে দুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার গ্রামের সর্ব্বত্র, ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলেও প্রচারিত হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবার জন্ত সেই উদ্যান মধ্যে সমবেত হইতে লাগিল। যে উচ্চ তরুশিরে সুদক্ষ শিউলীগণ ব্যতীত অপর পুরুষে উঠিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়—সেই আকাশস্পর্শী নারিকেল বৃক্ষের পত্রোপরি সুন্দরী যে ভাবে শুইয়া আছে—লোকে অট্টালিকা মধ্যে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও বোধ হয় সেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। রমণী স্বচ্ছন্দে সেই পাতার উপরে শুইয়া বিনা অবলম্বনে কিছু না ধরিয়া, কখন শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কখন বসিতেছে, কখন শ্লথ বসন ভাল করিয়া গুছাইয়া কোমর বাঁধিয়া পরিতেছে,—কখন মুক্ত অলকদাম অঙ্গুলি সঞ্চালনে বিচ্ছিন্ন করিয়া সজ্জিত ও সবদ্ধ

করিতেছে,—কখন দাঁড়াইতেছে, কখনও বা নৃত্য করিতেছে। সে পাতার উপরে একটী বড় পক্ষী বসিলে ঝুলিয়া পড়ে;- কিন্তু আশ্চর্য্য, একটী পূর্ণ যুবতী রমণী তদুপরি এতকাণ্ড করিতেছে,—অথচ তাহার ভারে পত্রটী কিছুমাত্র নত হইতেছে না। যে ভাবে বৃক্ষে জাত ঠিক সেই ভাবেই আছে! অল্পক্ষণ মধ্যে দর্শকবৃন্দে উদ্যান, এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী বাগান সকলও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চড়কের মেলার ভিড় সে দিনও স্থানে স্থানে থাকায় সেই বাগানে আসিয়া জমিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী থানার দারোগা জমাদার কনষ্টেবল পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহই কামিনীকে বৃক্ষশীর্ষ হইতে নীচে নামাইতে পারিল না। সে বলিল, "আমি এখন নামিব না; আমি যে সময়ে উঠিয়াছি,—ঠিক সেই সময়ে নামিব।"

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়া অপরাহ্ণকাল সমুপস্থিত হইল। বেলা প্রায় আড়াইটা কি তিনটার সময় মেয়েটী বলিল—"আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে, তোমরা আমায় একটু জল দাও।" কিন্তু কে সেই উচ্চাকাশে গিয়া তাহাকে জল দিয়া আসিবে? বিশেষতঃ সে পরী কি প্রেতাবিষ্টা,—তাহাই বা কে জানে? এরূপ অবস্থায় সেই শূন্যদেশে একাকী তাহার নিকটস্থ হওয়ায় যে বিপদের সম্ভাবনা নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে?" রমণী বলিল,—"আমার বাবুজীকে বল।" কিন্তু তাহার বাবুজী বৃদ্ধলোক, তাহার সাধ্য নহে যে সেই ঊর্দ্ধপ্রদেশে তাহাকে জল দিয়া আইসে। তখন সে বলে "তবে আমার ভাইকে বল।" তাহার ভাই বলে, যদি সে গাছে উঠিলে তাহাকে মারিয়া ফেলে, কিম্বা গাছ হইতে ফেলিয়া দেয়?—কেননা মুসলমানেরা কামিনীর সেই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া তাহাকে নিশ্চয় কোন জীনে আশ্রয় করিয়াছে অনুমান করিতেছিল। এমতে কেহই সেই অত্যুচ্চে একাকী তাহার নিকটে যাইতে সাহসী হইতেছিল না। তাহাদের ইতস্ততঃ দেখিয়া রমণী বলিল—"ভয় নাই; যে আমাকে জল দিতে আসিবে, আমি তাহাকে কিছু বলিব না। তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।" তখন তাহার ভ্রাতা জলপূর্ণ একটী মৃন্ময় ভাণ্ড কোমরে বাঁধিয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক তরুকণ্ঠ (নারিকেল গাছের যে স্থান হইতে পত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সেই স্থান) হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া ভাণ্ডটী তাহার ভগ্নীর হস্তে দিয়াই নামিয়া আইসে। ভগ্নী তখন মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া জলপান করিয়া ভাঁড়টী দূরে ছুড়িয়া

ফেলিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! অত উচ্চ হইতে অত দূরে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ভাণ্ডটী ভগ্ন হইল না! যে মৃৎপাত্র দুইহস্ত মাত্র উর্দ্ধ হইতে পতিত হইলে শতধা চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা ৫০।৬০ হস্ত উচ্চ হইতে সজোরে দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াও ভাঙ্গা দূরে থাক একটু ফাটিলও না!

ক্রমে বেলাবসান হইয়া সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। জনস্রোতও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। যে অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি নিরাবলম্বনে অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র থাকিতে সুদক্ষ শিউলীরও মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়ে, সেই অভ্রভেদী তরুশিরে রমণী অনায়াসে নিরবলম্বনে শুক্রবার রাত্রি হইতে শনিবার সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিয়াছে,—রাত্রি হইয়াছে, তবু এখনও নামিতে সম্মত নহে। গভীর নিশীথে যখন সকল লোকে নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে সুখসুপ্ত—রমণীর পিতামাতা তখনও উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ঘর একবার বাহির করিতেছিল এমন সময়ে কথিত বৃক্ষের তলদেশে নাকি একটী পত্রপতনশব্দে তাহারা দ্রুতপদে তথায় গিয়া দেখে যে নারিকেল গাছ হইতে একটী বাল্‌তো (পাতা) ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি তাহাদের কন্যা সুখে নিদ্রা যাইতেছে! তখন তাহারা ধরাধরি করিয়া তাহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল।

এই ঘটনা বর্ত্তমান বর্ষের বিগত ২রা বৈশাখ ঘটিয়াছে। সহস্র সহস্র লোকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে; তবু যদি পাঠকগণের অবিশ্বাস হয়, কিম্বা সত্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছা করেন তজ্জন্য প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা সমস্ত ঠিকানা খুলিয়া লিখিয়া দিয়াছি। ১০ই বৈশাখের বঙ্গবাসীতে এতদ্বিষয়ক বিবরণ একটু ছিল কিন্তু তাহাতে বিস্তর ভ্রম প্রমাদ ছিল। আমাদের লিখিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। *

শ্রীহরিচরণ রায়।

---

* জনরব যে এই মুসলমান মহিলা কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে একটী কবন্ধপুত্র প্রসব করিয়াছিল। একবার এক পুষ্করিণীমধ্যে না কি ৩।৪ দিন কাটাইয়া দিয়াছিল। একদা একটী সরু আমড়াগাছের শাখার উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিয়াছিল। এইরূপ কত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার সে দেখাইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই।

৪র্থ ভাগ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। } ২য় সংখ্যা।

পাণ্ডব-গীতা

বা

প্রপন্ন-গীতা

(পাণ্ডব-কৃতা)

(১ম সংখ্যার ৭ম পৃষ্ঠের পর হইতে)

(১১)

সহদেব কহিলেন :—

তস্য যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ॥

ধরি যজ্ঞ-বরাহের মূর্ত্তি একবার
দেখা'য়ে ছিলেন যিনি শক্তি আপনার,
সেই বিষ্ণু-পদে যিনি করেন প্রণাম,
তাঁহারো শ্রীপদে আমি নমি অবিরাম !

(১২)

কুন্তী কহিলেন :—

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্ !
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াঽস্তু মে ॥

নিজ কর্ম্মদোষে আসি, ওহে নারায়ণ !
যে যে যোনি প্রাপ্ত আমি হই না যখন,
সেই সেই যোনিতেই তোমারি উপর
ভক্তি মোর স্থির যেন রহে নিরন্তর !

(১৩)

বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে ॥

যেরূপ কৃপণ লোক আপনার ধন
বার বার গণে গাঁথে দিয়া একমন,
নাহি জানে কিছু আর সেই ধন ছাড়া,
তাই করে নাড়াচাড়া, তাই তোলাপাড়া,
তাহা ছাড়া কিছু ভাল নাহি লাগে প্রাণে,
আর কিছু নাহি চায়, চায় তারি পানে,
সেরূপ তোমার নাম হউক আমার
ধ্যান জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র জপমালা সার।

(১৪)

মাদ্রী কহিলেন :—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে ॥

কিবা সন্ধ্যা, কি প্রভাত, যখন তখন
নারায়ণে যেই জন করয়ে স্মরণ,

সে জন এ দেহ ছাড়ি বিষ্ণুপদ পায়,
মন্ত্রপূত ঘৃত যথা অগ্নিতে মিশায়!

(১৫)

দ্রুপদ কহিলেন :—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব ত্বৎপ্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ॥

কীট জন্তু সরীসৃপ অথবা বায়স
পিশাচ মানুষ নর অথবা রাক্ষস,
যেখানে যেরূপ জন্ম হউক আমার,
তোমা বিনা মোর গতি কেহ নাই আর!
তাই বলি, ওহে হরি! এই ভিক্ষা চাই;
তোমাতে অচলা ভক্তি থাকুক সদাই।

(১৬)

সুভদ্রা কহিলেন :—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥

দশ-অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অন্তে করি স্নান
যেই ফল লাভ করে কোন পুণ্যবান,
সেই ফল প্রাপ্ত হয় সে জন তখন
বারেক কৃষ্ণের পদে প্রণত যে জন।
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ ভাগ্যে রয় যার,
তাহারেও জন্ম ল'তে হইবে আবার;
কৃষ্ণেরে প্রণাম কিন্তু করে যেই জন,
তারে আর জন্ম ল'তে না হয় কখন।

(১৭)

অভিমন্যু কহিলেন :—

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥

গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! হরি ! মুকুন্দ ! মুরারি !
গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! হরি ! রথচক্রধারি !
গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! কৃষ্ণ ! চরণে তোমার
নমস্কার নমস্কার করি অনিবার !

(১৮)

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপাদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে ॥

কৃষ্ণপদ চিন্তা করে সদা যেই জন,
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্ব্বক্ষণ,
কি ভয়, কি ভয়, তার দুর্গম গহনে ?
কি ভয়, কি ভয় তার মরণে বা রণে ?

(১৯)

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন :—

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব
গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো
মাং ত্রাহি সংসারভুজঙ্গদষ্টম্ ॥

নারায়ণ ! বাসুদেব ! মুকুন্দ ! মুরারি !
গোবিন্দ ! শ্রীরাম ! কৃষ্ণ ! নরসিংহ ! হরি !
কেশব ! অনন্ত ! বিষ্ণু ! শ্রীমধুসূদন !
বিপদে পড়িলে লোক তুমিই শরণ।

বড়ই বিপদ মোর, রক্ষ নারায়ণ!
সংসার-ভুজঙ্গ মোরে করেছে দংশন!

(২০)

সাত্যকি কহিলেন :—

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত।
গোবিন্দানন্ত সর্ব্বেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥

অচ্যুত! অনন্ত! কৃষ্ণ! বিষ্ণু! দামোদর!
বাসুদেব! নারায়ণ! ওহে সর্ব্বেশ্বর!
কে করে নির্ণয় তব মহিমা অপার?
হরি হে! চরণে তব করি নমস্কার!

[ক্রমশঃ]

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

পৌরাণিক কথা।

ধ্রুব বংশ।

ধ্রুব হইতেই ত্রিলোকীর জীব সৃষ্টি। তখন জীবের রচিত দেহ ছিল না। এখন জীব জন্মগ্রহণ করিয়াই দেহে আবদ্ধ হয়। তখন মনুষ্য দেহের ত কথাই নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি উদ্ভিদ্ দেহেরও রচনা হয় নাই। সূক্ষ্ম পরমাণু সংঘাতে আবদ্ধ হইয়া জীব কর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে, মনুষ্য জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিতে হয়।

মনুষ্যের প্রথম গর্ভাবস্থা। শুক্র শোণিত মিলিত হইয়া প্রথম যে আকার ধারণ করে, তাহা অনেক জীবেরই সাধারণ। তাহার পর সেই সঙ্ঘাত নিম্ন-যোনিস্থ জীবের আকার ধারণ করে। সেই আকার ক্রমবিকশিত হইয়া পরম

মনুষ্যের আকারে পরিণত হয়। মনুষ্যের আকারে পরিণাম, এ অতি সহজ কথা নহে। আজ দশমাস গর্ভে যে কার্য্য সাধিত হইতেছে, কল্পের অনেক সময় সেই কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথমে দেহ রচনা, পরে সেই দেহের বিকাশ। দেহ রচনার অর্থ এই যে কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দেহাণুসমূহের কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে অবস্থিতি। এখন দেহাণু সমূহের আগম নির্গম দ্বারা দেহাণুর মৃত্যু, "বাসাংসি জীর্ণানি" ন্যায় স্থূল দেহের আগম নির্গম দ্বারা স্থূল দেহের মৃত্যু, প্রেতত্ব মোচন দ্বারা প্রেত দেহের মৃত্যু—এই মৃত্যুবিকার দ্বারা দেহ রচনা ও দেহের কাল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই মৃত্যুরূপ বিকার স্থূল পদার্থের উপর যেরূপ অধিকার বিস্তার করে, এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের উপর নহে। সূক্ষ্ম পদার্থের স্থিতি বহুকাল ব্যাপী। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পদার্থের সূক্ষ্ম পরিণাম হয়। এবং সূক্ষ্ম পদার্থ ক্রমে স্থূলে পরিণত হয়।

যখন পদার্থ অতিশয় সূক্ষ্ম তখন দেহ রচনা অতীব কষ্টকর। সূক্ষ্ম পদার্থে জীবদেহ রচিত হইলে, যদি সেই পদার্থ স্থূল পরিণতির অধিকারে আসে তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই পদার্থ ঊর্দ্ধগমনশীল হইয়া সূক্ষ্মতর প্রকৃতির অনুগমন করে, তাহা হইলে জীবের দেহরচনা হইতে পারে না, এবং জীবের ভোগোপযোগী দেহের আবিষ্কারও হইতে পারে না।

অনুভব বৈচিত্র্য দ্বারাই জীবের ক্রমবিকাশ হয়। বহির্জ্জগতের অনুভব দ্বারাই অনুভবের বিচিত্রতা হয়। স্থূল দেহ ভিন্ন বহির্জ্জগতের অনুভব হইতে পারে না। এই জন্যই প্রথমে স্থূল দেহ রচনার আবশ্যকতা। স্থূল দেহ রচনা করিতে হইলে, সূক্ষ্ম দেহকে কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে হয়।

উত্তানপাদের অর্থ ঊর্দ্ধপাদ। তাঁহার পুত্র উত্তম অর্থাৎ ঊর্দ্ধতম। সুনীতির পরবশ হইয়া ধ্রুব এই ঊর্দ্ধগমনের পথ রোধ করিলেন। তিনি ত্রিলোকীর ঊর্দ্ধতম স্থানে কল্পের জন্য অবস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে কাল ও দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া পরিচ্ছেদের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

ধ্রুবের পুত্র কল্প ও বৎসর। বৎসরের পুত্র ছয় ঋতু। এ সকল কেবলমাত্র কাল পরিচ্ছেদের ব্যঞ্জক।

যাহা হউক পরিচ্ছেদের দ্বারা ক্রমে, ক্রমে জীবের অঙ্গ সংগঠিত হইল। অঙ্গ সংগঠিত হইলেই জীবের মৃত্যুরূপ বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল।

অঙ্গ মৃত্যুর কন্যা সুনীথাকে বিবাহ করিলেন।

অঙ্গের পুত্র বেণ অদম্যভাবে চলিয়া ফিরিয়া অঙ্গের সার্থকতা করিতে লাগিল। বেণ শব্দের ধাতু অর্থ চলন।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে প্রথম অবয়ব বিশিষ্ট জীব Protozoon কিম্বা Protophyton, Protoplasm সেই জীবের সার অবস্থা। Protoplasmকে জীব দেহের জনক বলিতে পারা যায়। Protoplasm মন্থন করিয়াই জীব দেহের রচনা হয়।

বেণের দেহ মন্থন করিয়া পৃথুরাজার আবির্ভাব হইল। পৃথুরাজের আগমনে জীব সৃষ্টির নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। জীবের দেহ উদ্ভিদের আকার ধারণ করিল। এই সময়েই উদ্ভিদ্ জাতির সৃষ্টি হইল।

পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া পৃথু বলিলেন :—

ত্বং খল্বোষধি বীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।

ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ॥ ৪—১৭—২৪

পূর্ব্বসৃষ্ট ওষধি বীজ তোমার গর্ভে অবরুদ্ধ আছে। মন্দবুদ্ধি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, তাহা বাহির করিতেছনা।

পৃথিবী ওষধি ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পৃথিবী তখন সমতল ছিল না। তরুলতাদির বংশ বিস্তার জন্য এবং ভবিষ্যতে পশুদিগের বিচরণ জন্যও পৃথিবীর সমতলতা আবশ্যক।

চূর্ণয়ংশ্চ ধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্।

ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ॥

রাজা পৃথু গিরিকূট চূর্ণ করিয়া ভূমণ্ডল প্রায় সমতল করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই, পৃথু একজন অবতার।

পৃথুর বংশে রাজা প্রাচীনবর্হিঃ। তাঁহার অপর নাম বর্হিষদ্।

ক্রমে রূপের স্থিরতা, ক্রমে ইন্দ্রিয় বৃত্তির আবির্ভাব। কিন্তু তখনও উদ্ভিদের রাজ্য।

বর্হিষদের দশ পুত্র। সকলেরই নাম প্রচেতাঃ। এই দশ পুত্রই দশ ইন্দ্রিয়। তাঁহারা সমুদ্র মধ্যে মহা তপস্যা করিয়াছিলেন।

ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা উপাসনা দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। জীবের

ভাগ্য এইবার সুপ্রসন্ন। জীবের উন্নতি আর কে রোধ করিতে পারে। মহাদেব ও বিষ্ণু যখন এককালে সুপ্রসন্ন, তখন মনুষ্য দেহ রচনা করিতে আর কতদিন লাগিবে।

সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া প্রচেতাগণ দেখিলেন যে বৃক্ষ সকল প্রায় আকাশ ছুঁইয়াছে, পৃথিবী একেবারে বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অধিক বাড়াবাড়ী ভাল নয়। অত্যুচ্চং পতনায় চ।

অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাম্ গাং গাং রোদ্ধু মিবোচ্ছ্রিতৈঃ॥
ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা।
মহাং নিবীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে॥

রাজকুমারগণ বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন। তখন অবশিষ্ট বৃক্ষগণ তাহাদের কন্যা মারীষাকে কুমারদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ব্রহ্মার আদেশে কুমারগণ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি মারীষার গর্ভে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। এই প্রাচেতস দক্ষই মৈথুন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি প্রজার সৃষ্টি করেন।

এই দক্ষের বংশ মধ্যেই মনুষ্য দেহের রচনা হয়।

এই ত গেল জীব সৃষ্টির এক বিভাগ।

কিন্তু মনুষ্যের শরীর থাকিলে কি হয়। মনুষ্য শরীর লইয়া পশু প্রকৃতি, মনুষ্য পশু হইতে কোনরূপে বিভিন্ন নহে।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষঃ জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ॥

হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই মনুষ্য পশু হইতে বিভিন্ন হয়। যাহাকে যথার্থ মনুষ্য বলিতে পারা যায়, সেই হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন জীবের কথা আমরা পর প্রবন্ধে বলিব। এই হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যের আবির্ভাব করানই কল্পের উদ্দেশ্য। যেমন মনুষ্য গর্ভাবস্থায় থাকিলে তাহার কোন লাভ নাই, মনুষ্যের দেহ মাত্র পাইলেও কোন লাভ নাই, বালক অবস্থাতেও মনুষ্য কেবল মনুষ্য সংজ্ঞা মাত্র লাভ করে, সেইরূপ কল্পের প্রথম অবস্থাতে যখন নিম্নযোনির উপযোগী দেহ রচনা হয়, মনুষ্যের তাহা গর্ভাবস্থা। ভবিষ্যতে যে মনুষ্যদেহ

হইবে, পশুদেহরচনা তাহার আয়োজন মাত্র। কল্পের গর্ভাবস্থায় মনুষ্য দেহের আবির্ভাব মাত্র হয়। পরে সেই মনুষ্য শিশু অবস্থায় কালযাপন করে। তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাহার পর মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন হয়। তখনই কল্পের উদ্দেশ্য সফল। কেন হয়, তাহাও পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ভগবান বুদ্ধদেব।*

ভ্রাতৃগণ!

যে মহাপুরুষের জন্ম, নির্ব্বাণ, এবং প্রয়াণতিথির উৎসব উপলক্ষে অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে আমরা ভক্তিসহকারে এস্থলে সমবেত হইয়াছি তাঁহার জীবনী, শিক্ষা, ধর্ম্ম, এবং অক্ষয়কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পালি এবং ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরিতোষার্থে আমি যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি নেপালের এবং ইংরাজের অধিকারের মধ্যবর্ত্তী কপিলবস্তু নামক রাজ্যের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন; দেবল ঋষির গণনানুসারে হয় তিনি সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইবেন, না হয় সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে সর্ব্বপ্রধান ভিক্ষুক হইবেন এই সন্দেহদোলায়িত এবং শঙ্কাপর্য্যাকুলিত হৃদয়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব, আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় মনুষ্যকল্পনাবহির্ভূত বহুবিধ ভোগ বিলাসের মধ্যে রাখিয়াও তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে সক্ষম হয়েন নাই; ছয় বৎসর ক্রমান্বয়ে তপঃ, স্বাধ্যায়, ব্রত, জপ, ধ্যান ইত্যাদি পরিপালন করিয়া অবশেষে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া নগরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে নির্ব্বাণ লাভ করেন; এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া দেহত্যাগ করেন। এসকল কথা বোধ করি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই—এমন কি অধুনাতন নাট্যাভিনয় শ্রোতৃবর্গমাত্রেই

---

* ভগবান বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২৪৪৪ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৪ই মে সোমবার এলবার্ট হলে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ; তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম; তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান; তাঁহার অনন্যসাধারণ সত্যপূর্ণ কঠোর তর্কের এবং যুক্তির ছটা; তাঁহার স্বর্গাদপিগরীয়সী ধর্ম্মনীতি; তাঁহার দেবদুর্ল্লভ বিশ্বপ্রেম এবং অসীম সর্ব্বজীবে দয়া ইত্যাকার বিষয়গুলি সাধারণে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহেন। মাদৃশ অধস্তন শ্রেণীর মনুষ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে এসমুদায় ধারণা করিতেও অক্ষম। তবে, যদ্দ্বারা ভগবান বুদ্ধের অপৌরুষেয় মাহাত্ম্য, অনবদ্য চরিত্র, দেবগণেরও উপদেষ্টৃত্ব, প্রভৃতি সকলের কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতীব সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব।

জীব পুনঃ পুনঃ অনন্তকোটি যুগ যুগান্ত ধরিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতেছে; সুতরাং অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিতেছে; কিসে সৃষ্টির লমাভূত মানব এই কালচক্রের বাগুরা হইতে পরিত্রাণ পাইবে এই ভীষণ চিন্তায় দুর্ম্মনায়মান হইয়া কপিল প্রভৃতি মহর্ষির ন্যায় ভগবান বুদ্ধ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলস্বরূপ এইগুলি তত্ত্ব তাঁহার দিব্যচক্ষুঃ-ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়; এগুলি সিদ্ধপুরুষের অনুভবসিদ্ধ তথ্য, অতএব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে আমাদিগের গ্রাহ্য। বুদ্ধ জানিয়াছেন তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা বা ইচ্ছা যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত নিদান; তৃষ্ণা তিনপ্রকার কাম, ভব, বিভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত আসক্তি, জীবনের প্রতি আসক্তি, অর্থাৎ জন্মিবার ইচ্ছা; এবং বর্ত্তমান জগতের প্রতি আসক্তি। তাঁহার মতে সত্য চারি প্রকার, দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য এবং মার্গসত্য। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালস্থায়ী তাহাই সত্য; সংসার দুঃখময় ইহা একটী সত্য; মনুষ্য নিজ নিজ কামনার অপরিতৃপ্তিহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সকল কামনার তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে সচেষ্ট হয় সুতরাং কামনার দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে অনবরত দুঃখভোগ করে ইহা অপর সত্য। এই দুঃখ নিবারণের উপায় আছে ইহা তৃতীয় সত্য। সেই দুঃখ দুরীকরণের পন্থা আছে ইহা চতুর্থ সত্য। এই শেষোক্ত পন্থা আট প্রকার; যথা—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাচঃ, সম্যক্‌কর্ম্ম, সম্যক্‌জীবিকা, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি। আবার এই অষ্টপ্রকার পথে বিচরণ করিতে গেলে দশরূপ গুণের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে হয়; সেগুলি দান, শীল, নৈষ্কর্ম্ম্য, প্রজ্ঞা, মৈত্রী, বীর্য্য, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান, সত্য, উপেক্ষা। উপরি-

উক্ত আট পথ এবং দশ পারমিতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। ভগবান বহু জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই দশটী পারমিতার প্রভু হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের, এমন কি সকল ধর্ম্মের, প্রধান ভিত্তিদ্বয় কর্ম্ম এবং পুনর্জ্জন্ম। কর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে জীব নিজ অজ্ঞানতাদোষে জন্মে জন্মে অসংখ্য পাপ ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কষ্টভোগ করে, কোনও দেব দেবী, অথবা ভূত পিশাচাদি তাহার দুঃখভোগের কারণ নহেন। এই মোহ এবং অজ্ঞানতাবশে জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত চারিটি সত্যের নিগূঢ় পরিজ্ঞানের অভাবকে ভগবান বুদ্ধ অবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবিদ্যা কয়েকটী কারণ পরম্পরা হইতে উৎপন্ন; পালি ভাষায় তাহাকে পতিচ্চ সমুপ্পাদ 'সংস্কৃতে প্রতীত্য সমুৎপাদ' বলে; ইহার ইংরাজী অনুবাদ Dependent origination or Causal nexus of Being. ভগবান বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে ইহাকে "সমুদয়" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সেগুলির নাম অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এবং জাতি। এই বারটী নিদান—ইহা হইতে যাবতীয় দুঃখের উৎপত্তি। বুদ্ধ বলিয়াছেন "নাহং ভিক্খবে অন্নমেক ধম্মম্পি সমনুপস্সামি মহা সাবজ্জতরম্ যথা ইদম্ভিক্খবে মিচ্ছাদিট্‌ঠি, মিচ্ছাদিট্‌ঠি পরামনি ভিক্খবে বজ্জানি।" কার্য্যকারণরূপ বিধির অপরিজ্ঞান নিবন্ধন যে সকল অগণনীয় দুঃখাদি উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমি আর দেখিতে পাই না।

ভগবান বুদ্ধের উদ্ভাবিত অতি সূক্ষ্ম, প্রসন্ন গম্ভীর মনোবিজ্ঞান পৃথিবীতে কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও শাস্ত্রে, কোনও জাতিতে নাই, ভ্রাতৃগণ! ইহা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। বিস্তারিত রূপে উহার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার স্থান, সময়, অথবা উপলক্ষ অদ্যকার উৎসব নহে এবং হইতেও পারেনা। একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ না লিখিলে উহার প্রকৃত পদমর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারেনা। তবে, এপর্য্যন্ত নির্ভীক চিত্তে বলা যাইতে পারে বুদ্ধের মনোবিজ্ঞান চিন্তা এবং গবেষণার সাহচর্য্যে পরিশীলিত হইলে মানব মন, মানব হৃদয়, মানব বুদ্ধি, মানব জ্ঞান দেবোপম হইয়া উঠে।

বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি অতীব উচ্চকোটির, অহম্ভাব একেবারে বিস্মৃত হওয়া, জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া; সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা; অপহরণ এবং অন্যায়

রূপ ধনোপার্জ্জন হইতে বর্জ্জিত হওয়া; ইন্দ্রিয়সেবা এবং মাদক দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করা; মিথ্যাকথা না বলা, পরুষ এবং মর্ম্মঘাতী বাক্য ব্যবহার না করা; নীচ, কুৎসিৎ অপভাষা ব্যবহার না করা; পরনিন্দা, পরগ্লানি না করা; দ্বেষ, হিংসা অসূয়া পরিত্যাগ করা; স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দেওয়া; সর্ব্ববিষয়ে সত্য এবং ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য মতাবলম্বন করা; অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম উপাসক, উপাসিকাদিগের প্রতি এই সমুদায় উপদেশ ভূরি ভূরি প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতিকে সমান পদবীতে স্থাপিত করা বোধ করি বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় অপর কোনও ধর্ম্মে নাই। সর্ব্বজীবে দয়া এবং সমভাব হিন্দুধর্ম্মে বুদ্ধের জন্মের বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে ছিল বটে কিন্তু এভাবে উক্ত দুইটী মহান ধর্ম্মকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়া ধর্ম্মের মূলভিত্তিস্বরূপ করিয়া যাওয়া তাঁহার দ্বারা বিশিষ্টরূপে সাধিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সকল ধর্ম্মেই এক; বেদে এবং উপনিষদে যাহা নাই তাহা অন্যত্র নাই; কারণ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, শক্তি সকলেরই মহাভাণ্ডার বেদ। কিন্তু বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার উপর, নানাবিধ যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া কলাপে সেই অপৌরুষের বহু বিস্তারিত গ্রন্থ এতাধিক পরিপূর্ণ যে তন্মধ্য হইতে সত্য নিষ্কাসিত করা নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম ঈদৃশ বিশদ, অনায়াসগম্য, এবং আবর্জ্জনা বিরহিত করিয়াছেন যে প্রকৃতধর্ম্ম কি তাহা নিরূপণ করিতে কাহাকেও আয়াস পাইতে হয় না।

বুদ্ধ ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি দুরবগাহ কূট প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন আমি যে পথ দিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছি তোমরা সকলে সেই পথে বিচরণ করিলে 'তুমি কে,' 'জগৎ কি,' 'জগতের অনন্তকোটি বিশ্বের—কর্ত্তা কে,' 'বিশ্বের বিকাশের কারণ অথবা উদ্দেশ্য কি,' এসকল অবগত হইতে পারিবে; সাধনার প্রারম্ভে এসকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলে তোমার অহম্ভাব বর্দ্ধিত হইবে, তোমার তপস্যা ভ্রষ্ট হইবে, তুমি কস্মিন্‌কালে জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারিবেনা, সত্যের আলোকে তোমার হৃদয়ক্ষেত্র আলোকিত এবং উদ্ভাসিত হইবে না।

তবে বুদ্ধ নিরীশ্বর একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কানু ছাড়াগীত নাই, ঈশ্বরছাড়া

ধর্ম্মনাই। দেব দেবী হিন্দুরাও যেরূপ বিশ্বাস করেন, বুদ্ধও তাহাই করিতেন; তবে তিনি উপাসনা, বলিদান, দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণ এসমুদয় স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে মনুষ্যের মত দেবদেবীগণও নাশ্য, ব্রহ্ম ব্যতীত কেহই অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত, অনাদি নহেন; মনুষ্যের হৃৎপুণ্ডরীকে যে বস্তু আছে দেব দেবীতেও তাহাই আছে, মনুষ্য যত্ন করিলে দেবগণ অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারেন। আমাদিগের উপনিষদেও লিখিত আছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্যচ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ, স চানন্ত্যায় কল্পতে।"

কোনও দেবতা, ঋষি, মুনি অথবা অপরবিধ মহাপুরুষের বাক্য বলিয়া তাহা অবিচারিতরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধদেব মনুষ্য জাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির লাঘব এবং সত্য পথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তিনি বহুবার অকপট হৃদয়ে কণ্ঠরবে বলিয়া গিয়াছেন—কোনও তত্ত্ব আমি বলিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইওনা, অথবা উহা তদ্বিষয়ের চরম তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিওনা; তোমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, যুক্তির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয় তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে। বিশ্বের মঙ্গলের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ তাহার সহিত কোনও রূপ বিরোধ না ঘটে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দেহ, মন, প্রাণ, ও আত্মার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত করা যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে মজ্জায় মজ্জায় সুদৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ আছে বোধ করি অপর কোনও ধর্ম্মে সেরূপ নাই।

বুদ্ধ স্বীয় সার্দ্ধ পঞ্চশত পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন, জাতক নামক গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক জন্মের বৃত্তান্ত এস্থলে উল্লেখ করিয়া তাঁহার অসীম দয়ার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। একদা তিনি পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটা বাঘিনী তদীয় শাবকদ্বয় লইয়া শয়ানা রহিয়াছে, শাবকেরা স্তন্যপান করিবার জন্য বারম্বার মাতৃস্তন মুখদ্বারা স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু দুই তিন দিনের ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ নাই জানিয়া শাবকেরা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে; বাঘিনী মৃতকল্পা। এই হৃদয় বিদারক ব্যাপার সন্দর্শনে দয়ালু বুদ্ধহৃদয়ে অসহনীয় দয়া ও যাতনার উদ্রেক হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া বীরপুরুষের ন্যায় সেই ভীষণ শ্বাপদের সম্মুখীন

হইলেন, বাঘিনী মনের সাধে সেই সুকুমার দেহদ্বারা আপন এবং শাবকদ্বয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া জীবন দান পাইল। এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা বহুজন্মে ভগবান বুদ্ধ একে একে দশটী পারমিতার পারদর্শী হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে; এ সমারোহ-কালে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব তাঁহার চরিত্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অল্প কিছু বলিয়া আমি আজি আপনাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। অনেকে না জানিতে পারেন. ভগবান বুদ্ধ জ্ঞানের অবতার; ব্রহ্মার নিম্ন পদস্থ যে সাতজন ধ্যান চোহান বা ধ্যানী বুদ্ধ সৃষ্টি কার্য্যের অধি-নায়ক এবং পরিদর্শকরূপে বিরাজমান, তন্মধ্যে বুধগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতার অবতারণা করিয়াছিলেন। অতএব বলা বাহুল্য, জ্ঞানরাজ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিদমু পরমাত্মা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া সংসাররাজ্যে বিচ-রণ ও লীলা করেন নাই। বুদ্ধের অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অতৃপ্তিশীল অমানুষিক দয়ার ইয়ত্তা নাই, তুলনা নাই, দ্বিতীয় নাই; যে সকল প্রগাঢ় রহস্য জগতে প্রচারিত করা অযৌক্তিক বিধায়ে বুদ্ধ স্বয়ং তত্তৎ রহস্য সংগোপনে রাখিবেন বলিয়া দেবগণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জীবের দুঃখে অসহমান হইয়া সেই দয়ার মহাসমুদ্র জ্ঞানগুরু বুদ্ধদেব তাহা প্রকাশিত করিয়া ফেলিলেন; তাহার ফলে তাঁহাকে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সেই সেই রহস্য নিচয়ের অপলাপ করিতে হইল! বুদ্ধের মনো-বিজ্ঞানের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি; তাঁহার দর্শন, তাঁহার বিজ্ঞান, তাঁহার তর্ক ও যুক্তিশাস্ত্র জগতে অনন্যপূর্ব্ব না হউক সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট, বিশদ, সত্য এবং আবর্জ্জনাশূন্য, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। বুদ্ধের ধর্ম্মে এবং তাঁহার শিষ্যগণের কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ত্রিপিটক নামক লক্ষত্রয় শ্লোক গ্রন্থে অলঙ্কার, রূপক, অনাবশ্যক গল্পাদি, দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্কের বাক্যাড়-ম্বরের ছটা, ফক্কিকারাশি, ইত্যাদি না থাকাতে বৌদ্ধ শাস্ত্র যেরূপ অনায়াস বোধ্য এবং আদরনীয় হইয়াছে অপর কোনও শাস্ত্র সেরূপ হয় নাই। যে পশু হিংসাদিতে অধিকাংশ হিন্দুশাস্ত্র কলুষিত হইয়াছে, মহামুনি সিদ্ধ কপিলদেব যে কারণে তাহাকে "অবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা।" বলিয়া বেদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহার ছায়া বা স্পর্শমাত্র নাই। দয়া, অহিংসা, ভ্রাতৃ-ভাব, বিশ্বপ্রেম—এ তিনটী জীবকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই বোধ করি ভগবান তথাগত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বুদ্ধের জন্ম, কেবল তাঁহার কেন অবতার এবং মুক্তপুরুষ মাত্রের জন্ম সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য আছে; তাহা শুনিলে শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই। উহা ত সুদূর পরাহত; আমরা তৎপক্ষে "তিতির্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং"; তাঁহার দৈব জ্ঞানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে গেলে আমাদিগকেও বুদ্ধ হইতে হয়, কারণ বিজ্ঞান, নির্ব্বাণ সর্ব্বজ্ঞতা ব্রহ্মভাব—এগুলি একই বস্তু। ধন্য সেই বুদ্ধ দেহধারী নর যাঁহার জ্ঞানের, দয়ার, শক্তির, এবং প্রেমের ইয়ত্তা নাই!

এদিকে আবার প্রত্যূষে সর্ব্বজীবের মঙ্গল কামনা করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা, আহার কালে চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যাদি ভোজনে শব্দ না করা,; অপরের সহিত একত্র ভোজনে বসিলে তাঁহার পাত্রের দিকে দৃষ্টিনি-ক্ষেপ না করা; দ্বিপ্রহরের পর পেয় বস্তু ব্যতীত অপর কোনও দ্রব্য আহার না করা; ইত্যাকার সাধারণ স্বাস্থ্যের এবং নিষ্ঠাচারের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া ভগবান অনুপম বুদ্ধদেব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে অথবা পরে কোনও অবতার বা জীবন্মুক্ত পুরুষ আহার, ব্যবহার শিষ্টাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য দিয়া কাষ্ঠাগত বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া যান নাই, এ সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিব! ভ্রাতৃগণ! এধর্ম্ম, এ মহাপুরুষের আশ্রয় অবহেলা করিবেন না, আপনাদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় শাক্যসিংহ এই দেবদুর্ল্লভ তত্ত্বের অবতারণা করিয়া ভারতের, জগতের, ব্রহ্মাণ্ডের, জ্ঞানের, প্রেমের, এবং অবশেষে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, দয়ার অসীম ভাণ্ডার বিশ্বপতির গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্ব পাপস্য অকরণম্
কুশলস্য উপসম্পদা
স চিত্তপরিওদপনম্
এতম্ বুদ্ধানুশাসনম্।

ভগবান বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত মহাবাক্য স্মরণ ও তন্নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া সংসার সমরে জয়লাভ করুন্, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার জন্ম ও নির্ব্বাণ তিথি দিনে আপনাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

দান ধর্ম্ম।

বাল্যকালে পরলোকগত পূজ্যপাদ মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ পাঠে শিখিলাম, "দয়ার সমান গুণ নাই।" "দীন দেখিয়া দান করিবে।" তৎপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার প্রণীত দ্বিতীয় ভাগ খানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন শিখিলাম, "পরোপকার ব্রতের অনেক ফল।" "অন্নদান বড় দান।" নীতি, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের পক্ষে এই সরল অথচ সুমিষ্ট উপদেশ গুলি অতি মূল্যবান্, উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট। যদি অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে পরোপকার ব্রত উদযাপন কর; মন পবিত্র, হৃদয় নির্ম্মল এবং ভাব বিশুদ্ধ ও প্রসারিত হইবে।

পরোপ্রকার ব্রতের প্রধান অঙ্গ দান। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দান তিন প্রকার। তন্মধ্যে—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফল মুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃত মবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ গীতা।

প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় যে দান তাহাকে সাত্বিকদান কহে। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদির ফলোদ্দেশে কষ্ট সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই রাজসিক দান। এবং অশুচি

স্থানে বা অশুচি সময়ে অপাত্রে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে দান, তাহা তামসিক নামে খ্যাত। এই তিন প্রকার দানের মধ্যে সাত্ত্বিক দানই সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ও প্রশস্ত; ইহাই প্রকৃত দান নামের যোগ্য এবং মোক্ষধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ সমূহের এক বিশেষ অঙ্গ।

কলিতে দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, দানের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

সদাশিব মহাদেব বলিয়াছেন,

"কলৌদানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধি করং ভবেৎ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

"হে পার্ব্বতি! কলিতে দান ধর্ম্ম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, অর্থাৎ দান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; দরিদ্র ও সৎক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণকেই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবে।"

অতএব সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বতোভাবে সদাশয় ব্যক্তি দান ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

দানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। আবার কালের বশে এখন লোকের দান করার প্রবৃত্তিও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন সকলে কেবল ছল খুঁজিয়া বেড়ায়; শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়া ও বহুতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়া অধিকাংশ সময়েই লোকে উপযাচকদিগকে বিমুখ করিয়া দেয়। দান বিষয়ে সমাজের প্রসারিত হস্ত ক্রমেই সঙ্কোচিত হইয়া আসিতেছে। কিছু প্রাপ্তির আশায় একজনা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়া গৃহীর কাছে উপস্থিত হইল। দানে তাহার স্পৃহা নাই, অথচ না দিবার ছল চাই, অমনি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, কলির ব্রাহ্মণ পতিত, তাহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই ব্রহ্মতেজ নাই, যোগ ও সাধন বল নাই, সেইরূপ তপঃপ্রভাব নাই, তাহারা এখন দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও আচার ভ্রষ্ট, কাজেই দানের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র, তাহাদিগকে দান করিলে প্রত্যবায় আছে; শাস্ত্রবাক্যের ঘোর অবমাননা করা হয়," ইত্যাকার বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তিনি দরিদ্রব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আবার ব্রাহ্মণেতর নিরাশ্রয় ও দরিদ্র কেহ সাহায্যের প্রার্থী হইলে, "বেটা ভারি ভণ্ড, সক্ষম হইয়াও কেবল আলস্য ও নষ্টামি বশতঃ দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়! যখন সে খাটিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করত উদর পূর্ত্তি করিতে সমর্থ, তখন তাহাকে কিছু দিয়া সাহায্য করিলে অলসতার ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হয়," ইত্যাকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট ও আপ্যায়িত করিয়া তাহাকে বিমুখ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা আজকাল সমাজের নিত্য ঘটনা। তবে যে ভণ্ড ও প্রতারকদের দ্বারা সময় সময় লোক বঞ্চিত না হইতেছে এবং দশটা প্রবঞ্চক, জনসাধারণের মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়া যে প্রকৃত দানের ও দয়ার পাত্র উপায়-হীন নিরীহ লোকের অনিষ্ট সাধন না করিতেছে, তাহা নহে। যথা তথা দান করিলেও বঞ্চিত হইতে হয়, আবার হাত একেবারে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়, গৃহীর ধর্ম্মহানি হয়। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিয়া দান করিতে গেলে দানের কার্য্য চলে না, এই অবস্থায় করা কি? তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় এই, যদি উপ-যাচক হইয়া কেহ কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির এইরূপ ভাবিয়া দেখা উচিত, "ভিক্ষাবৃত্তি যার পর নাই হেয় ও অসম্মানের কার্য্য, যাহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা জ্ঞান আছে, সে সহজে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে চায় না, যদি কেহ স্বীয় মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া আমার নিকট ভিক্ষুকবেশে আসিয়া উপস্থিতই হইল, তবে তাহাকে একেবারে বিমুখ করিয়া দেওয়া উচিত হয় না, উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ধারণা হইলে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য কিছু দিয়া সাহায্য করিলাম, আর ভণ্ড বলিয়া সন্দেহ হইলে যৎকিঞ্চিৎ কিছু দিয়া বিদায় করিলাম। কি জানি, আমার ধারণা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত হইতে পারে, ভিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে দীন হীন ও দানের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে।" *

পাত্র ভেদে দানের পরিমাণের ইতরবিশেষ হইতে পারে, কিন্তু "সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি," এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, প্রত্যেক জীবের ঘটে ঘটে ভগবান বিরাজমান আছেন, এইরূপ ভাবিয়া কাহাকেও নিরাশ করা বিধেয় নহে; ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া নিষ্কামভাবে, "কৃষ্ণার্পণ মস্তু" বলিয়া, অবস্থা বিশেষে যথাযোগ্যরূপে দান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু,

* তবে নিতান্তই যাহাকে প্রতারক কিম্বা অন্যান্য কারণে দানের অনুপযুক্ত বলিয়া নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস ও ধারণা জন্মে, তাহাকে দান করা কোন মতেই উচিত নহে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা।

নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হয় না, তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই, কারণ ধর্ম্মের অত্যল্প অংশও মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অপিচ, "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ," যাহারা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা ও ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া দান করে, সেই সকাম ব্যক্তিরা অতি কৃপণ ও দীনভাবাপন্ন। কিন্তু যে দান করিতে একেবারে বিমুখ, সে ততোধিক পাপিষ্ঠ! সে নরাধম ও মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

অন্যকে বঞ্চনা করিয়া দান গ্রহণ করিলে, সেই দাতার কোনরূপে প্রত্যবায় হয় না, কিন্তু গ্রহীতাই প্রকৃতপক্ষে আত্মবঞ্চক ও অশেষ পাপভাগী হইয়া থাকে।

ভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্বের উপলব্ধি করিতে হইলে, দান ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হও, হৃদয়ের ও চিচ্ছক্তির পরিসর বৃদ্ধি হইবে, নতুবা চিরকালের মতন মোক্ষলাভের পথ রুদ্ধ থাকিবে।

পরোপকার ব্রত পালনে যে অজস্র অর্থ রাশিরই প্রয়োজন করে, এমন নহে। অবস্থা বিশেষে যৎসামান্য বস্তুর সদ্ব্যবহারেও মহৎ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রচুর অর্থদানে যদি লোকের দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনে অসমর্থ হও, তবে যথাশক্তি যাহা পার, তাহাই দান কর। অন্ধ আতুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যদি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা দানে অশক্ত হও, তবে একটী পয়সাই দেও; যদি তাহাও দিতে না পার, তবে পরিধেয়, পুরাতন একখানা জীর্ণ বস্ত্রই দান কর। বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদানে, ক্ষুধার্ত্তকে মুষ্টিমেয় অন্নদানে সন্তুষ্ট কর। তৃষ্ণার্ত্তকে একবিন্দু জলদানে তাহার পিপাসা শান্তি কর। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে শোক তাপানলে দগ্ধ হৃদয়, সংসার ক্লেশে ক্লীষ্ট হতভাগাকে দুটী মিষ্ট কথায় শান্ত কর, দুটী প্রবোধ বাক্যে প্রকৃতিস্থ কর, মনের তাপ দূর কর, অন্তরের দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব কর, তাহাতেই যথেষ্ট উপকার সাধন হইবে। ফলতঃ ফলোপযুক্ত সময়ে শ্রদ্ধা সহকারে যৎসামান্য বস্তুও দান করিলে মহদুপকার সাধিত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে ছোট একটী আখ্যায়িকা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কুরু পাণ্ডবদের বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের অবসান হইয়া গিয়াছে। মহারাজ

যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সার্ব্বভৌম সম্রাটরূপে হস্তিনার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হয়? দারুণ কালসময়ে যাবতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব বধজনিত শোকানলে অহোরাত্র মহারাজের অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছিল। ভগবান বাসুদেবের অনুজ্ঞায় তাঁহাকে শান্তনা দিবার জন্যে, মহাভারতের শান্তি পর্ব্বাধ্যায়ে যে সকল বহুমূল্য উপদেশ আছে, তত্তাবৎ সমস্ত পিতামহ মহাত্মা ভীষ্মদেব তৎসকাশে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইল না দেখিয়া মহর্ষি ব্যাসদেব মহারাজকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন।

যথা শাস্ত্রমতে যজ্ঞকুশল, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহামতি যুধিষ্ঠির বিধানানুসারে ঋত্বিক্ ও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র কোটি সুবর্ণ মুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতী তনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান কর।" তৎপর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান বাসুদেবের উপদেশানুসারে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্‌গণের উদ্দেশে বারম্বার তিন গুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ যজ্ঞভূমিস্থিত অসংখ্য অসংখ্য অলঙ্কার, তোরণ, ঘট ও কাঞ্চনময় পাত্র বিপ্রগণ বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ ঐ সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইরূপে যজ্ঞ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির নানা দিগ্দেশাগত ভূপালগণকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন, স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। তথায় সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, স্তূপাকার অন্নের পর্ব্বত ও রস সমূহের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে সেই যজ্ঞস্থল ও দিগ্‌দিগন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং "পান কর," "ভোজন কর," "দান কর," এই কথা ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হইয়া ছিল না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অবস্থানকালে তথায় এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সেই মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন দরিদ্র ও অন্ধগণের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইলে, ধর্ম্ম নন্দনের অসাধারণ দানশীলতা দশদিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, এমন সময়ে এক নকুল (বেজী) গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও শরীরের এক পার্শ্ব স্বুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বজ্রগম্ভীরস্বরে পশু পক্ষীগণের মনে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্য রাজ্যে ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি * বদান্য ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ শক্তু (ছাতু) † দানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না!"

নকুল গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল! তুমি কে এবং কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজার্হ মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নির্ম্মৎসর হইয়া বিবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায় যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দান দ্বারা রমণীগণের অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা আশ্রিতগণের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন। তবে তুমি কিজন্য এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ?" দ্বিজগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাস্য করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদের নিকট মিথ্যা কথা বলি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুজাঙ্গলবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তু প্রস্থদানের সদৃশ নহে। সেই বদান্য দ্বিজ যেরূপে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে আমার

---

* উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উদর পূরণকে উঞ্ছবৃত্তি কহে।

† শক্তু-ছাতু, যবাদির চূর্ণ।

এই অৰ্দ্ধ শরীর ও মস্তক কাঞ্চনময় হইয়াছে, সেই আশ্চর্য্য বিষয় এখন আপনা-দের নিকট আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।”

“ইতঃপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিক জনাকীর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজ কপোতের স্থায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ঐ দ্বিজ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারগণের সহিত ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন বা তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না সুতরাং সেই সেই দিন তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় দ্বিজের কিছুমাত্র সঞ্চিত ছিল না এবং দেশীয় শস্য সকলও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। সুতরাং দ্বিজ প্রায় প্রতিদিনই নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণের নিমিত্ত নানা স্থানে বিচরণ করি-লেন, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল। পরে দিব-সের ষষ্ঠভাগে অতি কষ্টে এক প্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা শক্তু (ছাতু) প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই দ্বিজ ও তাঁহার পরিবারবর্গ জপ, আহ্নিক ও হোম ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সেই শক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদের আবাসে উপ-নীত হইলেন। পবিত্র হৃদয়, শ্রদ্ধা সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ ও তাহার পরিবার-গণ সেই অতিথিকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে অভি-বাদন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কুটীর মধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি দ্বিজ সমাগত অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক বিনয় নম্র বাক্যে কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি যথানিয়মে এই পবিত্র শক্তু লাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করুন।’

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভোজন করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি

লাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথিকে অতৃপ্ত দেখিয়া কিরূপে তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবেন, ব্যথিত হৃদয়ে তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি এই অতিথিকে আমার ভাগই প্রদান করুন।' পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা সহধর্ম্মিণীকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আমি কিরূপে তোমার ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিব? পত্নীর দয়াতেই পুরুষের দেহ রক্ষা হয়। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাঁহাকে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।'

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহানুভবা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতির সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির অধীন। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষা নিবন্ধন পতি, ভরণ-নিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রদান নিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয়; অতএব আমার এই শক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।' মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণ প্রফুল্লচিত্তে সেই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করিলেন; অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। তদ্দর্শনে তাঁহার পুত্র কহিল, 'পিতঃ! আপনি আমার এই শক্তুগুলি লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। সতত যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। আপনি এই শক্তু দ্বারা অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন।'

পুত্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! যদি তোমার সহস্র বৎসর বয়ঃক্রমও হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবতী। আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং

আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণ ধারণ করা তাদৃশ কঠিন কাজ নহে। তুমি বালক অতএব তোমার এই শক্তু গুলি অতিথিকে না দিয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য।’

পুত্র পিতার এই কথা শুনিয়া কহিল, ‘পিতঃ। আমি আপনার আত্মা-স্বরূপ; সুতরাং আমাদ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারাই আত্ম-রক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি এই শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।’ পুত্র এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, ‘বৎস! তুমি সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। এখন তোমার বাক্যানুসারে তোমার শক্তুভাগ গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করিতেছি।’ এই বলিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অম্লানবদনে অতিথিকে প্রদান করিলেন! অতিথি তাহা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত লইয়া যারপর নাই চিন্তাকুল হইলেন। তখন তাঁহার পুত্রবধূ বিনয়বাক্যে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি এই শক্তু গুলি লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন, তাহা হইলেই ঐ ব্রাহ্ম-ণের সন্তোষলাভ নিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার অনুগ্রহে আমার অক্ষয় লোক লাভ হইবে।’

পবিত্র স্বভাবা পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, দ্বিজ মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, ‘বাছা! তুমি বায়ু ও রৌদ্র সেবনে নিতান্ত বিবর্ণা ও ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার শক্তু গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম পথ অতিক্রম করিব? বিশেষতঃ তুমি বালিকা; ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; এই অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।’ দ্বিজ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ক’হিলেন, ‘ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরুর এবং দেবতার দেবতা, গুরু সেবা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষনীয়া জানিয়া এই শক্তু গুলি গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।’

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, দ্বিজ তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া কহিলেন, ‘বৎসে! তোমার তুল্য সৎস্বভাবা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি সেবা-শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা; অতএব আমি

তোমার শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করিতেছি'। এই বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করিলেন।

তখন সেই অতিথি উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলৌকিক কার্য্য দর্শনে যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। স্বর্গবাসী দেবগণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্ষুধা দ্বারা মানুষের জ্ঞান, ধৈর্য্য, ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি ক্ষুধাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি স্ত্রী পুত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে, আমাকে শক্তু প্রদান করিয়াছ। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে, মহাফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গল স্বরূপ। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল লাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে। যাহার কিছুমাত্র সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফল লাভে সমর্থ হয়। ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতি সাধন করা যায়, অন্যায় লব্ধ মহামূল্য বহুতর বস্তু দান করিয়াও তাহার তদনুরূপ প্রীতি সাধন করা যায় না। তুমি এই শক্তু দান করিয়া যে ফল লাভ করিলে, ভূরি ভূরি দক্ষিণা, বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সে ফল লাভ হয় না। তুমি এই শক্তু প্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। আমি ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ বেশে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধার সাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। এখন তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর। অতিথি-বেশী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সপরিবারে দিব্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের আবাস মধ্যে বাস

করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে, আমি বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত শক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তদ্দত্ত শক্তুর আঘ্রাণ ও তাঁহার আশ্রমে আকাশ হইতে নিপতিত পুষ্প সমূহের গন্ধ প্রভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধ শরীর কাঞ্চনময় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ কাঞ্চনময় করিবার প্রত্যাশায় বারম্বার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞ স্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কোন স্থানেই আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না। এক্ষণে রাজকুমার যুধিষ্ঠিরের এই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি ; কিন্তু এখানেও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি যে, এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ শক্তু দানেরও তুল্য নহে।" নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তৎপর ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীসুদর্শন দাস।

প্রণব, ছবি ও গান।

সঙ্গীত আলাপ।

(১ম সংখ্যার ৬৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

১ নীরব। অন্ধকার ছায়া (grey)

২ ম স গগণের নীলবর্ণ (Blue) ভক্তি

৩ গ নি হেমাভ (Orange) Yellow + Red (জ্ঞান + ভক্তি) প্রেম

৪ রে ধ হেমাভযুক্ত নীল (purple) Yellow + Red + Blue (জ্ঞান + কর্ম্ম + ভক্তি)

৫ স প অস্তগামী সূর্য্য (সিন্দুর) Red (কর্ম্ম)

৬ নি ছায়াদেহ (স্থূল) Black

এস্থলে সাধক ও গৃহস্থের পক্ষে সূর্য্যাস্ত পৃথকভাব সমন্বিত। সাধক সন্ধ্যার কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন না; তিনি অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যদেবের অমিত তেজের সহিত স্বীয় প্রাণশক্তি মিশাইয়া তাঁহাকে টানিয়া হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে চান। সূর্য্যের মহান জ্যোতি তিনি সহ্য করিতে অশক্ত, অতএব হেমাস্তের উপর স্থির হইয়া থাকেন; এবং তথা হইতে আবার অস্তগামী প্রাণ সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয়েন। এই টানাটানির মধ্যে একবার তাঁহাকে ভক্তির দিকে, একবার কামনাযুক্ত সাংসারিক কর্ম্মের দিকে যাইতে হয়। যাঁহারা Luoifer নামক থিয়সফি গ্রন্থে Thought forms বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, জ্ঞান, কামনা, ভক্তি, প্রভৃতি বৃত্তি গুলি উত্তেজিত হইলে মানব শরীরের ছটায় (Aura) কিরূপ বিভিন্ন বর্ণ বিকসিত হয় তাহার সহিত মিলাইয়া লইলেই আমার বর্ণালাপ যে কল্পনা কিংবা রূপক নহে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে Aura (ছটা) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বিরত হইলাম। ইহার ভিত্তি শ্রুতিতে আছে, বারান্তরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পৃথিবীর সন্ধ্যা যেমন প্রকৃতির বর্ণে বিভাসিত হয়, জীবনের সন্ধ্যা তেমনিই প্রত্যেক চক্রের বর্ণে বিভাসিত হয়, এবং হৃদয়ও তেমনি তালে তালে নাচিতে থাকে।

যাহা হউক আমার পূরবীর আলাপে গা (Orange) বিশ্রাম স্থান (Orange is the prevailing color of sunset) সূর্য্যের রূপ হৃদয়ে দেখিতে * গিয়া গায়ক সা-রে-গা উচ্চারণ করিয়া আবার কর্ম্ম (সংসার) ক্ষেত্রের দিকে নামিলেন (গা-রে-সা) এবং নিশার অন্ধকারময়ী নি তখন তাঁহার বিশ্রাম স্থল হইল। পূরবীর গান্ধারই প্রাণ (জ্ঞান) নিষাদ (সম্বাদী) কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিশ্রাম স্থান। যাঁহারা যোগী তাঁহারা সূর্য্যের সঙ্গে তাঁহার নবীন গন্তব্য দেশে আবার খাদে (মূলাধারের দিকে) নামেন এবং সূর্য্যকে আকর্ষণ করেন। এটুকু খাদের (উদারার) আলাপ। উদারার মুদারার ভাব একই।

---

* যাঁহারা চিত্রকর তাঁহারা জানেন Orange বর্ণের contrast blue (নীল) অতএব প্রত্যেক orange light উদ্দীপ্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ নীলের shade প্রদান করিতে হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিতত্ত্বে আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

ঊর্দ্ধ বিভাগেরও ইতিহাস তাহাই। পঞ্চমকে সুর করিলে তাহার স মধ্যম হয়। সুতরাং গায়ক পুনরায় চড়ার নিষাদে গিয়া (গ) আবার কড়ি মধ্যমে (নি) আসিয়া পঞ্চম কড়িমধ্যম ও মধ্যম দেখাইয়া গান্ধার হইয়া সুরে নামিয়া আসেন। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা নীলবর্ণে "সম" ফেলিয়া দেন; যাঁহারা সংসার-কর্ম্মী তাহারা সুরে আসিয়া গান শেষ করেন। এই ঊর্দ্ধজগত ও অধোজগতের যুক্তস্থান ম র্ম এই জন্য পূরবীতে দুই মধ্যম লাগে।

নি স রে॑ গ ম+র্ম প ধ নি স

দুইটী মধ্যম একত্রিত হইলে যেন বেলা ধিক্ ধিক্ করে। "আমি দৃশ্যমাণ গোলক হইতে (প) অদৃশ্যমান জগতে চলিলাম, আমাকে ধারণ কর"

"আমাতে অবস্থিত হও"

এই মধুর ভাষাই পূরবী রাগিণীর মন্ত্র। তেমাতে (প) অবস্থিত হইলাম ত, তুমি কিন্তু অস্তে যাইতেছ, আবার আমাকে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইতে হইবে আমি যাই কোথা ?—

স্থায়ী। সাধক—প প র্ম ম গ র্ম প ? (যাই কোথা ?)
সূর্য্য—প স নি প র্ম ম। (হৃদয়ে রূপ দেখ)
সংসার। গ রে॑ স নি (অন্ধকার)

অন্তরা। সাধক। নি রে॑ গ প ধর্স র্সর্সনির্সা (অবস্থিত হইলাম)
নির্সরে॑র্গ (তারা) তোমাকে ভক্তি হইতে জ্ঞানে লইয়া গেলাম।
সূর্য্য। সা নি নি নি প র্ম প র্ম ম (হৃদয়েই থাক)
সংসার। গ রে॑ নি সা (অন্ধকারেই থাক ও কর্ম্মফল ভোগ কর)

পাঠক হয়ত মনে করিবেন এ লোকটা উন্মাদ। কিন্তু ইহা নূতন কথা নয়, হৃদয়ের ভাবের যে বিজ্ঞান আছে, তাহা বহু পুরাকালে ঋষিগণ * আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সেই জন্য মন সাবয়ব ইহা শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা মুখে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করি মাত্র; কিন্তু যাহা এখনও আবিষ্কার হয় নাই, সেই অজ্ঞাত জগতের কথা বলিতে গেলেই কথাটা বিজ্ঞান বহির্ভূত হইয়া পড়ে। কবির কল্পনা কল্পনা নহে। কবি

* নারদ, কহ্লার, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ।

ইচ্ছা করিয়া কল্পনা করেন না। প্রকৃতির ক্ষেত্রজ্ঞে (Spirit) মন ঢালিয়া দিলেই নীরব শব্দ ও রূপ সাবয়ব হয়। প্রকৃতির প্রলাপ হইলেও গায়ক এই সুর ভাল বাসেন, এবং কবি এই সুর লইয়া বৈখারি বাকে সঞ্চারিত করেন। আমি অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ করিয়া সন্ধ্যার চিত্র ও রাগিণী অনুভব করিয়াছি। চিত্রকর কবি ও গায়ক একই দৈবীশক্তির উপাসক। ইহার আর কোন কথা নাই "Dwell in me" আমাতে অবস্থিত হও।

কিন্তু এই আলাপ তানপুরার সুরে যুক্ত না হইলে বেসুরা হইবে। রাগিণী দৈবীশক্তির রূপ মাত্র (পরা প্রকৃতি) অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতি তাহার বাহন মাত্র। অর্থাৎ আপনার সম্মুখে কয়েকটী বর্ণ সাজাইয়া দিলেই যে আপনি চিত্রকর কিম্বা গায়ক হইবেন তাহা নহে; সকলেই "ক" দেখিয়া প্রহ্লাদের দশা প্রাপ্ত হয় না। মনে করিলে পূরবী রাগিনী একটা শব্দের তারতম্য মাত্র; কিন্তু সুরে যুক্ত হইলে পূরবী রাগিণী কামাখ্যাদেবীরূপে তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়েন। পশ্চিমাভিমুখী শিবের অপরা পূরবী শক্তি শিবের পরা শক্তিতে ভক্তের হৃদয়ে সম্মীলিত হইলে উদয়াস্তের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

যেমন অস্তকালে দেবী পূরবী মূর্ত্তি ধারণ করেন, তেমন উদয় কালে দেবীর ভৈরবী মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। ভৈরবী ভৈরব রাগের সহচরী। শিবের শক্তি উমা। এই স্থলে একটী কথার অবতারনা আবশ্যক।

> সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্
> কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
> প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ
> ভূত গ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃর্তেবশাৎ ॥ ৮
> ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়
> উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ গীতা ৯ম অধ্যায়।

যাঁহারা রাজযোগী তাঁহারা এই মায়ার গূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন। আপনি ত গীতার ৬৪ খানা টীকা পড়িয়াছেন, আপনি ত বিজ্ঞান-বিৎ, গ্রহ উপগ্রহের গতির কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আপনি ত রাসলীলা গ্রাহী, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় দ্বাদশরাশিচক্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আপনি আমাকে বলিতে পারেন

কি গ্রহ উপগ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডে ঘূর্ণায়মান হইবার কারণ কি ? আমাদিগের সনাতন শাস্ত্র কেন সূর্য্যকে অয়নমার্গে গতি বিশিষ্ট করিয়া, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণকে স্থির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ? ইহা কি ভ্রম ? না, ইহাই কি বলিতে হইবে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন ? আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ সন্দেহ নাই। অন্ধকার হইতে আলোক ভাল এবং বিজ্ঞান আলোক হইতে প্রজ্ঞা আরও ভাল। আপনি শিশুগণকে লাটিম খেলিতে দেখিয়াছেন ? তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন লাটিমটী কেন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুর্ণায়মান হয়। লাটিমের উপর যদি একটী পিপীলিকা থাকে তবে সে গতির স্রষ্টা (শিশু) কে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখিবে। ইহাই বিজ্ঞানের চরম গতিবাদ। লাটিম ঘুরিল কেন ? ইহা শিশুর (শ্রীকৃষ্ণের) খেলা। মায়া। মায়ার উদ্দেশ্য কি ? পিপীলিকা দেখিবে যে তাঁহার দেহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম এবং পুনরায় পূর্ব্ব হইতে লুকাচুরি খেলিতেছে ইহাতে তাঁহার আনন্দ হয়। প্রজ্ঞাচক্ষে তাঁহাতে যুক্ত হইয়া কি দেখিতেছেন ? যে তাঁহার শক্তি কুণ্ডলিনী-রূপে (লাটিমের দড়ি) একটি মায়াগতি বিস্তার পূর্ব্বক লাটিমকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ২৪ ঘণ্টায় মেরুদণ্ডে ও সৌর বৎসরে দুইটী অয়নে (eliptical orbit) হাবুডুবু খাওয়া হয়। পুনরায় ক্রান্তি বিন্দুতে আসিয়া ফেলিতেছে। আবার তিনি নিজে অজ্ঞাত পরাশক্তি দ্বারা সে লাটিমকে ধরিয়া আছেন। ইহারই (Dynamics) বুঝিতে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইলেন, দর্শনশাস্ত্রকারগণ বুঝিয়াও বিজ্ঞানবিৎগণকে বুঝাইতে পারিলেন না ; ভক্ত কেবল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইহা হইতে কাল, (time) এবং দেশ (Space), ইহা হইতেই বিজ্ঞানের আকুঞ্চন প্রসারণ, ইহা হইতেই অহঙ্কার এবং অষ্টধাপ্রকৃতি। শাস্ত্র যখন বলিয়াছিলেন যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তখন কেবল মায়াশক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে মাত্র। কল্পের প্রারম্ভে সূর্য্যের শক্তি যথার্থই মায়াজাল বিস্তার করিয়া দৈনিক গতি ও বার্ষিক গতির সৃষ্টি করে। এই গতিই ভ্রমের মূল। উহা অসৎ না সৎ ? তিনি ত নাদবিন্দুতে অবস্থিত তবে তাঁহার এই ত্রিভঙ্গ গতি কি চাতুরী ? (I spiral or axial II) (Orbital III Centrefugal) তাহা তিনিই জানেন।
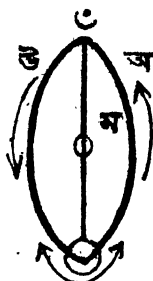
তিনি এই চাতুরী দেখিতেছেন অথচ বদ্ধ নহেন। তিনি ত লাটিমটী ঘুরাইয়া মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এখন ভক্ত যায় কোথায়? এই জন্য তিনি ভক্ত যোগীর পথ সুষুম্নায় রাখিয়াছেন। তাঁহার ঐ পরাশক্তি ধরিয়া তোমাকে শুকদেবের ন্যায় উঠিতে হইবে। তাঁহার কিরণ বড় মধুর। উহা সত্য প্রেমময়ী, গায়ত্রী, সতী। তাহারই অন্য নাম ভৈরবী।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মানবীয় সপ্তরূপ।

(১ম সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

চতুর্থরূপ—কামরূপ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু কামরূপের অন্তর্গত। গীতা শাস্ত্রে কথিত আছে :—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংযায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২।২অঃ
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩।২য় অঃ গীঃ

মনের দ্বারা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তত্তৎ বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে বাসনা, লোকের সকল বাসনা সফল হয় না, প্রতিবন্ধক বশতঃ বাসনা পূর্ণ না হইলে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম জন্মিয়া থাকে, স্মৃতি ভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধি নাশ হইলে মানুষ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় কার্য্যই এই কাম প্রসূত ও কাম প্রেরিত। এই কামই জীবের সংসার বন্ধনের মূল। সপ্ততত্ত্বের মধ্যে এই তত্ত্ব চতুর্থবশতঃ ইহা তত্ত্ব সকলের ঠিক্ মধ্যবর্ত্তী। ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতা সম্বন্ধে মনুষ্যও পশুজীবনে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। দেহকে নিমিত্তমাত্র করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ও আশ্রয়ে কাম বাহ্য জগতে নানারূপে প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মন দুইভাগে বিভক্ত, সংকল্প অর্থাৎ অধোমনস্ (Lower Manas) এবং বিজ্ঞান বা উর্দ্ধমনস্ (Higher Manas) কাম এই সংকল্পের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে কামমনস্ কহে; ইহাই মানুষের নিয়মিত সাধারণ জ্ঞান, কিন্তু সংকল্প বর্জ্জিত শুধু কাম, আমাদের মধ্যে পাশব শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কাম প্রাণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুবোধক জীবনীশক্তি স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; ইহা আমাদের সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভব শক্তির ভিত্তি ভূমি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যিক পদার্থাদির সংস্পর্শে আইসে, তাহারা পিণ্ডদেহস্থিত আভ্যন্তরিক বোধশক্তির কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু প্রাণ উক্ত ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের কেন্দ্র সমূহের সহিত মিলিত হইয়া যদি তাহাদিগকে ক্রিয়া দ্বারা অনুকম্পিত না করিত, তবে তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য পালনে কখনই সমর্থ হইত না। এই প্রাণ অসার কামদ্বারা চালিত হইয়াই ক্রিয়া শক্তিশালী হইয়া থাকে।

যদি কেহ কোনরূপ কাম ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হয়, তখন তাহার বোধ শক্তি কামরূপে গিয়া স্থিত হয়। একটি গাছের রশ্মি দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইল, অর্থাৎ সূক্ষ্মাকাশে বা ঈথারে বৃক্ষটির আকৃতির আন্দোলন হইয়া, সেই আন্দোলন প্রবাহ বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিঘাত করিল, সেই প্রতিঘাতে

ভাওদেহের স্নায়বিক কোষ সমুদয় আন্দোলিত হইল, তাহারা আবার ভাও ও পিণ্ডদেহের কেন্দ্রস্থানগুলিকে প্রকম্পিত করিল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত আন্দোলনপ্রবাহ সুখ-দুঃখ-বোধ-শক্তির-ক্ষেত্র কামে গিয়া উপস্থিত না হয়, এবং কাম আমাদিগকে অনুভব না করায়, সেই পর্য্যন্ত বৃক্ষের কোনরূপ দৃশ্য আমাদের সুখ দুঃখ উৎপাদক হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কামের দ্বারাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুনিচয় আমাদের সুখদুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

জীবিতাবস্থায় এই কাম কোন আকৃতি বিশিষ্ট থাকে না, কিন্তু মরণের পর ইহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগতের স্বচ্ছ উপাদানে কামরূপ বা কামশরীর ধারণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট এক অবয়ব বিশিষ্ট হয়। এই জন্য কামকে কামরূপ বলা হইয়া থাকে।

কামলোকে ভোগ শেষ হইলে যখন আত্মা বদ্ধি-মনস-বিশিষ্ট জীব কামলোক বা যমলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়, তখন এই কামশরীর কামরূপী ভূতের ন্যায় কামলোকে বিচরণ করে।

যমলোকে পাপকর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে জীব যখন স্বকীয় পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বরূপ স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্যে স্বর্লোকে গমন করে, তখন কামাদি রিপুনিচয় একটি নির্দ্দিষ্ট অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া যমলোকে (ভুবর্লোকে) পরিভ্রমণ করে। এই কামদেহের অনুভব শক্তি নিতান্ত কম ; জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবেক বিহীন হইয়া ইহা কেবল পাশব ভোগ তৃষ্ণায় ও ধূর্ত্ত বুদ্ধি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারা ভূতের অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া যে সকল স্থানে মদ্যপান, মাংসাহার ও ব্যভিচার ইত্যাদি পাশব ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়, এবং যাহাদের কামরিপু ও ইন্দ্রিয়াসক্তি অতি প্রবল এবং দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের সমীপে অজ্ঞাতসারে গমন করিয়া উক্ত কার্য্যে তাহাদিগকে আরও বিশেষ রূপে এবং অলক্ষিত ভাবে প্ররোচিত এবং প্রবৃত্ত করে। প্রেততত্ত্ববাদীদিগের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, তবে এই কামরূপ আসিয়া নিতান্তই তাহাকে আশ্রয় করিবে, এবং তাহার হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তিকে আরও উত্তেজিত করিয়া দিবে। কামদেহ কামে পরিপূর্ণ, কিন্তু অবলম্বন ও আশ্রয় ব্যতীত পার্থিব জগতে এই কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদিত হয় না, তাই ইহা কামাসক্ত আবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করে। আবার এই কামদেহ

যে পরলোকগত ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সদৃশ কামাসক্ত কোন ব্যক্তি যদি দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উপস্থিত থাকেন, তবে এই কামদেহ তাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ণিত পরলোকগত ব্যক্তি এবং উক্ত দর্শকের মধ্যে অভাবনীয় এক কামাসক্তির প্রবাহ চালিত করিয়া পরিণামে বিষময় ফল উৎপাদন করে।

*পরলোকগত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগ তৃষ্ণার তারতম্যানুসারে কাম*লোকে কামদেহের স্থিতিকাল পরিমাণেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যদি মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে, তবে তাহার কামদেহ কামলোকে অধিক দিন স্থায়ী হইবে, এবং যিনি জ্ঞানাশ্রয় করিয়া সংযতচিত্তে পুণ্যপথে বিচরণ করতঃ জীবন যাপন করিয়া থাকেন, মৃত্যুর পরে যমলোকে তাহার কামদেহ অল্পদিন স্থায়ী হয়, এবং তিনি অনায়াসেই কামলোকরূপ বৈতরণীর অপর পারে চলিয়া যাইতে সমর্থ হন। আর যদি কোন দৈব ঘটনা বশতঃ অকস্মাৎ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বা আত্মহত্যা করে, তবে কামে ও প্রাণে যে সুদৃঢ় বন্ধনটি থাকে, তাহা সহসা ছিন্ন না হওয়াতে কামদেহ সমধিকভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া বহুকালস্থায়ী হয়, কিন্তু যিনি জীবনে কামকে সংযত ও রিপু সমূহকে বশীভূত করিয়া পবিত্র ধর্ম্ম জীবন যাপন করেন এবং তদ্দ্বারা সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সমূহের স্ফুরণ করেন, তাহার কামদেহ কামলোকে ক্ষণস্থায়ী হয়, এবং তাহা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্হিত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অর্জ্জুনোবাচঃ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬।৩য় অঃ গীতা

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃষ্ণিবংশধর, পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে বলপূর্ব্বক তাহাকে পাপাচরণে লিপ্ত করে ?

তদুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেনঃ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহবৈরিণম্॥ ৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮।৩

আবৃতং জ্ঞান মেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯।৩
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০।৩
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্ ॥
৪১।৩য় অঃ। গীতা।

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি পুরুষের পাপাচরণের যে হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, উহা কাম; কোন কারণে প্রতিহত হইলে তাহা ক্রোধ রূপে পরিণত হয়, ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র, উহাকেই মোক্ষপথের বৈরী বলিয়া জানিবে।

যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, মলদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত থাকে। হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীগণের চির শত্রু, দুষ্পূরণীয়, অনল সদৃশ এই কামই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র; এই কামাশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ, তোমাকে বিমোহিত করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশী পাপরূপ কামকে পরিত্যাগ কর।

এই কামরূপ শত্রুকে কিরূপে পরাজয় করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ আবার বলিয়াছেনঃ—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরংমনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২।৩
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মান মাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩।৩ গীতা

ইন্দ্রিয় সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয় দেহাদি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ও তাহাদিগের প্রকাশক, এজন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত। মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি আছে, এইজন্য সংকল্পাত্মিকা বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,

আর যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। অতএব হে মহাবাহো, আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া, বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চলকরত কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে বিনাশ কর।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫। ৬ গীতা।

হে মহাবাহো, চঞ্চল স্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ তাহাতে সংশয় নাই, তথাপি হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।

পুরাকালে যযাতি নৃপতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরাগ্রস্থ হইয়া তস্য সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পুরুতে উক্ত জরা সংক্রামিত করতঃ তৎপরিবর্ত্তে তাহার সতেজ ও বর্দ্ধিষ্ণু নবযৌবন লাভ করিয়া শতবর্ষব্যাপী রাজোচিত বিষয় বিলাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া পুরুকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়নক্রমে বলিতে লাগিলেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপ ভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥

বিষয় বাসনার উপভোগ করিলে তাহা উপশম হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে যেমন অগ্নির তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষয় বিলাস সম্ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-নিচয় প্রশমিত না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তৃষ্ণা এতই বলবতী এবং অতৃপ্ত যে, এই পৃথিবীতে যত কিছু ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও নবযৌবনসম্পন্না রমণীগণ আছে, তাহা একজনের সম্ভোগের জন্যেই প্রচুর নহে, অতএব এমন যে দারুণ ও প্রবল তৃষ্ণা তাহাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া মহারাজ যযাতি পুরুকে তাহার যৌবন প্রত্যার্পণ করিয়া স্বীয় জরা পুনঃ গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

আমাদের সিমলাস্থ ঔষধালয়ের সান্নিধ্যে, কোন সম্পন্ন গৃহস্থের এক যুবা পুত্র, পশু চিকিৎসায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাঞ্চলের সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। গত বৎসরের প্রারম্ভে সেই কর্ম্মোপলক্ষে পাটনার সন্নিকটে কোন নগরে যাইতে যাইতে একটি জনহীন প্রান্তর পার হইতে হয়। সেই প্রান্তরে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার তীর দিয়া যুবক যাইতে ছিলেন, কোথাও জন প্রাণী নাই, এমন সময় একজন দীর্ঘাকার হিন্দুস্থানী অকস্মাৎ দীর্ঘিকার "পাহাড়" মধ্য হইতে যেন উঠিয়া তাহাকে রুক্ষ স্বরে "কাঁহা জাতা?" জিজ্ঞাসা করিল। যুবক উত্তরে বলিল যে সে তাহার কর্ম্মস্থলে যাইতেছে। ইহা শুনিয়া আগন্তুক অধিকতর রুক্ষস্বরে বলিল "ল্যাড়কা তুম্ আপ্‌না ঘর যাও, পর-দেশ মে মত্ রহো, তেরা বড়ী বুরী বখৎ আয়ী হ্যায়।" যুবক ইংরাজী নবীশ, তাহাতে আবার চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বয়সও উচক্কা কাজেই অপরিচিতের কথায় বড় কর্ণপাত না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকপদ মাত্র গিয়া মনে করিল যে লোকটা কে কেনই বা আমাকে অযাচিতভাবে সতর্ক করিল, একবার দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে কেহ কোথা নাই। কিছু বিস্মিত হইয়া আপন গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট সহরে পৌঁছিয়া আপন কর্ম্মে মন দিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে বদ্‌লী করা হইলে, সে হাজারীবাগ অঞ্চলে আসিল। তথায় দুই চারি দিন পরেই তাহার এত কঠিন জ্বর হইল, যে তাহাকে অগত্যা বাটীতে আসিতে হইল। বাটী পৌঁছিয়া বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা তাহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে তাহার যকৃতে স্ফোটক উৎপন্ন হইল। ডাক্তারেরা শস্ত্রোপচার করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহার পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। সকলই স্থির হইল। ২।১ দিবসে অস্ত্র করা হইবে, পোল্‌টিসের ব্যবস্থা হইল। এমন অবস্থায় তাঁহার কোন আত্মীয়া নিষ্ঠাবতী বিধবা রাত্রিযোগে স্বীয়া পতি ও অপর এক ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দেখিলেন ও শুনিলেন যে তাঁহারা রোগীর নিমিত্ত কোন পদার্থ তাঁহার হস্তে দিয়া পর দিন

প্রত্যুষেই রোগীর দক্ষিণ বাহুতে বন্ধন করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পরদিন বিধবা শুচি হইয়া সেই পদার্থটি রোগীর দক্ষিণ বাহুতে বন্ধন করিয়া দিলেন। রোগী ও তাঁহার পিতা বড় একটা শ্রদ্ধান্বিত হইলেন না বটে তথাপি বন্ধন করিতে কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর দিবস ডাক্তারেরা সাজ সরঞ্জাম লইয়া অস্ত্র করিতে আসিয়া দেখেন যে যকৃতের বেদনা ও স্ফীতি প্রায় নাই, জ্বর ও অনেক লাঘব হইয়াছে। ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহাদের ঔষধ ও পোল্‌টিস্‌ দ্বারাই মহোপকার হইয়াছে। কাজেই অস্ত্র করা নিস্প্রয়োজন। তাঁহারা ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন ও বলিলেন যে জল বায়ু পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক। কিছুদিনের মধ্যেই রোগী প্রায় নিরাময় হইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল। তথায় অল্প দিন বাস করিতে করিতে পুনরায় জ্বর দেখা দিল ও এবার সেই সঙ্গে খুশ খুশে কাশি দেখা দিল। তত্রত্য ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ও ক্ষয় রোগ অধিকার করিতেছে আশঙ্কা করিলেন। রোগীও দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। একদিন বায়ুকোষ হইতে কতকটা রক্তপাতও হইল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইতে লাগিলে যুবকের পিতাকে তার যোগে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। এদিকে বাটীতে শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজা। সুতরাং সেদিন তাঁহার পিতা কোন ক্রমেই যাইতে পারিলেন না। পরদিন রেলগাড়ীতে রওনা হইয়া বৈদ্যনাথে গিয়া দেখেন পুত্র প্রায় মুমূর্ষ অতিশয় ক্ষীণ। অতি সাবধানে যেন কোন প্রকারে রোগী লইয়া তিনি গৃহাভিমুখীন হইলেন। বাটী পৌঁছিয়া চৌকিতে বসাইয়া অতি যত্নে তাহাকে অন্দরে লওয়া হইল। পরদিন ডাক্তারেরা আসিয়া বড়ই ভয় পাইলেন এবং রোগীর পিতাকে বড় আশা দিতে পারিলেন না। ঔষধ ব্যবস্থা হইল, চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু বড় কিছু ফল হইল না। একদিন রাত্রিকালে তাঁহার পিতা বিষণ্ন মনে রোগীর পার্শ্বে শয্যায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ রোগী চীৎকার করিয়া "ফিট্" হইবার মত হস্তপদ ছুড়িতে লাগিল, গোঁ গোঁ করিতে লাগিল, শিবনেত্র হইল, দাঁতি কপাটিও লাগিল। পিতা নিতান্ত ভীত হইয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গললগ্নবাসে রোগীকে বলিলেন "আপনি কে?" রোগী বলিয়া উঠিল "আমি বাবা তারকনাথ" ইহাতে বড় আশ্চর্য্য হইয়া পিতা বলিলেন। আমার ও পুত্রের কি অপরাধ? উত্তর—অপরাধ নাস্তিক্য ও অবি-

শ্বাস। আমি রক্ষা বন্ধন করিতে দিয়াছিলাম তাহাতে তোমাদের কাহারই শ্রদ্ধা হয় নাই। ডাক্তারের ঔষধে অধিকতর বিশ্বাস। এখন দেখি তোমার কোন ডাক্তারে কি করিতে পারে। ইহাতে কর্ত্তা ও পুরবাসিনীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাহাতে উত্তর হইল যে "আচ্ছা দেখি তোদের ভক্তি, কলিকাতায় এক কাঠা জমির উপর একটি বিল্ববৃক্ষ স্থাপনা করিতে পারিস্ তবে এ রোগী আরোগ্য হ'বে নচেৎ টাকার শ্রাদ্ধ ও মনঃকষ্ট অবশ্যম্ভাবী।" ইহা শুনিয়া বাটীর কর্ত্তা মাণিকতলায় আদেশানুযায়ী বৃক্ষ স্থাপনা করিলেন। রোগীও ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু ২।১ দিন অন্তর রোগীর উপর "ভর" হইতে লাগিল। এই অবস্থায় রোগী যাহাকে সম্মুখে দেখিত তাহার ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিত। কতলোকের উৎকট উৎকট রোগের ঔষধ দিতে লাগিল। আজিও প্রত্যহ "ভর" হইতেছে। কিন্তু অনাচার অশুদ্ধি হইলে রোগীর ক্লেশ হয়, নচেৎ কোন কষ্টই হয় না; কেবল অজ্ঞানবৎ অবস্থান করিয়া "বক্তার" হয়। রোগের এখন আর কোন লক্ষণই নাই তবে বড় কৃশ ও রক্তহীন বলিয়া বোধ হয়। আমরা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগকে দেখা-ইতে পারি কিন্তু বাটীর কর্ত্তা ইহাতে অসম্মত। তবে উপরোধ অনুরোধ করিলে কি করেন বলা যায় না। "ভর" অবস্থায় অনেক যুবকের পাদোদক লইয়া যায় কিন্তু ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে প্রকৃতই কি "বাবা তারকনাথ" "ভর" দিয়া আশ্রয় করেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে কোন "Good spirit" গুড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ দেবতার অনুগ্রহ হওয়া সম্ভব। গণদেবতারা যে দেবের পার্শ্বচর ও আজ্ঞাবহ তাঁহারা প্রভুদেবের নাম গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন। নতুবা প্রকৃত "বাবা"র অনুগ্রহ হইলে আশ্রিতের মুখে ও দেহে একপ্রকার ওজঃ নিসৃতঃ হইত। একপ্রকার কমনীয়তা লাবণ্য ও দৈবী ভাবের বিকাশ হইত। কিন্তু রোগীর আকৃতিতে সেপ্রকার কিছুই উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক এবিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে প্রকৃত তথ্য জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তই এই বৃত্তা-ন্তটি পত্রস্থ প্রকটিত হইল।

শ্রীক্ষীরোদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

সার হল যে কথার কথা দেখনা কি আমার মন।
কাজের কথা নাহি তোমার বৃথা কাল কর হরণ ॥
উপদেশ নানা মত, পেলে তুমি অবিরত,
বিচার বিতর্ক কত, করিলে হে অনুক্ষণ ॥
ভেবে কিছু কি দেখেছ, ও সবে কি ফল পেয়েছ,
যা ছিলে তুমি তাই রয়েছ, না দেখি পরিবর্ত্তন।
সেই ত বিষয়াসক্ত, রাগাদিতে সেই প্রমত্ত,
সেই রিপু অনুরক্ত, কোথা তব সংশোধন ॥
শাস্ত্র কথায় ফল চাও যদি, কার্য্যে কর পরিণতি,
কাণে শুনে মহৌষধি, কোথা ব্যাধি প্রশমন ॥
তাই বলি ওরে মন, সাধনা কর সেবন,
(দিয়ে) সদাচার অনুপান, ভক্তি মধু প্রক্ষেপণ।
বল্‌বে শুন্‌বে যদি কথা, সার কররে হরি কথা,
কথার কথায় হয়ে যাবে, ভব-ব্যাধি নিবারণ ॥

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

গান।

অহংকার ভাই করবো কিসে ?
আমার আকার ভাবলে হাকার আসে।
পুঁজ রক্ত নাড়ীভুঁড়ী, জড়ীভূত হাড়ে মাসে,
আবার, গায় গরবে দেহের গরব, সেত যাবে সেই শমন বাসে।
ক্রিয়া কর্ম্ম দান ধর্ম্ম না করিলাম দেবোদ্দেশে,
যত জারি জুরি বাহাদুরী বেরিয়ে যাবে এক নিশ্বাসে।
দর্পহারী হরি যিনি হৃদয় মাঝে আছেন বসে,
কিঞ্চিৎ দোষ দেখলে পরে কাণ মলে দেন অমনি কসে।
সত্যভামার কথা শুনে মনে মনে মরি হেসে ;
মহেন্দ্র তার কীটানুকীট জোর তুফানে যাবে ভেসে।

৪র্থ ভাগ। { আষাঢ়, ১৩০৭ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

পাণ্ডব-গীতা

বা

প্রপন্ন-গীতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২১)

উদ্ধব কহিলেন :—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যং দেবমুপাসতে।
তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ॥

দেবদেব বাসুদেবে ছাড়ি যেই জন
অন্য দেবতার পূজা করে অনুক্ষণ,
সে দুর্ম্মতি পিপাসায় হইয়া বিহ্বল
বসিয়া গঙ্গার তীরে চায় কূপ-জল।

(২২)

ধৌম্য কহিলেন ঃ—

অপাং সমীপে শয়নাসনস্থিতৌ
দিবা চ রাত্রৌ চ যথাধিগচ্ছতা।
যদাস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥

পুণ্য জলাশয়-তীরে গমন করিয়া
শয্যায় শুইয়া কিম্বা আসনে বসিয়া
হউক দিবস কিম্বা হউক রজনী
বথায় যেরূপ ভাবে থাকি না যখনি,
যদি ক'রে থাকি কিছু সুকৃতি কখন,
তাহে যেন তুষ্ট হন দেব নারায়ণ!

(২৩)

সঞ্জয় কহিলেন ঃ—

আর্ত্তাবিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমাত্রং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥

পীড়িত দুঃখিত কিম্বা পুনঃ ভগ্নদেহ,
ব্যাঘ্রাদিরো ভয়ে যদি ভীত হয় কেহ,
নারায়ণ শব্দ মাত্র আনে যদি মুখে,
সব দুঃখ যায় তার, থাকে মহাসুখে!

(২৪)

অক্রূর কহিলেন ঃ—

অহং হি নারায়ণ দাসদাস—
দাসস্য দাসস্য চ দাসদাসঃ।

অন্ত্যন্ত ঈশো জগতাং নরাণাং
তস্মাদহং চান্যতরোঽস্মি লোকে ॥

হরির দাসের দাস, তাঁরো দাস—দাস,
তাঁহারো দাসের দাস হইতে প্রয়াস!
এ সংসারে কত জন কত দেবতার
পূজা করে নিরন্তর, সীমা নাহি তার।
আমি কিন্তু সেই সবে করিয়া বর্জ্জন
কেবল হরির পদে সঁপিলাম মন!

(২৫)

বিদুর কহিলেন :—

হরে নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার,
একমাত্র হরিনাম জীবন আমার।
কলিকালে জীবগণে করিতে উদ্ধার
গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই আর!

(২৬)

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবে জন্মনি জন্মনি ॥

হরিপদে মন প্রাণ করি সমর্পণ
যাহার হৃদয়ে শান্তি রহে সর্ব্বক্ষণ,
তাহার দাসের দাস হইয়া, শ্রীহরি!
জন্মজন্ম ভবে যেন জন্ম লাভ করি!

(২৭)

ভীষ্ম কহিলেন :—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল ॥

দুরন্ত কালের চক্র আসিল ঘুরিয়া,
আমারো জীবন দেখি যাইল চলিয়া!
এ সংসারে ছিল মোর যত বন্ধুগণ,
একে একে দেখি সব হইল নিধন।
আশ্রিত-বৎসল ওহে কৃপাময় হরি!
এ সময় রক্ষ মোরে তুমি কৃপাকরি।

(২৮)

এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে।

এস এস এস হরি! এস হে এখন,
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী তুমি নারায়ণ!
শার্ঙ্গধর গদাধর চক্রধর হরি!
তব পদে বারবার প্রণিপাত করি।
যুদ্ধক্ষেত্রে বিপন্নের তুমিই শরণ,
তাই হরি এই ভিক্ষা করি হে এখন;—
রথ হ'তে ভুজবলে ভূতলে ফেলিয়া
বধ ক'রে ফেল মোরে যাই হে চলিয়া!

(২৯)

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারচ্ছেদ ভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

জীবন দুর্গম বনে পথের সম্বল,
ভব-রোগ নাশিবার ঔষধ প্রবল,
শোক—দুঃখ নিবারণ করে নিরন্তর,
ধন্য ধন্য ধন্য হরি এই দুইটী অক্ষর!

[ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

নমস্কার।

জ্যৈষ্ঠ মাস, গ্রীষ্মকাল, বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে ; গাছের একটী পাতাও নড়িতেছে না। গ্রীষ্ম অসহ্য হইয়াছে ; শরীরের ঘর্ম্ম ধারা বহিয়া পড়িতেছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে : রৌদ্রের তাপ প্রখর হওয়ায় মনুষ্যগণ সকলেই যে যাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, সেই জন্য পথে মানবের কোন কোলাহল নাই। সময়টি বেশ নিস্তব্ধ কেবল শব্দের মধ্যে শুনিতেছি, বৃক্ষ শাখায় বসিয়া কতকগুলি কোকিল সুমধুর স্বরে ডাকিতেছে এবং অন্যান্য কতকগুলি পক্ষীও নানারূপ কলধ্বনি করিতেছে। পাখীগুলির কলধ্বনি বড়ই মধুর লাগিতেছে ; এই শ্রুতিসুখকর বিহঙ্গ কলধ্বনি নিশ্চয়ই উহাদের আনন্দ উচ্ছাস নতুবা উহা এত হৃদয়স্পর্শী হইত না। যে রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হইয়া মনুষ্যগণ কতই কষ্ট বোধ করিতেছে সেই রৌদ্রতাপের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীগণ কিরূপে এত আনন্দব্যঞ্জক গান গাহিতে পারে এই সমস্যা আমার মন মধ্যে উদয় হইয়াছে।

আমরা যখন দুটি সুর একত্র বাজিতে শুনি তখন যদি উহারা একতানে বাজিতে থাকে তবেই উহা শ্রুতিসুখকর হয় কিন্তু যদি বেসুরা বাজে তবে উহা বিরক্তিজনক হয়। এই একতানতাই আনন্দের মূল ; এবং উহার বিপরীত ভাবই নিরানন্দের মূল ইহাই সুখ ও দুঃখের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অবলম্বনে আমি এখন বুঝিতেছি যে এই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রের সময়, দেবী প্রকৃতি সূর্য্যরশ্মিগুলিকে যে সুরে চড়াইয়া বাঁধিয়াছেন, পাখী-গুলির হৃদয় তন্ত্রীও ঠিক সেই চড়া সুরে চড়াইয়া দিয়াছেন এবং এই এক-তানতা নিবন্ধন এই রৌদ্রতাপ উহাদের কাছে ক্লেশজনক বোধ হইতেছে না। মানবগণ কথঞ্চিৎ স্বাধীন ইচ্ছা বৃত্তি লাভ করিয়া, নিজের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিজেই সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া, প্রকৃতিকে ভুলিয়া গিয়াছে ; সেই জন্য দেবী প্রকৃতি হৃদয় মধ্যে বসিয়া, মানবকে দুঃখ নিবারণের সহজ উপায় আর বলিয়া দেন না ; কিন্তু ইতর জীবগণ যাহারা প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে, প্রকৃতি তাহাদের দুঃখ নিবারণের উপায় নিজেই করিয়া দিতেছেন। "অহং করিষ্যে" এই অভিমানের বশে পড়িয়া মানব দুঃখ নিবারণের উপায়

অন্বেষণ জন্য বাহিরের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু নিজের হৃদয়ের ভিতর যে সর্ব্ব-দুঃখ-হারিণী বসিয়া আছেন তাঁহার দিকে আর লক্ষ্য করে না। ইহার ফল দুঃখ; দুঃখের উপর দুঃখ।

"অহং কর্ত্তা' এই অভিমানই মানবের যত দুঃখের মূল। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এই অভিমানের নাম অহংকারতত্ত্ব। দেবী প্রকৃতির উদ্দেশে এই অহংকার তত্ত্ব বিসর্জ্জন করিতে যিনি শিখিয়াছেন তিনি আপন হৃদয় মধ্যে দেবী প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হন এবং প্রকৃতিও তখন আপন সন্তানের দুঃখ মোচনের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। দেবী প্রকৃতির উদ্দেশ্যে অহংকার তত্ত্ব বিসর্জ্জন যে উপায় দ্বারা সাধিত হয় উহার নাম **নমস্কার**! ললাটে ভ্রূদ্বয় মধ্যে অহংকারতত্ত্বের বাস স্থান। ললাট নিঃসৃত তেজ, করপুটরূপ অর্ঘ্যপাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মপদ নিঃসৃত ব্রহ্মতেজে আহুতি প্রদান করা রূপ যে ক্রিয়া উহার নাম **নমস্কার**। দুটি পা দুটি হাত ও একটি মাথা, এই পায়ের তেজের একত্র সংহতি করণের নাম নমস্কার যজ্ঞ। এই নমস্কার-যজ্ঞের ফল **ভক্তি**। এই ভক্তি লাভই মানব জীবনের ক্রম বিকাশের চরম ফল।

আজি ভারি গ্রীষ্ম; ঘর্ম্মের যেন স্রোত বহিতেছে। এইঘর্ম্মের স্রোত কথাটি মনে হওয়ায় এক পৌরাণিক কথা মনে হইল। সে বহু পুরাকালের কথা—এক দিন দেবলোকে এক বিরাট সভাতে সমগ্র দেবগণ উপস্থিত হইয়া ছিলেন; স্বয়ং মহাদেব গান গাহিতেছিলেন। তানপুরার নাদধ্বনির সঙ্গে নিজের সুর মিলাইয়া, সৃষ্টির আদিতে পুরুষোত্তমের যে সঙ্গীত ব্রহ্মযোনিস্বরূপা প্রকৃতির হৃদয়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ হইয়াছিল, সেই গান মহাদেব দেবগণকে শুনাইতেছিলেন; প্রথম গণাধিপতি গণেশ তাল দিতেছিলেন। দেব সভায় পূর্ণানন্দ। ভগবান বিষ্ণু গান শুনিয়া মোহিত হইয়া পড়েন, তাঁহার পদদ্বয় হইতে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতে থাকে। বিষ্ণুপাদ নিঃসৃত এই স্রোত ধারা দেখিয়া ব্রহ্মা উহা আপন করস্থিত কমণ্ডলু মধ্যে ধরিয়া সেই পূতবারি ধারা আবার মহেশের মস্তকে ঢালিয়া দেন। এই স্রোতের নাম গঙ্গা। এখানে মজা দেখেছ, দুই পা দুই হাত ও এক মাথার সংযোগ! বিষ্ণুর পা, ব্রহ্মার হাত, ও মহেশের মস্তক একটি স্রোতধারা দ্বারা মিলিত হইতেছে। এই গঙ্গার

স্রোতই ব্রহ্ম তেজের স্রোত। যদি কেহ প্রণবের রহস্য বুঝিতে চাও তবে এই ব্রহ্মতেজের স্রোত দিবারাত্রি ধ্যান করিতে শিখ। 'অ' বিষ্ণু, 'উ' ব্রহ্মা, এবং 'ম' মহাদেব, এই তিনের সংযোজক ধারাই গঙ্গার স্রোত। যিনি ধ্যানযোগে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ক্ষরিত, বিষ্ণুপদনিস্থত এই পূত বারিধারা আপন মস্তকে পতিত হইতেছে দেখিতে পান তিনি বুঝিতে পারেন, যে তিনি এই স্থূল দেহ-ধারী জীব নহেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী শিবস্বরূপ।

দুটি পা, দুই হাত ও মাথার মিলন সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা বলিব। ভগবান পুরুষোত্তম, সকাম জীবের উদ্ধার জন্য, স্বয়ং সকাম সাজিয়া ব্রজধামে কিছুদিন খেলা করিয়াছিলেন। সেই খেলার মধ্যে এক রজনীতে যে রজনীতে শ্রীমতী নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, প্রিয়তমের অদর্শনে অধীরা হইয়া, শেষে অভি-মান আশ্রয়ে মৌনী হইয়া শয়ান ছিলেন আমরা সেই নিশীথের ঘটনার কথা বলিতেছি। সেই নিশীথে অভিমানিনী রাধার মান ভঞ্জন জন্য নটবর শ্যাম কতই সাধনা করিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। শেষে দুই কর ও মস্তক, দুই পদে মিলিত হইল; অভিমান দূরে পলাইল; সুন্দরের অঙ্কে সুন্দরী শোভিতে লাগি-লেন। ভগবান কামী সাজিয়া সুন্দরী প্রিয়তমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছেন—

'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম হৃদি জলধিরত্নং,
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং,
দেহি পদ পল্লবমুদারং।'

জয়দেব।

ইহা যে কি রস পূর্ণ তাহা বুঝি বুঝাইবার ভাষা নাই। সাধক ভক্ত জয়দেব এই রস আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া গুটিকত কথা বলিয়াগিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার ন্যায় সাধক ও ভক্ত হইতে পারি তবে আমরাও ঐ রসের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দেবী প্রকৃতির উদ্দেশে অহংকার তত্ত্ব বিসর্জ্জন করাই নমস্কার ক্রিয়া। এই নমস্কার ক্রিয়ার ফল ভক্তি এবং এই ভক্তি লাভই মানব জীবনের ক্রম বিকাশের চরম ফল। এই খানে একটি কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। অহংকার তত্ত্ব বিসর্জ্জনীয় পদার্থ বটে কিন্তু উহা

উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে। আমাদের এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা বলিয়াছি যে ইতর জন্তুগণের ভিতর অহংকার তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া দেবী প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের দুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দেন কিন্তু মনুষ্যগণ অহংকার বশতঃ দেবী প্রকৃতিকে ভুলিয়া দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবকে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব বলিতে পারি না। মনুষ্য যে ইতর জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব সে বিষয়ে কেহই কখন সন্দেহ করে নাই। কোন্ তত্ত্ব আশ্রয়ে মনুষ্য ইতর জন্তুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে মনুষ্য অহংকার তত্ত্বের স্ফুরণ হওয়াতেই মনুষ্য ইতর জন্তুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। জীব কত শত যোনি ভ্রমণ করিয়া অহংকার তত্ত্ব উপার্জ্জন করিয়া তবে মনুষ্য হইয়াছে; সুতরাং অহংকার তত্ত্ব উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে। কিন্তু অহংকার তত্ত্ব বিসর্জ্জনীয় পদার্থ কারণ উহাই যাবতীয় দুঃখের মূল। এই অহংকার হইতেই রাগ ও দ্বেষ উদ্ভূত হয় এবং এই রাগ দ্বেষই ক্লেশের মূল।

দেবী প্রকৃতি এই সংসার চক্র ঘুরাইতেছেন; জীব এই চক্রে পড়িয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিতেছে। জীব এই চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পশু পক্ষী আদি নানা যোনি ভ্রমণ করার পর যখন তাহাতে অহংকার তত্ত্ব উদ্ভূত হয় তখন জীব মনুষ্য হইল; এই অহংকার তত্ত্ব ক্লেশের মূল। তবে কি এই ক্লেশের মূল অহংকার তত্ত্বের উদ্ভব করাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য? জীবকে কষ্ট দিবার জন্যই কি প্রকৃতি এই সংসার চক্র ঘুরাইতেছেন? স্বভাব স্বরূপা প্রকৃতির স্বভাব কি এতই নিষ্ঠুর? ইহার উত্তর এই যে প্রকৃতি নির্দ্দয়া নহেন। অহংকার তত্ত্বের উদ্ভাবন সংসার চক্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। অহংকার তত্ত্বের উদ্ভাবন, প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য নহে। অহংকার তত্ত্বের উদ্ভাবন, প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ সংগ্রহ মাত্র (means to the end)। জীব অহংকার তত্ত্ব উপার্জ্জন করিয়া উহা প্রকৃতি পদে বিসর্জ্জন দিলে ভক্তি রূপা এক-প্রবণা-বুদ্ধির উদ্ভব হয়; জীব তখন এই বুদ্ধি তত্ত্বে যুক্ত হইয়া প্রকৃতি কি পদার্থ এবং নিজেই বা কি পদার্থ ইহা বুঝিতে পারে জীব যখন এইরূপে আপনাকে চিনিতে পারে তখন তাঁহার সম্বন্ধে সংসার চক্রের নিবৃত্তি হয়। ভক্তি লাভ ও তাহার আনুষঙ্গিক আত্মজ্ঞানই সংসার চক্রের চরম উদ্দেশ্য।

অহংকারতত্ব, প্রকৃতি পূজার প্রধান উপকরণ; উহা যত্নের সহিত সংগ্রহ করা চাই কিন্তু সদাই যেন স্মরণ থাকে যে প্রকৃতিপদে উহা বিসর্জন করিবার উদ্দেশেই উহা সংগ্রহ করিতেছি। যিনি অহংকারতত্বকে প্রকৃতি পূজার উপকরণ স্বরূপ বুঝিয়া অহংকারতত্ব অর্জন করেন অহংকার তাঁহাকে আর বিমোহিত করিতে পারে না। অহংকার কর্তৃক বিমোহিত হইয়াই জীব দুঃখ ভোগ করে কিন্তু অহংকার যাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারে দুঃখ তাঁহার কাছে আর আসিতে পারে না। প্রকৃতিপদে বিসর্জন উদ্দেশে সংগৃহীত অহংকার বিশোধিত অহংকার। অহংকারতত্বকে বিশুদ্ধ করণই সুখের প্রথম সোপান। আমাদের অহংকারতত্ব এবং ইংরাজীর Free will একার্থ বোধক। মানবের এই Free will বা অহংকারতত্ব ক্রমবিকাশের চক্রে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে; ইহার কলিকা অবস্থায় ইহাকে কেহ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিও না; ইহা ফুটিলে ইহার কেহ অসদ্ব্যবহার করিও না। এই অহংকারতত্ব কুসুম স্বরূপ, ইহা ফুটিলেই হৃদয় মধ্যস্থ দেবীপদে উহা যোজনা করিয়া দিও। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক 'হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণে অহংকার বিসর্জন দিতে হয়। আমরা এই মন্ত্রটি ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে শিখি এস।

নমঃ শিবায়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

প্রাচেতসদক্ষ ও মনুষ্য।

প্রাচেতস দক্ষ মৈথুন ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে মন দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছেনা দেখিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজের স্তব করিতে লাগিলেন এবং হরি প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন —

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ।
অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্॥
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ।
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি॥
ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্॥

হে দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী পুরুষে মৈথুন ধর্ম্ম অবলম্বন কর। তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণে প্রজা সৃষ্টি হইবে। তোমার পরবর্ত্তী প্রজাসকল মদীয় মায়াবশে স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিবে।

প্রভো, তোমার মায়াবশে মৈথুন ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। আমরা বিনা মৈথুন ব্যাপারে তোমার বলি আহরণ করিব। করপুটে নিবেদন করি, মায়াজাল সংহরণ কর। বিশ্বনাথ তোমার কৃপা ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই। তোমার পবিত্র চরণরেণু দ্বারা যে পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছে; সে পৃথিবী মধ্যে আর মিথুন ব্যাপার ধর্ম্ম ভাল দেখায় না।

সৃষ্টির যথেষ্ট প্রচার হইল। সকল জাতীয় জীবেরই আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য পৃথিবী মধ্যে অবতীর্ণ হইল।

মনুষ্যের আকার বিশিষ্ট জীব ও যথার্থ মনুষ্য এ দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ।

কেবল মনুষ্যের রূপ থাকিলেই মনুষ্য হয় না।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

পশুর জ্ঞান নাই। মনুষ্যের জ্ঞান আছে। যে মনুষ্যরূপধারী জীবের জ্ঞান অথবা জ্ঞানের বৃত্তি নাই, সে পশু। পশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, এবং মনুষ্যরূপ-ধারী পশুরও ইন্দ্রিয় বৃত্তি থাকে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কাহারও মনোবৃত্তি থাকে না।

সুন্দর মনুষ্যদেহের রচনা কাল্পিক সৃষ্টির চূড়ান্ত ব্যাপার। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা জীব জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

মনুষ্য দেহ কেবল ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে।

পুরঞ্জনী মনুষ্য দেহের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পুরঞ্জনের অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। পুরঞ্জনী ইন্দ্রিয়বৃত্তির রাণী। পুরঞ্জনীর মনুষ্যপুরী পঞ্চপ্রাণ করে। সে পুরীর রাজা কবে আসিবে?

পূর্ব্ব কল্পে মনুষ্যদেহ পাইয়া জীব যথাশক্তি কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিল। কল্পের অবসানে সেই সকল জীব জন লোকে গমন করে। কারণ ত্রিলোকীর সম্পূর্ণ নাশ হয় এবং প্রলয়াগ্নি পীড়িত হইয়া মহর্লোকবাসী-গণও জনলোকে গমন করেন। জনলোকে জীব ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করে। সেখানে জীব ও ঈশ্বর বন্ধু। দুয়ের অভেদ। বেদের সেই দুই সুপর্ণ, দুই সখা।

যখন ত্রিলোকীর পুনঃ সৃষ্টির পর মনুষ্যদেহের রচনা হয়, তখন জনলোক-বাসী প্রলয়াবশিষ্ট জীবের উপর টান পড়ে। পূর্ব্ব কল্পে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া সেই সকল জীব কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহাদের জন্য আবার মনুষ্য দেহের রচনা হইয়াছে। আবার তাহারা অগ্রসর হইবে। আবার তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মের ক্ষেত্রে, উপাসনার বলে অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে।

পুরঞ্জন এইবার জনলোক ছাড়িয়া অধোগামী হইলেন। হায় পুরঞ্জন, তিনি আপনার সখাকে পর্য্যন্ত ভুলিতে লাগিলেন! পুরঞ্জনীর অঙ্কে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। পুরঞ্জনের হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাই রক্ষা। সেই হিতাহিত জ্ঞান-বশতঃ যখনই পুরঞ্জনের অনুতাপ হয়, তখনই সেই অদৃষ্ট সখা, সেই একমাত্র বন্ধু, একমাত্র ত্রাতা, পুরঞ্জনকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইবার চেষ্টা করেন। যখনই পুরঞ্জন জনলোকের কথা মনে করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি লাভ হয়।

একবার জীব সেই সখার কথা মনে কর। যদি মায়ার কুহক হইতে নিস্তার পাইবার ইচ্ছা কর, যদি এই সংসারে হাবুডুবু খেলিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে সেই অনন্ত বন্ধুর কথা স্মরণ কর।

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ॥
অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ॥
হংসাবহঞ্চ ত্বঞ্চার্য্য সখায়ৌ মানসায়নৌ।
অভূতামন্তরাবৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্॥
স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতৌ গ্রাম্যমতির্মহীম্।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া॥
পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্।
ষট্‌কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ॥
বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া।
শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববধ্যতে॥
তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো॥

তুমি কে এবং কাহার? তুমি এই যে ভূপতিত পুরুষের জন্য শোক করিতেছ, ইনিই বা কে? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছ? আমি তোমার সুহৃদ্। তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে। যদিও আমার

না চিনিতে পার, তথাপি তোমার কি এরূপ স্মরণ হয় যে, কোন কালে তোমার কোন বন্ধু ছিল? সখে, তুমি পার্থিব সুখে রত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করতঃ আপন স্থানের অন্বেষণে আগমন করিয়াছিলে। তুমি এবং আমি—আমরা দুইটি হংস। মানস সরোবরে আমাদিগের বাস। প্রলয়কালে গৃহ শূন্য হইয়া আমরা দুই জনে সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত একত্রে বাস করি। বন্ধো, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম্যসুখে রত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে এবং বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কোন কামিনী কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত এক পুরী দর্শন করিয়াছিলে। ঐ পুরীর পাঁচটি উপবন (শব্দাদি), নয়টি দ্বার, একটি রক্ষক (প্রাণ), তিনটি কোষ্ঠ (ক্ষিতি, জল ও তেজ), ছয়টি বণিক্ (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই ছয় বিষয় সমর্পণকারী বণিক্), পাঁচটি হাট (পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়), এবং পাঁচ ভূত সেই পুরীর উপাদান কারণ। একটি স্ত্রী সেই পুরীর অধীশ্বরী। পুরুষ এই পুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন না। এই পুরী মধ্যে রমণী স্পর্শে তোমার স্বরূপ জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। রমণী সঙ্গ হেতু তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

ভগবান্ পুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমরা দুজনেই হংস।

অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভো।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥

তুমি ও আমি—আমরা ভিন্ন নহি। সখে আমাকে তোমা বলিয়াই জান। যাঁহারা তত্বজ্ঞ, তাঁহারা আমাদিগের দুই জনের মধ্যে অনুমাত্রও অন্তর দর্শন করেন না।

যেখানে যেখানে মনুষ্য আছে, সেইখানে এই পবিত্র বাণী প্রতিধ্বনিত হউক। এই পবিত্র বাণী মনুষ্যকে চিরদিন প্রবোধিত করুক। সেই চিরসুহৃদ্ ঈশ্বরের বাক্য অবহেলনা করিয়া মনুষ্য যেন গভীর পঙ্ক মধ্যে নিপতিত না থাকে।

পুরঞ্জন যতই ভুলিয়া থাকুক, ভগবান্ তুমি যেন পুরঞ্জনকে ভুলিও না। যাহাকে একবার সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সে তখনই কৃতার্থ হইয়াছে। যাহা বাকী আছে, তোমার কৃপায় তাহাও পূর্ণ হইবে।

পুরঞ্জন হিতাহিত জ্ঞান লইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই পুরঞ্জনের মুক্তির

আশা আছে। হিতাহিত জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য, যথার্থ মনুষ্য হইতে পারে না।

অর্যমণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥

অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা। চর্ষণিরা তাঁহাদিগের পুত্র। সেই চর্ষণিদিগের মধ্যে ব্রহ্মা মনুষ্য জাতির কল্পনা করিয়াছিলেন।

এই চর্ষণির কথা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

তেজ।

অধিক দিন হয় নাই, বৰ্দ্ধমানের সন্নিকট বসন্তপুর গ্রামে আমি এক পাগল দেখিয়াছিলাম। তাহার সম্বন্ধে যে এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তাহাই এখানে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐ পাগল একদিন কোথা হইতে বসন্তপুরে উপস্থিত হয়। সে সমস্ত দিবস ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। কখন ছাই ফেলিবার স্থানে, কখন বা প্রসূতির আতুড় ফেলিবার স্থানে, কখন রাশীকৃত ময়লার উপর বসিয়া থাকিত। গাত্রে ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড পরিয়া থাকিত। তাহার মাথায় তৈলাভাবে চুল তামার ন্যায় দৃষ্ট হইত। শরীর হইতে এমন তীব্র একটা দুর্গন্ধ বাহির হইত যে, তাহার নিকট তিষ্ঠান ভার হইত। পাগলের কার্য্যের মধ্যে ছিল সমস্ত দিন 'মরার কানি' রাস্তার কানি, প্রভৃতি সংগ্রহ, আর নিজের মাথায় হাতে কাণে সাজান। তাহাকে কখন কথা কহিতে দেখা যায় নাই। কখন একস্থানে উপবিষ্ট থাকিতেও কেহ দেখে নাই। অস্থিরতাই যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল তাহার গলে এক গাছি যজ্ঞোপবীত ছিল। সেই জন্য সকলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিত।

প্রায় দশ দিন অতীত হইলে আমি এক দিন পাগলের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য তাহাকে ধরিয়াছিলাম। পাগলকে নিকটে বসিতে বলায় সে কোন আপত্তি না করিয়া আমার নিকট বসিল, তাহার পর যথাসময়ে তাহাকে স্নানা-

হার করাইলাম এবং পাছে পলায়ন করে এই আশঙ্কায় তাহাকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। পাগল সমস্ত দিন নীরবে স্তব্ধভাবে কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যা আরম্ভ হইতেই সে যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একবার উঠিয়া দাঁড়ায় আবার বসে। এইরূপে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ৭॥টা হইল। হটাৎ পাগলের মুখ হইতে অতি ব্যাকুল স্বরে বহির্গত হইল 'আমি যাব''। প্রবন্ধলেখক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন যাইবে'? উত্তর নাই—নীরব। আবার " আমি যাব" "কোথায় যাইবে'? আবার নীরব। এই সময় পাগলের চক্ষুর চঞ্চলতা ও মুখের বিষণ্নতা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যেন সে যাইতে না পাইয়া বড়ই দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সে আবার বলিল "আমায় ছেড়ে দাও" আমি বলিলাম ছাড়িব না, আজ এখানেই থাকিতে হইবে পাগল বলিল, 'তাহা হইলে ত বাড়ী-তেই থাকিতাম'। পাগলের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কেন কেন?" পাগল যেন হটাৎ আত্ম সংবরণ করিয়া এবং যেন কোন অর্দ্ধো-চ্চারিত কথা লুকাইয়া বলিল, 'না, আমি এক জায়গায় কখন থাকিতে পারি না'। 'পার না, আজ থাকিতে হইবে', আবার নীরব। আবার 'আমি যাইব'। তাহাতে আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম তোমায় অদ্য সমস্ত রাত্রি এইখানে বসাইয়া রাখিব। কিছুতেই যাইতে দিব না। রাত্রিই প্রভাতে ছাড়া যা ইও।

পাগল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "তুই কি জানিবি? ভিতরে যে মোহময় নিত্য সৌরভে আমি বিভোর, তাহা তুই কি জানিবি? তাহা আমিই জানি, যে আনন্দময়ের আনন্দ রসে আমি নিমগ্ন তাহা আমিই জানি"। তাহার মুখে হঠাৎ এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম প্রকৃত তথ্য জানিতে হইবে। এই ভাবিয়া বলিলাম 'তুমি আমায় জানাইয়া দাও? তাহা-হইলেই ত জানিতে পারিব'।

পা। তোর সে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

আ। কেন। তুমি ক্ষমতা দাও; যেরূপে বুঝিতে পারি সেইরূপে বল, বালককে বুঝাইবার মত বুঝাও। বুঝিবার শক্তিও ত দিলেই পার।

পা। আমার সে শক্তি নাই। সে তোমার নিজের শক্তি—সাপেক্ষ চেষ্টা করিলে তুমি সে শক্তি বাড়াইতে পারিতে। কিন্তু তাহা যখন কর নাই, তখন অপরে তাহাকে কিরূপে বাড়াইবে?

আ। আচ্ছা, কত সাধনার উপযোগী গিরিগুহা কত নিবিড় অরণ্য কত দেশ থাকিতে তুমি এই সামান্য পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? এখানে থাকায় তোমার উদ্দেশ্য কি?

পা। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নহে। এখানকার মনুষ্য শূন্যতাই এখানে থাকিবার কারণ, যেখানে প্রকৃত মনুষ্য থাকে, তথায় থাকা বড় কঠিন। তেজস্বী মানবদিগের শরীরে এমনই একটী আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহাতে অল্পতেজাদিগের বহু কষ্টের সঞ্চিত তেজটুকু আকর্ষণ করিয়া লয়।

আ। এখানে কি একটীও মনুষ্য নাই?

পা। নাই বলিয়াই এই ১০।১২ দিন আছি জানিও। মনুষ্য থাকিলে এক দিনও থাকিতাম না। দেখ বহু দিনের কত কষ্টের সঞ্চিত ধন কেন স্বেচ্ছায় নষ্ট করিব? আর সেই জন্যই পাগল, সেই জন্যই এই পাগলামি।

আ। তাহা হইলে আপনার তেজ আছে?

পা। না, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় ঘুরিয়া মরিব কেন?

আ। আপনি যখন মনুষ্যের আকর্ষণ ভয়ে মনুষ্য হীন স্থানে থাকি বলিলেন, তখনই স্বীকার করা হইয়াছে যে আপনি একজন তেজস্বী, আমার সানুনয় প্রার্থনা আমায় বঞ্চনা করিবেন না। আপনার সেই তেজের কিছু আমায় দেখাইয়া কৃতার্থ করুন।

পা। না, তেজ কি দেখিবে? সেরূপ কিছু নাই।

আ। আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না, আমায় দেখাইতেই হইবে।

পা। যদি নিতান্তই দেখিতে চাও—তবে দেখ—

বলিতে বলিতে কথা শেষ না হইতেই সমস্ত গৃহটী বিদ্যুতের আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিদ্যুততরঙ্গে ক্ষুদ্র গৃহ ঝকমক্ করিয়া ঝলসিয়া উঠিল। একবার দুইবার তিনবার তড়িততরঙ্গের কম্পনে গৃহ কম্পিত হইল। আমার নয়ন ঝলসিত হইল। আমি ভীত স্তম্ভিত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলাম। পাঁচ মিনিট হইয়া গেল। দর্শনশক্তি ফিরিয়া আসিল দেখিলাম আর সেখানে সে পাগল নাই, গৃহ বাহির, গৃহ পার্শ্ব; রাস্তা, গ্রাম ক্রমে গ্রামান্তর তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

শ্রীরামগতি বিদ্যাবিনোদ।

প্রণব, ছবি ও গান।

(২য় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

পূরবী পশ্চিমাভিমুখী, ভৈরবী পূর্ব্বাভিমুখী। পূরবী শ্রীরাগের স্ত্রী, ভৈরবী ভৈরব রাগের স্ত্রী। রাগ শিবের ছয় মূর্ত্তি, রাগিণী শক্তির নানাবিধ মূর্ত্তি। ভৈরবী শিবশক্তির প্রভাতী সম্মীলন অতএব মনোহর। গৌরী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রেমাভিষিক্ত করিতেছেন।* এই মধুর সম্মীলনে ৪টী স্বরই কোমল—

রে̂ গ̂ ধ̂ নি̂

মায়ার আবরণ নাই অতএব অন্ধকার নাই।

পূর্ব্ব গগন ;

১			আলোকচ্ছটা (বর্ণনীয় নহে)
২	ম	স	নীলবর্ণ (গগন) (Blue) ভক্তি
৩	গ̂	নি̂	পীত (Yellow) জ্ঞান
৪	রে̂	ধ̂	হেমাভ (Orange) প্রেম
৫	স	প	উদীয়মান সূর্য্য (হিঙ্গুল) কর্ম্ম (ভৈরব) =লোহিত
৬	নি̂		উষার ধবল আভা (ললিতা)

* সন্ধ্যার গৌরী অবগুণ্ঠনবতী সুতরাং পাঠকবৃন্দ সন্ধ্যার গৌরী ও প্রভাতের ভৈরবীর পার্থক্য বুঝিয়া লইবেন।

রাগের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তবে সতীর প্রেমভাব, উদ্দীপ্ত-অগ্নির সংমিশ্রণে কি করিয়া ভৈরবী মুর্ত্তি ধারণ করে, উহার আভাষ দিতে গেলে দুই একটী রাগের কথা বলিতে হইবে। ভৈরব অরুণ বর্ণ। ঋষভ (রেখাব) আসন। সতী 'রে' পীঠস্থা। প্রেমবারি সেচন করিয়া অগ্নিতে কোমলতা প্রদান করিতেছেন। 'রে' বাহন। মধ্যম 'জ্ঞান' (ভক্তি, আনন্দ) 'নি' জ্ঞান (পীত), যাঁহারা গায়ক তাঁহারা ইহার সহিত পুরবীর পার্থক্য দেখিবেন পুরবীতে মধ্যমে (হৃদয়ে তাঁহার জ্যোতিতে) দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা, এখন মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে (Isis unveiled)। অতএব মধ্যমই আমার প্রাণ (জ্ঞান)। মধ্যমই (মা) ভৈরবীর "জ্ঞান"। যাঁহারা কাশীর গায়ক, তাঁহারা টপ্পায় মধ্যমের পরে কড়িমধ্যম দিয়া ভৈরবীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। কিন্তু পুরবীতে অবরোহী সময় কড়িমধ্যম হইতে মধ্যম দিয়া গান্ধারে আইসে। পূরবীর প্রণব উকার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া (গ) বিশ্রান্ত হয়। ভৈরবীর প্রণব 'মা' পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এই জন্য তান্ত্রিকগণ দেবীর বিমর্ষ ও উদ্দীপ্ত ভাব দেখিয়া থাকেন। ভৈরবীতে বিমর্ষ ভাব নাই। প্রেমও কোমল ভক্তিময়, জ্ঞানও কোমল ভক্তিময়, কেন না, মা সকলকে আহ্বান করিয়া নিজের কোলে লইতেছেন। মা হেমাভ হইতে পীত, পীত হইতে নীলমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। উমা হইতে দুর্গা, দুর্গা হইতে কালী। সকলেরই কোমল রূপ। সেই পঞ্চম পুনরায় স্বর করিয়া 'ধ' 'নি' কোমল 'রে' 'গ' কোমলের স্থান অধিকার করিতেছে।

এই শিবশক্তির সম্মীলন যে কি মধুর তাহা বাক্য দ্বারা পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। নারদ যখন বীণাধ্বনি করিতেন, তখন নাকি দেবী মূর্ত্তিমান হইতেন। সে মূর্ত্তি উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যভাব জড়িত ভাষায় বুঝাইব আমার সাধ্য কি?

ভৈরবী প্রণবের কোমল ভাব। ভৈরব ও ভৈরবীর ঠাটের পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—
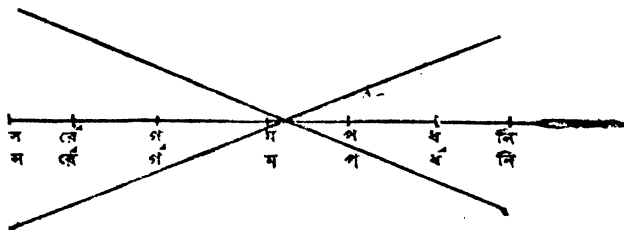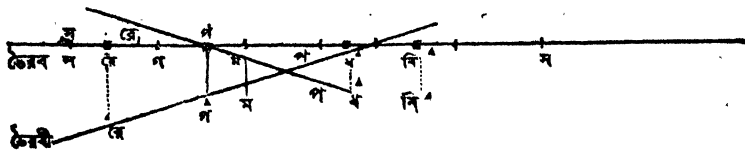
N. B.—এই দৃষ্টান্ত গুলি কোমল পর্দ্দা বুঝিতে হইবে— = ।

ভৈরব ও ভৈরবীর রূপের সঙ্গে পূরবীর পার্থক্য বুঝিতে পারিলেই উদয় ও অস্তের চিত্র (Painting) উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ভৈরব পূরবীর গান্ধার লইয়া আছেন। তিনি শ্রীরূপে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশাবসান করিয়া প্রেমের ছাপ লইয়া আসিয়াছেন। ভৈরবীর সহিত যুক্ত হইয়া তাহা পীতবর্ণ ধারণ করিল (জ্ঞান) পূরবীর Purple Sun set ভৈরবীতে নাই। একদিকে প্রাণের অবসান অন্যদিকে উত্থান। আর একটি পার্থক্য এই যে পূরবীর জ্ঞান মধ্যম নয়, অতএব 'ধ' 'নি' হৃদয়ের ভক্তি দ্বারা কেন্দ্রাকৃষ্ট হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হয় নাই। বিরহের দীর্ঘ নিশ্বাস এবং প্রিয় সম্মীলনের হর্ষোৎফুল্ল আবেগের নিশ্বাসের যে পার্থক্য, পূরবীর ও ভৈরবীর সেই পার্থক্য। পাঠকগণ "দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন' সুন্দর গানটীর স্বরলিপি করিয়া দেখিবেন হৃদয়ের শক্তির (ভাবের) আকুঞ্চন ও প্রসারণ ও সন্ধার ডুবু ডুবু ছবির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কিনা। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা আরও বিশদ ভাবে করা যাইবে। ভৈরবী রাগিণীর মাধুর্য্য একদিনে বুঝাইবার নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সাধনা।

(৩য় বর্ষের ৮ম সংখ্যার ২৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

৯ম পরিচ্ছেদ

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চপঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥"

(ভগবৎগীতা।)

"প্রকৃত্যা ক্ষোভমাপন্নে পুরুষাখ্যে জগদ্‌গুরৌ।
মহান্‌ প্রাদুরভূদ্‌ বুদ্ধিস্ততোঽহং সমবর্ত্তত॥
অহঙ্কারাচ্চ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রেন্দ্রিয়ানিচ।
তন্মাত্রেভ্যোহি ভূতানি জাতানি জগতঃ কৃতে॥
আকাশবায়্বগ্নিজলভূময়োঽব্জ ভবাত্মজ।
যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যোপযন্তি বৈ॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

যিনি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই চিৎ বা চৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ বা আত্মা, এবং তিনিই সৎ।

"সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।
"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)।

মহাপ্রলয়ে নিরবয়ব নিরাকার অরূপ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, এবং তখন মায়াশক্তির প্রতিবিম্বোৎপাদিকা ক্রিয়াভাবে মায়াশক্তির ক্রিয়াভাব বা ক্রিয়াশূন্যাবস্থাকে অব্যক্ত, প্রধান, বা মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আবার যখনই মায়াশক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের আত্মপ্রতিবিম্ব-দর্শনোন্মুখতা হয় তখনই নিরাকার মায়াশক্তির সাকার অবতারস্বরূপ "শক্তি" প্রকাশিতা হয়েন।

"ত্বমেব সূক্ষ্মাত্বং স্থূলাব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারাকস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।

এই শক্তি অনির্ব্বচনীয় এবং অলোকসামান্যজ্যোতির্ম্ময়ী, এবং এই শক্তিই ব্রহ্মের প্রথম দ্বৈতজ্ঞানের কারণ। ব্রহ্ম, এই সাকার পরমজ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিকে, প্রথম ক্রিয়ায় দর্শন করিয়া, ঈশ্বরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন,এই ঈশ্বরই মায়ার অব্যক্তাবস্থায় মহেশ্বরসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

নিরবয়ব মায়াশক্তির প্রথম ক্রিয়ায়ই মায়া হইতে মহত্তত্ব প্রাদুর্ভূত হয় অর্থাৎ মায়া মহত্তত্ব বা বুদ্ধিসংজ্ঞক পদার্থ সৃষ্ট্যারম্ভে প্রসব করেন। এই সময়েই মায়াশক্তির দ্বিতীয় ক্রিয়ায় অহঙ্কারতত্ব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মহত্তত্ব অহঙ্কারতত্ব নামক পদার্থ প্রসব করে। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই মায়াশক্তির বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণস্বরূপ সাকার জ্যোতির্ম্ময়ীশক্তিসংবেগে, অহংকারতত্ব হইতে একই সময়ে ইহার সাত্বিক ও রাজসিক ভাগ হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তামসিক ভাগ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়; এবং এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ স্থূলভূত সৃষ্ট হয়। জৈব স্থূলদেহ সকল এই স্থূলপঞ্চভুতনির্ম্মিত। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহগুলি স্বয়ং ক্রিয়াশীল নহে বলিয়াই, স্বয়ং ক্রিয়াশীল শক্তি কর্ত্তৃক ইহাদের আকুঞ্চন, প্রসারণাদি পঞ্চবিধ অবস্থা সংঘটিত হয়; ইহারা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে শক্ত্যাধীন। জীবগণের বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান পাঞ্চভৌতিক জগতের, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহসকলেরও পরিবর্ত্তনমূলক বলিয়াই, পাঞ্চভৌতিক দেহের জীবগণ শক্তিদেহধারী ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। এক ব্রহ্মই শক্তিদেহধারী ঈশ্বর এবং পাঞ্চভৌতিকদেহধারী অসংখ্য জীব! বিভিন্ন প্রকার শক্তিসংবেগ জীবগণের বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ বলিয়াই জীবগণ ঈশ্বরের অধীন, অর্থাৎ জীবগণ স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না; তাহাদের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, যেহেতু ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছাই জীবগণের বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণস্বরূপ বিভিন্নপ্রকার শক্তিসংবেগের কারণ বা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। বিভিন্নপ্রকার শক্তিসংবেগ, বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ বলিয়াই উক্ত শক্তিকে "ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি" সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এবং জীবগণের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিসংবেগাধীন বলিয়াই জীবগণের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান সসীম, কিন্তু শক্তি ঈশ্বরের দেহ বলিয়াই ঈশ্বরকে শক্ত্যাধীন বলা যায় না, যেহেতু শক্তিদেহ বিবক্ষায়েই তিনি ঈশ্বর; এবং

ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণভূত শক্তি তাঁহার দেহ বলিয়াই তাঁহার সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষমতা স্বীকার্য্য।

সাকার আদি আত্ম-প্রতিবিম্বই "শক্তি," যেহেতু ইহা অন্যান্য প্রতিবিম্ব সকলের বীজ ও মূলকারণ। এই শক্তিকে অহংজ্ঞান হয় বলিয়াই ব্রহ্ম এবং শক্তিদেহবিবক্ষায়ে ঈশ্বর। এই শক্তিকে স্বয়ংক্রিয়াশীল স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার অন্য সাকার কারণ নাই। এক সাকার পদার্থের ক্রিয়া অন্য সাকার পদার্থের ক্রিয়ার কারণ, যেমন তেজের ক্রিয়া বায়ুর গত্যাদি ক্রিয়ার কারণরূপে দৃষ্ট হয়। শক্তিনামধেয় সাকার পদার্থের সংবেগরূপ ক্রিয়া অন্যান্য সাকার পদার্থ সকলের আকুঞ্চনাদি পঞ্চবিধ অবস্থার মূলকারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু মূলকারণের কারণ নাই, এজন্য শক্তি যে স্বয়ং ক্রিয়াশীল, ইহা কে না স্বীকার করিবেন ?

যদি বল শক্তি যখন সাকার জড় পদার্থ, তখন এই শক্তি স্বয়ং ক্রিয়াশীল কিরূপে হইতে পারে ? পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের ন্যায় এই শক্তি ও ত মহা-প্রলয়ে অন্তর্হিত হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর আমি একমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রহ্মে কিছুই অসম্ভব নহে; এই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি এবং ইনিই অনাদি অনন্তকাল জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী। স্বয়ংক্রিয়াশীল এই শক্তি অনাদি অনন্তকালই আছেন, তবে মহাপ্রলয়ে ইনি আপনা আপনিই অদৃশ্যা হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত থাকেন এবং সৃষ্টি প্রারম্ভে আবার ইনি স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েন। ইঁহার ক্রিয়াতেই ইনি সাকাররূপে দৃশ্য এবং আবার ইঁহার ক্রিয়াতেই ইনি অব্যক্ত; ব্রহ্ম অনাদি অনন্তকালই নিষ্ক্রিয় আছেন, তিনি কেবল সাক্ষীরূপে দ্রষ্টা মাত্র। এই শক্তির স্বরূপ কাহাকেও বুঝান যাইতে পারে না, যেহেতু ইনি পঞ্চভূতাদির অতীত পদার্থ; পঞ্চভূতাদি এই শক্তি হইতে শক্তিসংবেগে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং আবার কালে এই শক্তিতেই লীন হইয়া যায়। এই শক্তিই জৈব অন্তঃকরণের আবির্ভাব, তিরোভাব ও পরিবর্ত্তনের কারণ। এই শক্তির বিনাশ নাই, ইনি কেবল অব্যক্ত হয়েন মাত্র এবং ইহা হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয় তাহারও বিনাশ নাই, কারণ এই জগৎও শক্তিতে লীন হয় মাত্র।

ব্রহ্মের যে মায়ানাম্নী শক্তি আছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত ;—

"অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যং কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্য মনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তির্ম্মায়েতি বিশ্রুতা॥"

(দেবীগীতা।)

মায়াকে ব্রহ্ম হইতে এখনও অর্থাৎ জগতের স্থিতিসময়েও অভিন্ন যদি কেহ নিশ্চয় করেন তাহা হইলেও এই সাকার শক্তিকে নিরাকার মায়াশক্তির অবতার স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু জাগতিক সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনাদির কারণ এই শক্তিরই সংবেগ ; যাঁহারা এই শক্তিকে কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা এই শক্তির স্বরূপ কতকটা বুঝিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

"সৃষ্টেরাদৌত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং পরংব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥"

এখানে তমশব্দে কথিত সাকার শক্তিকেই বুঝাইয়াছে বলিতে কোনওই বাধা নাই যেহেতু এই শক্তি সৃষ্টির আদিতে অগোচর অর্থাৎ অদৃশ্য থাকেন কারণ তখন তিনি অব্যক্ত এবং সৃষ্ট্যারম্ভে দৃশ্য হয়েন. বিশেষতঃ ইহাঁ হইতেই ইহাঁর ক্রিয়ায় বা অন্তরসংবেগে জগতের উৎপত্তি এবং ইহাঁতেই স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। যদি এই শক্তি হইতে মায়াশক্তিকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আমার তাহাতে কোনওই আপত্তি নাই; তবে ইহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই শক্তি মায়াশক্তির অবতার এবং ইনি যে সময়ে ব্রহ্মে অব্যক্ত থাকেন তখনই মায়ার তিরোভাব এবং ইনি যখন ব্যক্ত হয়েন তখনই মায়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি বল এই শক্তিকে কোন পদার্থ বলা যায় না, ইনি প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং প্রতিবিম্ব কোন পদার্থ নহে। আমি সবই স্বীকার করিলাম, কিন্তু শক্তিরূপ প্রতিবিম্ব জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন ইহা সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের কোন ভ্রমও নাই ইহাও সত্য। এই প্রতিবিম্ব মিথ্যা দৃশ্য নহে স্বীকার্য্য যেহেতু অনাদি অনন্ত কালই এই প্রতিবিম্ব আছে, তবে মহাপ্রলয়ে ইহা ব্রহ্মে অব্যক্ত হয় মাত্র। ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানের

ভ্রম নাই স্বীকার্য্য, তবে ব্রহ্ম, এই শক্তিরূপ প্রতিবিম্ব কোন পদার্থ না হইলে, এ অপদার্থ দর্শন করেন কিরূপে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ইহা ব্রহ্মের নিত্য ধর্ম্ম বা প্রকৃতি যে ব্রহ্ম আপনাকেই শক্তিরূপ প্রতিবিম্বাকারে দর্শন করিয়া থাকেন; আমিও বলি যে এই শক্তি প্রতিবিম্ব বটেন কিন্তু নিত্য অর্থাৎ অনাদি অনন্ত কাল এই শক্ত্যুপাধি পদার্থ আছে, এবং কোন সময়ে এই পদার্থ ব্রহ্মে অব্যক্ত থাকে ও কোন সময়ে ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রকাশিত হয়; ইহা কি ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইতে পারে না?

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তা ব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদি ভূতত্বাদাদ্যাকালীতিগীয়তে॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥

যদি বল শক্তিনামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ শক্তিকে নিত্য পদার্থ বলিলে দুইটী নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিবাক্যের কোনওই সার্থকতা থাকে না। আমি বলি শক্তিকে নিত্য পদার্থ বলিলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যের অবমাননা করা হয় না, যেহেতু এই শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি, এই শক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা স্বীকার করিলেও ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ নির্ব্বাণ-মুক্তিতে ইনি মুক্ত ব্যক্তির নিকট একেবারে অদৃশ্য হয়েন; ইনি সদসৎরূপিণী। জগৎরূপ দ্বৈত এখন দৃষ্ট হওয়াতেও যখন 'ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্,' তখন শক্তিকে অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী জ্ঞান করিয়া এই শক্তিকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া জানিলে কেনই না ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা যাইতে পারিবে? জগৎ অনিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে মূলকারণে লীন হয় বা বীজরূপে থাকে বলিয়াই যদি ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা যায়, তবে ব্রহ্মশক্তিও যখন মহাপ্রলয়ে অব্যক্ত থাকেন তখন উক্ত শক্তিকে নিত্য বলিয়াও কেননা ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'

বলা যাইবে? এই শক্তিই প্রকৃতপক্ষে কালী, তারা, দুর্গা প্রভৃতি নামে চির-দিন অভিহিতা; এবং এই শক্তিরই অধীন সকলে আমরা। শক্তির নিত্যতা কেহ স্বীকার কর বা নাই কর কিন্তু সকলেই যে এই শক্তির অধীন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ পদেপদেই তোমাকে এই শক্তির অধীন দেখিতেছি এবং তুমিও অধীনতা বোধ করিয়া থাক। সে যাহা হউক এই শক্তি স্বয়ং ক্রিয়াশীল বলিয়াই এই শক্তিদেহাভিমানী ঈশ্বর জগতের যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা, এবং এই জন্যই জীবগণ ঈশ্বরের অধীন; এবং এই জন্যই ঈশ্বর জীব-গণের উপাস্য ও আরাধনীয়। তুমি উপাসনা ও আরাধনা স্বীকার কর বা না কর, আমি তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই উপাসনা করিতে দেখিতেছি, এবং শক্তি তোমাকে চিরদিনই উপাসনা করাইবেন। এই শক্তিকে ঈশ্বর অহংজ্ঞান করেন বলিয়াই তাঁহার ঈশ্বরত্ব এবং এই জন্যই বলি, মা তারা শক্তিরূপিণী অর্থাৎ শক্তিই তাঁহার রূপ বা দেহ; এবং এই জন্যই বলি মাতারা শক্তি-স্বরূপা, যে হেতু শক্তির কার্য্যই তাঁহার কার্য্য তারা মায়ের বর্ত্তমানতা ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, গর্ভধারিণী মাতার প্রতি ভক্তি যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয় তবে এই মহা-মাতার প্রতিও ভক্তি কেননা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে? এই মহামাতা কি উপাস্যা ও আরাধনীয়া নহেন?

মা তারা! আনন্দময়ী মা! তুমি ঈশ্বরেরও পরম সেব্যা! তোমাকে যিনি পাইয়াছেন, তোমার সেই অলোকসামান্যজ্যোতির্ম্ময়ী সৌম্যমূর্ত্তি যিনি ক্ষণ-কালের নিমিত্তও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ তত্ত্ব জানিবার বাকি আছে? তুমি যাহাকে মুহূর্ত্তমাত্রও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ তোমার দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছ, তাঁহার পক্ষে তত্ত্ব সমুদ্র করতলস্থিত আমলকীবৎ সহজ দৃশ্য সন্দেহ নাই এবং তোমার স্বরূপব্যঞ্জক ওঙ্কাররূপ মন্দার গিরির গভীর ধ্বনি ও নির্ঘোষই তাঁহার সমুদ্রমন্থন ক্রিয়ার প্রকাশক। সমুদ্রমন্থন তোমার দর্শনকারী ভক্তের পক্ষে কঠিনতর ব্যাপার নহে। তোমার কার্য্য তুমিই কর মা, কিন্তু মন্থনকার্য্যে তোমার ভক্তের কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার আত্মপ্রসাদরূপ আনন্দ, এবং এই জন্যই, মা, তুমি আনন্দময়ী! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তোমার দর্শনই তোমার ভক্তসাধকগণের সাধনার লক্ষ্য। তুমিই যদি মহা-প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার আনন্দের মহাসংসার লইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে

তোমার ভক্তসন্তানগণ মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কেনই না আনন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে? মাতা প্রকৃত সন্তানের মৃত্যু দর্শন করিতে পারেন না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র সংসারেই দৃষ্ট হয়। তুমি যাহাকে দর্শন দিয়াছ এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমাকে যিনি মা বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনিই তোমার যথার্থ সন্তানশব্দবাচ্য, এবং তুমিও যথার্থ তাহারই মাতৃশব্দাভিধেয়। মা সন্তানের মৃত্যু দেখিতে পারেন না বলিয়াই, তোমার দর্শনকারী সন্তানগণ অমর অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তোমার সুশীতল প্রেমপূর্ণ ক্রোড়েস্থিত অবোধ অপোগণ্ড শিশু। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুকে চাকচিক্যশালী দ্রব্যজাতের যতই প্রলোভন দেখান যাউক না কেন, সে কিছুতেই প্রলোভনে ভুলিয়া মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিবে না; এই জন্যই তোমার ক্রোড়েস্থিত ভক্ত শিশু মোক্ষকেও তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে। তোমার ক্রোড়েস্থিত থাকাই তোমার ভক্তের পরম পদ, যেহেতু এই পদে স্থিত থাকিলে মোক্ষাদিরও কামনা থাকে না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গীতা—৭।১৪

অভয়।

ভগবান গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দৈবসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

*   *   *

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

"হে অর্জ্জুন! যিনি দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; অভয়, শুদ্ধচিত্ত, জ্ঞানযোগনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান থাকে। দৈব-সম্পৎ-সম্পন্নের বিশিষ্ট গুণগ্রামের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ প্রথমেই "অভয়" গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই "অভয়" কি পদার্থ তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

এ পৃথিবীতে সকলে দৈবী সম্পৎ লইয়া জন্মগ্রহণ করেনা। অধিকাংশ লোকই মানুষ কিম্বা অসুর প্রকৃতি সঙ্গে করিয়া আনে। তাহারা স্বভাবতঃ অভয় প্রভৃতি সদ্গুণের অধিকারী হয় না। এ সকল গুণ তাহাদিগকে অনেক যত্নে উপার্জ্জন করিতে হয়। কি উপায়ে অভয় গুণ আয়ত্ত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জগতের মধ্যে যে কিছু পদার্থের সহিত মানবের সম্বন্ধ ঘটে, সে সকল পদার্থ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাজ্য। এক শ্রেণীর পদার্থের সম্পর্কে মানুষের চিত্তে রাগ (Attraction) উৎপন্ন হয়। আর অপর শ্রেণীর পদার্থের সম্পর্কে মানুষের চিত্তে দ্বেষ (Repulsion) উৎপন্ন হয়। এই রাগ ও দ্বেষ জাগতিক পদার্থ সমূহকে মহা দ্বন্দ্বে পৃথক করিয়া রাখে। সেই জন্য গীতাতে কথিত হইয়াছে যে,

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ"

যাহা আমাদের ইষ্ট, তাহাতে আমাদের রাগ; এবং যাহা আমাদের দ্বিষ্ট

তাহার প্রতি আমাদিগের দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দ্বেষের দুই বিভাগ একের নাম ক্রোধ ও অপরের নাম ভয়। ক্রোধ ও ভয় দ্বেষেরই অবস্থাভেদে রূপান্তর মাত্র। বস্তুতঃ উভয়ই দ্বেষ হইতে ভিন্ন নহে। দ্বিষ্ট বস্তু যদি দুর্ব্বল হয় তবে তাহার প্রতি আমাদের ক্রোধ উৎপন্ন হয়; আর দ্বিষ্ট বস্তু যদি প্রবল হয় তবে তাহা হইতে আমাদের ভয় উৎপন্ন হয়। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয় প্রদান কালে ভগবান তাহার একটী লক্ষণ করিয়াছেন

"বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধঃ"

অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষহীন– আসক্তিবর্জ্জিত এবং দ্বেষের যে দ্বিবিধ রূপ ভয় ও ক্রোধ তদ্বিরহিত। এই ভয়ের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে?

ইহার এক উপায় উপনিষদে উপদিষ্ট দেখা যায়। উপনিষদ্ বলেন—

"দ্বৈতাদ্ধি ভয়ংভবতি।"

দ্বৈত হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়।

'যদাদহরমপি দৈবতম্ পশ্যতি

তদাস্য ভয়ং ভবতি"

যতক্ষণ এক রতিও দ্বৈত থাকে, ততক্ষণ মানুষ ভয়ের অধীন হয়। অতএব ভয়ের হাত এড়াইতে হইলে দ্বৈতের নাগাল ছাড়াইতে হয়। তাহার উপায় কি?

উপায় উপনিষদেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সে উপায় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দ্বৈতভাণের নিবৃত্তি সাধন করা। ইহাই জ্ঞান মার্গ। যখন সকল পদার্থেই ব্রহ্মসত্তার অনুভব হয়, যখন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই উপদেশের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আর দ্বৈতভাণ তিষ্টিতে পারে না। তখন সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয়। এবং সেই সঙ্গে দ্বৈতভ্রান্তিমূলক দ্বেষ, এবং তজ্জনিত ভয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন জ্ঞানী সর্ব্বত্র সমদর্শন হন, এবং সমস্ত পদার্থে আত্মার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বৈতভাব বিসর্জ্জন করেন। তখন আর শোক, মোহ, রাগ, দ্বেষ. তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এবং তিনি অনায়াসে অভয়রূপ দৈব সম্পদ আয়ত্ত করিয়া লয়েন।

দুর্ব্বলেরই ভয় হয়, প্রবলের হয় না। যে বলবান তাহার কাহাকে ভয়? অতএব, ভয় দূর করিবার একটী প্রধান উপায় আত্মনির্ভর—আত্মার বলাধান। শ্রুতি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।" সুতরাং তাহার আত্মনির্ভর হইবে কিরূপে? আত্মার অন্তস্তল হইতে যখন বলের উৎস উচ্ছসিত হইয়া মানবের হৃদয় প্লাবিত করে, তখন সে ভয়কে দূরে ফেলিয়া দেয়, এবং পর্ব্বত যেমন নিজের ভিত্তির উপর সুদৃঢ় হইয়া ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাতের নির্য্যাতন অটলভাবে ধারণ করে, সেও সেইরূপ অমিতবল আত্মার উপর নির্ভর করিয়া সহস্র বিভীষিকার ভ্রুকুটীকে অবহেলা করে।

আত্মার বল বৃদ্ধির প্রধান উপায়—ধ্যানযোগ। যোগমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে প্রভুত আত্মনির্ভর অর্জ্জন করিতে হয়। যে উদ্‌যোগ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা ধ্যানযোগীর নিত্য সাধনার বস্তু, তদ্বারা নিয়তই আত্মনির্ভরের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহার পক্ষে

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

সে নিয়ত আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই চরিতার্থ। তাহার আর রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ কোথায়?

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবাভি সন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।"

যাহার আপনাতেই রতি, আপনাতেই তৃপ্তি, আপনাতেই সন্তোষ তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই। কারণ তাহার রাগ দ্বেষ নাই,—ভয় ক্রোধ নাই।

আত্মনির্ভরের অপেক্ষাও ভয়ের হাত এড়াইবার একটী প্রকৃষ্টতর উপায় আছে। সে উপায় ঈশ্বরে নির্ভর—ভক্তি যোগ। ভগবানই ভয়ত্রাতা, বরাভয় দাতা। তাঁহাতে নির্ভর করিলে ভয় কিরূপে স্পর্শ করিবে? যে ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, সেত মহা বলশালী: সে কাহাকে ভয় করিবে, কিসের জন্যই বা ভয় করিবে? ভবযুদ্ধে সে নির্ভয় হৃদয়। কবি আশ্বাস দিয়াছেন

"ভবযুদ্ধে ভয় কিরে জগদম্বা জননী।"

যে জীবন সংগ্রামের কঠোর কোলাহলের মধ্যে একবার তাঁহার অভয় বাণী শুনিতে পাইয়াছে, সে আর কিছুতেই ভয় করে না। কিন্তু ভক্তি জিনিসে

মাভৈঃ রব আর কাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ লাভ করে? যাহার সম্পূর্ণ ঈশ্বরে নির্ভর হইয়াছে সে কিছুতেই বিভ্রান্ত হয় না। সে বুঝে, যে যাহাই ঘটুক না কেন, ভালর জন্যই ঘটে। যিনি মঙ্গল নিদান, তাঁহার নিকট হইতে অমঙ্গল আসিতে পারে না। যাহা প্রথম দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ছদ্মবেশী কল্যাণ মাত্র। যাহার এই বিশ্বাস অটল থাকে, সে 'জোবের' মত কিছুতেই বিচলিত হয় না, বরং সকল নির্য্যাতন, সকল নিপীড়ন, অম্লান মুখে সহ্য করিয়া থাকে। সে বুঝে, যে বিভীষিকা যদি তাঁহারই রচিত বা প্রেরিত হয়, তবে তাহাতে ভয়ের অবসর কোথায়? শিশু যখন জানিতে পারে যে, যে মুখসের বিকট মূর্ত্তিতে সে ভীত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে তাহার জননীর স্নেহময় মুখ লুক্কায়িত আছে, তখন আর তাহার ভয় থাকে কি? তখন ভক্তের মানস নয়নে ভগবানের কালীরূপ ফুটিয়া উঠে। সে তাঁহার খর্পর খড়্গের সহিত বর ও অভয় প্রত্যক্ষ করে। তখন আর তাহার ভয় থাকে না।

অভয় অর্জ্জন করিবার যে সকল প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যকর কিনা প্রহ্লাদের চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়। প্রহ্লাদ সর্ব্ব জগতে বিষ্ণুর বিস্তার দেখিতেন।

"বিস্তারঃসর্ব্বভুতস্য বিষ্ণোঃ বিশ্বমিদংজগৎ।"

তিনি, সর্ব্বভুতে সমদর্শনই ভগবানের আরাধনা মনে করিতেন। সেই জন্য তাঁহার কিছুতেই ভয় হইত না। পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে সহস্র নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যখন শত সহস্র দৈত্য, নানা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রহ্লাদের বিনাশে উদ্যত হইল, তখনও প্রহ্লাদ নির্ভীক অটল। কেন?

"বিষ্ণুঃশস্ত্রেষু যুষ্মাকম্ ময়িচাসৌ যথাস্থিতঃ,
দৈতেয়া স্তেনসত্যেন মাক্রামন্ত্বায়ুধানিমে॥"

হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু আমাতে যেমন আছেন, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রেও সেই-রূপ আছেন; অতএব ইহার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। যখন দৈত্য পুরোহিতগণ প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য ভীষণ কৃত্যার সৃষ্টি করিয়া দাবানলে নিজেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন প্রহ্লাদ তাহাদের রক্ষার জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন

"যথাসর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি, জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥"

অর্থাৎ দাহকারী অগ্নিকেও আমি শত্রু ভাবি না, যেহেতু সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তাহাতেও আছেন। অতএব এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। ইহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা; যিনি জগৎ বিষ্ণুময় দেখেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" অনুভব করেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার কথা।

আবার যখন হিরণ্যকশিপু নানা বিভীষিকা দেখাইয়াও তাঁহাকে ভয়াকুল করিতে পারিল না, তখন আমরা প্রহ্লাদের মুখে প্রকৃত ভক্তের অভয়ের কারণ জানিতে পারি।

" ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্রতিষ্ঠতি।"

ভয়হারী ভগবান যখন হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন তখন আর আমার ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? পরে যখন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য স্বকৃত সমস্ত চেষ্টা বিফল দেখিয়া প্রহ্লাদকে তাহার অদ্ভুত প্রভাবের রহস্য জিজ্ঞাসা করে, তখন ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের মুখে ভক্তির সারতত্ত্ব বিবৃত শুনিতে পাই।

"ন মন্ত্রাদিকৃতস্তাত! ন বা নৈসর্গিকো মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতোহৃদি॥"

"আমার এ প্রভাব মন্ত্র জনিত নহে; আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে। যাহার যাহারই হৃদয়ে ভগবান অবস্থিতি করেন তাহাদেরই এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

অতএব ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ভক্তিযোগই প্রকৃষ্ট উপায়। সেই জন্য ভগবান প্রহ্লাদকে বর গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে প্রহ্লাদ এইমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

"হে নাথ! জন্ম জন্মান্তরে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি সর্ব্বদা অবিচলিত ভক্তি থাকে।" এরূপ ভক্তি যাহারই থাকে, অভয় তাহার ইচ্ছালব্ধ সামগ্রী।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

"নানা বর্ণ পুষ্প রাশি হ'লে একত্রিত
কতরূপ মাল্য তার হয় সে গ্রথিত
সারা বর্ষ ধরি এই মানব জীবনে
নিরত উচিত রত সুকার্য্য সাধনে"

শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বারামে অবস্থানকালে পরম গুরু শ্রীবুদ্ধদেব উপদেশ প্রদান কালে, রমণী শিষ্যা বিশাখার কাহিনী বলিতেছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাদিয়া নগরে বিশাখা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা-কোষাধ্যক্ষ মেন্দকার পুত্র ধনঞ্জয়, পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতা সুমানা প্রধানা স্ত্রীর আসনে আসীনা ছিলেন।

যখন বিশাখা সাত বৎসর বয়সে উপনীত হন, লোক শিক্ষক শাক্যমুনি ঐ নগরীর ব্রাহ্মণ শেল এবং অন্যান্য অধিবাসী নির্ব্বাণ লাভের উপযুক্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অসংখ্য শ্রমণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তথায় আগমন করিলেন।

তৎকালে ভাদিয়া নগরের কোষাধ্যক্ষ মেন্দকা বহু গুণশালী পঞ্চজন পূর্ণ পরিবারের নেতা ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ পঞ্চজন; তিনি, তাঁহার প্রধানা ভার্য্যা পদুমা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনঞ্জয়, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু সুমানা এবং মেন্দকার কৃতদাস পান্না। বিম্বিসার রাজ্যে মেন্দকা কেবল একা অতুল ধনের অধিকারী নহেন আরও চারিজন তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গৌরব করিতে পারে। তাঁহাদের নাম যতিয়া, জটিলা, পুন্নকা, কেকাবলিয়া।

যখন কোষাধ্যক্ষ দশ শক্তির অধীশ্বরে ভগবানের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তিনি ধনঞ্জয়ের ক্ষুদ্র বালিকা বিশাখাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

বিশাখা আসিলে তিনি বলিলেন—

"প্রিয়তমা বালিকা। অদ্য তোমার ও আমার কি শুভদিন। শ্রীভগবান শাক্যসিংহ আজ আমার পুরে অবস্থিত। বিশাখা! পাঁচশত রথে পাঁচশত সহচরী লইয়া দশ শক্তির অধীশ্বর শ্রীবুদ্ধদেবের সম্যক্ সম্বর্দ্ধনা কর।

"যথা আজ্ঞা' বলিয়া বিশাখা পিতামহের আদেশ মত কার্য্য করিলেন। প্রয়োজনীয় রীতি নীতি বিষয়ে বালিকা বিশেষ পটু ছিল, যানারোহণে যতদূর যাওয়া বিধেয় ততদূর গিয়াছিলেন। পরে তিনি অবতরণ করিয়া পরম গুরুর নিকটে গমন করিলেন। বিশাখা তাঁহার পাদ বন্দন করিয়া ভক্তি সমন্বিত চিত্তে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তথাগত তাঁহার প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মমত শিক্ষা দিলেন। উপদেশ শেষে বিশাখা উপদেশ কালে সার্দ্ধ সহস্র সহচরীর সহিত শ্রোত্রাপত্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

কোষাধ্যক্ষ মেন্দকা শ্রীবুদ্ধের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান জ্যোতিঃ পূর্ণ বাক্য সুধা শ্রবণে শ্রোত্রাপত্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া তদীয় ভবনে তাঁহাকে আগামী দিবসের নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিন স্বগৃহে মেন্দকা লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য সিদ্ধার্থ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রমণদিগকে পরম পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব ছয় মাস তথায় অবস্থান করিয়া পরিশেষে ভাদিয়া নগরী পরিত্যাগ করিলেন।

সেই সময় বিম্বিসার ও কোশলপতি পসেনজিৎ উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন; উভয়ে পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন!

এক দিন কোশলপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন "বিম্বিসার রাজ্যে পাঁচজন ধনকুবের বাস করিতেছে কিন্তু আমার এই বিশাল আধিপত্যে একজনও তেমন ধনশালী নাই। আচ্ছা, এখন যদি বিম্বিসারের নিকট গমন করিয়া এই সকল গুণবান ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রার্থনা করি তাহা হইলে কি বিম্বিসার আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

এইরূপ মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া পসেনজিৎ রাজা বিম্বিসারের নিকট গমন করিলেন। বিম্বিসার যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনার পর জিজ্ঞাসিলেন 'আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি?"

"মহাশয়ের রাজ্যে পাঁচজন ধনকুবের বাস করিতেছেন। আমার ইচ্ছা তাঁহাদের একজনকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই। মহাশয় আদেশ করুন।" "ইহা

অসম্ভব, কোশলপতি ! এই সব সম্রান্ত পরিবারদিগকে দেশত্যাগী করা একরূপ অসম্ভব।"

কোশলপতি উত্তর করিলেন "আমিও না লইয়া যাইব না।" রাজা মন্ত্রীদিগের সহিত পরামার্শ করিলেন এবং পরে কোশলপতিকে বলিলেন, "যতি প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগকে দেশত্যাগী করা বিশাল গ্রহ, উপগ্রহের স্থান চ্যুতের সমান।

কিন্তু কোষাধ্যক্ষ মেন্দকার ধনঞ্জয় নামে এক পুত্র আছে। আমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনাকে যথাযথ উত্তর দিব।"

অনন্তর বিম্বিসার কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়কে ডাকিতে লোক প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় আসিলে পর তিনি বলিলেন।

"প্রিয় সুহৃদ্, কোশলপতি বলিতেছেন তুমি তাঁহার সহিত না যাইলে তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না। আমার অনুরোধ যে তুমি ইহার সহিত গমন কর।"

"মহারাজ। আপনি অনুমতি করিলেই আমি যাইব।"

"তবে, বন্ধুবর, প্রস্তুত হইয়া কোশলপতির সহিত যাত্রা কর।"

ধনঞ্জয় প্রস্তুত হইলেন, রাজা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বিদায়ের সময় নরপতি পশস্তজিতের সহিত ধনঞ্জয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কোশলপতি পথিমধ্যে কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিবেন এই মানস করিয়া শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ধনঞ্জয় কহিলেন আমরা এখন কাহার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছি? নরপতি উত্তর করিলেন, "কোষাধ্যক্ষ, এই রাজ্য আমার।"

ধনঃ। এখান হইতে শ্রাবস্তী কত দুর?

পশঃ। সাড়ে দশ ক্রোশ হইবে।

ধনঃ। সহরে অত্যন্ত জনতা এবং আমার অনুচরবর্গও অত্যাধিক মহারাজের অনুমতি হইলে আমি এখানে বাস করিতে পারি।

"ভাল তাহাই হউক' কোশলপতি সম্মতি দিলেন। ধনঞ্জয়ের জন্য একটী নগর স্থাপনের রাজা স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। সায়ংকালে উক্ত স্থান বসবাসের নিরূপণ করাতে নগরীর নাম হইয়াছিল সাকেতা।

শ্রাবস্তীতে পুণ্যবর্দ্ধন নামে একটী যুবা বাস করিতেন। তাঁহার পিতা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, নাম ছিল মিগার; বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া জনক জননীর স্বীয় পুত্রবধুর মুখচন্দ্রিমা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল। এক দিন উভয়ে পুণ্যবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলেন।

"বৎস! তোমার যে বংশ ইচ্ছা সেই বংশ হইতে পত্নী গ্রহণ কর। আমাদের অভিলাষ, এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট দিন ভগবানের চিন্তা ও নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত করি।

"বিবাহে আমার কোন বাসনা নাই।

"সে কি বৎস! এরূপ কথা বলিতে নাই। তুমি কি আমাদিগকে সুখী করিতে চাও না? আর সন্তান বিহীন হইলে কোন কুলই রক্ষা পাইতে পারে না।"

পিতা মাতা ক্রমাগত অনুরোধ করাতে অবশেষে যুবক উত্তর করিল "যদি পঞ্চরূপ বিভূষিতা কোন রমণী পাই তবে আপনাদের আদেশ মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছি।"

"পঞ্চরূপবতী কন্যা! সে কি বৎস?"

"কেশ সৌন্দর্য্য, শরীর সৌন্দর্য্য, অস্থি সৌন্দর্য্য, চর্ম্ম সৌন্দর্য্য এবং যৌবন সৌন্দর্য্য। এই পঞ্চ রূপ।"

পাঠকবর্গের বিদিতার্থ আমরা এস্থলে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি। যে রমণীর, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় সুন্দর, আগুল্ফ লম্বিত কেশ রাশি; যাহার অধরোষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুরঞ্জিত, কোমল ও সুখস্পর্শ;—যাহার হীরক বা মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় সিত শুভ্র দন্ত;—অগুরু চন্দনাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়াও যাহার চর্ম্ম নীল পদ্মমালার ন্যায় সমুজ্জল ও কর্ণিকারা কুসুমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ; যে প্রৌঢ়াবস্থাতেও যৌবনসুখ বালিকার ন্যায় লাবণ্যবতী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাকেই পঞ্চরূপযুতা রমণী বলিয়া থাকে।

পুত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথনান্তর তাঁহার পিতা মাতা একশত আটটী ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপ আহার করাইলেন, পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়গণ, পঞ্চরূপশীলা কন্যা কি জগতে কোথাও আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে আটজন রূপবতী বালিকার অন্বেষণে গমন করুন।" পরে তাঁহারা আটজনকে প্রচুর উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন "যখন আপনারা পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেন আপনাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই বর্ণনানুরূপ কন্যার সন্ধান করুণ; যদি কোথাও দেখিতে পান তবে এই স্বর্ণহার তাহার গলবিলম্বিত করিয়া দিবেন।" এই বলিয়া একলক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটী স্বর্ণহার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বিদায় হইয়া কথিত কন্যার সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

বড় বড় সহরে, নগরে নগরে সেই আটজন ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু পঞ্চ রূপবতী কন্যা তাঁহারা কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর করিল না। স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে তাহারা সৌভাগ্যক্রমে সাধারণ পর্ব্বাহ দিনে সাকেতায় আসিয়া উপনীত হইল।

প্রতি বৎসর ঐ নগরে সাধারণ পর্ব্বাহ দিনে একটী উৎসব হইয়া থাকে। অসূর্য্যম্পর্শা কুলকামিনীগণ সহচরী সমালঙ্কৃতা হইয়া স্বীয় রূপরাশি বহন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে নদীতীর পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করেন। ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য জাতির ধনী পুত্রগণ পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সম কুলশীলসম্পন্না সুন্দরী কুমারী দেখিলেই তাহার গলে মালা দিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণগণ নদীতটস্থ একটী বিস্তীর্ণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল। তৎকালে সার্দ্ধ সহস্র যুবতী সহচরী পরিবৃতা নানা অলঙ্কারাভরণা ষোড়শী বিশাখা নদীতে অবগাহন করিতে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ মেঘ উঠিল, গগণ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, এক বিন্দু, দুই বিন্দু করিয়া ক্রমে সহস্র ধারে বৃষ্টি ধারা পতিত হইতে লাগিল। সহচরীগণ দ্রুতগমনে ঐ সুবিস্তীর্ণ গৃহে আশ্রয় লইল। ব্রাহ্মণেরা যত্ন পূর্ব্বক প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু পঞ্চশত রমণীর মধ্যে কাহাকেও পঞ্চরূপে বিভূষণা দেখিতে পাইল না। পরে সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাখা স্বভাব সুলভ মন্থর গতিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার মুহ সিক্ত।

ব্রাহ্মণগণ তাহাকে চারিটী সৌন্দর্য্যের মুর্ত্তিমতী দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এখন সুন্দরীর অবশিষ্ট দশন সৌষ্ঠব দর্শন করিবার জন্য পরস্পর ঔৎসুক চিত্তে বলাবলি করিতে লাগিল—

এই বালিকা কিছু অলস প্রকৃতি বিশিষ্টা। বোধ হয় অহংকারে এই বালিকা তাহার স্বামীর সহিত কর্কশ ব্যবহার করিবে।

গম্ভীরনাদী ঘণ্টারবের ন্যায় গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে বিশাখা বলিল "আপনারা কি বলিতেছেন?"

(ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিল তাহার স্বর মধুর ;)

ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন "আমরা তোমার মন্থর স্বভাবের বিষয় আন্দোলন করিতেছিলাম।"

'আপনারা এরূপ বলিতেছেন কেন?'

তোমার সহচরী রমণীরা এইগৃহে দ্রুতপদে আগমন করিল, এবং তাহাদের বসনভূষণ কিছুই সিক্ত হয় নাই। কিন্তু এই অল্প পথেও তুমি ক্ষিপ্রগতিতে আইস নাই এবং তোমার বসনভূষণও সিক্ত করিয়া আসিয়াছ। আমরা এই কথাই ঐরূপ বলিতেছিলাম।

"মহাশয়গণ! চারিটী অবস্থায় দৌড়ান ভাল দেখায় না। ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে।"

"কি কি চারি অবস্থা?"

"মহাত্মাগণ, সুগন্ধ চর্চ্চিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভূষিত নরপতি রাজসভায় দ্রুতপদ সঞ্চালনে প্রবেশ করিলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে বলে "সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় রাজা বেগে প্রবেশ করে! এ কি রকম?" মৃদুগতিতে চলিলে তিনি প্রত্যেকের প্রশংসা ভাজন হন। বিভূষিত রাজহস্তী বেগগামী হইলে সুন্দর দেখায় না। করীর স্বাভাবিক গজেন্দ্র গমন সকলেই সুখ্যাতি করে, মায়ামুক্ত উদাসীন ক্ষিপ্রচরণ হইলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে "সন্ন্যাসী সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় চলে ইহা কি রূপ?" শান্ত পদবিক্ষেপ তাঁহার গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। চঞ্চলা ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপশীলা রমণী সকলের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। লোকে তাহার দোষারোপ করিয়া বলে "একি! রমণী হইয়া পুরুষের মত দৌড়ায়! এই চারি অবস্থায় দৌড়াইলে সকলেই কুৎসিৎ দেখে।"

"এতদ্ব্যতীত বালিকা তোমার অন্য কি কারণ ছিল?"

"সুধীগণ! জনক জননীই কন্যাকে লালন পালন করিয়া থাকে। নন্দিনীর

দেহের প্রতিঅঙ্গ বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কারণ আমরা স্ত্রী জাতি পণ্য দ্রব্যের মধ্যে। অপর পরিবারে বিবাহ দিবার জন্যই তাঁহারা আমাদের পালন করেন। ভূমিতে পতিত হইয়া যদি বিকলাঙ্গ কিম্বা হস্তপদ চূর্ণ হয় তাহা হইলে আমাদের চিরদিন পিতৃগৃহে ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে। অলঙ্কারাদি সিক্ত হইলেও শুষ্ক হয় সুতরাং আমি দৌড়াইয়া আসি নাই।

যতক্ষণ বিশাখা কথা বলিতেছিল ততক্ষণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় কুন্দ বিকসিত দন্ত শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। এরূপ সৌন্দর্য্য তাহারা কখন দেখে নাই, বালিকার সুবিন্যস্ত বাক্যের অনুমোদন করিয়া তাহারা বালার কমনীয় কণ্ঠে স্বর্ণহার পরাইয়া দিয়া বলিল।

"সুন্দরি! তুমিই কেবল এই হার পাইবার যোগ্য।"

"বালিকা উত্তর করিল "কোন পুর হইতে আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে?"

"শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে।

"কোষাধ্যক্ষের নাম কি?"

"তাঁহার নাম মিগার।"

"তাঁহার পুত্রের নাম?"

"পুণ্যবর্দ্ধন।"

তাহার সমতুল্য কুলশীল জাতি জানিয়া বিশাখা রথ পাঠাইবার জন্য পিতার নিকট লোক প্রেরণ করিল। যদিও আসিবার সময় সুন্দরী রীতি অনুসারে পদব্রজে আসিয়াছিল, কিন্তু একবার মাল্য শোভিনী হইলে রথারোহণে গৃহে প্রত্যাগমন করা সিকেতার প্রথা ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূতা কুমারীগণ রথাদি আরোহণে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিত, কেহ কেহ বা সামান্য শকটারোহণে বা তালবৃন্ত নির্ম্মিত পত্রাচ্ছাদিত হইয়া কিম্বা নিতান্ত পক্ষে গাত্রাবরণ বিস্তীর্ণ পূর্ব্বক সমস্ত শরীর সম্পূর্ণ আচ্ছদন করিয়া গৃহাভিমুখে পদব্রজে গমন করিত। বর্ত্তমান স্থলে তদীয় পিতা সার্দ্ধ সহস্র রথ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বিশাখা সখি সমভিব্যাহারে স্যন্দনে আরোহন করিয়া গৃহ মুখে ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ-গণও তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসিলেন

"আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"শ্রাবস্তীর ধনাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে।

"ধনাধ্যক্ষ ? তাঁহার নাম কি ?"

"মিগার।"

"তাঁহার পুত্রের নাম ?"

"পুণ্যবর্দ্ধন।"

"অর্থ—তাঁহার অর্থ কত ?"

"চারি কোটী মুদ্রা।"

আমাদের নিকট উহা যৎসামান্য মাত্র।

"যাহা হউক, বয়ঃ ধর্ম্মানুসারে বালিকার পবিত্র উদ্বাহ শীঘ্রই প্রয়োজন। অর্থাদির বিষয় দেখিবার আবশ্যক কি ?' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া এই রূপে তিনি সম্মতি দিলেন।

দিন দুই আতিথ্যের পর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিয়া মিগারকে কহিল "আমরা বালিকা দেখিয়া আসিয়াছি।"

'কাহার কন্যা ?'

"ধনাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের কন্যা।

"যাঁহার কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি শক্তিমান পুরুষ। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিতে যাই চলুন।" অনন্তর কোষাধ্যক্ষ নরপতি সমীপে সকল বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিয়া কতিপয় দিবসের অবসর প্রার্থনা করিলেন।

রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "এই ব্যক্তি মহাশক্তিশালী ধন-কুবের, ইহাকে আমি বিম্বিসারের নিকট হইতে গ্রহণ করি। এই বিষয়ে আমার মনোনিবেশ করা আবশ্যক।" কোশলপতি কহিলেন "মিগার, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

"যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের নিকট এই বলিয়া লিপি প্রেরণ করিলেন যে "আমি যাইতেছি' মহারাজও স্বয়ং যাইবেন, রাজ অনুচর বর্গও অসংখ্য। এত লোকের যত্ন করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি ?"

প্রত্যুত্তর আসিল "ইচ্ছা হইলে দশজন রাজাকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

গৃহ রক্ষার জন্য জন কয়েক প্রহরী ব্যতীত মিগার সুবৃহৎ নগরের সমগ্র জনপদের সহিত সিকেতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিকেতা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তাঁহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট তাহাদের আগমন বার্তা অবগত করাইলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া কন্যার সহিত পরামর্শ করিলেন।

ধনঃ। বৎসে, শুনিতেছি তোমার শ্বশুর কোশলপতি সহিত এখানে আসিয়াছেন। রাজার জন্য রাজ প্রতিনিধি বর্গের জন্য এবং তোমার শ্বশুরের জন্য কোন্ কোন্ বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিব!'

বুদ্ধিমতী কোষাধ্যক্ষ দুহিতা সহস্র সহস্র যুগ যুগান্তরের বাসনা ও উচ্চ আশার ফলে, সুমার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে রাজ', রাজকর্ম্মচারীগণ এবং তাহার শ্বশুরের জন্য বিভিন্ন অট্টালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। পরিশেষে দাস দাসীদিগকে ডাকাইয়া বলিল "রাজার জন্য তোমরা এতজন, রাজপ্রতিনিধিগণের জন্য এতজন এবং শ্বশুরমহাশয়ের জন্য এতজন আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অশ্বাদিরক্ষণাদিতে সুনিপুণ তাহারা হস্তী অশ্ব এবং অন্যান্য পশুর তত্বাবধারণ করিবে; আমাদের অতিথীগণ যেন এখানে আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।" বালিকা এইরূপ আদেশ করিয়াছিল কেন? যাহাতে কেহ না বলিতে পারে আমরা বিশাখার নিকট আনন্দ লাভ করিতে আসিয়াছিলাম তৎপরিবর্ত্তে আমরা কষ্টে ও পশুদিগের প্রহরীকার্য্যে সময় অতিবাহিত করিলাম।

ঐ দিন ধনঞ্জয় পাঁচশত স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া এক সহস্র নিষ্কার কাঞ্চন, রৌপ্য হীরা মুক্তা পান্না প্রবাল প্রভৃতি যথেষ্ট দিয়া বলিলেন "আমার কন্যার জন্য একটী বৃহৎ মহালতা আবরণী নির্ম্মাণ কর।"

কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, কোশলপতি পসেনজিৎ ধনঞ্জয়কে বলিয়া পাঠাইলেন "আমাদের বহু ও এত লোকের আহার সংগ্রহ একজন সামান্য কোষাধ্যক্ষের উপর বিষম ভারস্বরূপ। আপনার কন্যার যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব।

ধনঞ্জয় বলিয়া পাঠাইলেন—

ক্রমশঃ।

৪র্থ ভাগ। { শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

পাণ্ডব-গীতা

বা

প্রপন্ন-গীতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩০)

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন :--

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজন্
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে নরা বিষ্ণুপুরীং প্রয়াতাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণতুল্যঃ ॥

ত্রিসংসার পতি চক্রধারী নারায়ণ
যারে যারে মহারাজ করেছে নিধন,
জন্ম নাহি লবে তারা আর এই ভবে,
সকলেই অনায়াসে বিষ্ণুলোক পাবে।
ক্রুদ্ধ কভু হন যদি দেব নারায়ণ,
তাঁর ক্রোধ বর হ'য়ে দাঁড়ায় তখন।

(৩১)

কৃপাচার্য্য কহিলেন :—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য—
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

লইয়া মানব-জন্ম এসেছি শ্রীহরি!
আছে এক সাধ, তাহা দাও পূর্ণ করি।
সেই সা'ধ মিটাইয়া দিলে একবার,
বুঝিব আমার প্রতি করুণা তোমার।
তোমার দাসের দাস, তারো দাস দাস,
তারো দাস-দাস-দাস হই বারমাস!

(৩২)

অশ্বত্থামা কহিলেন :

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব
বিশ্বেশ বিশ্ব, মধুসূদন বিশ্বনাথ।
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ
নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে॥

গোবিন্দ কেশব বাসুদেব জনার্দ্দন!
বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ বিশ্ব নারায়ণ!
পদ্মনাভ নরোত্তম শ্রীমধুসূদন!
অচ্যুত নৃসিংহ হরি কমল লোচন!

তোমা বিনা এ জগতে কে আছে আমার ?
প্রণিপাত করি হরি ! চরণে তোমার।

(৩৩)

কর্ণ কহিলেন :—

নাহং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নাহং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥

আর কারে কোন কথা না চাই বলিতে,
আর কারো কোন কথা না চাই শুনিতে,
আর কারে নাহি চাই ভাবনা করিতে,
আর কারো নাহি চাই আশ্রয় লইতে,
তবে পাদ-পদ্ম বিনা, ওহে নারায়ণ !
আর কোন কিছু আমি না চাই কথন।
ভক্তিভরে ভিক্ষা চাই, তাই শ্রীনিবাস !
তোমার চরণে মোরে ক'রে রাখ দাস।

(৩৪)

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন :—

নমো নমঃ কারণবামনায়
নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়।
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায়
নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥

জগৎ-কারণ হরি ! তুমি হে বামন !
ধনু-খড়্গ-গদা-চক্রধারী নারায়ণ।
অসীম তোমার শক্তি, সীমা নাহি তার,
নমস্কার করি হরি ! চরণে তোমার ;

(৩৫)

নমো নরকসন্ত্রাসরক্ষামণ্ডলকারিণে।
সংসারনিম্নগাবর্ত্ততরিকাষ্ঠায় বিষ্ণবে ॥

বিষম সংসার—নদী বহিছে প্রবল,
মায়াবর্ত্ত ঘুরিতেছে তাহে অবিরল।
নরকের ভয় হ'তে যে করে নিস্তার,
সেই শ্রীবিষ্ণুর পদে প্রণাম আমার!

(৩৬)

গান্ধারী কহিলেন :—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

তুমিই জনক মোর, তুমিই জননী,
তুমি সখা; তুমি বন্ধু, হেন মনে গণি;
তুমি বিদ্যা, তুমি বুদ্ধি, তুমি অর্থ ধন
তুমিই সর্ব্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ!

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

পৌরাণিক-কথা।

চর্ষণি।

বেদে মনুষ্য অর্থে "চর্ষণি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। নিঘণ্টু বলিয়া বেদের যে অভিধান আছে, তাহাতে মনুষ্যের পর্য্যায়বাচী শব্দের মধ্যে "চর্ষণি" আছে।

সায়নাচার্য্যও "চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কৃষ্ ধাতু হইতে চর্ষণি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ চাষ করা। চাষের সহিত মনুষ্যনামের কি সম্বন্ধ আছে?

ভাগবতে লিখিত আছে—

অর্য্যম্‌ণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥

অর্যমা দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন আদিত্য। তাঁহার পত্নী মাতৃকা। তাঁহাদিগের পুত্র চর্ষণিগণ। এই চর্ষণিদিগের মধ্যেই ব্রহ্মা মনুষ্যজাতির কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"চর্ষণয়ঃ কৃতাকৃতজ্ঞানবন্তঃ। পশ্যতিকর্ম্মত্বেন নির্ঘণ্টাদাযুক্তেঃ। যত্র যেষু আত্মানুসন্ধানবিশেষেণ মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা।"

কৃতাকৃতজ্ঞানসম্পন্নকে চর্ষণি বলে। নিঘণ্টুর তৃতীয় অধ্যায়ে "পশ্যতি" অর্থাৎ দর্শন ও বিচার কর্ম্মের জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেওয়া আছে—

"চিকাৎ, চাকনৎ, আচক্ষ, চষ্টে, বিচষ্টে, বিচর্ষণিঃ, বিশ্বচর্ষণিঃ, অবচাকশদিত্যষ্টৌ পশ্যতিকর্ম্মাণঃ"।

সেই জন্য শ্রীধরস্বামী বলেন, চর্ষণির অর্থ বিচারশালী।

চর্ষণি আদিত্য অর্যমার পুত্র। আমাদিগের দেহ ক্ষয়শীল ও ছেদ্য। অদাদিগণীয় দা ধাতুর অর্থ ছেদন করা। যাহা ছেদন করা যায়, তাহা দৈত্যসম্পর্কীয়। যাহা ছেদন করা যায় না, তাহাই আদিত্যসম্পর্কীয়। বিচারশীল মন লইয়াই আমাদিগের আদিত্য অর্যমার সহিত সম্বন্ধ। যে কালে আমরা বিচারশীল মন লাভ করি, সেই কালে আমরা চর্ষণি শব্দে অভিহিত হইতে পারি। এ চাষ মনের দ্বারা চাষ। যদি "আর্য্য" শব্দের অর্থ হলবাহ হয়, তাহা হইলে সে হল মানসিক। তাই শ্রীধরস্বামী বলেন "আত্মানুসন্ধান বিশেষেণ মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা"।

পিতৃদেবতারা আমাদিগকে এই শরীর দিয়াছেন। এই মনুষ্যশরীর অতি অপরূপ। দেহ রচনার পরাকাষ্ঠা, পিতৃদেবতাদিগের চরম উত্তম মনুষ্যদেহ, কল্পের অত্যুত্তম প্রাকৃতিক রচনা।

কিন্তু পিতৃদেবতারা যাহা দিতে পারেন নাই, অর্যমার নিকট হইতে আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জন্য তিনি পিতৃদেব না হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে পিতৃদেবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা।

কেবল হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই পশুর সহিত মনুষ্যের বিভেদ। যতদিন হিতাহিত জ্ঞান না হয়, ততদিন মনুষ্যও পশু। মনুষ্যশব্দেরও প্রকৃত অর্থ মন লইয়া। নিরুক্তশাস্ত্রে লিখিত আছে—

মনুষ্যনামামুত্তরাণি পঞ্চবিংশতির্মনুষ্যাঃ কস্মান্মত্বা কর্ম্মাণি সীব্যন্তি মনস্যমানেন স্বষ্টা মনস্যতিঃ পুনর্মনস্বীভাবে মনোরপত্যং মনুষ্যো বা তত্র পঞ্চজনা ইত্যেতস্য নিগমা ভবন্তি।

এইবার আমরা যথার্থ মনুষ্যজাতির ইতিহাস আরম্ভ করিব।

প্রথম হইতে পঞ্চম মন্বন্তরের ইতিহাস এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে দিবার প্রয়োজন নাই। এই পাঁচ মন্বন্তর কেবল আয়োজন মাত্র। যথার্থ মনুষ্যের আবির্ভাব কল্পের এক মহাব্যাপার।

মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র ঈশ্বর। মনুষ্যশরীর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ আত্মহারা হয়। মনুষ্য আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহধর্ম্মের অনুগত হয়। মনই মনুষ্যের নিজসম্পত্তি। সেই মন ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়া মনুষ্যকে পরদাস করে। পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যও পশু হয়। পাশবিক বৃত্তির উপর আপন অধিকার বিস্তার করাই মনুষ্যের প্রকৃত কার্য্য। যখন মন পাশবী বৃত্তিকে দমন করে, তখন বিচার প্রবল হইয়া মনকে অন্তর্মুখ করে। তখন মনুষ্য আপনার স্বরূপ জানিতে পারে। তখন সে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়াস করে। যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যের কায আছে, সেইরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যের কায আছে। যখন আত্মসংযত জীব উপাসনাবলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে, তখন সে ঈশ্বরের যথার্থ দাস হয়। তখন সে ঈশ্বরের অনুচর ও ভক্ত। এই ভক্ত লইয়াই ঈশ্বর নিজকার্য্য সাধনা করেন। ভক্তজীবন কেবল ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত আর কিছুই ভাবে না। মুক্তি তাহার করতলগত হইলেও, দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

চর্ষণিকুলগত মনুষ্য কিরূপে অগ্রসর হইবে, কিরূপে পাশবীবৃত্তি দমন করিবে কিরূপে মনঃসংযম করিবে, কিরূপে আত্মস্বরূপ অবগত হইবে, কিরূপে

বিশ্বতত্ত্ব অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম করিবে, কিরূপে ঈশ্বরের সহকারী হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে, জীবের চিরসখা ঈশ্বর ইহার উপায় বিধান করেন।

আমরা ষষ্ঠ মন্বন্তর হইতে সেই উপায় অনুধাবন করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

চণ্ডী।

হিন্দুর নিকট চণ্ডী ও গীতার অতুল সম্মান। নানা কারণে বাঙ্গালা দেশের সাধারণ পাঠকের সহিত গীতার কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে। চণ্ডীর সহিত তাদৃশ পরিচয় হয় নাই। আজ চণ্ডীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব মনে করিয়াছি।

গীতা যেরূপ মহাভারতের অন্তর্গত, চণ্ডী তদ্রূপ মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের অন্তর্গত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ইতিবৃত্ত এইরূপ। ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মুনি একদিন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

তাহাতে মার্কণ্ডেয় বলেন যে এখন আমার সময় নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতে পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামে চারিটী পক্ষী আছেন। তাঁহারা বেদাদিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তুমি তাঁহাদের নিকট যাও; তাহা হইলে তোমার সন্দেহের উপযুক্ত উত্তর পাইবে। মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া জৈমিনি পক্ষীদের নিকট গমন করিয়া প্রশ্নগুলি বলিলেন। পক্ষীদিগের উত্তর শুনিয়া জৈমিনির সন্দেহ দূর হইল। পরে তিনি আরও নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে জগতের উৎপত্তির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষীরা বলিলেন যে পূর্ব্বে ক্রোষ্টুকি নামে এক ঋষি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাই অদ্য আমরা তোমাকে বলিব। এই বলিয়া জগতের উৎপত্তির প্রসঙ্গে ১৪ চৌদ্দ জন মনুর উৎপত্তি ও তাঁহাদের সময়ের নানাবিধ বৃত্তান্ত বলিলেন। এই মনুদিগের মধ্যে অষ্টম মনুর নাম সাবর্ণি। তিনি পূর্ব্বজন্মে স্বারোচিস নামক

দ্বিতীয় মনুর সময়ে সুরথ নামে রাজা ছিলেন। জন্মান্তরে মহামায়ার অনুগ্রহে সূর্য্যের পত্নী সবর্ণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অষ্টম মনুত্ব লাভ করেন। ইহাঁর মাতার নাম সবর্ণা বলিয়া ইহাঁকে সাবর্ণি বলে।

চণ্ডীর ইতিবৃত্ত প্রথমে মেধাঃ মুনি সুরথ রাজাকে বলেন। তৎপরে মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকিকে বলেন। পক্ষীরা আবার তাহাই জৈমিনিকে বলেন। এইরূপে তিনবারে তিন জন বক্তা ও তিন জন শ্রোতার সমাগমে ও কথোপকথনে চণ্ডী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্য চণ্ডীকে ষট্‌সংবাদিকা কহে।

> মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় মহাত্মনে।
> সাচৈব কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ॥
> তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণোজৈমিনিং প্রতি।
> অনেনৈব প্রকারেণ চণ্ডিকাষট্‌কথা মতা॥

মেধাঃ প্রথমে মহাত্মা সুরথকে বলেন। তাহাই মার্কণ্ডেয় ভাগুরিকে বলেন (ভাগুরি ক্রৌষ্টুকির অন্য নাম) আবার তাহাই পক্ষীগণ জৈমিনিকে বলেন।

চণ্ডী তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক ভাগকে চরিত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের নাম প্রথম চরিত, দ্বিতীয় ভাগের নাম মধ্যম চরিত এবং তৃতীয় ভাগের নাম উত্তর চরিত।

ইহা ভিন্ন অধ্যায় বিভাগও আছে।

প্রথম অধ্যায়েই প্রথম চরিত সম্পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিন অধ্যায়ে মধ্যম চরিত, এবং পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত নয় অধ্যায়ে উত্তর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। মোট ১৩ অধ্যায়।

চণ্ডীতে শ্লোক সংখ্যা ৭০০ বলা হয়। ইহার সকল বর্ণ মন্ত্রাত্মক, সেই জন্য "ঋষিরুবাচ", কি, "দেবা উচুঃ" প্রভৃতিও শ্লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি অৰ্দ্ধ শ্লোক আছে, সে গুলিও শ্লোক বলিয়া পরিগণিত। পূর্ণ শ্লোক সংখ্যা ৫৩৫, অৰ্দ্ধ শ্লোক সংখ্যা ১০৮, 'উবাচ' দ্বারা যে শ্লোক গণনা করা হয় তাহার সংখ্যা ৫৭। এইরূপে চণ্ডীতে সর্ব্বসমেত ৭০০ শ্লোক আছে। এই জন্য চণ্ডীর অপর নাম সপ্তশতী। "পঠেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমা-

দিতঃ। চণ্ডীতে যে ৭০০ শ্লোক আছে বরাহপুরাণের এই বচনই তাহার প্রমাণ।

প্রথম চরিত।

পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনুর অধিকার কালে চৈত্রবংশীয় সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। কিরাত রাজাদের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। যুদ্ধে সুরথ পরাজিত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার রাজধানী শত্রুগণ আক্রমণ করিল। ঐ সময়েই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীগণ বিদ্রোহী হইল। রাজাও মৃগয়া করিবার নাম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী রাজধানী ত্যাগ করিয়া গেলেন। বহু-দূর গিয়া নিবিড় বন মধ্যে মেধাঃ মুনির আশ্রম দেখিতে পাইয়া সেথানে প্রবেশ করিলেন। মুনিগণ তাঁহার উপযুক্ত সৎকারাদি করিলে পর তিনি চিন্তাকুল হৃদয়ে আশ্রমের বাহিরে বিচরণ করিতে করিতে একটি ভদ্র লোককে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন আপনি কে? আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনার মনে কোন গুরুতর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কি ব্যাপার আমাকে বলুন।

সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম সমাধি। আমার যথেষ্ট অর্থ সঙ্গতি ছিল। কিন্তু ধনলোভী স্ত্রী ও পুত্রগণ আমার সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এখন সেই স্ত্রী পুত্রাদির কুশল সংবাদ না জানিতে পারিয়া আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন যে এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে স্ত্রী পুত্রেরা ধন লোভে আপনাকে তাড়াইয়া দিতে পারিল তাহাদের জন্য আপনি ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সমাধি বলিলেন আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সমস্তই সত্য। যদিও আমার স্ত্রী পুত্রগণ পতিভক্তি ও পিতৃভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে তথাপি কেমনই আমার মন, আমি তাহাদিগকে ভুলিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে।

তখন সুরথ ও সমাধি এক সঙ্গে মেধার নিকট গমন করিলেন। রাজা মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখুন আমি রাজ্য হারাইয়াছি।

তাহা এখন শত্রুর আয়ত্ত। তথাপি সেই রাজ্যের জন্যই আমার মন অস্থির রহিয়াছে। আমার এই বন্ধুর স্ত্রী পুত্রগণ ধনলোভে ইহাঁকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। ইনি আমার সেই স্ত্রী পুত্রগণের কুশল সংবাদ প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত। আমরা উভয়েই জ্ঞানী তথাপি নির্ব্বোধের ন্যায় আমাদের মনের এরূপ অস্থিরতা কেন হইতেছে? মেধাঃ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সমস্তই সত্য। প্রাণিমাত্রই জ্ঞানী। মনুষ্যেরা পুত্রকে স্নেহ করে যত্ন করে তাহাতেও প্রত্যুপকারের আশা করে কিন্তু পশু পক্ষিরা শাবক-দিগকে কেন যত্ন করে? তাহাদের ত কোনও প্রত্যুপকারের আশা নাই। আসল কথা এই যে পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়দের প্রতি এরূপ স্নেহ স্বাভাবিক। ইহা দ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে। ইহা না থাকিলে সৃষ্টি লোপ পাইত। এই সমস্তই সেই দেবী মহামায়ার ক্রিয়া। তিনিই জ্ঞানীরও মন বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মায়াবদ্ধ করেন। এই দেবী সংসারে বন্ধেরও হেতু, মুক্তিরও হেতু। ইনিই পরমেশ্বরী।"

মুনির এই অভূতপূর্ব্ব নূতন কথা শুনিয়া রাজা মহামায়া দেবী কে তাহা জানিতে চাহিলেন। তাহাতে ঋষি উত্তর করিলেন যে সে দেবী নিত্যা। তাঁহার উৎপত্তি নাই। দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির জন্য তিনি কখন কখন আবির্ভূতা হন। তাহাকেই লোকে তাঁহার উৎপত্তি বলে।

প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ জলে আচ্ছন্ন ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ান, তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে তখন বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু এবং কৈটভ নামে ভয়ানক দুই অসুরের জন্ম হইল। জন্মমাত্রই তাহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তবের উদ্দেশ্য এই যে মহামায়া বিষ্ণুকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইলেই বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া এই দুই অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিধন করিবেন। ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। "তুমিই জগতের সৃষ্টি কর তুমিই জগতের পালন কর, তুমিই জগতের সংহার কর। তুমিই শ্রী তুমিই স্বধা, তুমিই স্বাহা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই তুষ্টি, অধিক কি তুমিই সব। বিষ্ণু, শিব এবং আমি তোমারই অনুগ্রহে শরীর গ্রহণ করিয়াছি। তোমার স্তব করিতে

কে সক্ষম? তুমি এই দুরাধর্ষ অসুরদ্বয়কে মোহাচ্ছন্ন কর এবং যাহাতে বিষ্ণু জাগরিত হইয়া ইহাদিগকে বধ করেন তাহার বিধান কর।"

ব্রহ্মার এই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বিষ্ণুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মার দৃষ্টি-গোচর হইলেন। বিষ্ণুও নিদ্রা ভঙ্গের পর উঠিয়া দেখিলেন যে মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতঃপর বিষ্ণু তাহাদের সহিত ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর বাহু যুদ্ধ করিলেন। মধু ও কৈটভও মহামায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণুও "তোমরা দুই জন আমার বধ্য হও" এই বর প্রার্থনা করিলেন। তখন তাহারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে সকলই জলাচ্ছন্ন। তাহা দেখিয়া তাহারা উভয়েই বিষ্ণুকে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিয়া বলিল যে "তুমি আমাদিগকে জলহীন স্থানে বধ করিও। এই কথার পর বিষ্ণু তাহাদের মস্তক নিজ উরু-দেশে স্থাপন করিয়া চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। এই দুষ্ট দৈত্যদের এইরূপেই শেষ হইল।

মধ্যম চরিত।

পূর্ব্বকালে একবার দেবতাদিগের সহিত অসুরদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তখন মহিষাসুর অসুরদিগের রাজা। যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হন। মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে ও অন্যান্য দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইলেন।

এ দিকে দেবতারা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মনুষ্যের আকার ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন গেল। তখন তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া একদিন শিব ও বিষ্ণুর নিকট সকল কথা বলিতে গেলেন। সেখানে ব্রহ্মার নিকট সকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মুখ হইতে তেজঃ নির্গত হইল। এই সকল দুঃখের কথা বলিবার সময় ব্রহ্মারও অন্য সকল দেবতারও ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাদেরও শরীর হইতে তেজঃ নির্গত হইল। সেই সকল তেজঃ একত্র মিলিত হইয়া স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিল। শিবের তেজে সেই স্ত্রীর মুখ বিষ্ণুর তেজে তাহার বাহু, ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পাদদ্বয় এবং অন্যান্য

দেবতার তেজে অন্যান্য অঙ্গ জন্মিল। সকল দেবতাই নিজ নিজ অস্ত্র ও অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তখন তিনি হিমালয় প্রদত্ত সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরের উদ্দেশে গমন করিলেন। দেবতারাও অতি আহ্লাদে তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন।

দেবীর সহিত অসুর সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল। অসুরদিগের সেনাপতি চামর, চিক্ষুর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, বিড়ালা প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইলে পর মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। দেবী তাহাকে আঘাত করিলেও সে পুনঃ পুনঃ রূপ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। শেষে আবার মহিষের রূপ ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তাহার মস্তক ছেদন করিলে তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে পুরুষ মূর্ত্তি অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার মৃত্যু হইল। মহিষাসুরের মৃত্যুর পর তাহার অনুচরেরা পলায়ন করিল এবং দেবতারা পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর চরিত।

পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য ভ্রাতা অতি পরাক্রান্ত হইয়া স্বর্গ অধিকার করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে দূর করিয়া দিয়াছিল। তখন দেবতারা মনে করিলেন যে দেবী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন বিপদের সময় আমাকে স্মরণ করিও আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের বিপদ দূর করিব। এখন আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে আমরা তাঁহার শরণাগত হই। এই মনে করিয়া তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা স্তব করিতেছেন তখন পার্ব্বতী স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর হইতে এক দেবী নির্গত হইয়া বলিলেন যে শুম্ভ দৈত্যের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ আমার স্তব করিতেছেন। ইনি পার্ব্বতীর শরীর কোষ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁকে কৌষিকী বলে।

তৎপরে কৌষিকী অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়ের একস্থানে বসিয়া রহিলেন। সেখানে চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই দৈত্য তাঁহাকে দেখিতে

পাইল। তাহারা গিয়া শুম্ভকে বলিল মহারাজ, হিমালয়ে অতি সুন্দরী একটী স্ত্রীকে দেখিলাম। এমন রূপ কখনও দেখি নাই। পৃথিবীতে যাহা কিছু উত্তম যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই আপনার ভোগ্য, ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি হস্তীশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈশ্রবা ও বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতারাও ভয়ে পড়িয়া অনেক দ্রব্য আপনাকে দিয়াছেন। এই স্ত্রীলোকটিকেও আপনার ভোগ্যা করুন। তিনি সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত।

এই কথা শুনিয়া শুম্ভ সুগ্রীব নামক দূতকে বলিল তুমি যাও গিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া এখানে আনায়ন কর।

সুগ্রীব দেবীর নিকট গিয়া বলিল দৈত্যরাজ শুম্ভ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি ত্রৈলোক্যের রাজা, এখন আর দেবতারা যজ্ঞভাগ পান না। তিনিই সমস্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হইয়া নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রী জাতির মধ্যে আপনি অতি রূপবতী আপনার উচিত তাঁহার সেবা করা। অতএব আপনি নির্ব্বিবাদে তাঁহার বশীভূত হউন।

তখন দেবী বলিলেন তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সমস্তই সত্য। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই নির্ব্বোধ। আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি। প্রতিজ্ঞাটি এই যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন আমি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। সুগ্রীব বলিল এমন কথা মুখেও আনিবেন না। যে সকল দৈত্যের সঙ্গে দেবতারা যুদ্ধ করিতে সাহস করেন না আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কোন্ সাহসে তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চান। আপনি এখন মানে মানে আমার সঙ্গে চলুন। এখন না গেলে শেষে অপমানিত হইয়া যাইতে হইবে। দেবী বলিলেন শুম্ভ অতি বলবান্ তাহা আমি জানি। কিন্তু কি করিব? এখন কিরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব? তুমি গিয়া তোমার রাজাকে সমস্ত বল। তিনি যাহা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই করিবেন।

সুগ্রীব শুম্ভের নিকট গিয়া সমস্ত কহিল। তাহা শুনিয়া শুম্ভ ধূম্রলোচনকে বলিল তুমি শীঘ্র গিয়া তাহাকে লইয়া আইস। ধূম্রলোচন দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল তুমি শীঘ্র দৈত্যাধিরাজ শুম্ভের নিকট চল। যদি

সহজে না যাও তবে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। তিনি কহিলেন আপনি মহাবলপরাক্রান্ত শুম্ভ কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং বহু সৈন্য পরিবৃত আপনি যদি বল পূর্ব্বক লইয়া যান আমি কি করিতে পারি? ধূম্রলোচন বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে হুঙ্কার দ্বারা দেবী তাহাকে ভস্মসাৎ করিলেন।

ধূম্রলোচনের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া দৈত্যরাজ চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুরকে বহু সৈন্য সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া অম্বিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাট হইতে করালবদনা কালীর আবির্ভাব হইল। তিনি দৈত্য সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সৈন্য নষ্ট হইতে দেখিয়া চণ্ড ও মুণ্ড যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। কালী তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহাদের শিরচ্ছেদন করিলেন।

তৎপরে চণ্ড ও মুণ্ডর মস্তক গ্রহণ করিয়া কালী দেবীর নিকট গিয়া কহিলেন এই চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক আপনার নিকট আনিয়া দিলাম। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আপনি স্বয়ংই বধ করিবেন। দেবী বলিলেন তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ অদ্যাবধি তোমার নাম চামুণ্ডা হইল।

শুম্ভ নিজ সৈন্যগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইল ও রক্তবীজ নামক মহাসুরকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিল। এই অসুরের বিশেষত্ব এই যে ইহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইলেই আর একটি নূতন রক্তবীজের সৃষ্টি হয়।

এ দিকে দেবতারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া নিজ নিজ শক্তিকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। যে দেবতার যে বাহন যেরূপ ভূষণ ও যেমন রূপ তাঁহার শক্তিও ঠিক তদ্রূপ। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হংসারূঢ়া ও কমণ্ডলু-হস্তা। মাহেশ্বরী ত্রিশূল হস্তে করিয়া বৃষারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এইরূপ ময়ূরারোহণে শক্তিহস্তা কার্ত্তি-কেয়ের শক্তি কৌমারী, গরুড়াসনা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-হস্তা বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তির শক্তি বারাহী, নরসিংহমূর্ত্তির শক্তি নারসিংহী এবং বজ্র-হস্তা গজরাজবাহনা ঐন্দ্রী যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মহাদেব এই সকল দেব-শক্তিকে সঙ্গে লইয়া দেবীর নিকট কহিলেন আপনি শীঘ্র শীঘ্র অসুরদিগকে সংহার

করুন। তৎক্ষণাৎ দেবীর শরীর হইতে এক শক্তি নির্গত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন ভগবন্, আপনি আমাদের দূত হইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন করুন এবং তাহাদিগকে বলিবেন যে তোমরা দেবরাজ ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিয়া পাতালে গমন কর নতুবা তোমাদের নিস্তার নাই। ইনি শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই জন্য শিবদূতী এই নাম পাইয়াছেন। অসুরেরা শিবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে ভগবতীর নিকট আগমন করিল।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঐন্দ্রী বজ্র দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলে তাহার রক্ত পৃথিবীতে পড়া মাত্রই যে কয়েক বিন্দু রক্ত ছিল সেই কয়েক জন রক্তবীজের সৃষ্টি হইল। এইরূপে অন্যান্য শক্তির আঘাতেও নূতন নূতন রক্তবীজের সৃষ্টি হইল। তখন দেবীর পরামর্শানুসারে রক্তবীজের শরীর হইতে রক্তক্ষরিত হওয়া মাত্রই চামুণ্ডা তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে আর নূতন রক্তবীজের সৃষ্টি হইল না এবং পুরাতন রক্তবীজগুলিও নিধন পাইল।

অতঃপর নিশুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধের পর দেবী তাহার বক্ষঃস্থলে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থল হইতে এক পুরুষ নির্গত হইল। দেবী খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

এইবার শুম্ভের পালা। সে আসিয়া দেবীকে কহিল তুমি অন্যের বলে যুদ্ধ করিতেছ। তোমার আবার গৌরব কি? দেবী বলিলেন এই জগতে আমি ব্যতীত আর কি আছে? যাহা হউক আমারই শক্তি সকল আমাতেই লীন হউক। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি দেবীর শরীরে লীন হইলেন। ঘোর যুদ্ধের পর শুম্ভ নিহত হইল।

তখন দেবতারা সকলেই নিজ নিজ অধিকার পুনর্ব্বার পাইলেন এবং দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

মেধাঃ বলিলেন এই আমি আপনাদের নিকট মহামায়ার উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম। ইনি সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি ইহাঁ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাতেই সকল লীন হইবে। তোমরা উভয়ে ইহাঁর প্রভাবেই মুগ্ধ হইয়াছ ৷ ইহাঁর আরাধনা কর।

তখন নদীতীরে গিয়া দুই জনে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের পর তাঁহারা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

দেবী বর দিতে চাহিলে সুরথ পর জন্মে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং এ জন্মে হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। দেবী সেই বর দিয়া কহিলেন পর জন্মে সূর্য্যের ঔরসে সবর্ণার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুমি সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবে।

সমাধি তত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন দেবী তাঁহাকে সেই বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

আমরাও মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন।

প্রণব, ছবি ও গান।

(৩য় সংখ্যার ৯৯ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

অনেক সময় গায়ক কঠিন সমস্যায় পড়েন। শ্রোতা বলিয়া থাকেন যে গানের উদ্দেশ্যই যদি আনন্দ হয় তবে অর্থবিহীন সাতটা সুর ভাঁজিয়া লাভ কি? ফলকথা, অনেকে সুরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিন্তু সুরে কি করিয়া চৈতন্য হয় তাহা অনুভব করিতে পারেন না। কাজেই এতাদৃশ শ্রোতার নিকট আমার কল্পনার সত্যতা প্রচারিত না হইবারই কথা। হৃদয়ের ভাব স্বয়ং উপলব্ধি না করিলে প্রমাণ দ্বারা তাহা স্থির করা অসম্ভব। ভালবাসা হৃদয়ের একটী ভাব (Expression of the spirit) এ ভাব প্রকাশ করিতে গেলেই কতকগুলি ক্ষেত্রের সাহায্য লইতে হয় যেমন: (১) মাত্রা (Harmonious recurrence । (২) শব্দ (৩) বর্ণ (৪) ভাষা। যাঁহাদিগের চৈতন্য স্থূল দেহমাত্র অবলম্বন করিতে পারে তাঁহাদের পক্ষে আসঙ্গলিপ্সাই ভালবাসার প্রমাণ। এবম্বিধ লোক ভালবাসা প্রকাশ করিতে গেলে কোন বস্তুর স্থূল

দেহ লইয়া গুরুতর টানাটানি করিয়া থাকেন। যাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা স্থূল দেহ ছাড়িয়া বাক্যবিন্যাস দ্বারা স্বীয় ভাবের সার্থকতা প্রতিপাদন করেন। Poetry তাহা হইতেও উচ্চ। যাঁহারা হৃদয়ের ভাব বর্ণে প্রতিফলিত করিতে পারেন তাঁহারা Painter। কিন্তু কেবল সাতটী বর্ণ ফলাইলেই চিত্র হয় না। তেমনিই সাতটা সুর ভাঁজিলেই গায়ক হয় না এবং মধুর বাক্য বিন্যাস করিলেই কবিতা হয় না। ইহাদের সকলের মধ্যেই একটু সুর (Harmony) আছে। হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে কে গাহিয়া এই সুর প্রচার করে। কে যেন বলিয়া দেয় যে "এই মধুর কথা বলিলে আমার সত্য প্রচারিত হইবে" "এই প্রকারে সপ্তস্বর বিন্যাস করিয়া গাহিলে আমার আনন্দ প্রকাশ পাইবে" "এইরূপে সপ্তবর্ণ চিত্র পটে বিভাসিত করিলে আমার রূপ মনোহারী হইবে" ইত্যাদি। কবিবর Wordsworth বলিয়াছিলেন " There is a spirit in the woods" তেমনি গানেও একটী spirit আছে। এই spirit অর্থাৎ পুরুষের আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী সকলই মধুর এবং ঐ মধুরত্ব উপলব্ধি করিয়া আনন্দময় হওয়াই Evolution অর্থাৎ বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এই জীবন সংগ্রাম-সঙ্কুল পৃথিবীতে অলক্ষ্যে সেই চৈতন্যময় spirit বেসুরা সংগ্রামের মধ্যে সুরময় শান্তি স্থাপন করিতেছেন ; এবং সেই জন্য এক একটী ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ কর্ষণ পূর্ব্বক আর একটী দেহ সৃষ্টি করিতেছেন। এই সকল আনন্দময় দেহ কবির মধুর ভাষায়, চিত্রকরের চিত্রে ও গায়কের গানে ঢলিয়া পড়ে। যখন কোন ভাবুক সন্ধ্যাকালে সংসারের অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতির শান্তি পূর্ণ চিত্রে মন আবিষ্ট করেন তখন তাঁহার চৈতন্য কতকগুলি অস্ফুট বর্ণ ও শব্দে প্রথমতঃ সংলিপ্ত হয়। তখন যেন একটী উদাসভাব আসে। ইহা বহির্ম্মুখী মনদেহের সঙ্কোচন মাত্র। এই সময় পূর্ব্বস্মৃতিগুলি এক একবার উদয় হইয়া আবার অস্ত যায়, যেন কত দূর হইতে কত গান, কত মধুর কথা আসিয়া আবার ঢলিয়া যায়। ক্রমশঃ মনোমধ্যে কেমন একটী অন্ধকার আসিয়া পড়ে "Leaving the world to darkness and to me (Gray's Elegy)। চৈতন্য তখন কতকটা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় আমরা আত্মচৈতন্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সেই মুক্তাবস্থায় জীব চৈতন্য সূক্ষ্ম উপাদান সংগ্রহ

করিয়া সুন্দর কারণ দেহ রচনা করেন। ইহার নাম কল্পনা (Ideation) এবং ইহাই জীব দেহ আবর্ত্তনের (Evolution) কারণ স্বরূপ। ইহা আমরা দেখিতে পাই না। তবে যখন সেই আত্মহারা অবস্থা হইতে পুনরায় কিঞ্চিত নিম্নগামী হইয়া সুখের কল্পনা করিতে থাকি তখন ইহা বুঝিতে পারি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চৈতন্য এমন ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়াছিল যে সে স্থান হইতে শান্তিপূর্ণ বারতা লইয়া আসিয়াছে, ভালবাসার কথা লইয়া আসিয়াছে. আশা ভরসা লইয়া আসিয়াছে, নূতন বল লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এভাব আমাদি-গের নিকট ক্ষণস্থায়ী মাত্র ; কেননা অন্য একটী নিম্নগামী শক্তি আমদিগকে পুনরায় অন্য দেহে লইয়া যায়। সেই দেহে আমরা অন্যপ্রকার চৈতন্য প্রাপ্ত হই; তাহার ভাব স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ক্লেশ পরিপূর্ণ। এই গতিকে সঙ্গীতে অবরোহী কহে এবং উর্দ্ধ অর্থাৎ পরাগতিকে আরোহী কহে। এই জন্য

আমি, 'গারে সা' (অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ হও) স্বরূপ সঙ্কেত দ্বারা পূরবী রাগিণীর শেষ ভাগ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। (পন্থার গত সংখ্যার ৬৭ পৃষ্ঠা ; ৬৮ পৃষ্ঠায় ভ্রম ক্রমে " কর্ম্ম ফল ভোগ কর " লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া বই আর কিছুই নহে।) যেমন সন্ধ্যার ভাব Turner " Lake Como" নামক চিত্রপটে বিকাশিত করিয়াছে, রবীন্দ্র নাথ সন্ধ্যাসঙ্গীতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তেমনি বিখ্যাত গায়কগণ সপ্তস্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পূরবী রাগিণীতে গাইয়া থাকেন।

সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতির ভাষা অতি সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ এদেশে চিত্রের সমধিক চর্চ্চা না হওয়াতে অনেক ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। (যেমন "Perspective tone, shade, light প্রভৃতি।) দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতের চর্চ্চা অনেকে করেন না! অতএব সঙ্গীত-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব স্বতঃই দুরূহ হইয়া পড়ে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতির সম্বন্ধ বিশদ-রূপে আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে অনেক কথা বলিতে হয়। একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকায় তাহার বিস্তৃতি করা অসম্ভব! সুতরাং কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ভাব লইয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা সরল ভাষায় আলোচ্য বিষয়ের

মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসুক। মস্তিষ্কের ধর্ম্ম এই যে হৃদয়ের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিতে চাহেনা। ভাব হৃদয় উদ্ভূত। (Reasoning) বিজ্ঞান মস্তিষ্কের ধর্ম্ম। যিনি যতটুকু উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন তিনি ততটুকু প্রেমিক (spiritual); তিনি ততটুকু বিজ্ঞানের চক্ষে অন্ধ (Blind)। এই জন্য (Faith) অনন্যা ভক্তি, (love) প্রেম প্রভৃতিকে blind কহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ তর্ক দ্বারা প্রেম সংস্থাপিত হয় না। তবে গোল মিটাইবার জন্য অনেকে spiritual love প্রভৃতি বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসটী একটী Compromise between intellect & emotion; অর্থাৎ প্রেমিক না হইয়াও মস্তিষ্কের ঘোর আন্দোলন হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস করিয়া লই। এরূপ বিশ্বাসে আনন্দ হয় না। তবে মোটামুটী সরল ভাষায় কয়েক কথা বলিলে সামান্য উপলব্ধি হয় সত্য। অতএব নূতন কোন রাগিণীর আলাপে রত না হইয়া উপক্রমণিকা স্বরূপ এস্থলে কতকগুলি কথা বলিলে আমার আলোচনার উদ্দেশ্য পরে অনেকটা অনুভূত হইতে পারিবে।

১। কূটদার্শনিক তত্ত্ব অর্থাৎ মায়াবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুধাবনা করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ ইহাই বুঝা যায় যে মানব দেহে তিনটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। প্রথম স্থুল (gross matter), দ্বিতীয় সূক্ষ্ম (subtle matter) অর্থাৎ বাসনাময় কামদেহ। ইহা স্থুলদেহের সহিত Nervous System দ্বারা সংযুক্ত। অর্থাৎ প্রাণরূপী শক্তির (force) সাহায্যে স্পন্দন উপস্থিত করিয়া আমরা স্বীয় বাসনার অনুরূপ কর্ম্ম করিতে পারি। এই শক্তির গতি বহির্ম্মুখী (Centrifugal) অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ের দিকে ধাবমান। বৈষয়িক বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি এই শক্তি পরায়ণ। ইহার অন্য নাম অপরা শক্তি তৃতীয় কারণদেহ; ইহার এক অংশ অতি সূক্ষ্ম উপাদানে সংগঠিত এবং অন্য অংশ স্বরূপ। ইহার শক্তি অন্তর্ম্মুখী (centripetal) কিম্বা পরাশক্তি। এই দুইটী শক্তিই যে মানবদেহে আছে তাহা Higher reason, self control, self sacrifice প্রভৃতি বৃত্তি গুলি অনুধাবনা করিয়া দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এই শরীরের স্বরূপ অংশে ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাব সকলের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে অবস্থিত হইলে আমরা আনন্দময় হই। উভয় শক্তির সন্ধিস্থলকে অন্তঃকরণ

কহে। পরাশক্তির অন্য নাম দৈবীশক্তি, গায়ত্রী, গৌরী, উমা প্রভৃতি। উপনিষদে এই শক্তি প্রাণ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে এবং যোগীগণ এই শক্তির সাহায্যে প্রাণের বহির্ম্মুখী স্পন্দন দমন করিয়া থাকেন। প্রাণের একটা গতি সংবরণ করিতে গেলে যে অন্য একটা প্রাণশক্তির সাহায্য আবশ্যক ইহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পারে যথা "প্রাণ রাখিতে হলে যে প্রাণান্ত, জন্মিবারে চাইত কেবা আদি আগে সেটা জা'ন্ত" (দ্বিজেন্দ্র বাবুর গান)। এই কারণ শরীরের অরূপ ক্ষেত্র স্বর্গ কিম্বা দেবযান (Devachan) বলিয়া খ্যাত। যাঁহারা ধর্ম্মবীর ও মুক্তাত্মা তাঁহারা সেই স্বর্গের আদর্শনীয় অশ্রবণীয় মহিমা নানাবিধ রূপে মানবের মনোময় দেহে প্রচার করেন। Esoteric Philosophy এই তিনটী দেহকে পঞ্চভাগে বিভাগ করিয়াছেন যথা Budhi, Manas, Kama-manas, Ethereal double and gross। এ সকল উপাধি মাত্র। spirit এই দেহ সকল যুক্ত হইয়া যে চৈতন্য লাভ করেন তাহা প্রত্যেকটীতে এক এক ভাব ধারণ করে এবং এই ভাব সকল ক্রমে ক্রমে অরূপ দেহস্থিত দৈবী-প্রকৃতির (অর্থাৎ spiritএর উর্দ্ধগামীর শক্তির) সাহায্যে সংস্কৃত হইয়া আনন্দ-ময় রূপ ধারণ করিলে spiritএর স্বরূপ অনুভব করিতে আমরা সমর্থ হই। যেমন যৌবনাবস্থায় আমরা ভাবী প্রেমময়ীর একটা রূপ গড়াইয়া লই ও তাঁহার সপ্ত স্বরা মধুর কণ্ঠের গান অনেকটা কিরূপ হইবে তাহা কল্পনা করিয়া লই। সেইরূপ কারণ দেহের স্বরূপ অবস্থার spiritকে আমরা বর্ণ ও শব্দ বিশিষ্ট করিয়া নিজের anthromorphic idea অনুসারে একটা অভীষ্ট দেবতার স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাতে (অর্থাৎ স্বীয় উচ্চভাবেই) মগ্ন হই। ইহা দ্বৈত উপাসনা। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন অরূপক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদেহ অবস্থায় আত্ম উপাসনা লোপ পাইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। তাহাকেই আত্মা কহে।

২। এই দেহ রচনাই সৃষ্টির গূঢ় লীলা। যাঁহার যতদূর দেহক্ষেত্র সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত তিনি ততদূর সমঝদার। যাঁহারা কেবল Matter এবং Force স্বীকার করেন, কিন্তু Spirit স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই force অর্থাৎ শক্তির গতি (motion) দ্বিবিধ এবং এই দুইটীর strug-gleএ জড়জগতে দেহের (Evolution of form) আবর্ত্তন হয়। যতদিন

জীবদেহ মনুষ্য উপাধি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই Dual শক্তির অস্তিত্ব সে নিজে অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ "আমি কে" "আমার কি করা উচিত" এ সব সন্দেহ উপস্থিত হয় না। এই দেহ আবর্ত্তন অর্থাৎ ক্ষেত্র কর্ষণের মূলে কোন একটা শক্তিময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় তত্ব রহিয়াছে, যাহার ক্রিয়া-শক্তির প্রভাবে মানবের উচ্চভাব যেন স্বভাবতঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আপনি ঈশ্বরই মানুন আর প্রকৃতিই মানুন দেখিতে পাইবেন যে এই impelsive ideation যাহা দ্বারা মানব ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে তাহার মূর্ত্তি ত্রিবিধ অর্থাৎ জ্ঞান (intelligence or motion), ভক্তি কিম্বা আনন্দ (Devotion & harmonious bliss), এবং শক্তি (will un-fettered by Desire on purposive selfish action). ইহার একটীর ও অভাব হইলে মানব সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করে না।

৩। এই উৎকর্ষ যাঁহারা যত লাভ করেন, তাঁহারা ততই spirit নামক কারণে যুক্ত অর্থাৎ তাঁহারা যোগী। তাঁহারা স্বীয় পরাশক্তির বলে প্রথমতঃ প্রাণের বাসনা ও স্পন্দন সংবরণ করেন এবং সদাবস্থা প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহারা সেই শক্তির বলে স্বীয় কারণ দেহ রচনা করিয়া এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া উপাসনা নামক অভ্যাস সাহায্যে আনন্দময় হন। শেষে তাঁহারা দ্বৈত আস্থা ছাড়াইয়া সেই শক্তির বলে জ্ঞানময় হইয়া থাকেন। Will, Devotion, Higher reasoning প্রভৃতির কথা উক্ত ত্রিবিধ প্রকৃতির অন্তর্গত।

৪। যে উপায় অর্থাৎ শক্তির গতি দ্বারা প্রথমতঃ willএর উৎকর্ষ হয় তাহা যোগ শাস্ত্রের একঅংশ। প্রাণায়াম মাত্র প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে।

৫। যে উপায় দ্বারা শক্তিকে (Energy) কারণদেহের স্বরূপ অংশে চালিত করিয়া ভক্তি আনন্দ প্রভৃতি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায়, উপাসনা, গান, ছবি, প্রভৃতি তাহারই অন্তর্গত। ইহাই আমাদিগের আলোচ্য। ইহা হৃদয়স্থানীয়।

৬। যে উপায়ে শক্তিকে জ্ঞানাংশে চালিত করিয়া বেদান্ত প্রদর্শিত পথে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাও আমাদের আলোচ্য নহে।

৭। ফল কথা আমরা আপাততঃ নীরস ও ক্লেশকর দুইটী পথ ছাড়িয়া

একটু হৃদয়ের আনন্দ-বিজ্ঞান লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ দেহের উপাদান সাতটী, স্বরও সাতটী, বর্ণ বাস্তবিক তিনটী ও তাহারই সংমিশ্রণে সাতটী। সুগায়ক ও সুচিত্রকর হইতে যদিও দৈবী প্রকৃতির উপরোক্ত তিনটী ভাব বিভিন্ন কিন্তু তাহারা পরস্পরে যুক্ত অর্থাৎ একটী অন্যটির সাহায্যকারী। অর্থাৎ জড় জগতে (সূক্ষ্মই হউক বা স্থূলই হউক), বিকাশ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই মূলে শক্তি আধার স্বরূপ হইয়া থাকে। Energy এবং motion না থাকিলে মানসিক কোন ক্রিয়াই স্ফূরণ হয় না। মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ মানসিক দেহস্পন্দন যে নিয়মে আবদ্ধ, সকল জড়েরই সেই নিয়মে আবদ্ধ। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ইন্দ্রিয় সংযম।

হিন্দু শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্র মতে ইন্দ্রিয় সংযম ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ, সাধকের প্রধান সাধন। ভগবান্ মনু ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে ইন্দ্রিয় সংযমের উল্লেখ করিয়াছেন।

"ধৃতিঃক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
হ্রীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, চৌর্য্যাভাব, শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, লজ্জা, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ। গীতায় ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে ইন্দ্রিয় সংযমের গণনা করিয়াছেন।

"বশেহি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

অর্থাৎ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ, যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে।

সাধকের পক্ষেও ইন্দ্রিয় সংযম অত্যাবশ্যক। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগ উপদেশ করিয়া ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন

"তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

'চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া একাগ্রমনে আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতে হইবে।' অতএব ইন্দ্রিয় সংযম আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আর্য্য ঋষিগণ দুষ্ট অশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের তুলনা করিয়াছেন। দুষ্ট অশ্ব যেমন সারথির বলগা না মানিয়া আপন ইচ্ছামতে বিপথে ধাবিত হইয়া আরোহীকে বিপন্ন করে, সেইরূপ প্রবল ইন্দ্রিয়গণ বিবেকের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বিষয়ের অভিমুখে ধাবমান হইয়া জীবকে অবসন্ন করে। এই ইন্দ্রিয়াশ্বকে সংযত করিবার উপায় কি?

ইন্দ্রিয়ের গতি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখ। ইন্দ্রিয়ের প্রবাহ স্বতঃই বিষয়ের দিকে প্রসৃত হয়। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ইন্দ্রিয় সকলকে পরাক্ (বহির্ম্মুখ) করিয়াছেন।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণোৎ স্বয়ম্ভুঃ।"

গীতাকার ও বলিয়াছেন

"ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।"

'প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রাম বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করে!' এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিয়া ইহাদিগের প্রবল বেগ রোধ করিতে সমর্থ হন না। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাস পুরাণে বিরল নহে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা মেনকার রূপের ঘোরে কিরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রূপমোহে বিল্বমঙ্গলের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। নিত্য জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত দুই একটা বোধ হয় সকলেরই গোচরে আসিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয় সংযম কি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কঠিন হইলেও ইহা একবারে অসাধ্য নহে; তবে বহু যত্ন ও আয়াস সাধ্য বটে। কি উপায়ে ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনা যায় তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কেন ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ এবং কেনই বা এত প্রবল ও প্রমাথী তাহা জানা উচিত।

আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইতে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইরূপ সংযোগকে "মাত্রাস্পর্শ" বলে। মাত্রাস্পর্শের ফলে কোন কোন স্থলে সুখ এবং কোন কোন স্থলে দুঃখ অনুভূত হয়। বিজ্ঞানের

সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিষয়ের স্পন্দন ইন্দ্রিয়ে সংক্রামিত হইলে, সেই স্পন্দন ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হয় এবং তাহার ফলে আমাদের চিত্তে অনুভূতি(Perception) উৎপন্ন হয়। বিষয় হইতে সংক্রামিত স্পন্দন যদি অনুকূল বা সমঞ্জস (harmonious) হয়, তবে তজ্জাত অনুভূতি সুখের আকার ধারণ করে; আর সেই স্পন্দন যদি প্রতিকূল বা অসমঞ্জস (Disharmonious) হয়, তবে তজ্জাত অনুভূতি দুঃখের আকার ধারণ করে। রাত্রির ঘনান্ধকারের পর পূর্ব্বাকাশে যখন উষার রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠে, তখন সেই আলোকের সংস্পর্শে আমাদের চক্ষু যে ভাবে স্পন্দিত হয় তাহাতে সুখের অনুভূতি জন্মে। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফাটিয়া যখন করাল বিদ্যুদগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহার আঘাতে আমাদের নেত্রে যে স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তাহাতে দুঃখের অনুভূতি জন্মে। এইরূপে প্রত্যেক মাত্রাস্পর্শই হয় সুখ নয় দুঃখের জনক হইয়া থাকে।

সুখ আমাদের অনুকূল এবং দুঃখ প্রতিকূল। সেই জন্য স্বতঃই সুখের প্রতি আমাদের রাগ এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষ আছে। যে স্পন্দন সুখজনক তাহা আমেদের ইষ্ট এবং যে স্পন্দন দুঃখজনক তাহা আমাদের দ্বিষ্ট। মানবের যেমন অনুভূতি আছে সেইরূপ স্মৃতিও আছে। সেই জন্য মানুষ যে বিষয়ের সংসর্গে একবার সুখ অনুভব করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। এবং সেই বিষয়ের সংসর্গ যদি পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়, তবে তাহার সংস্কার স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। একজন অসভ্য মানব হঠাৎ একদিন মধুপান করিল। মধুর সহিত তাহার জিহ্বার সংসর্গের ফলে সে একটা নূতন সুখ অনুভব করিল। যদি তাহার স্মৃতিশক্তি প্রবল হইয়া থাকে, তবে এই মধুপান জনিত সুখের সংস্কার তাহার চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া গেল। আর যদি স্মৃতি এখনও দুর্ব্বল থাকে, তবে আরও কয়েকবার রসনার সহিত মধুর মিলন ঘটিবার পর উক্ত সংস্কার সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জ্ঞান তাহার মনে অস্পষ্টভাবে নিহিত থাকাতে, সে বুঝিল যে যখনই জিহ্বা ও মধুর সংসর্গ ঘটিবে, তখনই তাহার উক্তরূপ সুখানুভব হইবে। এই ধারণার বশে এবং সে সুখের প্রতি রাগযুক্ত বলিয়া অতঃপর চেষ্টার দ্বারা সে মধুর সহিত জিহ্বার সংসর্গ ঘটাইতে লাগিল। এইরূপ অন্যান্য স্থলে ও সে সমঞ্জস

স্পন্দন জনিত সুখাস্বাদন করিয়া কয়েকটী বিষয়কে সুখের আকর বলিয়া স্থির করিল। অন্যপক্ষে, অন্য কয়েকটী বিষয়ের অসমঞ্জস স্পন্দনে দুঃখানুভব করিয়া সে ঐ ঐ বিষয়কে দুঃখের হেতু বলিয়া সাব্যস্ত করিল। এইরূপে সে জগতের বস্তু নিচয়কে অনুকূল ও প্রতিকূল এই দুই মহা কোটিতে বিভক্ত করিল এবং তাহার ফলে কয়েকটী অনুকূল বস্তুতে তাহার রাগ ও কয়েকটী প্রতিকূল বস্তুতে তাহার দ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। সুখের লালসায় সে অনুকূল বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল এবং দুঃখের ভয়ে প্রতিকূল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। এই-রূপে রাগ ও দ্বেষ হইতে তাহার ইন্দ্রিয়ের, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সিদ্ধ হইল। যে বিষয়ের প্রতি রাগ, যাহা অনুকূল বিধায় সুখের হেতু, তৎ-প্রতি ইন্দ্রিয় ধাবিত হইতে লাগিল এবং যে বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, যাহা প্রতিকূল বিধায় দুঃখের হেতু, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাবৃত্ত হইতে লাগিল।

এই যে রাগদ্বেষ জনিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি সঞ্চার ও প্রত্যাহার, ইহা যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের একটামাত্র জীবন ব্যাপিয়া ঘটিতেছে, তাহা নহে। ইহা যুগ যুগান্তে, জন্ম জন্মান্তরে প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে। তাহার ফলে অনুকূল বিষয়ের প্রতি রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি দ্বেষ ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছে। এই জন্য যখনই কোন অনুকূল বিষয় মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ব্বানুভূত সুখাস্বাদনের প্রত্যাশায় ইন্দ্রিয়, সঞ্চিত সংস্কারবশতঃ স্বতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং প্রতিকূল বিষয়ের সম্মুখীন হইলে সংস্কাররূপে সঞ্চিত দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয় স্বতঃই তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব পূর্ব্বানুভূত সুখের প্রত্যাশা, এবং সুখের হেতু জ্ঞানে বিষয়ের প্রতি অনুরাগই, ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ গতির কারণ। এই প্রবাহকে অন্তর্ম্মুখ করিবার উপায় কি?

সারথি যেরূপ বলপ্রয়োগ দ্বারা দুষ্ট অশ্বকে সংযত করে, সাধকও সেইরূপ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়দিগকে বশে আনয়ন করিতে পারেন। পর্ব্বত যেমন আপনার ভিত্তির উপর সুদৃঢ় থাকিয়া ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাতের আক্রমণ ব্যর্থ করে, সাধকও সেইরূপ আপনার আত্মার উপর নির্ভর করিয়া কাম ক্রোধ-জনিত বেগ ধারণ করিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ আপনার বৈরশক্তি প্রতিহত

দেখিয়া অশ্ব অবশেষে বশীভূত হয় এবং সারথির বল্গা মানিয়া উদ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে শিখে। ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের দিকে ধাবিত হইলেই যদি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংহৃত করা যায় তবে ক্রমশঃ অভ্যাস বশে তাহারা অধীনতা স্বীকার করে। এরূপ করা প্রভূত আয়াস, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। আর ইহার অভ্যাসও অন্তরায় শূন্য নহে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে সাধক কায়ক্লেশে ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ প্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু মনের বাসনা সংযত করিতে পারে নাই। চিত্তের মধ্যে বাসনার প্রচণ্ড আস্ফালন; আর চিত্তের বাহিরে বাসনার ক্ষোভকারী ধৈর্য্যের বাঁধ। এই মর্ম্মান্তিক আহবে অনেক সময় বাসনার প্রবাহ, বাঁধকে উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। সে বেগের বশে সাধকের কষ্টার্জ্জিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ভাসিয়া যায়। বাসনার সঙ্কোচ না করিয়া অসংযত চিত্তে ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক সংযম কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ ব্যক্তিকে গীতায় মিথ্যাচার বলা হইয়াছে।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

'যে মূঢ় ব্যক্তি বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়ের অনুধ্যান করে, তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায়।' মনই বাসনার রঙ্গ ভূমি; ইন্দ্রিয় সকল নায়কের আজ্ঞাকারী ক্ষুদ্র নট মাত্র। বাসনা ক্ষয় ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় অসাধ্য ব্যাপার। অতএব কিসে, বাসনার সঙ্কোচ হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বাসনার উচ্ছেদ——একবারে ক্ষয়——অতীব কঠিন সাধন। কিন্তু তাহার সংকোচ বিধান করা ততটা দুঃসাধ্য নহে।

বাসনা সঙ্কোচের প্রধান উপায় বৈরাগ্য। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বিষয়ের দোষানুদর্শন বলিয়াছেন। বিষয় ক্ষণভঙ্গুর; ইহাতে স্থায়ী সুখ হয় না। বিষয়-জনিত সুখ দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র। তাহা প্রথমতঃ অমৃতের মত বোধ হয় কিন্তু পরিণামে বিষপূর্ণ, সুখের আস্বাদনে আদিতে মোহ এবং অবসানে অবসাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রকারগণ জীবকে বাসনা বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ উপদেশের মর্ম্ম যখন চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখন হৃদয়ে বৈরাগ্যের অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়।

যে তু সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখ যোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

'হে কুন্তী পুত্র! সংস্পর্শ—(বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ) জনিত যে সুখ তাহা দুঃখের নিদান। ঐ সুখের আদি অন্ত আছে, অতএব উহা ক্ষণস্থায়ী। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাতে আকৃষ্ট হন না।' রাজা যযাতি পুত্রের নিকট তিক্তাধিক যৌবন ব্যবহার করিয়া অনেক বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও অবশেষে অবসাদ পীড়িত হইয়া বলিতে হইয়াছিল

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবা ভি বর্দ্ধতে॥

কামীর কামনা কখনও উপভোগে শান্ত হয় না। কিন্তু ঘৃত সংযোগে অগ্নির মত বিষয় সংযোগে আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

বৈরাগ্য উপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত উপায়—বিবেক অভ্যাস করা। বিবেক অর্থে আত্মা ও বিষয়ের—পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ জ্ঞান। যদি আত্মাকে শরীর মন হইতে পৃথক জানা যায় যদি সুখ দুঃখ প্রকৃতির বিকার মাত্র বুঝা যায়, যদি সে সুখ দুঃখের সহিত আত্মাকে সম্পর্কহীন উদাসীন বুঝিতে পারা যায়, তবে আর বিষয় সম্বন্ধে রাগ দ্বেষে৷ অবসর থাকে না। সে অবস্থায় সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। তখন হৃদয়ে যথার্থ বৈরাগ্যের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহ মেবচ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।

এই অবস্থায় সাধক দুঃখের উপস্থিতিতে উদ্বেগ রহিত এবং সুখাগমে স্পৃহাহীন হন। জ্ঞানীব্যক্তি গুণের বিকার ইন্দ্রিয়, গুণের আধার বিষয়ে, সংযুক্ত হইতেছে এই জানিয়া আসক্ত হয়েন না।

যিনি যোগ যুক্ত তিনি গুণ ত্রয়ের সংক্ষোভ (সত্ত্বগুণের ক্রিয়া প্রকাশ, রজো

গুণের ক্রিয়া প্রবৃত্তি এবং 'তমো গুণের ক্রিয়া মোহ') উপস্থিত হইলে তাহার দ্বেষ করেন না এবং তাহাদের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে পুনঃ প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না।

তত্ত্বজ্ঞানী ইন্দ্রিয়মাত্র বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে এই ধারণা বশে 'আমি নিষ্ক্রিয় কিছুই করিতেছি না' এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন।

ইহা সাংখ্যযোগের কথা। জ্ঞানযোগী এইরূপ অবস্থায় উপনীত হন। তখন তাঁহার দ্বৈত ভাব দূর হয়—সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমান জ্ঞান হয়। যদি সুখ দুঃখই তুল্য বোধ হয়, তবে আর কোন কিছুই অনুকূল বা প্রতিকূল থাকিতে পারে না। তবে আর কিসের আকর্ষণে ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখে ধাবিত হইবে? এইরূপে ইন্দ্রিয়ের স্রোত বিষয় ছাড়িয়া অন্তর্ম্মুখে আত্মার দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ সাধক আত্মাতেই তৃপ্ত হইতে আরম্ভ করেন। সে তৃপ্তিতে বিষয় রসের অনুমাত্র সংস্পর্শ থাকে না। সাধক আত্মারাম হয়েন। তখন কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংহৃত করিয়া রাখে, তিনিও সেই রূপ বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহৃত করিয়া রাখেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানিব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

'তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যিনি কূর্ম্মের মত ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে সংহৃত করিয়া রাখেন।' এই কূর্ম্মের দৃষ্টান্তটী প্রণিধানের যোগ্য। কূর্ম্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংহৃত করিয়া রাখে বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহা আবার বাহির করিতে পারে; সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞানী ইন্দ্রিয় সকলকে একবারে উচ্ছেদ করেন না, কিন্তু সংযত ও সংহৃত করিয়া রাখেন। বিষয়ের আকর্ষণে সেই ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ প্রবাহ হয় না; কিন্তু যখন জগতের হিতার্থে বিশ্বব্যাপারে নিয়োজিত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আবশ্যক হয়, তখন তিনি রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইয়া, বশীভূত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করেন। তজ্জন্য যে মাত্রাস্পর্শ ঘটে তাহা বাসনাতাড়িত, বিষয়াকৃষ্ট, উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খল বেগ জনিত নহে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা অতি উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মযোগ। এইরূপ কর্ম্মযোগীকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"

যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন তিনি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত, বশীকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

এই আত্মপ্রসাদ পরাশান্তির নামান্তর মাত্র। ইহা ভূমানন্দের পূর্ব্বরূপ।

উল্লিখিত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সংযমের আর একটী সহজ ও উৎকৃষ্টতর প্রণালী আছে। তাহার নাম ভক্তিযোগ। মধুমক্ষিকা যেমন মধু লোভে পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করে, আমাদের ইন্দ্রিয়সকলও সেইরূপ সুখের লালসায় বিষয়ে বিষয়ে প্রধাবিত হয়। বিষয়ের সংসর্গে যে সুখ, যদি তাহার অপেক্ষা উচ্চতর সুখের সন্ধান তাহাকে কোথাও বলিয়া দেওয়া যায়, তবে সে কি আর তুচ্ছ বিষয়সুখের জন্য লালায়িত হয়? যেমন সূর্য্যের আলোকে জোনাকীর ঝিকিমিকি নিবিয়া যায়, সেইরূপ সেই বৃহত্তর সুখের তুলনায় ক্ষুদ্র বিষয়সুখ আর তাহার মনে ধরে না। যেমন উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হরিণী দূরাগত বংশীর মোহন রবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতেই একতান হয়—কানন, নদী, শষ্পাঙ্কুর, ব্যাধের জাল, সমস্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ সাধক সেই মহত্তর সুখের আস্বাদন পাইয়া তাহাতেই তন্ময় হয়—মাত্রাস্পর্শ জনিত বিষয় সুখ তাহার আর স্মরণ থাকে না, এই বৃহত্তর মহত্তর সুখ কি?

যে অত্যন্ত সুখের ছায়া লইয়া বিষয় সুখের সুখত্ব, যে ভূমানন্দের আভাস লইয়া পার্থিব আনন্দের অস্তিত্ব, সেই সুখ সেই আনন্দের উৎস, মন্দাকিনী ধারার ন্যায়, যাঁহার শ্রীচরণ হইতে উৎসারিত হইতেছে, সেই ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিলে ঐ মহত্তর ও বৃহত্তর সুখ অনায়াসলভ্য হয়। ভগবানের একটী নাম হৃষীকেশ; তিনি হৃষীকের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়ার্পণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করা যায়। যদি চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিতেই হয়, তবে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের মত ইন্দ্রিয়ের আর কি সদ্ব্যবহার আছে? যদি শ্রবণ, শব্দ না শুনিয়া থাকিতে না পারে, তবে তাহাকে তাঁহার সুধাময় নাম শুনাইবার অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠতর বিনিয়োগ হইতে পারে? যদি রসনা বাক্য উচ্চারণ করিবেই করিবে, তবে সে কেন তাঁহারই গুণগানে ব্যাপৃত থাকুক না! এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারই ভগবানে অর্পণ

করা যায়। এবং সেরূপ করিলে যে বিপুল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় তাহার তুলনায় তুচ্ছ বিষয়ানন্দ, সূর্য্যের তুলনায় জোনাকীর ঝিকিমিকি বই আর কি? এই সুখের সন্ধান পাইলে বহির্ম্মুখ গতিশীল ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়িয়া অন্তর্ম্মুখে তাঁহারই পাদপদ্মে লয় হইবার জন্য ধাবিত হয়। তখন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিষয়ের দিকে প্রবাহিত করা কঠিন ব্যাপার হয়। মধুকর যখন ফুলে ফুলে চঞ্চল ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া কমলের অভ্যন্তরে নিস্পন্দ নিঃশব্দে মধুপানে নিমগ্ন হয়, তখন অজস্র বরষা বায়ুতেও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয় সংযমের ইহাই সুগম ও শ্রেষ্ঠ উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে আর চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রবাহকে নিরুদ্ধ করিতে হয় না। ইন্দ্রিয় আপনিই বিষয় ছাড়িয়া ভগবানে নিবিষ্ট হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শক্তি-সঞ্চার ও শক্তি-সংহার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ডে মেস্‌মার সাহেব প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে কোন ব্যক্তির স্পর্শশক্তি বিলোপ করিতে পারিতেন। তখনও স্পর্শ ও সংজ্ঞাবিলোপী ক্লোরোফর্ম নামক মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই অঙ্গচ্ছেদাদি দুরূহ শস্ত্রোপচার করিতে হইলে, হতভাগ্য রোগীগণ ভীষণ যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইত। মেস্‌মার সাহেবের প্রক্রিয়া জন সাধারণে প্রচার হইলে, প্রথম প্রথম চিকিৎসক মণ্ডলী তাহাতে বড় একটা আস্থা প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাঁহারা স্বচক্ষে তাঁহার প্রক্রিয়া দেখিলেন ও তাঁহাদের দুই এক জন রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া বস্তুতই তাহাদের স্পর্শ শক্তির লোপ হইল বুঝিলেন তখন সাদরে তাঁহার উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া

তাহাকে "মেস্‌মেরিজম্‌" আখ্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু পরে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হইলে, মেস্‌মেরিজম্‌ এর আর তত আদর রহিল না।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রেড নামক জনৈক শল্য চিকিৎসক মেস্‌মেরিজম্‌এর উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া, তাহার নূতন নামকরণ করিলেন। "হিপ্‌নটিজম্‌" এক্ষণে কেবল স্পর্শ লোপ করিতে ইহার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপখণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রে আজ কালি, অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রোগ হিপ্‌নটীজমের সাহায্যে আরোগ্য করা হইতেছে। ফ্রান্সে দুইটী স্থানে ইহা নিয়মিতরূপে উৎকট ব্যাধি মোচন উদ্দেশে অধুনা অবলম্বিত হইতেছে। স্কুল এট্‌ নান্সি ও স্কুল এট্‌ সন্টপিট্রে নামক দুইটী রোগীনিবাস স্থাপিত হইয়া শতশত দুঃসাধ্য রোগী আরাম হইতেছে। ইহার একতরের অধ্যক্ষ ভিষক্‌প্রবর ডাক্তার শার্কো। এই উভয় স্থলে, চিকিৎসা প্রণালী কিছু পার্থক্য আছে।

মেস্‌মার সাহেব রোগীকে হস্ত দ্বারা ঝাড়িয়া তাহার অভিষ্ট অঙ্গের স্পর্শলোপ করিতেন, কিন্তু আজ কাল আর ঝাড় ফুঁক্‌ করিবার প্রথা নাই। রোগীকে শয়িত কি উপবিষ্ট রাখিয়া তাহার মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে একটী সমুজ্জল কোন পদার্থ এমন ভাবে স্থাপিত করিয়া রাখা হয় যে রোগী তাহারদিকে একদৃষ্টে চাহিতে গেলে, চক্ষুতে টান পড়ে। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ চাহিতে চাহিতে রোগীর নিদ্রাবেশ হয়, তৎকালে চিকিৎসক একমনে দৃঢ়তাসহকারে এই অনুজ্ঞা করেন যে নিদ্রা ভঙ্গের পর সে তাহার আর কোন রোগই নাই, দেখিবে। ইহাতে কেহবা একদিনেই রোগমুক্ত হয় কাহারও বা দুই তিন দিন লাগে।

হিপ্‌নটিজম্‌ দ্বারা কেবল স্পর্শ লোপ কি রোগ মোচন করা হয় এরূপ নহে। দুষ্ট ও পাপাশয় ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা স্ব স্ব পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় লাভ করিয়াছে, অথচ তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয় থাকে না। ইউরোপবাসীগণের ধারণা এই যে জ্ঞানার্জ্জনে মানব মাত্রেরই অধিকার সমান, সুতরাং তাঁহারা কোন শাস্ত্র গুহ্য বা গুপ্ত রাখেন না, এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া বিদ্যার্থী হইলেই তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার ফলে আজি ইউরোপ সন্ত্রস্ত; ডাইনামাইট প্রভৃতি মহাকস্ত্রবানের রহস্যোদ্‌ঘাটন হওয়াতে, আজি রুসিয়ার জার

নিহত, কালি অন্য কোন সম্রাট বিপন্ন হইতেছেন। তাহার পর এই হিপনটিজমের রহস্য. যাহাকে তাহাকে শিক্ষা দেওয়ায় পাপাশয় ব্যক্তিগণ কত সতীসাধ্বীর সর্ব্বনাশ করিতেছে; এমন কি কত লোককে গুপ্তহত্যা করিয়া রাজদণ্ডকে উপহাস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই বলি, পূজ্যপাদ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ যে অধিকার ভেদে শিক্ষা ভেদের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা কতদূর যুক্তি ও ব্যবহার সঙ্গত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধু সচ্চরিত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন হিপনটীজম্ দ্বারা জগতের হিত সাধন করিতেছেন, তেমনি বিপরীত গুণশালী ব্যক্তিগণের হস্তে ইহা দ্বারা মহান অনিষ্টও সাধিত হইতেছে।

প্যারী নগরের বিনে ও ফেরী নামক দুই জন বহুদর্শী চিকিৎসক "সাইকোপ্যাথী, অর ট্রিটমেণ্ট বাই শ্লীপ এণ্ড সাজেশ্চন" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কিরূপে হিপনটীজম্ দ্বারা রোগীর নিদ্রাকর্ষণ করিয়াছে এবং নিদ্রাভঙ্গের পর রোগ আরাম হইয়াছে দেখিবে, এই কথাগুলি তাহাকে বলিয়া দেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, রোগের দ্বারা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগকে আশা ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য বলিয়া, তাহাদের, হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে পারিলে, অতি দুর্জ্জয় রোগও আরোগ্য হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন, যে কোন তীর্থ স্থানে গিয়া অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরাও, যৎসামান্য বস্তু দ্বারা নিরাময় হইয়া থাকে তাহা জগতের সমস্ত সভ্য জাতিই অবগত আছেন। এই সকল তীর্থে গিয়া ডাক্তার কবিরাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রোগীও কেহ কেহ আরোগ্য হইয়াছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া, ঐরূপ অন্যান্য রোগীরা অথবা তাহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া অনশনে একাগ্র ও তদ্গত চিত্তে "হত্যা" দিয়া পড়িয়া থাকে। ইহাতে তাহারা নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা হিপনোটাইজড্ হইয়া পড়ে এবং কেহ বা স্বপ্নযোগে কোন সামান্য বস্তু সেবন করাইবার আদেশ পাইয়া আনন্দচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট মত কার্য্য করে ও অচিরে রোগ মুক্ত হয়।

আমাদের আর্য্যাবর্ত্তে এই শক্তি সঞ্চার ও শক্তি নিরোধ পদ্ধতি যে কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে এক্ষণে ইহা সমাজের নিম্নতম স্তরে অজ্ঞ, অশিক্ষিত "চাষা ভূষো" ব্যক্তিদেরও

অনিগত আছে দেখিয়া ইহা যে কত প্রাচীন, তাহার কতক অনুমান করা যাইতে পারে। পরমারাধ্য আর্য্য ঋষিগণ কেবল যে মনুষ্যগণকে শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাহাদের ইহকালের মঙ্গল বিধান করিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা মৃচ্ছিলাদিতেও শক্তি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার স্পর্শে আজিও কত শত ব্যক্তি পূত পবিত্র ও নিরুজ হইতেছে।

সৃষ্টিপ্রকরণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ইহার মূলে অনন্ত শক্তি নিহিত থাকিলেও মুখ্যতঃ তিনটী শক্তিই প্রবল। ইচ্ছা, জ্ঞান, ও ক্রিয়া এই তিনটীই সেই মুখ্য শক্তি। অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দ্বারা তপস্যা করিলে এই তিনটী শক্তিই সম্যক বর্দ্ধিত করা যায়। যাহারা চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা বিধৌত কল্মষ হইয়া শক্তি সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের প্রভূত ও অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। পক্ষান্তরে স্বার্থান্ধ প্রভূত কামী ও সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহার ফলে তাহাদিগকে দেহান্তে রুদ্র পিশাচ হইয়া থাকিতে হয়।

শক্তি সঞ্চারের চতুর্ব্বিধ উপায় দৃষ্ট হয়। (১) দর্শন (২) স্পর্শন (৩) বচন এবং (৪) অনুধ্যান। সর্ব্ব প্রাণীর হিতে রত, মহাভাগ, মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ, তাঁহাদের পতিতপাবন শ্রীচরণের রেণু স্পর্শন, তাঁহাদের অমৃত নিঃস্যন্দিনী কল্যাণী বাণী শ্রবণ এবং তাঁহাদের লোকোত্তর মহান চরিত অনুধ্যান দ্বারা, মহাপাতকী, স্তব্ধশক্তি জনগণের হৃদয়েও শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে। তাহার ফলে যে কেবল দৈহিক ও মানসিক রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এমন নহে, ভবরোগ হইতেও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অশেষ সুকৃতি কিম্বা অসাধারণ দুষ্কৃতির অধিকারী না হইলে, এ প্রকার শুভ যোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যাবৎ ভগবদ্ভক্তি অঙ্কুরিত না হয়, সাধুসঙ্গ, সদাচার ও সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কালে কৃপানিধি, লোকোদ্ধারশীল মহাত্মা সন্দর্শন সংঘটীত হওয়া বিচিত্র নহে। এক জন মাত্র লোকের শক্তি সঞ্চার হইলে, তাঁহা দ্বারা শত সহস্র লোকের উদ্ধার হইতে পারে। পৃথিবীর যে কোন প্রদেশে একজন লোকের হৃদয়ে শুভ বাসনার উদ্রেক হইলে, করুণাপরবশ, অন্তর্যামী মহাপুরুষগণ, অলক্ষ্যে তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং যাবৎ সে ব্যক্তি নিজ শক্তির উপর

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হইতে পারে, তাবৎ তাহাকে অসহায় শিশুর উপর জননীর যেরূপ সতর্ক ও সতৃষ্ণ দৃষ্টি থাকে, সেইরূপে সমস্ত বিঘ্ন বাধা হইতে স্বতঃই রক্ষা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের লীলা অধ্যয়ন করিলে, শক্তি সঞ্চারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহাকে দর্শন মাত্র কত ঘোর নারকী মহাপাতকীর হৃদয়ে ভাব ও শক্তি সঞ্চার হইয়াছিল তাহা সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য উদ্ধার মানসে তিনি প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুই একজন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নাম প্রচারের অনুজ্ঞা দিয়া সেই দুই একজন ব্যক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামে শক্তি ও ভক্তির প্রবল বন্যা বহাইতেন। এইরূপে সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা পরমকারুণিক মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শন, বাক্য শ্রবণ ও অনুধ্যান দ্বারা চিরকালই বিষয়ানুরক্ত সংসারী জীবগণের উদ্ধার সাধন হইয়া আসিতেছে।

ইউরোপে আজ কাল, রোগীকে একবার মাত্র দেখিয়া, পরে সুদূর হইতেও তাহাকে হিপ্‌নোটাইজ্ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতই রোগীরা তাঁহাদের নিজাবাসে থাকিয়াও চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অনুভূত করিয়া থাকে। ইহাকে "হিপনোটীজম এট্ এ ডিষ্টান্স" বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে চিকিৎসক একবার মাত্র রোগীকে দেখিয়া, পরে নিজ গৃহে বসিয়া রোগীর অবয়ব অনুধ্যান করতঃ দূর হইতেই তাঁহাদের সদিচ্ছা স্রোত তাহার প্রতি প্রবাহিত করান। মহাপুরুষগণের কৃপা ভিখারী হইয়া আমরাও যদি একমনে সমস্ত চিন্তাস্রোত তাঁহাদের দিকে প্রবাহিত করাইয়া দিই তাহা হইলে তাঁহাদের "আসন টলিয়া" উঠে ও আমরা অলক্ষ্যেও বাঞ্ছিতার্থ লাভ করি। শাস্ত্রে যাহাকে "ভ্রমরীকরণ" বলে ইহা তাহারই প্রকার ভেদ মাত্র। ভগবানে যে কোন উপায়ে তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলে, সারাজ্য সিদ্ধি হয়। পাঠকবৃন্দ বোধ হয় অনেকেই তৈলপায়িকা ও কাঁচপোকার দৃষ্টান্ত জানেন। ইহা তন্ময়ত্বের একটী দৃষ্টান্ত।

রূপানুধ্যান দ্বারা যে শক্তি সঞ্চার ঘটে তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। আমরা কেবল একটী মাত্রের উল্লেখ করিব। বারাণসীধামে কোন মহাত্মার আশ্রমে একবার "শ্রীগুরু মহারাজের" দেহান্তের পর তাঁহার একখানি আলেখ্যের অভাব, কোন প্রিয় শিষ্যের মনে বড়ই উৎকণ্ঠা উপস্থিত করে কথা প্রসঙ্গে

আশ্রমস্থ জনৈক সাধু সেই শিষ্যকে বলেন যে তিনি একখানি ভাল কাগজের উপর হস্তার্পণ করিয়া শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমূর্ত্তির তীব্র ভাবনা করিলেই তাঁহার বাঞ্ছিত আলেখ্য আপনিই উৎপন্ন হইবে। আমাদের সমক্ষে আমরা এই প্রক্রিয়া সফল হইতে দেখিয়াছিলাম।

ক্রূরকর্ম্মা আসুরিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা তমঃ পরিচালিত হইয়া দূর হইতে এই উপায়ে অশুভ সংঘটন করিয়াও নিজেরা প্রচ্ছন্ন থাকিতে সক্ষম হয়। ইচ্ছা ও বাক শক্তি প্রভাবে মন্ত্র চৈতন্য বা মন্ত্রে শক্তিসঞ্চার করা যাইতে পারে। কেবল বাক ও ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নেপোলিয়ন্ আদি মহাবীরগণ অসংখ্য সেনা পরিচালন করিয়া ধরিত্রীকে নরশোণিতাপ্লুত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে শক্তিসংহার বা শক্তি সম্বরণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। সকলেই জানেন যে ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, মহাতেজস্বী জামদগ্ন্য, পরশু রামের শক্তিসংহৃত করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও তাঁহার তেজ খর্ব্ব করিয়াছিলেন। দ্বাপরে ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল প্রভৃতির শক্তিসম্বরণের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাউণ্ট সেইণ্ট জার্মেন্ নামক কোন প্রচ্ছন্ন মহাত্মা প্যারী নগরে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজ ঐশর্য্য দ্বারা অতি সম্ভ্রান্ত ধনকুবেরগণকেও মোহিত করিয়াছিলেন। তিনি কে, কোথায় নিবাস অথবা কোথা হইতে আসিলেন কেহ জানিত না তাঁহার হীরকাদি রত্নরাজী দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও হতগর্ব্ব হইয়াছিল।

জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা লোভ পরবশ হইয়া একটি চক্রান্ত করেন। তিনি নগর প্রান্তে কোন প্রাসাদে এক রাত্রে প্রীতি ভোজ ও বল্ নাচ উপলক্ষ করিয়া কাউণ্টকে নিমন্ত্রণ করেন এবং অনেক ধনী ব্যক্তির সমাগম হইবে বলিয়া কাউণ্ট বহুমূল্য হীরকাদি পরিধান করিয়া সভায় আসিতে অনুরোধ করেন। নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যার পর কাউণ্ট যথারীতি রত্ন ভূষিত হইয়া বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং কোন আয়োজন কি সাজ সরঞ্জম না দেখিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলেন যে তাহার ভ্রম হইয়াছে নিমন্ত্রণের তারিখ তাহার পর দিবস। কাউণ্ট ইহাতে যেন বিস্মিত হইলেন. এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া মহিলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও বিদায়

চাহিলেন। মহিলা বলিলেন যে, যখন কষ্ট স্বীকার করিয়া এত দূর শুভাগত হইয়াছেন তবে এক পেয়ালা চা সেবন ও তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ না করিয়া কখনই যাইতে পাইবেন না, কাউণ্ট সম্মত হইলে, চা আনিতে হুকুম দিবার ব্যপদেশে মহিলাটি কক্ষান্তরে গমন করিয়া তদ্দন্তেই প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসন গ্রহন করিবামাত্র, কতকগুলি লোকের পদ শব্দ শুনা গেল ও পরক্ষণেই ৭।৮ জন সশস্ত্র দস্যু কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেই নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র কাউণ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, এই মুহূর্তেই তিনি সমস্ত রত্নরাজী খুলিয়া তাহাদিগকে অর্পণ না করিলে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া কাউণ্ট কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে যেখানে যে ভাবে আছ, ঠিক সেই ভাবে সেই স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, শ্রবণ মাত্র ঐ মহিলা ও দস্যুদল প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ নিজ নিজ স্থানে অচল হইয়া রহিল, কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি কি অঙ্গ সঞ্চালন করিবার কোন শক্তি রহিল না। কাউণ্ট বাটী চলিয়া গেলেন ও পরদিন পুলিসের কমিসারি জেনারেল ও কয়েক জন প্রহরী সঙ্গে লইয়া সেই বাটিতে গেলেন এবং যাহাকে যে ভাবে গত রাত্রিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ভাবেই সকলকে কাষ্ঠ পুত্তলীবৎ দেখিতে পাইলেন। পুলিসের অধ্যক্ষ ব্যপার দেখিয়া অবাক হইলেন ও তাহাদিগকে সশস্ত্র হস্ত নামাইতে বলিলেন এবং তাহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই হস্ত নামাইতে কিম্বা কথা কহিতে পারিল না কেবল গলদঘর্ম্ম হইতে লাগিল। তখন কাউণ্ট ঈষদ্‌ হাস্য করিয়া যেই তাহাদিগকে হস্ত নামাইতে অনুজ্ঞা করিলেন, অমনি তাহারা সকলে এক যোগে হস্ত নামাইয়া পলায়ন পর হইবা মাত্র প্রহরীরা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন সকলে স্বীকার করিল যে ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রেরণায় কাউণ্টকে হত্যা করিয়া তাঁহার বহুমূল্য রত্নরাজী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। তাহারা সকলে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইল, কেবল মহিলাটি সম্ভ্রান্ত বন্ধুদের মধ্যস্থতায় অব্যাহতি পাইলেন।

উপরের ঘটনাটি কেহ গল্প বলিয়া যেন উপহাস না করেন। বিদ্বৎসমাজে ইহা সকলের নিকট সুপরিচিত।

অধিক দিনের কথা নহে লেখকের দার্জ্জিলিং প্রবাস কালে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কর্ণেল অলকট্ দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছিলেন। একদিন অপরাহ্নে সমবেত ভদ্র মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি হিপনটিজম্ বিষয়ে শিক্ষা দিবার মানসে অন্যান্য অনেক লোকের পর লেখককে আহ্বান করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিতে বলিলেন ও ২।১ মিনিট কাল চক্ষুর উপর ঝাড়িয়া চক্ষু উন্মীলন করিতে বলিয়া বলিলেন যে সহস্র চেষ্টায়ও তুমি চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিবে না। বস্তুতই লেখক সম্যক চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না পরে তিনি অনুজ্ঞা করিলে চক্ষু খুলিতে পারা গেল। এই রূপে হস্ত ও পদ স্তম্ভিত উক্ত রূপে শক্তিসম্বরণ করিয়া দেখাইলেন যে ইচ্ছা শক্তির প্রভাব কত অধিক।

দুষ্ট লোক এই প্রকারে স্বীয় ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি কি মন্ত্রশক্তি অসদভিপ্রায়ে বিনিয়োগ করতঃ মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদি ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম। বিগত কোন সংখ্যার পন্থাতে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে।

প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে হুসেন খাঁ জিন্নী নামক জীন্-সিদ্ধ কোন ব্যক্তি তৎকালে অনেক ব্যক্তির নিকট স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া "বুজ্রুগী" করিয়া গিয়াছিল। আগ্রা সহরে ১৮৮১ সালে লেখক জনৈক বর্ষীয়ান হিন্দু তপস্বীর সহিত পরিচিত হইয়া শুনিয়াছিলেন যে হুসেন্ খাঁ তাঁহার শিষ্য। কিন্তু সে অসন্মার্গ অবলম্বন করায়, গুরুদেব তাহার শক্তি প্রত্যাহরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হুসেনের পরিণাম অতি ভীষণ হইয়াছিল।

অনেকেই জানেন যে আমাদের দেশের লোকেরা রুগ্ন কি অতি প্রাচীন ব্যক্তির সহিত সুস্থকায় শিশুকে এক শয্যায় শয়ন করিতে নিষেধ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সুস্থ ব্যক্তির কি শিশুর ওজঃ ধাতু ইহাতে ক্ষয় হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তি তাহা সংগ্রহ করিয়া সুস্থ ও প্রাচীন দুর্ব্বল ব্যক্তি সবল হইয়া থাকে।

ইউরোপ খণ্ডের কোন দেশেই শব দাহের প্রথা না থাকায় কেহ কেহ প্রবল বাসনা চালিত হওয়ায় দেহান্তে ভূগর্ভে প্রোথিত শবদেহ বিগলিত না হইয়া কিছুকাল যেন সজীববৎ অবস্থান করে, এমন কি তাহাদের নখ, কেশ,

শ্মশ্রুও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে ইউরোপীয় বুধগণ "ভ্যাম্পিরিজম্" নাম দিয়াছেন। আফ্রিকাখণ্ডে এক প্রকার বৃহৎকায় বাদুড় আছে, তাহাকে "ভ্যাম্পায়ার" বলে। পথশ্রান্ত পথিকগণ ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন মানসে শয়ন করিলে, এই বাদুড় পক্ষসঞ্চালন দ্বারা তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ করায় পরে তাহাদের দেহ হইতে শোণিত শোষণ করিয়া মৃতবৎ ফেলিয়া যায়। মৃত্যুর পর যাহারা 'ভ্যাম্পায়ার" হয় তাহারা এই বাদুড়ের মত জীবিত ব্যাক্তির শোণিত পান দ্বারা তাহাদের শবদেহ পচিতে না দিয়া বরং কিয়দ্দিন পুষ্ট রাখে। তবে প্রভেদ এই বাদুড়েরা প্রত্যক্ষ ভাবে শোণিত পান করে আর ঐ সকল প্রেত অলক্ষ্য ও অদৃশ্য দেহে তাহাদের নিজ ঘনিষ্ট লোককে আশ্রয় করিয়া শোণিত আকর্ষণ করে এবং অতি সূক্ষ্ম সংযোগ নাড়ী দিয়া তাহা শবদেহে চালিত করে। বাদুড়েরা একদিনে একেবারে তাহাদের শীকার দেহ হইতে রক্ত টানিয়া লয় কিন্তু উক্ত প্রেতেরা অনেক দিন ধরিয়া অল্পে অল্পে শোণিত ও শক্তি সঞ্চয় করে। এইরূপে আশ্রিত ব্যক্তির শক্তি সংক্ষয় হইয়া সে দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে। কবরস্থান হইতে তাহাদের আত্মীয় স্বজন বহুদূরে থাকিলেও, তাহারা কোন গূঢ় প্রক্রিয়া দ্বারা শোণিত ও শক্তি সংক্ষয় করে। লোকে জানিতে পারিলে প্রেতের কবর পুনরায় খনন করিয়া শবদেহ উত্তোলন করে, এবং মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃতপিণ্ড পেষণ করে। তখন সবেগে রক্তধারা নির্গত হইলে অচিরে প্রেত শবদেহ ত্যাগ করিয়া কামলোকে প্রস্থান করে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে অধিকারী অনধিকারী ভেদে শক্তি-সঞ্চার বা সংহার দ্বারা কি প্রভূত মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে।

যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে একান্ত নির্ভরশীল নির্ম্মৎসর ও নির্ম্মল চিত্ত, তাঁহারা শাস্ত্রাদি জ্ঞান বিহীন ও মহামূর্খ হইলেও, তাঁহার পদারবিন্দ অনুধ্যান দ্বারা সর্ব্বশক্তি সংগ্রহ করিতে সক্ষম। কেন না, তাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয় এবং পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে।

ভগবদ্ভক্তগণও তাঁহারই মত দয়ানিধি। কণিকামাত্র তাঁহাদের কৃপালাভ করিতে পারিলে আমরা সর্ব্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন স্পর্শন, কি বাক্য শ্রবণ সকলের পক্ষে সম্ভব পর না

হইলেও তাঁহাদের লোকোত্তর মহানচরিত পাঠ এবং নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তাঁহাদের কোন একটি রূপ অনুধ্যান নিত্য নিয়মিতরূপে করিতে পারিলে, তাঁহারা আমাদের চিত্তের কলুষ শক্তি সম্বরণ বা সংহার করিয়া দূর হইতেও শক্তি সঞ্চার করেন এবং কাল ও পাত্র বিচার করিয়া দর্শন, স্পর্শন ও বাক্য কথন দ্বারা অপরকে উদ্ধার করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন। তাই বলি দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া চিরকাল অনিত্য বিষয়াকৃষ্ট না হইয়া, প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া এবং ত্রিভুবনের মঙ্গল চিন্তা করতঃ অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ভগবচ্চিন্তা এবং তাঁহার পার্শ্বচর স্বরূপ মহাত্মাগণের কল্পিত রূপ চিন্তা করা উচিত। ঐরূপ করিলে দিন দিন অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চার হইতেছে তাহা অনুভব করা যায়। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা*

বা

বিশাখার উপাখ্যান

বর্ষাকাল আগত, আপনি চারি মাস এখানে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন। আপনার সৈন্যাদির প্রত্যেক ভারই আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যখন বিদায় দিব মহারাজ তখন যাত্রা করিবেন।

সেই দিন হইতে সিকেতায় ক্রমাগত উৎসব চলিতে লাগিল, রাজা হইতে সামান্য দীন প্রজাও পুষ্পমাল্যে, সুগন্ধ সৌরভে ও বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া কোষাধ্যক্ষের অতিথি সৎকারের পাত্র হইয়াছিল।

এই রূপে তিন মাস গত হইল কিন্তু মহালতা এখনও নির্ম্মিত হইল না। অতঃপর স্ব স্ব ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ আসিয়া কোষাধ্যক্ষকে জানাইল "আর কিছুরই অভাব নাই, শুধু সৈনিকদিগের রন্ধনার্থ প্রচুর কাষ্ঠের অভাব।

ধনঞ্জয় কহিলেন "জীর্ণ হস্তীশালা ও যাবতীয় নগরের ভগ্ন কুটীর গুলি রন্ধনের জন্য লইয়া যাও"।

---

* মূল পালী হইতে অনুবাদিত।

অৰ্দ্ধ মাসের পর কোষাধ্যক্ষের নিকট আবার সংবাদ আসিল "কাষ্ঠ নাই।" বৎসরের এই সময়ে কেহ কাষ্ঠ আহরণের জন্ত যাইতে পারিবে না। বস্ত্রের ভাণ্ডার খুলিয়া মোটা কাপড়ের পলিতা প্রস্তুত কর। পরে তৈল কটাহে ডুবাইয়া রন্ধন কর। অর্দ্ধ মাসও এইরূপ অতিবাহিত হইল।

চারি মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, মহালতা আবরণী নির্ম্মিত হইল। এই আবরণীতে সূত্রের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। সূত্র স্থানে রৌপ্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। মহালতা আবরণী পরিধান করিয়া শিরোদেশ হইতে পদ চুম্বন করিত। পাদদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহাতে সারি সারি কারুকার্য্যে খচিত ছিল। মস্তকে একটি, কর্ণ শিরীষে দুইটী, কণ্ঠে একটী, জানুদেশে দুইটী, বাহুযুগে দুইটী এবং কটিদেশে দুইটী পদক ছিল।

মহালতা আবরণীর একদিকে ময়ূর চিত্রিত, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে লোহিত কাঞ্চনের সহস্র পক্ষ বিস্তারিত, অধরে প্রবাল, নয়নে হীরকের দীপ্তি, কণ্ঠে মুক্তা এবং পুচ্ছদেশে পদ্মরাগ মণি শোভিত; জানু হইতে চরণ ও পক্ষদেশ রৌপ্যময় ছিল। বিশাখার শিরোদেশে স্থাপিত হইলে শিখির শীর্ষে নৃত্যশীলা শিখিনীর ন্যায় দেখাইত। সহস্র পক্ষ ঘর্ষণের রব স্বর্গীয় সঙ্গীত ধ্বনি ও কলা-বতী কুলের সুললিত তানের ন্যায় শ্রুতি গোচর হইত। সুন্দরীর সম্মুখীন হইলে লোক বুঝিতে পারিত ইহা স্বভাব সৌন্দর্য্যের স্বতঃ বিকশিত সুচিত্রিত কেকোৎকণ্ঠা শিখিনী নহে সৃষ্টির মহীয়সী ধ্যানমূর্ত্তি লোক ললামভূতা লাবণ্য-বতী ললনার মোহিনী পারিজাত ছবি।

মহালতা আবরণীর মূল্য নবতি লক্ষ মুদ্রা, কারুকার্য্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের কোন সুকৃতি বলে বিশাখা এই মহালতা প্রাপ্ত হইয়াছিল! কথিত আছে, কাশ্যপ বুদ্ধের অবতারে বালিকা বিংশতি সহস্র পুরোহিতকে পরিধেয় বস্ত্রাদি, সূত্র সূচিকা এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করি-য়াছিল। সেই পুণ্যফলে কোষাধ্যক্ষ দুহিতার এই প্রসাধন লাভ, কারণ, বসন দানে রমণী মহালতা ফল প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ মানুষে স্বর্গীয় কমণ্ডলু ও কাষায় বস্ত্র পাইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

৪র্থ ভাগ। { ভাদ্র, ১৩০৭ সাল। } ৫ম সংখ্যা।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

আছি আমি, আছে কি তাই জগৎ আমার,
অথবা অস্তিত্বে বিশ্ব চির জাগরিত,
থাকি, বা না থাকি নিজ ঘটে আপনার?
কেবলি অধ্যাস কিরে প্রকৃতির খেলা,
—অর্থহীন অমূলক স্বপনের ভাষা?
আমিত্বের মানদণ্ড এই যে সংসার,
আছি আমি—এ সিদ্ধান্ত অস্তিত্বে যাহার,
শুধু কি কল্পনা তাহা, আকাশ কুসুম?
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে গরবিণী
আদরিণী বিশ্বময়ী বিরাট প্রকৃতি;
মুগ্ধ আমি, মগ্ন প্রাণ বিশ্বপ্রেমরসে।

পারি কই, আপনারে পর না করিয়া,
আত্মবঞ্চনায় পরে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া ?
আপনারে দিয়া ভর পারেনা তিষ্টিতে
সতৃষ্ণ সাপেক্ষ জীব; মনের কল্পনা,
বুদ্ধির বিজ্ঞানময়ী সিদ্ধান্ত স্থচনা
ইন্দ্রিয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ ; ইন্দ্রিয়ের
ভোগরাগ প্রকৃতিরে লয়ে। কে বলিবে,
সংসারের আয়োজন নহে তার তরে ?
অখিল যাজন করি করে দিনপাত
দশকর্ম্মান্বিত দশ ইন্দ্রিয় আমার,
বুদ্ধি তার উচ্ছিষ্টভাগিনী। উদাসীন
ইন্দ্রিয় যাহাতে, অভুক্ত অপরিচিত
অহৃদা যা তার, বুদ্ধির অতীত তাহা ;
ইন্দ্রিয়ের দ্বারপ্রান্তে বুদ্ধি ভিখারিণী।
মনের ধারণা, আর চিত্তের কল্পনা,
বুদ্ধির সিদ্ধান্তবাদ, প্রজ্ঞার নির্ভর
প্রসাদ কণিকামাত্র ইন্দ্রিয়ের বটে ;
কিন্তু আস্থা নাহি হয় কথায় তাহার।
নির্গুণ আকাশখানি ঢাকি নীলিমায়,
বর্ণগন্ধ হীন জলে মসী মিলাইয়া,
অথবা রজ্জুতে ফণী, রজ্জু ফণা ধরে,
কিম্বা স্বপ্নে সিংহাসন শৃগালেরে দিয়া
যে সাক্ষ্য উদয় অস্ত দিতেছে ইন্দ্রিয়,
কেমনে কথায় তার করিয়া বিশ্বাস
মানিব যে, বিশ্বপট সত্যের বিকাশ ?
মিথ্যা শিক্ষা মৃষাবাদ প্রাণগত যার,
যে কিছু সংগ্রহ তার সকলি আকাশ ;
আকাশ অধ্যাস মায়া স্বপনকল্পনা
লুপ্ত লুকায়িত ব্যক্ত উপাদান যত।

সকলি ফুরাল, স্থূল সূক্ষ্ম গেল মুছি।
গেল মুছি প্রকৃতির লেখা ; কে রহিল ?
বিশ্ব অনুভূতি যার, সে রহিল কোথা ?
সুধাধবলিত স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা যেমন
চন্দ্রমায় সহজাত স্বাভাবিক রস,
আমিত্বের অঙ্গীভূত বিশ্ব কি তেমতি,
এ বৈচিত্র্য আমারি কি গুণের পর্য্যায় ?
সৃষ্টি ইন্দ্রজাল, আমি কি অস্তিত্বশীল ?
আমি কি রহিনু বাঁচি বিশ্বের মরণে ?
কোথা আমি, আমিত্বের উপাদান কিবা,
আমাতে বিশ্বের ভাণ কেন বা জনমে ?

বুদ্বুদ জলের লেখা, জগৎ আমার ;
অভেদ বুদ্বুদ জলে, অভেদ আমরা।
বিশ্বরূপ আমারি বিকাশ ; আমি আছি,
বিশ্বরূপ অনুভূতি আমাতে জাগায়ে।
পরচর্চ্চা প্রকৃতি আমার ; উদাসীন
আমিত্ব আপন ধনে ; আপন ভবনে
দৃষ্টিহীন যথা রাহু, ফিরে অহোরহঃ
পরচর্চ্চা করি। শিশু মাতে, আত্মছবি
নেহারি মুকুরে ; মুগ্ধ মগ্ন মাতোয়ারা
আমিত্ব তেমতি, হেরে যবে বিশ্বপটে
আত্মঅনুলিপি। আমিত্বের খেলা এই।
আমিই বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বটী আমার।
আমারি এ গৃহস্থালী, দ্বিতীয় সংস্কার।
উত্তর সাধক "তুমি" ; তুমিত্ব প্রশ্রয়
অনন্তব্রহ্মাণ্ডকোটি আমিত্বের লেখা।
আমি আছি, তুমি বিশ্ব জাগিছ বলিয়া।

দ্বৈত বুদ্ধি নাহি যথা, নাহি যথা তুমি,
নহে কভু আমিত্বের অস্তিত্ব সম্ভব।
মায়ার সংসার মিছে ফুরাবে যে দিন,
উত্তর সাধক বিনা আমিত্ব না রবে,
আত্মবোধ দ্বৈতবোধ সকলি ফুরাবে।
যতদিন ছন্দোহীন না হয় সংসার,
রব আমি গতানুগতিক যোগফলে।
নদীর প্রশাখা শাখা প্রত্যপ্তপ্রণালী
শুষ্ক কিম্বা প্রতিহত হয় যেই দিন,
নদীত্ব না রয় তার ; দুকুল ভাঙ্গিয়া
অচিরে আপন ক্লেদে আপনা হারায়।
বাহ্য আলাপে আমিত্বের সেই গতি,
নির্ব্বাণ প্রদীপ্তদাব তেজ উষ্মা বিনা।

আমি সাক্ষী এ বিশ্বের ; বিশ্ব অনুভূতি
আমারি প্রকৃতি গুণে আমাতে রোপিত
মায়াবীজ, ফল ফুল বিশ্বরূপ যত।
আমি আছি, যতদিন তাহা ; নিজগুণে,
নিজের অর্জ্জিত ফলে জীবত্ব আমার,
জগতের নাশ আমারি নাশের হেতু।
জগতের ভঙ্গুরতা কেন ; কায়াত্যাগ
মায়া কেন করে ?

জগতের উপাদান
মায়া মায়া মিছে ; মিথ্যার স্থায়িত্ব কোথা ?
অলীক স্বপন আপনি ভাঙ্গিয়া যায়,
আপনি মিলায় কোথা মিথ্যা মরীচিকা।
যদিও নির্ভর মায়া আমিত্বের মম।
গেল মায়া-ক্ষণধ্বংসী বিশ্বরূপ ভাণ,
সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বের চির অবসান।

আমি আছি, হস্তলিপি জগৎ প্রমাণ,
মুছিয়াছে লেখা, মুছিল উপাধি মোর।

মানিনু সকলি মিছে, মিথ্যা অমূলক
অলীক উপাধিমাত্র আমি ও জগৎ;
আমিও জগতে অবর্গ নাহিক কিছু;
আত্ম ছায়া, অন্যতর প্রতিচ্ছায়া তার।
কার ছায়া আমি; সে কি বা, আরূঢ় যায়
আমিত্ব উপাধি? জগতের অনুভূতি
জগতে যেমতি, আমিত্বের অনুমিতি
আরোপিত কোথা? কে জাগে পশ্চাতে মোর?
কাঞ্চনে কাঞ্চন জাগে, জাগেনা অয়স;
ভাবে ভাব অভাবে অভাব মূর্ত্তিমান;
অসৎ অস্তিত্বহীন অধ্যাস অভাব,
অভাবের মূলভিত্তি গঠিত আকাশে।
হ্রাস বৃদ্ধি রূপান্তর উৎপত্তি মরণ,
অভাবের নাই আড়ম্বর; ভূত ভব্য
অনাগত, অভাব ত্রিকালজয়ী; নাই
আজ, ছিল না আদিতে, অন্তিমে না রবে।
অভাবের ভাব অচিন্ত্য অনন্তমেয়,
অভাবের অভিজ্ঞান ভাবের সঙ্গমে।
অভাবের নাস্তিকতা পরাভূত যথা,
যথা মাত্রাতীত প্রেমে করে আলিঙ্গন
অব্যক্ত ইয়ত্তাহীন বরণীয় কালে
বাষ্পীয়-জলীয়-স্থূল-তৈজস প্রকৃতি;
ভাবপদার্থের তথা অধিষ্ঠান ভূমি।
ভাবের অস্তিত্বে গাঁথা মূর্ত্ত উপাদান
স্থূল সূক্ষ্ম, শীত উষ্ণ, কর্কশ কোমল;

কেহ শ্বেত রক্ত পীত বিচিত্র কৃত্রিম,
কেহ গুরু, কেহ লঘু, নিবিড়, বিরল।
মূর্ত্তযুগলের যথা দূরত্ব মাপিয়া
শূন্যের মহত্বচিত্র আঁকে অনুমিতি,
অভাবের, অধ্যাসের সমস্যাপূরণে
অন্যথা যুক্তির কিবা আছে গুণপনা?
নহে ক্ষিতি, নহে অপ্, নহে তেজবাত,
কে বলিল পঞ্চম স্থানীয় মহাকাশ?
ভূতের প্রকৃত সংখ্যা করিতে নির্দ্দেশ
আজিও প্রস্তুত নয় দুর্ব্বল বিজ্ঞান।
নহে যা বাষ্পীয়, স্থূল, জলীয়, তৈজস,
তাহা যে আকাশ কিম্বা অভাব নিশ্চয়,
দেখিনা অকাট্য যুক্তি অনুকূলে তার।
ভাবের বিচ্ছেদ কিম্বা দূরত্বদ্যোতক
আকাশের অভাবের স্বরূপ নিশ্চিত।
ন ভূত, ন ভবিষ্যৎ নাস্তি যা আজিও,
অসৎ আকাশ তাহা অভাব তাহাই।

পাই কি খুঁজিয়া কারে অভাবে কি নহে,
হারায়ে যদ্যপি ফেলি অঘোর আঁধারে
গুণের আধার সেই ভাবেরে আমার
একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিলাসভাণ্ডার?

[ক্রমশঃ]

শ্রীকেদারনাথ মিত্র।

আধ্যাত্মিক তমস।*

(SPIRITUAL DARKNESS)

আধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশকামী সাধকের গন্তব্য পথে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি সচরাচর আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তমঃ যেরূপ ভয়াবহ ও অনিষ্টকারী বোধ হয় আর কোনটীও সেরূপ নয়। ইহার অভ্যুদয়ে সাধকের হৃদয় চিত্ত একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, সমস্ত প্রকৃতি জড় ভাবাপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গে অতীত শান্তির স্মৃতি ও ভবিষ্য উন্নতির আশা এককালে মন হইতে তিরোহিত হয়। ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছাদিত জনপদের পরিচিত দৃশ্য সমূহ যখন দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং উজ্জ্বল আলোকমালা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, তখন যেরূপ পথিক হতবুদ্ধি ও পথহারা হয়, এবং চারিদিকে কুয়াশা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তমসাবৃত সাধকের অবস্থাও ঠিক সেই প্রকার। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত চিহ্ন (Land-marks) সমূহ, পূর্ব্ব পরিচিত পথ সমস্ত অন্ধকারে মিশাইয়া যায়। যে সমস্ত আলোক এতদিন তাঁহার জীবন পথ আলোকিত করিতেছিল, এখন তাহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বিষম অন্ধকার তাঁহাকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে, এবং সেই আঁধার ভেদ করিয়া মনুষ্য মূর্ত্তিসমূহ সময়ে সময়ে প্রেতের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং পরক্ষণেই অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। এই বিষম অন্ধকারে সাধক একা——যেন এক প্রকাণ্ড জনশূন্য অন্ধকারময় প্রান্তর দিয়া একাকী চলিয়াছেন—কালের মুখে প্রবেশ করিতে চলিয়াছেন। মানবের হাসিমুখ আর তিনি দেখিতে পান না, তাহাদের সুমিষ্ট বাণী আর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না, প্রেমময় মধুর ভাষা আর তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায় না। জনকল্লোল মুখরিত হর্ষক্ষোভ বিজড়িত জগৎ যেন তাঁহার নিকট হইতে বহু, বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে; মধ্যে দারুণ নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার; একটী ক্ষুদ্র আশাবাণীও এই কঠোর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছে না। সাধক কেমন করিয়া অগ্রসর

---

* শ্রীমতী আনি বেশান্ট কৃত—Theosophical Review Vol. XXV. of 1899.

হইবেন? সম্মুখে বিষম গহ্বর তাঁহার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, একপদ অগ্রসর হইলেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ভয়ানক অন্ধকার! ইহলোক, পরলোক কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে; একটী ক্ষীণ জ্যোতিরেখাও আর এই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে না। চারিদিকেই আঁধার! চারিদিকেই শূন্য! তাহার মধ্যে তিনি যেন নিরালম্ব হইয়া অবস্থান করিতেছেন, বুঝি এখনই শূন্যের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবেন। অন্ধকার যেন এখনই তাঁহার ক্ষীণ জীবন শিখা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সাধক নির্জ্জীব জড়বৎ, নৈরাশ্যপূর্ণ, একা। কেহ কাছে নাই, দেবতা এবং মানব সকলেই যেন তাঁহাকে এই তমোগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়াছে।

উপরে যে চিত্র অঙ্কিত হইল তাহা যে কিছুমাত্র অতি রঞ্জিত নহে, প্রত্যেক রহস্যপথের পথিক (Mystic) ই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাধনাবস্থায় স্ব স্ব অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সেরূপ করুণ মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা কাহিনী মানবেতিহাসের আর কোথাও দেখা যায় না। শান্তির আশায় এই পথ অবলম্বন করিয়া শেষে দারুণ অশান্তির সহিত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আনন্দজ্যোতির (Beatific vision) পরিবর্ত্তে নরকের অন্ধকার তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে না, কারণ তাহার নিজের জীবনে এই ভীষণ পরীক্ষা এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহার সময় এখনও আসে নাই। শিশু শুধু খেলাধুলা লইয়াই থাকে, সংসারে কত ঝড় বহে তাহার কোন খোঁজ রাখে না। যাহা মানবের পরিজ্ঞাত তাহা তাহার পক্ষে সহজ বোধ্য, কিন্তু যাহা কখন ইন্দ্রিয় গোচর বা অনুভূতির বিষয় হয় নাই, তাহার ধারণা করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ লাভ যাহার ভাগ্যে এখন ঘটিয়া উঠে নাই সে সাধক জীবনের বর্ণিত কষ্টের কথা লইয়া উপহাসই করুক আর উহা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়াই দিক্, যে সমস্ত পুণ্যাত্মা সাধনার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়পদ্ম ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

সাধনের প্রারম্ভাবস্থায়ই এই তমস্ সাধকের চিত্তে হটাৎ আসিয়া

আবির্ভূত হয়। কোথা হইতে আসে, কেন আসে, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। এই অবস্থায় সাধকের আত্মাভিমান (Sensitiveness) অতিশয় প্রবল থাকে, এবং উহার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই তমসাবির্ভাবের জন্য আপনাকে আপনি দোষী বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যে শান্তির জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাহার বিনাশের জন্য আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে থাকেন! তাঁহার বিষাদ-খিন্ন-চিত্তের সম্মুখে জগৎ এক অস্বাভাবিক বিকৃতরূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এখন তাঁহার কাছে বৃহদায়তন বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা হয় ত অপর সময়ে লক্ষ্যেই আসিত না এরূপ সামান্য দুঃখ কষ্টগুলি এখন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। তাঁহার মনে হয় এত চেষ্টা এত আয়াস স্বীকার করিয়া যে উন্নতস্থানে পঁহুছিয়াছিলেন, বুঝি আবার তথা হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা, আয়াস, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি উপায় দ্বারা যে সমস্ত আধ্যাত্মিক রত্নরাজী লাভ করিয়াছিলেন, হটাৎ দৈত্যবল (Powers of the Dark) আসিয়া সে সমস্ত এক ঝটকায় কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এত আয়াসের, এত সাধনের ফল এইরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে নবীন সাধক যে বেপমান, বিমূঢ় ও নৈরাশ্য-গ্রস্ত হইবেন তাহা আর বিস্ময়ের বিষয় কি।

এখন দেখা যাউক, এই তমোভ্যুদয়ের হেতু কি। অবশ্য এই কারণ জ্ঞানই আমাদিগকে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু তদ্দারা এই টুকু লাভ হইবে যে উহার সাহায্যে আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিতে সক্ষম হইব। সত্য বটে বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে কেহই অন্ধকারে স্থির থাকিতে পারে না কিন্তু তথ্য জ্ঞানও চিত্তবিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমরা দুই শ্রেণীর সাধকদিগের কথা এস্থলে পৃথকভাবে আলোচনা করিব। প্রথম যাঁহারা এপর্য্যন্ত কোন মহাপুরুষের শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, ২য়, যাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ—সাধন পথে বিচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবার পরই সাধকের প্রথমেই 'Quiekening of the Karma' বা 'শীঘ্র কর্ম্মফলভোগ' উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইলে

চলিতে পারে। রাগদ্বেষাদি মনোবৃত্তি জন্য সুখদুঃখাদি সূক্ষ্ম বিষয় মানব সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়াই সে সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মদেহানুভূত কষ্ট ভোগই আমাদের পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্ম সমূহের ক্ষয়কারী। সেই সমস্ত অসৎকর্ম্মই বর্ত্তমান অবস্থার দুঃখভোগের যথার্থ কারণ, স্থূল জগতে যে সমস্ত ঘটনাবলী আশ্রয় করিয়া উহারা উদ্ভূত হয় সে সকল নিমিত্ত মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে যদি এই নিমিত্ত সকল স্থূল জগতে প্রকাশমান হইবার পূর্ব্বেই কোনরূপ দুঃখভোগ দ্বারা কর্ম্মঋণ পরিশোধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে যখন সে সকল বিকশিত হইতে থাকে তখন আর দ্বিতীয়বার ক্লেশ পাইতে হয় না।

উপরে যাহা 'শীঘ্র কর্ম্মফল ভোগ' বলিয়া উক্ত হইল তাহাতে ঠিক এই রূপই হইয়া থাকে। তমসাক্রান্ত হইয়া সাধক যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্মের ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার ফলে এই হয় যে ভবিষ্যতে যখন দুর্ঘটনা সকল ঘটে তখন তিনি প্রশান্ত চিত্তে ও নিরুদ্বেগে সে সকল সহ্য করিতে সক্ষম হন, কারণ তাঁহার কর্ম্মঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তমসের আবির্ভাবে সাধকের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু ইহাতে তাঁহাকে শান্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে মাত্র।

আর এক কথা তমসের আবির্ভাবের জন্য সাধকের দুঃখ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি অহঙ্কার বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, জগৎ কারণের সম্মুখে আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছেন; তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে তাঁহার পূজা গৃহিত হইয়াছে। জন্মজন্মান্তর হইতে সঞ্চিত যে আবর্জ্জণরাশী তাঁহার অভিমান ও অহঙ্কারকে পরিপুষ্ট করিতেছিল, আজ সেই আবর্জ্জণরাশী দগ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয় নিহিত বিশুদ্ধ কাঞ্চন বাহির করিবার জন্য পরম কারুণিক বিশ্বপিতা এই তমসাগ্নি প্রজ্জলিত করেন। তিনি কি এই বিষম অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন? যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের শ্রীচরণে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন তবে একদিন এ অন্ধকার অপসারিত হইবেই হইবে। শান্তির বিমল উৎস তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইবেই হইবে। তিনি নব জীবন লাভ করিয়া

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত দেখিবেন। কিন্তু হায়! এ সৌভাগ্য অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না, সহিষ্ণুতা অভাবে কত সাধকই তমসাবির্ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এবং যে তমস্ তাঁহাকে জ্যোতিতে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, পরিশেষে তাহাই তাঁহাকে বর্ত্তমান জীবনের জন্য চির অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত সংহার শক্তি (Destructive Forces) প্রতিনিয়ত জগতে ক্রীড়া করিতেছে উল্লিখিত তমস্ অনেক সময়ে তৎ সমূহের কার্য্য দ্বারা সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশের জন্য (Evolution) সৃষ্টি ও সংহার (Construction and Destruction) সংযোজন ও বিশ্লেষণ (Integration & Desintegration) উভয়েই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। আপাতদৃষ্টিতে যাহা বিঘ্নকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয় বস্তুত তাহা বিঘ্ন না করিয়া সহায়তাই করে। মৃত্যুই ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাস্তবিক মৃত্যু কি? উহা জন্মেরই দ্বার মাত্র। গুপ্তবিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে প্রত্যেক জাগতিক শক্তিই কোন একটী অদৃশ্য শরীরী (Intelligence)এর ক্রিয়া মাত্র। নির্ম্মাণ শক্তি ও সংহার শক্তি উভয়েই এইরূপে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা আরও জানেন যে, যে মুহূর্ত্তে কোন সাধক সাধারণ জীবকে অতিক্রম করিয়া সাধনারাজ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হন অমনি সংহারকারী বামমার্গী ভূতগণ (Dark powers) তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, এবং সাধন পথ বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। ক্রমবিকাশের উর্দ্ধগামী স্রোত রোধ করিয়া জড়ের আধিপত্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের কার্য্য। সেই জন্য যাঁহারা সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহাদিগকে ইহার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারাই গুপ্তবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাবলীতে (Mystic Books) সাধন পথের বিঘ্নকারী প্রাকৃত শক্তি (Powers of Nature) বলিয়া প্রায়ই বর্ণিত হইয়া থাকে। সাধন বিচ্যুতি ঘটাইবার জন্য ইহারা সাধকহৃদয়ে নৈরাশ্যের উদ্রেক করে, এবং তমস্ সঞ্চার করিয়া তাঁহার এরূপ চিত্ত বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়া দেয়, যে তিনি আপনাকে অসহায় ও পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সাধক যে আপনাকে নিঃসহায় বিবেচনা করেন তাহা ইহাদেরই স্পর্শ জন্য, যে সমস্ত নৈরাশ্য পূর্ণ চিন্তারাশি তাঁহাকে ব্যাকুল করে সে সকল ইহাদেরই বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি মাত্র।

সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে সাধককে একাকী এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যথার্থই কি তিনি নিঃসহায় কখনই না। মুক্তপুরুষগণের করুণা তাঁহার উপর সকল সময়েই বর্ষিত হই-তেছে। তবে অজ্ঞানবশতঃ সাধক তখন তাহা বুঝিতে পারেন না, তাই আপনাকে পরিত্যক্ত ও অসহায় বলিয়া বিবেচনা করেন।

যখন আমরা কোন মহাপুরুষ চরণাশ্রিত কোন শিষ্যের জীবন পর্য্যালোচনা করি তখন দেখিতে পাই যে উপরোক্ত কারণগুলি অতিরিক্ত আর একটা কারণ তাঁহার জীবনে কার্য্য করে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রবল হইতে থাকে। তাঁহার নিজ কৃত কর্ম্মশৃঙ্খল মোচন হইলে তিনি দুর্ব্বহ জাগতিক কর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী হন, তখন তিনি জগতের হিতার্থ বৃহত্তর সংহার শক্তি সমূহের সম্মুখিন হইতে আরম্ভ করেন, এবং মানব জাতীর রক্ষার্থ আত্মশক্তি দ্বারা যথাসম্ভব উহাদের বিনাশসাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। জগতের দুঃখ তাঁহাকে পেষণ করিতে থাকে। মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পাপসাগরে ভাসমান জীবের ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে থাকে। আর এই দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যও তিনি সচেষ্ট হন না কারণ উন্নত জ্ঞানালোকে তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি এবং জীবসমূহ একই প্রাণসূত্রে গাথা রহিয়াছেন—তাহাদের দুঃখরাশী তাঁহার নিজেরই সেই দুঃখের ভাগ লইয়া তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মফল হইতে মুক্ত করিতেছেন এবং তাহাদের উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি আর ইহাকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন না যত তিনি অগ্রসর হন ততই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সার্ব্বজনীন অনুকম্পা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে।

এই শ্রেণীর সাধক যখন মুক্তির বিমল জ্যোতি তুচ্ছ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনার্থ একাই অনৃতশক্তি সমূহের (Powes of Evil) বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তখন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ এই কার্য্য জগত্রাতাগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গুরুচরণাশ্রিত শিষ্যের জীবনেও এমন এক সময় আইসে, যখন এই মহান্ কার্য্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে। যে সংহার শক্তিসমূহ জগতে সামঞ্জস্যের বিদ্রোৎপাদন করিয়া থাকে সেই গুলিকে ক্রমশঃ আপনার মধ্যে টানিয়া লইতে অভ্যাস

করিয়া তিনি এই গুরুভার বহনের উপযোগীতা লাভ করিয়া থাকেন। এই রূপে ঐ সমস্ত শক্তি তাঁহার মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং তথায় পুনরায় সামঞ্জস্য হইয়া জগন্নির্ম্মাণ কার্য্যের সহয়তা করিবার জন্য পুনঃ প্রেরিত হয়। সাধকগণ প্রকৃতির রাসায়নিক পাত্র (Crusible) স্বরূপ। অনিষ্টোৎপাদন কারী প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ সমূহ তাহাদের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া মঙ্গলময় নূতন রূপ ধারণ করে। কিন্তু অনেক সময়ে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সাধককে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ কালে বিভিন্ন শক্তি নিচয়ের ঘাত প্রতিঘাত বশতঃ মিশ্রণাধারটি যেরূপ যায় যায় হইয়া উঠে, সাধকও সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত শক্তি সমূহের সংযোগ বিয়োগ ক্রিয়া প্রভাবে বিচলিত হইয়া উঠেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি যে সময়ে সময়ে এই তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া শতধা চূর্ণ হইয়া যান, তাহা আর বিচিত্র কি। দীর্ঘকাল এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া সাধকের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি ক্রমে আরও গুরুতর ভার গ্রহণের উপযোগী হন; যে ভয়াবহ তমসের কথা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহার অভ্যুদয়ে সাধক আপনাকে দেব ও মানব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মনে করেন, এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শান্তিলাভের আশায় সংজ্ঞা লোপের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন, এখন তিনি সে তমসও সহ্য করিবার উপযুক্ত হন। এই অবস্থায় পিচাশগণ তাঁহাকে এই স্বেচ্ছানুষ্ঠিত কঠোর ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানা রূপ প্রলোভন বাক্য কহিতে থাকে। তিনি যে বৃথা স্বেচ্ছায় এই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন, এবং মনে করিলে এক দণ্ডেই ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা যেন কে তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে থাকে। যদি সাধক এই প্রলোভন এড়াইতে না পারেন তাহা হইতে তাঁহার যন্ত্রণার শেষ হয় বটে, কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া যায়। আর যদি প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া তিনি এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাহা হইলে তাঁহার এই মহা যজ্ঞের ফল স্বরূপ জীবের ভার ঈষৎ লঘু হইয়া আইসে। পরহিত রূপ মহাব্রতের ইহাই নিয়ম। প্রভু যীশুকে ক্রুশে বদ্ধ দেখিয়া দুরাত্মারা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল "ইনি অপরকে ত্রাণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না" কিন্তু তাঁহাকে জানিত না যে আত্মবলিদান ভিন্ন কখনই পরহিত সাধিত হয় না।

কিন্তু এই পরীক্ষা এতই ভয়ানক যে, যে আশায় বুক বাঁধিয়া সাধক এতদিন সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে যেন তাহাও অন্তর্হিত হইতে থাকে, এবং দারুণ নৈরাশ্য আসিয়া একেবারে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তাঁহার মনে হয় যে বুঝি তিনি বৃথাই এত যন্ত্রনা সহ্য করিলেন, বুঝি যে জীবহিতের আশায় তিনি এই মার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নিতান্তই স্বপ্নবৎ অলীক ও ভিত্তিহীন। আর কখনও তিনি সানন্দ চিত্তে গুরু আজ্ঞা প্রতি পালন করিতে পারিবেন না; আর তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখক্লিষ্ট মানব হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার হইবেনা। তিনি সকলকে যে পন্থা অবলম্বন করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন আজ নিজে তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। চিরকাল প্রেমের মহাগীত গাইয়া আজ নিজে অন্ধকার গহ্বরে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। যদি এই অবস্থায় তিনি স্থির থাকিতে না পারেন তাহাহইলে তাঁহাকে সাধন ভ্রষ্ট হইতে হয়, এবং কিছুদিনের জন্য জগৎ একজন মহাপুরুষের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যদি এইরূপ দারুণ নৈরাশ্যে নিপতিত হইয়াও তিনি জগতের কল্যাণ কামনা করিতে থাকেন, এবং ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক জীবের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে অন্ধকার আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সহসা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিমল জ্যোতি তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে এবং শান্তি আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকে। তখন তিনি নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন বিশ্বাসের সহিত পুনরায় জগৎ কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন। মোহের শক্তি কতদুর, মায়ার স্বরূপ কি তাহা তিনি তখন কতক পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হন এবং এই জ্ঞানবলে ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে তমসের আবির্ভাবে ব্যাকুল হইতে হয় না। ইহাই তমসের মহাশিক্ষা এবং এইরূপ মহাসংগ্রাম করিয়া তবে মানব ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ মিত্র

ক্রোধ।
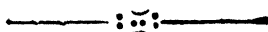
মনুষ্যের উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, যে যে বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি সম্ভবে এবং সেই সেই বিষয় পরস্পর কিরূপে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, এই কয়টিকথা আমাদের যতদূর পারা যায় ভাবিয়া দেখা উচিত নতুবা দূরদৃষ্টি অভাবে পর্য্যালোচনা অসম্পূর্ণ হইবে এবং সেই জন্য সিদ্ধান্তও একদেশিত হইবে।

এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের অনুধাবন করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় তিনটী বস্তু আমাদের অনুভূত হয় যথা—ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, ক্রোধের কারণ ও ক্রোধের বিষয়; ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ক্রুদ্ধ হইতে গেলে প্রথমেই দ্বৈতভাবের প্রকাশ হয় যথা আমি ও আমার প্রতিদ্বন্দী ব্যক্তি, এই দ্বৈত জ্ঞান না থাকিলে কখন ক্রোধের সম্ভাবনা হয় না, কারণ প্রতিদ্বন্দী অভাবে ক্রোধ করিবার বিষয় থাকে না কেহ কখন আপনার উপর ক্রোধ করে না, নিজের দোষ দেখিলে দুঃখ হয় বটে কিন্তু ক্রোধ হয় না, যেখানে এই প্রতিদ্বন্দিতা কম সেখানে ক্রোধের পরিমাণও কম হয় যথা আপন স্ত্রী বা পুত্র কন্যার উপর এই ক্রোধের বিকাশ কম হয়, কিন্তু যে আমার চিরশত্রু বা যাহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা ভাব অধিক ভাবে চলিতে থাকে তাহার উপর শীঘ্র রাগ হয় এবং সেই রাগ শীঘ্র শান্ত হয় না অতএব যাহারা ক্রোধের উপশম করিতে চান তাহাদের এই দ্বৈতভাব নাশ করিতে হইবে, যিনি এই ভাব নাশের সাধন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্রোধ স্বভাবতঃ হীন তেজ হয়।

ক্রোধের আর একটী উপাদান আছে যাহাকে আমি ক্রোধের কারণ বলিয়াছি এই কারণটি জানিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কারণ উপস্থিত বা প্রবল হইলেও সকলের ক্রোধের কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে ক্রোধের কারণ কোন একটী পার্থিব বস্তু, যে বস্তুতে প্রতিদ্বন্দিদ্বয়ের সমান আসক্তি সেই বস্তু ঐ দুই জনের মধ্যে কেহ নিজস্ব করিয়া লইলেই অপরের ক্রোধের কারণ হয় অথবা যাহা সমাজের

প্রথা অনুসারে বা অধিক কাল দখলের দ্বারায় এক বস্তুতে যখন এক ব্যক্তির অধিকার জন্মে তখন অন্য ব্যক্তি যদি লোভ পরবশ হইয়া বা তাহার ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির ঐ বস্তু ভোগে বাধা দেয় বা তাহাকে ঐ বস্তু হইতে বঞ্চিত করে তখনই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায় ; ইহার দ্বারা জানা গেল পার্থিব বস্তুর ভোগের বাধা পাওয়া বা বঞ্চিত হওয়াই ক্রোধের কারণ কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে জানা যায় যে পার্থিব বস্তু ক্রোধের প্রকৃত কারণ নয় ঐ বস্তুতে অত্যাসক্তিতাই ইহার কারণ। যেমন অপরে অর্থাপহরণ করিলে ক্রোধ হয় কিন্তু সন্তানে যদি ঐরূপ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রোধ হয় না কিন্তু অনেকানেক এরূপ কৃপণ ব্যক্তি আছেন যাহারা সন্তান দ্বারা অর্থ গ্রহণও সহ্য করিতে পারেন না ইহার কারণ অর্থে অত্যাসক্তি। অতএব দেখা গেল যদি পার্থিব বস্তুতে আসক্তি কমাইতে পারা যায় তাহা হইলে আর ক্রোধের কোন কারণ থাকে না। এবং আসক্তিই ক্রোধের কারণ আর আসক্তি ত্যাগেই ক্রোধের উপশম হয়।

উপরে ক্রোধের কারণ ও বিষয়ের বিষয় বলা হইয়াছে এক্ষণে ক্রোধের পরিণামের বিষয় ভাবা যাইতেছে। ইহার পরিণাম দুই প্রকার (১) ক্ষণিক (২) স্থায়ী, ক্ষণিক পরিণামের তিনটি ক্রম (১) মানসিক উত্তেজনা বা চিত্ত বিকাশ (২) শারীরিক উত্তেজনা বা স্নায়ু ভ্রু আদি কম্পন (৩) বহির্বিকাশ হস্তপদাদি সঞ্চালন বা কোন কার্য্য সাধন ; সাধারণ লোকে এই তিন অবস্থার মধ্যে শেষ দুইটি সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে প্রথমটি জানিতে পারা শিক্ষা সাপেক্ষ। কারণ মনের ভাব জানিতে গেলে লোকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, যখন কেহ ক্রোধ গোপন করিতে চাহেন না তখন মানসিক ভাব সহজেই শারীরিক ভাবে বিকশিত হওয়ায় তাহা সাধারণে জানিতে পারে কিন্তু যখন ঐ ভাব কেহ গোপন করিতে চান তখন মনোজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন তাহা জানিতে পারে না, অসভ্য জাতির পক্ষে ভাব গোপন স্বভাব সিদ্ধ নহে কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতা সহকারে যত কৃত্রিমতা বৰ্দ্ধিত হয় যত সত্যের অপলাপ হয় ততই ভাব গোপন স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই তিনটি ক্ষণিক ক্রোধের পরিণাম মধ্যে আবার দেখা যায় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে শেষটি অল্প স্থায়ী যেমন কেহ কাহাকে আঘাত করিলে ঐ কার্য্য শেষ

হয়। কিন্তু ঐ আঘাত করিবার সময় অপেক্ষা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্নায়ুর বিকার অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং কম্পনাদি অপেক্ষাও মানসিক বিকার অধিকক্ষণ স্থায়ী; অতএব দেখা যাইতেছে বাহ্য জগতে যাহার বিকাশ তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, যাহা অন্তর্জগতে বিকাশ পায় তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী।

পূর্ব্বে ক্রোধের অস্থায়ী পরিণামের বিষয় বলা গেল, এক্ষণে স্থায়ী পরিণামের বিষয় বলা যাইতেছে। লোকের যত ক্রোধের বিকাশ বেশী হয় ততই তাহার স্নায়ুর বিকার ও মানসিক বিকার অধিক হইতে থাকে; লোকে সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব খিট্‌খিটে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকার প্রকারেরও পরিবর্ত্তন হয়, যেমন একজন লোকের মুখ দেখিলেই তাহার স্বভাব রাগী কি শান্ত তাহা শীঘ্রই বুঝা যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ক্রোধের দ্বারায় যে কেবল বাহ্য জগতে কার্য্য হয় তাহা নয় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরে ও মনে ঐ কার্য্যের চিহ্ন রহিয়া যায়। এইসকলকে ক্রোধের স্থায়ীপরিণাম বলিয়াছি, কারণ যাহা শরীরগত বা মনগত হয় তাহা সহজে বিদূরিত হয় না। এই কারণ ক্রোধের অস্থায়ী পরিণাম অপেক্ষা স্থায়ী পরিণাম বড় অপকারী ও তাহা সকলেরই ত্যাজ্য।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে জানা গেল যে ক্রোধের পরিণাম জীবনান্ত অবধি থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা জন্মান্তরবাদী তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যে মানুষের বর্ত্তমান প্রকৃতি তাহার পূর্ব্ব জন্মের চেষ্টার অনুরূপ হয়; এই কারণে জগতে কাহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাহাকে জড়বুদ্ধি, কাহাকে ধর্ম্মাত্মা কাহাকে অধার্ম্মিক দেখা যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যদি এক ব্যক্তি ইহ জন্মে সর্ব্বদা ক্রোধের বশীভূত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ পর জন্মে তাহার স্বভাব ক্রোধন হইবে। এই পরিণাম বড় ভয়ানক। অতএব সকলেরই নিজের ভাবী প্রকৃতি গঠন বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ক্রোধ পরিবর্জ্জন করা উচিত।

আমি উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা ক্রোধের কর্ত্তা, কারণ ও বিষয়, এবং ক্রোধের পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি এক্ষণে, এই ক্রোধের সহিত ঈশ্বরের সৃষ্টি উদ্দেশ্যের কি সম্বন্ধ তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বিষয় চিন্তা করিতে গেলে সূক্ষ্মজগৎ ও স্থূলজগতের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মজগতের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্থূলজগতের বিষয় বিবেচনা

কয়া প্রয়োজন কারণ অনেকের সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই অতএব তাহাদের বুঝাইতে হইলে স্থূল জগতের বিষয়ই বলা উচিত।

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেইখানেই দেখি বস্তু সকলের পরিণাম সৌন্দর্য্য বা সুখ দান দেখা যায়। বীজের পরিণাম বৃক্ষ, বৃক্ষের পরিণাম পুষ্প পুষ্পের পরিণাম ফল। এইরূপ জীবের পরিণাম শৈশবে অপূর্ণ অর্ভক শরীর, যৌবনে বল ও সৌন্দর্য্য—বার্দ্ধক্যে তাহার ক্ষয় বা পতন। ইহার দ্বারা অনেকে মনে করিতে পারেন সৃষ্ট বস্তুর পরিণাম কি প্রকারে সৌন্দর্য্য হইতে পারে? কারণ পুষ্পের নাশ আছে, ফলের নাশ আছে, শেষ বৃক্ষের নাশ আছে আর যৌবনের পর বার্দ্ধক্য ও বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু কিন্তু যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহাদের ভাবা উচিত যে ফলের জন্ম দিয়া ফুল নষ্ট হয়, ফল পরিপক্ক হইয়া অনেক বীজের উৎপাদন করিয়া সে আপন কার্য্য সাধন করে, মনুষ্যও সেইরূপ যৌবনে আপন কার্য্য সাধন করিয়া বার্দ্ধক্যে জ্ঞান পর্য্যালোচনায় পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করেন। এই দেহ অনিত্য। জীব দেহ দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া পরবর্ত্তী জীবে বা বীজে আপন শক্তি সংক্রামিত করিয়া দেহ ত্যাগ করে। আর ডারুইন সাহেবের মত মানিতে গেলে বানরের পরিণাম মনুষ্য ধরিতে হয়, আর অধ্যাত্ম-শাস্ত্র মানিতে গেলে শরীরেরও নাশ নাই ভাবিতে হয়, পদার্থের নাশ নাই, ভাবের অভাব হয় না অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র পরমাণু সকল জীবের দেহ সংস্পর্শে জীবের মানসিক উন্নতির সহিত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উন্নত জীবের দেহ গঠনের উপযোগী হয় এবং যখন কোন উন্নত জীব জন্ম গ্রহণ করিতে চায় তখন তাহার দেহের উপাদান ভূত হইয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, অতএব সকলদিকেই উন্নতি স্রোত বা সুখের স্রোত প্রবাহিত। কারণ উন্নতিই সুখের কারণ অধোগতি বা স্থিতি অসুখের কারণ। অতএব যদি অধ্যাত্ম-বিদ্যা দ্বারা পদার্থের ক্রমোন্নতি প্রমাণীকৃত হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা জীবের সুখ ও জগতের মঙ্গল বিষয় প্রমাণ হয়। এই সুখ বা উন্নতিই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্থির হইল তবে ক্রোধের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যের কি ক্ষতি হয় তাহা বিচার করা উচিত।

দেখা যায় যে উন্নতি বা সুখের প্রধান উপাদান সামঞ্জস্য। চতুর্দ্দিকে যতই শক্তি বিরাজ করে ততই লোক উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া সুখ ভোগ

করে ও চতুর্দ্দিগে সুখ বিস্তীর্ণ করে। আর যেখানে অসামঞ্জস্য বা প্রতি-দ্বন্দিতা যত প্রবল, সেখানে সেই পরিমাণে অশান্তি বিরাজ করে আর সেই-খানেই অসন্তোষ, অসুখ ও অবনতি; আবার পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে প্রতিদ্বন্দি-তাই ক্রোধের কারণ অতএব কার্য্য কারণ বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে ক্রোধের কারণ প্রতিদ্বন্দিতা ও বাধা এবং ক্রোধের দ্বারা অধিকতর বাধা বা প্রতিদ্বন্দিতার উৎপত্তি হয় অতএব ক্রোধ যে অশান্তি ও অবনতির কারণ এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিঘ্নকারী তাহা প্রতিপন্ন হইল। অতএব অত্যন্ত স্থূলদর্শীরাও ক্রোধকে জগতের অমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

কিন্তু যাহারা সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহারা স্থূলজগৎ ছাড়া সূক্ষ্মজগতে (Astral World) বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জানেন যে ক্রোধের দ্বারা যে কেবল নিজের দৈহিক ও মানসিক ও স্থূলভৌতিক জাগতিক বিকৃতি হয় তাহা নয়, তাঁহার সূক্ষ্মজগতেও বিষম বিকৃতি উপস্থিত হয়। ক্রোধ দ্বারা বাহ্যজগতে যেমন ক্রোধের পরিণাম ক্রোধের উত্তেজনা ও বস্তু নাশ প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ সূক্ষ্মজগতেও ক্রোধের দ্বারা মনুষ্য অসংখ্য অসংখ্য সূক্ষ্ম হিতাহিত জ্ঞান রহিত দেবাণু (Elementals) সৃষ্টি করেন,—যাহাদের স্বভাব ক্রোধন এবং যাহা ক্রোধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ অধিকতর উদ্রেক করিয়া তাহাদিগকে অনিষ্টকর কার্য্যে রত করে, যথা হটাৎ রাগের দ্বারা লোকে হত্যাদি করিয়া থাকে, ঐ সকল (Elementals) দেবাণুগণের জীবনও স্থায়ীত্ব ক্রোধের উৎকটতার (Intensity) উপর নির্ভর করে এবং তাহারা জীবিত থাকিয়া ক্রোধের বৃদ্ধি করে ও ক্রোধের দ্বারা পুষ্ট হয়, এই কারণ সূক্ষ্মজগৎবিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ক্রোধ বর্জ্জন করেন।

ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যাহারা স্থূলজগতের বা সূক্ষ্মজগতের বা নিজ দৈহিক ও মানসিক-উন্নতির প্রার্থী, তাঁহারা ক্রোধের দমন করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া সুখে জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আর যাঁহারা এই তত্ত্ব না বুঝিয়া ক্রোধ পরায়ণ হন, তাহারা ভগবানের উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া আপনার ও সংসারের অনিষ্ট সাধন করেন। এই কারণ প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়ঃ! বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ গী ৩।৩৬

হে বার্ষ্ণেয়! কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পুরুষ পাপে রত হয়, এমন কি অনিচ্ছা করিলেও যেন বলপূর্ব্বক সেই কর্ম্মে নিয়োজিত হয়, ইহা কে করায়। এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—

কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনোমহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩।৩৭।

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে।২।৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সাম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥২।৬৩

শাক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুংপ্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥৫।২৩

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।১৬।২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততোযাতি পরাং গতিং॥১৬।২২

রজঃগুণ সমুদ্ভুত, সর্ব্বনাশী, অত্যন্ত পাপকারী কামনা ও ক্রোধ ইহলোকে মনুষ্যের পরমবৈরী। বিষয় চিন্তার দ্বারা বিষয়ে আসক্তির আবির্ভাব আসক্তি হইতে কামনার প্রতিবন্ধকতা হেতু ক্রোধ, ক্রোধের দ্বারা মোহ বা অজ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা স্মরণশক্তির বিনাশ, স্মরণশক্তি বিনাশ দ্বারা বুদ্ধিনাশ ও তৎপরে বিনষ্ট হইতে হয়। যিনি শরীর নাশ পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধের উদ্বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনি মুক্ত ও সুখী হন। আত্মনাশকারী কাম ক্রোধ ও লোভ রূপ নরকের তিনটি দ্বার আছে। তাহা সর্ব্বোতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই তিনটি

যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তিনি আত্মার শ্রেয়ঃ সাধন করিবেন ও পরম গতি লাভ করিবেন।

অতএব পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এবং এই ভগবৎ বাক্য দ্বারায় যাহা দৃঢ়ীকৃত হইল তাহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে কি সুখাভিলাষী, কি উন্নতি অভিলাষী, কি জগতের মঙ্গলকামী ও আত্মজ্ঞানী সকলেরই এই নরক দ্বারস্বরূপ ক্রোধকে ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে শান্তি ও সামঞ্জস্য পোষণ করিয়া বিশ্বপ্রেমিক সচ্চিদানন্দ ভগবানের ভব সংসারে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাঁহার সৃষ্টির কৌশল বিস্তার ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন উদ্দেশে সংসার যাত্রা করিতে করিতে তাহারই স্মরণ লওয়া উচিত। ইহাই ভক্তির চরম। যেহেতু ভগবান বলিয়াছেন — মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ॥১১।৫৫

যিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি সকল রকম আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত হয়েন, যিনি মৎপরম অর্থাৎ আমাতে (ঈশ্বরেতে)ই আত্ম সমর্পণ করেন, যিনি সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর অর্থাৎ যিনি কাহারও বৈরী নন—কাহাকেও দ্বেষ করেন না—সর্ব্বভূতে অভেদজ্ঞান (ভেদজ্ঞান হইতে ভয় ও ক্রোধাদি উদ্ভূত হয়)—— আত্মজ্ঞান, তিনিই আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অতএব কি ভক্তিকামী, কি মুক্তিকামী সকলেরই ক্রোধ জয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস।

সাবিত্রীতত্ত্ব*

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সমালোচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, অনুদিন, অনুক্ষণ স্মরণীয় সাবিত্রী চরিত্রের আলোচনা করিয়া "সাবিত্রী তত্ত্ব" নামে একখানি অপূর্ব্ব চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। সাবিত্রী চরিত্র যে ভাবে

*শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১৷০। ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

কেহ কখন ভাবেন নাই, যাহা এতদিন কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই, অসাধারণ চিন্তাশীল লেখক সেই সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন; সেই সকল তথ্য তাঁহার অমূল্য সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা অবাক্ হইয়া তাহা পড়িতেছি ও ভাবিতেছি। যতই পড়ি, শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, আনন্দে বিভোর হইয়া যাই, বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা কাশীদাসের মহাভারতে সাবিত্রী উপাখ্যানে সাবিত্রী ও সত্যবান চরিত্রের বিকৃত চিত্র দেখিয়াছি মাত্র; সংস্কৃত মহাভারতের উপাখ্যান ভাগ তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকারের; মূল উপাখ্যান অবলম্বনেই "সাবিত্রী-তত্ত্ব" লিখিত হইয়াছে। ইহা মনগড়া 'তত্ত্ব' বাহির করা নহে; প্রকৃত ঘটনার বিচিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা। হিন্দুমাত্রেরই নিকট সাবিত্রী পরম ভক্তির পাত্রী, পূজার সামগ্রী। কিন্তু সে ভক্তিতে যে টুকু খুঁত ছিল, সে আখ্যানে যে টুকু সংশয় ছিল, সাবিত্রীতত্ত্ব পড়িয়া সে খুঁত মুছিয়া যাইবে, সে সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে। মৃত পতির পুনঃ জীবনলাভরূপ ঘটনা যাহা সাবিত্রী উপাখ্যানে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ছিল, সূক্ষ্মদর্শী লেখক তাহা সম্ভব স্বাভাবিক বলিয়া সুন্দররূপে, সরলভাবে, অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ করিয়াছেন। সাবিত্রী চরিত আর অমানুষিক চিত্র নহে।

সাবিত্রীর জন্মপ্রসঙ্গে লেখক যে সকল গভীর তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, সে সব বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়, পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, তিনি প্রকারান্তরে ম্যালথসের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি মতের কেমন সহজ, সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এখন মানুষের অভাব হইয়াছে। কি উপায়ে মানুষের মত মানুষ জন্মিবে, প্রতি বংশে বংশধর জন্ম গ্রহণ করিবে, প্রথম অধ্যায়ে আমরা সেই মহাশিক্ষা পাইব। বংশধর লাভের কথায় চন্দ্রনাথ বাবু বাল্যবিবাহ, যৌবনবিবাহ, অপক্ব বীজ, পক্ব বীজ, রুগ্ন সন্তান, বলিষ্ঠ সন্তান, অল্পজীবী, দীর্ঘজীবী প্রভৃতি এতদিনের সব বাকবিতণ্ডা, তর্ক, গণ্ডগোল সমস্ত মিটাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃত বংশধর লাভ করিতে হইলে যে সব নিয়ম পালন করিতে হইবে, যেরূপ সংযমী হইতে হইবে, যতটা জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে; সুসন্তান লাভের প্রত্যাশায়, বংশধর লাভের উচ্চাশায়, নিজ নিজ চরিত্রোন্নতি এবং যে সকল সংবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে,

রাজা অশ্বপতির প্রসঙ্গে গ্রন্থকার তাহা সুললিত ভাষায়, সরলভাবে বুঝাইয়াছেন, বলিষ্ঠ অথচ গুণী, ধার্ম্মিক, কৃতীপুত্র কিরূপে হইবে, তাহা দেখাইয়াছেন। এই অধ্যায়ে আমরা আর একটী জ্ঞান লাভ করিব ; সেটি আহার তত্ত্বের কথা। সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য, কোন নিয়ম বা ব্রত পালনার্থ, কোন সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া, কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধে হিন্দু নরনারীর বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে যে উপবাস করার প্রথা ও অভ্যাস আছে, তাহাতে কঠোরতা, অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র নাই। হিন্দুর তাহাতে দৈহিক অনিষ্ট করে নাই; বরং উন্নতিই করিতেছে ; হিন্দু তাহাতে মরে নাই, বরং বাঁচিতেছে ; হিন্দুর পরমায়ু তাহাতে হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিধবার জন্য দেশহিতৈষীগণের অপরিমিত অশ্রু বিসর্জ্জনের আর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন দেখি না।

সাবিত্রীর বিবাহ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। বেদের দু চারিটী ঋকে স্ত্রী জাতির যৌবন বিবাহের ব্যবস্থা আছে এবং সাবিত্রীর মত সাধ্বী কয়েকটী রমণীর যৌবনোদ্গমে বিবাহের কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়, এইরূপ যুক্তি ধরিয়া অধুনা যাঁহারা বিলাতী অনুকরণে আমাদের দেশে যৌবনবিবাহ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী তিনি তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনুষ্য জগতে সাবিত্রীর মত পতিব্রতা, ধর্ম্মৈকপ্রাণা, মনোময়ী চিন্ময়ী, জ্ঞানময়ী নারী দুর্লভ। সেই সাবিত্রী যৌবনকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিলেন বলিয়াই পিত্রাদেশ—"যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও, এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমারে সম্প্রদান করিব।"—রক্ষা করিতে বিস্মিত হইয়াছিলেন ; বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, প্রবীণ মন্ত্রীদিগের সহিত পাত্রান্বেষণে গিয়াও সত্যবানকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। যৌবনবিবাহে এত সঙ্কট বুঝিয়াই হিন্দুসমাজে গোভিল প্রভৃতি ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে যৌবন-বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সমাজের নীতি ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে নারীজাতির বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। তা ছাড়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের যৌবনবিবাহ এবং আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের যৌবনবিবাহে আকাশ পাতাল প্রভেদ ; সাবিত্রী তত্ত্ব পাঠে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বনবাসী দরিদ্র দ্যুমৎসেনের বধূ হইয়া অশ্বপতি রাজদুহিতা সাবিত্রী বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আজি বঙ্গের গৃহে গৃহে তদনুকরণের সময় আসিয়াছে। যে সকল কারণে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের, সর্ব্ব প্রকার সৎবৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও বিকাশের ক্ষেত্র হিন্দু পরিবার প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ধনী পুত্রবধূ তাহার অন্যতম কারণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সব দোষ বধূর নহে। যদি পূর্ব্বের মত ধনীতে ধনীতে মধ্যবিত্তে মধ্যবিত্তে, দরিদ্রে দরিদ্রে, বিবাহ হইত, এ অনিষ্টও ঘটিতে পারিত না। এখন সকল বিষয়ে যেমন 'চাল' বাড়িতেছে, মধ্যবিত্তের ধনীর সহিত কুটুম্বিতার সাধ ও 'চাল' ক্রমে প্রবল হইতেছে; তাহাই যত অনর্থের মূল। কিন্তু সাবিত্রী ত সর্ব্বধনীর শ্রেষ্ঠ মহারাজ অশ্বপতির কন্যা হইয়া পর্ণ কুটীর বাসী দ্যুমৎসেনের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। এত বিসদৃশ কুটুম্বিতাতেও তাঁহার নম্র প্রকৃতি, বিনয়, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, করুণা প্রভৃতি সবগুণই পূর্ণ মাত্রায় ছিল; তাঁহাতে ত দম্ভ অহঙ্কারের লেশমাত্র ও ছিল না। অমন ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজের কন্যা হইয়াও তিনি মাটীর মানুষ ছিলেন; ধনীর কন্যা হইয়াও কেমন করিয়া শ্বশুরঘর করিতে হয়, সে দৃষ্টান্ত সমগ্র নারীজাতিকে দেখাইয়া গিয়াছেন; ধনের গর্ব্ব ত তাঁহার হয় নাই। ধনের অনিত্যতা জ্ঞান না জন্মিলে ধনের গর্ব্ব যায় না; ধর্ম্মময়প্রাণ না হইলে মানুষ নম্র, বিনয়ী, অহমিকাশূন্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজে কেবল ধনীর কন্যা গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী নহেন, নির্ধনীর কন্যাও গর্ব্বিতা ও অহঙ্কৃতা। ধনীর কন্যার মত তিনিও হিংসুক, ঈর্ষাপরায়ণা, ক্রোধী ও কলহপ্রিয়া হইয়া সংসার চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন। অহঙ্কার ও গর্ব্ব এখন আমাদের জাতির বিশেষত্ব হইয়াছে। কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চিত হইলে, দু চারিটী পাশ করিলে, একটু উচ্চ পদ পাইলে আমাদের এবং আমাদের অপেক্ষা আমাদের স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির অহঙ্কারের সীমা থাকে না। যে দিকে চাহিবে, অবস্থা নির্ব্বিশেষে, এখন সকলেরই মুখে গর্ব্ব ভাব সকলেরই আচরণে অহঙ্কার যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আমাদের মতে, যে যত ধর্ম্মে আস্থাহীন এবং যাহার ভগবানে ও ভগবানের নিয়মে যত কম বিশ্বাস ও নির্ভরতা সে তত গর্ব্বিত, তত দাম্ভিক, তত অহঙ্কারী।

সাবিত্রীর পাতিব্রত্য প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু সতীত্ব, পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের মতের কিছু অনৈক্য হইয়াছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলি, আমার ধর্ম্ম আমি রাখিব, আমার সতীত্ব রক্ষা কেবল আমার স্বামীর জন্য নহে, আমার নিজের ইহকাল পরকাল রক্ষার জন্য, এই ভাবিয়া এই মহাজ্ঞানে কেবল হিন্দুনারীই সতী হইতে পারেন বটে, কিন্তু যে স্ত্রী পতিকে ভালবাসেন না, তাঁহার পক্ষে সে হৃদয়বল—সে ধর্ম্মবল, সম্ভবে না। কারণ যে হিন্দুধর্ম্মের পরকালবাদ ও কর্ম্মফল-বাদ সতীকে উল্লিখিত সতীত্ব শিক্ষা দিয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্মই তাঁহাকে শিখাই-য়াছে, পতি কুৎসিৎ হউন, দুশ্চরিত্র হউন, বৃদ্ধ হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে ও ভালবাসিবে। সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিকে না ভালবাসিয়া সতী থাকা যায় না। যে কারণেই হউক, যে নারীর পতিকে ভাল বাসিবার শক্তি নাই, সে নারীর পতিকে ভাল না বাসিয়া পরপুরুষে স্পৃহাশূন্য থাকিবার হৃদয়বলও নাই। সেরূপ রমণী অতি বিরল। উৎকৃষ্ট হিন্দু পরিবার প্রথার গুণে, সমাজের সুশাসনে শুভাদৃষ্ট ফলে পতিতে বীতশ্রদ্ধ দু' একটী নারী আজীবন সতীত্ব রাখিয়া জীবন কাটাইয়া গেলেও তাহা কি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে? পাঁচরকমে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন, পতিকেও ভালবাসেন (কিন্তু পতিব্রতা নহেন) অথচ পর পুরুষে অনুরাগিণী এরূপ নারীর সংখ্যাও কম নহে। বিশেষতঃ মনের পাপও যখন পাপ, বাক্যেও যখন পাপানুষ্ঠান হয়, তখন পরপুরুষে অনুরাগিণী নারী সতী পদ বাচ্যা হইতে পারেন না। চন্দ্রনাথ বাবুর পাতিব্রত্যের ব্যাখ্যা আমরা শিরোধার্য্য করি; ইহা তাঁহার মত প্রগাঢ় অন্তর্দর্শী লেখকের যোগ্যই হইয়াছে।

সত্যবানকে মনোনয়ন করিবার পর নারদের উক্তি শুনিয়া ও পিতার অনুরোধপালনে অক্ষমতা জানাইয়া সাবিত্রী যে সতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সতীত্বের সে ভাব নাই; লেখক এ কথা ঠিকই বলিয়াছেন। আমরাও বলি, কায়মনোবাক্যে সতী ভারত ছাড়া আর কোথাও জন্মিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রভাব বড় বিষম, দৃষ্টান্ত বড় প্রলোভনীয়; তাই সাবিত্রীতত্ত্বের মত পুস্তকের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

আধুনিক ও পুরাকালিক পতিপ্রেম চিত্রের তুলনা করিয়া ১০২ পৃষ্ঠা হইতে ১১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে

পারিলে মনের ক্ষোভ মিটিত; কিন্তু স্থানাভাব। আমরা প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে সেই অংশ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন, যে প্রেম-চিত্রে কেবলমাত্র বক্তৃতা, হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চুম্বনাদি আছে; যে প্রেমে পতির কার্য্য করা নাই, পতিকে অনুসরণ নাই, পতিকে অনুকরণ নাই, সে প্রেম বড় লঘু, বড় বিসদৃশ, তাহার গভীরতা নাই; সে প্রেম জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না। আমরা বাহ্যিক প্রেমালাপ ও প্রেমের বক্তৃতা অপেক্ষা পতির প্রীতিকর আহার্য্য প্রস্তুত করা, সুস্থ ও অসুস্থ উভয়াবস্থাতেই পতির সেবা শুশ্রূষা করা গাঢ়তর প্রেমের নিদর্শন মনে করি। পতির সকল সদনুষ্ঠানে প্রসন্নমনে যোগদান করিয়া, পতি যাঁহাকে ভক্তি করেন তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, যাঁহাকে স্নেহ করেন তাঁহাকে স্নেহ করিয়া, যাঁহাকে যত্ন করেন, তাঁহাকে যত্ন করিয়া পতির অণুকরণ করা পতি-প্রেমিকা ও পতিব্রতার কার্য্য মনে করি। সকল বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, অন্তর্দর্শী, প্রকৃত প্রেমিক মাত্রেই তাহা মনে করেন। তাই সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার ঠিক বলিয়াছেন "যে রমণী পতির পিতামাতা প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অনাদর বা অযত্ন করেন, তিনি পতিকে লইয়া থাকিলেও পতিব্রতাও নহেন, পতিপ্রেমিকাও নহেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গে এরূপ নারীর সংখ্যাই বাড়িয়া যাইতেছে।"

সাবিত্রী পতিকে পুনর্জীবিত করাইবার জন্য যে ত্রিলোকবিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন, এই পাপযুগে, এই ঘোর অসংযমের, সর্ব্বপ্রকার সাধনার অভাবের কালে সাবিত্রীর সে কার্য্য অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সাবিত্রীর যুগে কিছুমাত্র অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ছিল না। তথাপি সে ঘটনা প্রকৃত হইলেও সে যুগেও সাবিত্রীর তুল্য শক্তি-শালিনী সতী বিরল ছিলেন। কারণ অশ্বপতির মত "পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা দ্যুতিমান, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাত্মা, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাগশীল, বদান্যগণের অগ্রগণ্য, দক্ষ, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে নিরত রাজাকেও ১৮ বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য, নিয়মিতাহার, ইন্দ্রিয়দমন করিয়া প্রতিদিন লক্ষবার সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া তবে সাবিত্রী দেবীর বরে সাবিত্রীর মত কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল। যেমন সাধনা তেমনি সিদ্ধি। বংশধর লাভের জন্য এমন করিয়া কেহ সাধনাও করেন নাই, এমন

ফলও কেহ পান নাই। পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া হিন্দু সতীর অকস্মাৎ প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে; অনেকে বা আত্মহত্যা করিয়া দুর্ব্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন বটে; কিন্তু সাবিত্রীর শক্তি তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক, সাবিত্রীর পতিপরায়ণতা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক। পতির মৃত্যুর দিনের কথা শুনিয়া পতিগত প্রাণার অমানুষিক সহিষ্ণুতা ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, এইরূপ করিয়া এক বৎসরকাল অসহ্য কষ্ট দুঃসহ মর্ম্মবেদনা, নীরবে সহ্য করিতে জগতে কোন সতী কি পারিয়াছিলেন? সীতাকে অনেক দীর্ঘতর কালব্যাপী যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ধরণের ক্লেশ, এরূপ ধরণের মর্ম্মবেদনা তাঁহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই; সীতাদেবীকে পতির নিশ্চিত অকালমৃত্যুর ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। পতিব্রতার পক্ষে তদপেক্ষা কষ্ট কি আর আছে।

এতদিন যমের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল, সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক লেখক সে ভ্রমপূর্ণ ধারণা অপনীত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হয়, যেন কাব্য পড়িতেছি। তাহার কি গাম্ভীর্য্য, কি মর্ম্মস্পর্শী বাক্য স্তবক, হৃদয়ের কি পবিত্র উচ্ছ্বাস। কাশীদাসের মহাভারত পাঠকগণ জানেন যে, প্রথমে যমদূতগণ সত্যবানকে লইতে আসিয়া সতীত্ব প্রভায় প্রভান্বিতা সাবিত্রীর তেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে অগ্রসর হইতে পারে নাই; তাহারা প্রত্যাগমন করিলে ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং সত্যবানকে লইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা স্বয়ং যমের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে "এই সত্যবান ধর্ম্মসংযুক্ত, রূপবান্ ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন, এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং আসিয়াছি।" পাপীর শাসনের জন্য যমকে কঠোর ও নিষ্ঠুর হইতে হয় বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকের প্রতি তাঁহার কত করুণা, কত দয়া, তাঁহার হৃদয় কত কোমল, কেমন কমনীয়, তিনি ধার্ম্মিকের কতটা সম্মান করেন, ধার্ম্মিকের কতদূর শুভানুধ্যায়ী তাহা উল্লিখিত কথায় সাবিত্রীর সহিত সম্ভাষণে, তাঁহাকে সান্ত্বনায় তাঁহাকে বরদান কালে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গিয়াছে। "ধার্ম্মিকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যম মহানিয়তি উড়াইয়া দিলেন"—মৃত সত্যবানের প্রাণদান করিলেন। নিয়তি

খণ্ডন কেহ কখন করিতে পারে নাই; ইহা মানবের ধারণায় আসে না। করুণার আধার যম সেই নিয়তি খণ্ডন করিলেন।

আজ ইউরোপে প্রাকৃতিক শক্তির যেরূপ আধিপত্য, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্যেরা যে অঘটন ঘটনা ঘটাইতেছেন, এককালে ধর্ম্মভূমি ভারত ভূমিতে হিন্দুগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সেইরূপ এবং তদপেক্ষা বহুগুণ বিস্ময়জনক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যাবতীয় পুরাণাদিতে তাহার অনেক বর্ণনা আছে। পুরাণে লিপিবদ্ধ হয় নাই, এমন সহস্র সহস্র ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং এখনও মধ্যে মধ্যে ঘটে। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মগতপ্রাণ যাঁহাদের পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে রিপুগুলি যাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত, এবং ভগবানে যাঁহাদের অমোঘ ও অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তি, সেরূপ অতি অল্প সংখ্যক মহাত্মাগণের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় আজিও পাওয়া যায়। জড়বিজ্ঞানের ন্যায় ইহা প্রত্যক্ষ প্রকৃত ঘটনা। অলৌকিক ঘটনার মর্ম্ম যাঁহারা পরিজ্ঞাত, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাদের জন্য এ অধ্যায় লিখেন নাই। যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের অতীত কিছু জানেন না ও জানিতে চাহেন না, যাঁহারা ধর্ম্মে আস্থাহীন অথবা নাস্তিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে যাঁহারা বিশ্বাসহীন সেই সকল একদেশ দর্শীদিগের জন্যই তিনি এত পরিশ্রম করিয়া ছেন। তিনি প্রতিপদে প্রমাণের সহিত বুঝাইয়াছেন, আধ্যাত্মিক শক্তির অভাবে আমরা দেখিতে পাইনা এবং বুঝিতে পারি না বটে' কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি কর্তৃক চিরদিন নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি আধ্যাত্মিক বলে জড়প্রকৃতি পরাস্ত, পরিস্কৃত, পরিমার্জ্জিত, ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। জগতে যে জড় দেখিতে পাওয়া যায়, চিন্ময়ের প্রকাশিত সেই জড়জগতেও চৈতন্য আছে। জড় প্রকৃতির অদ্ভুত শক্তি, গুণ ও সম্মিলিত ক্রিয়াপ্রণালী দেখিয়া আমরা এই উনবিংশ শতাব্দিতে চমৎকৃত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতেছি; কিন্তু যখন বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সম্মিলিত ক্রিয়া হয়, তখন আরও কত বিস্ময়ের কারণ হয়; তখন মানবমণ্ডলীকে শতগুণ বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হয় না কি? কিন্তু সে অদ্ভুত শক্তির মর্ম্ম কয়জন বুঝিতে পারেন? যাঁহাদের সাধনাবলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি জন্মিয়াছে, কেবল তাঁহারাই সে শক্তির ফলাফলের নিগূঢ়

তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণে সক্ষম। জড়বিজ্ঞানবাদীই হউন বা দার্শনিকই হউন, এই অধ্যায়পর্ব্বে সকলেই লেখকের যুক্তিপ্রণালী ও বিশ্লেষণ শক্তির শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এত পাণ্ডিত্য এত জ্ঞান বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ দুরূহ ও জটিল তত্ত্ব চন্দ্রনাথ বাবু জলের মত বুঝাইয়াছেন, এমন সরল ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা অতি অল্প গ্রন্থকারেরই আছে। সাবিত্রী কথার অলৌকিকতার অবতারণার তাঁহার আর একটী উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়। হিন্দুর পরকালবাদ ও কর্ম্মফলবাদ, যাহা এক দিন পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতি অবলম্বন করিবেন, সেই পরকালবাদ ও কর্ম্মফলবাদ মতে নিয়তিখণ্ডন কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত অসম্ভব। সাবিত্রীও সে কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার মত সাধ্বী, পতিব্রতারও এক বৎসর কাল বৈধব্যাশঙ্কার যন্ত্রণা ও মর্ম্মদাহ কিয়ৎপরিমাণে বৈধব্যাবস্থারই সমতুল। তারপর তাঁহারই ক্রোড়ে তাঁহার পতির মৃত্যু হইল। যম পতিকে লইতে আসিলেন, সাবিত্রীর হৃদয় ভাঙ্গে নাই সত্য, কিন্তু ভাঙ্গিবার অবশেষ আর কিছু রহিল কি? এই পর্য্যন্ত সাবিত্রীর কর্ম্মফল ভোগ হইল; ঈশ্বরের নিয়ম—নিয়তি এই পর্য্যন্ত ফলিল, আঠার বৎসর ব্যাপী কঠোর ব্রত পালনের ফলে জাতা, সাবিত্রী দেবীর বরে উৎপন্না আজীবন নিষ্পাপদেহা, অসীম আধ্যাত্মিক শক্তিশালিনী, নিজে কঠোর ব্রতপরায়ণা সাবিত্রীর উপর নিয়তির প্রভাব আর খাটিল না। তাঁহার পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফল কাটিয়া গেল; ইহজন্মের পুণ্যকর্ম্ম পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। মানব মাত্রেই পাপী—হতাশ পাপীর ইহা বড় আশ্বাসের সংবাদ, বড় শান্তনার বাণী। গ্রন্থকারের সাবিত্রী কথার অলৌকিকতার অবতারণার ইহা মহত্তর উদ্দেশ্য।

চন্দ্রনাথ বাবু শেষ অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন, সাবিত্রী কি উপাদানে গঠিত। তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি সাবিত্রীর স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। ভক্ত যেমন ভগবানের ভাবে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইয়া যান, বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যান, তাঁহার সেইরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে; সাবিত্রীর চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন জগদান্তরে গিয়া পড়িয়াছেন। তাই শেষ অধ্যায়ের ভাষার এত সৌন্দর্য্য, এত লালিত্য, এত মাধুর্য্য; তাই তাহার ভাবের এত গভীরতা,

এত ঔদার্য্য, এত পবিত্রতা। ১৮ বৎসর ব্যাপী কঠোর ব্রত পালনে সাত্বিকতা প্রাপ্ত, সাক্ষাৎ সাবিত্রী দেবীর বরে জাতা সাবিত্রীতে ও সাত্বিক ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের বিন্দুমাত্র স্থান পায় নাই। শারীরিক তৃপ্তি, শারীরিক সুখের দিকে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না; অন্তরের সৌন্দর্য্যে অন্তরের ভাবে তিনি ওতঃপ্রোত ছিলেন। লেখক বড় ঠিক কথা বলিয়াছেন, "সাবিত্রী মনোময়ী, চিন্ময়ী, জ্ঞানময়ী ছিলেন।" তাঁহার ধর্ম্মের কাছে, কর্ত্তব্য জ্ঞানের কাছে শারীরিক কষ্ট তৃণাদপি তুচ্ছ ছিল, তাই সত্যবানের মৃত্যু রজনীতে তিনি মহাবীরপুরুষের অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন; অমানুষিক আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তিনি শরীরের দ্বারা অসাধ্য কার্য্য শরীরের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

জীবনাখ্যায়িকা লেখা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গ সাহিত্যসেবী মাত্রেই বিশেষরূপে তাহা প্রণিধান করিবেন; তাহা কতদূর সত্য, কতদূর হিতজনক তাহা নিরপেক্ষ, জ্ঞানী, অন্তর্দর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। স্থানাভাবে আমরা তদালোচনায় বিরত হইলাম।

পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা রহিল, ইহার প্রত্যেক পত্রের প্রত্যেক ছত্র বুঝিবার ও শিখিবার বিষয়। বহুকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ পুস্তক বাহির হয় নাই। দরিদ্র বাঙ্গালীর বড় সৌভাগ্য আজ তাহার এমন মহারত্ন লাভ হইল।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা
বা
বিশাখার উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আবরণী নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে পর ধনঞ্জয় বিশাখাকে যৌতুক দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পাঁচশত শকট অর্থে, পাঁচশত শকট স্বর্ণপাত্রে পাঁচশত

শকট রৌপ্যপাত্রে, পাঁচশত তাম্রপাত্রে, পাঁচশত পশম বস্ত্রে, পাঁচশত ঘৃতে, পাঁচশত চাউলে এবং পাঁচশত হল ও কৃষিযন্ত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচশত রথারূঢ়া সুন্দরী দাসী তাহার আহার, অবগাহন এবং বেশ বিন্যাসের নিমিত্ত দিলেন।

অনন্তর তিনি তাঁহার কন্যাকে কতকগুলি গো মেষাদি প্রদান করিতে স্থির সংকল্প করিয়া অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন 'আমার ক্ষুদ্র গোগৃহের দ্বার খুলিয়া দাও এবং অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর বাদ্যসহ তোমরা অবস্থান কর। একশত চল্লিশ হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়া গাভীগণ নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে তোমরা বাদ্য নিনাদ দ্বারা তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে।

তাহারা ঐরূপ করিল। গাভীদল গোশালা হইতে পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় গমন করিলে সীমাস্থিত লোকেরা বাদ্য নিনাদ করিতে লাগিল। এইরূপ দেড়ক্রোশ ব্যাপী; একশত চল্লিশ হস্ত পরিসরে সাগর লহরীর ন্যায় গাভী দল দণ্ডায়মান হইল।

পরে কোষাধ্যক্ষ কহিলেন "আমার কন্যার জন্য যথেষ্ট গাভী হইয়াছে দ্বার বন্ধ কর।" গোগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল; কিন্তু গুণবতী বিশাখার এমনই আকর্ষণী যে বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ এবং দুগ্ধবতী গাভী হাম্বারবে তাহার দিকে ধাবিত হইল। উপস্থিত জনসমূহের বাধা সত্ত্বেও ষাট হাজার বৃষ এবং ষাট হাজার দুগ্ধবতী গাভী ও তাহার পশ্চাৎ বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ বৎস বাহির হইয়াছিল।

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোন কার্য্য ফলে গাভিগণ বাহির হইয়া আসিয়াছিল? কোন সময়ে এই বালিকা বহু লোকের প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যথা সাধ্য দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রবাদ আছে, ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে বিশাখা নরপতি কিকিরের সপ্তম কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা ছিল। তৎকালে তাহার নাম ছিল ভক্তদাসী। একদা সে বিংশতি সহস্র শ্রমণকে গাভীদুগ্ধজনিত পাঁচ প্রকার খাদ্য বিতরণ করিয়াছিল, পুরোহিত ও গ্রহিতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে "যথেষ্ট, যথেষ্ট" বলিয়া উত্তম রূপ হস্ত সঙ্কুচিত করিলেও বালিকা "খাদ্য বিতরণ করিতে বিরত হয় নাই। এই পুণ্যবলেই সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও গাভীদল বাহির হইয়াছিল।

যখন কোষাধ্যক্ষ এইরূপে কন্যাকে নানা প্রকার যৌতুক দান করিতেছিলেন

তাঁহার স্ত্রী সুমনা কহিলেন "তুমি আমার মেয়েকে শুধু যৌতুক দিতেছ, কিন্তু তাহার আদেশ পালন অমাত্য বা সহচরী সঙ্গে দিলে না," এরূপ করিলে কেন?

"তাহার কারণ আছে। কাহারা কাহারা বিশাখার অনুরাগী আমার তাহাই দেখিতে ইচ্ছা অবশ্য তাহার আজ্ঞা পালনার্থ কিছু কিছু দাস দাসী পাঠাইব যখন বিশাখা বিদায় গ্রহণান্তর রথারোহণ করিতে উদ্যত হইবে তখন আমি ঘোষণা করিব "যাহার ইচ্ছা আমার কন্যার সহিত যাইতে পারে, অপরের যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—এখানে বাস করিতে পারে।"

বিদায়ের পূর্ব্ব দিন ধনঞ্জয় একটী গৃহে আপনার কন্যাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পতিগৃহে কিরূপ স্বভাব ও আচরণ হওয়া কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে অনেক কহিলেন। দৈব ক্রমে কোষাধ্যক্ষ মিগার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। ধনঞ্জয়ের এই দশটী বিধি তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল।

"বৎস, যখন তুমি তোমার পতি গৃহে বাস করিবে দেখিও (১) অভ্যন্তরের অগ্নি যেন বাহিরে না প্রকাশ হয়; (২) বাহিরের অগ্নি যেন ভিতরে না আনীত হয়, (৩) যে প্রতি দান করিবে তাহাকে দান করিও, (৪) যে প্রতিদান করেনা তাহাকে দান করিও না, (৫) যে দান করে কিম্বা করেনা তাহাদের উভয়কেই দান করিবে। (৬) সুখে উপবেশন করিবে; (৭) সুখে আহার করিও, (৮) আনন্দে নিদ্রা যাইও, (৯) অগ্নি পার্শ্বে অবস্থান করিও, (১০) গৃহদেবতাকে ভক্তি করিও।"

পরদিন ধনঞ্জয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজসৈন্যদলের সম্মুখে তাঁহার কন্যার জন্য আটজনকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "বিশখার নূতন গৃহে তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন অপবাদ হয়, তোমরা তাহার বিচার করিবে" তৎপরে নবতি লক্ষ মূল্যের সেই মহালতা আবরণী কন্যাকে পরিধান করাইয়া, তিনি দুহিতার স্নানের নিমিত্ত সুগন্ধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য পাঁচশত চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। পরে রথারোহণ পূর্ব্বক তিনি বিশাখাকে সাকেতার নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দশ গ্রাম অতিক্রম করিয়া অনুরাধাপুর পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং ঘোষণা করিলেন, "যে কেহ বালিকার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, যাও।" এতদ্ শ্রবণে সমগ্র চৌদ্দটী গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়া কহিল,

"মহারাজ! যখন আমাদের রাজলক্ষ্মী যাইতেছেন, তখন আমরা আর এখানে থাকিব কেন?" ধনঞ্জয়, কোশলপতি ও বৈবাহিক মিগারের সমুচিত আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়া কিঞ্চিত দূরে অগ্রসর হইলেন. অবশেষে তাহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কোষাধ্যক্ষ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অন্যান্য ব্যক্তির পর, মিগার যানারোহণ করিল এবং বিপুল জনস্রোত দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "একি ব্যাপার?"

"আপনার পুত্রবধূর আদেশ পালনার্থ দাস দাসী ও অনুচর বর্গ যাইতেছে।"

মিগার বলিলেন, "ইহাদের খাওয়াইবে কে? প্রহার করিয়া সব তাড়াইয়া দাও। যাহারা কিছুতেই পলাইবে না তাহাদের শুধু থাকিতে দাও।"

বিশাখা বলিলেন, "শান্ত হউন, উহাদের তাড়াইয়া দিবেন না। একদল অপর দলকে খাওয়াইতে পারে।"

বৃদ্ধ জেদ করিয়া বলিল, "বৎসে, উহাদের লইয়া আমার কোন আবশ্যক নাই। উহাদের খাওয়াইবে কে? বৃদ্ধ মিগার অধীনস্থ অনুচর বর্গকে প্রস্তর নিক্ষেপ ও যষ্টি প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। যাহারা প্রহার খাইয়াও পলাইল না তাহাদিগকেই শুধু থাকিতে বলিয়া মিগার কহিলেন "ইহাই যথেষ্ট হইবে।"

এদিকে বিশাখা শ্রাবস্তী নগরীর সীমা দেশে উপনীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমি কি এই আবৃত যানে উপবেশন করিব, না উন্মুক্ত রথে গমন করিব?" পরে ভাবিলেন "যদি আমি এই আবৃত যানে গমন করি, তবে কেহ আমার মূল্যবান মহালতা আবরণী নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিবে না।

এই ভাবিয়া সুন্দরী উন্মুক্তযানে গমন শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। [illegible] শ্রাবস্তীর নাগরিকগণ বিশাখার ঐশ্বর্য্য দেখিল, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইনিই সেই বিশাখা! বাস্তবিক ইহার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্যের [illegible]" এইরূপে মহা সমারোহে বিশাখা কোষাধ্যক্ষগৃহে প্রবেশ করি[illegible]ন।

যাবতীয় নগরবাসীগণ তাহাদের সামর্থ্যের অনুযায়ী [illegible] করিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, "ধনঞ্জয় আমাদ[illegible] আমাদিগকে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এই স[illegible]

করিয়া নগরের যাবতীয় গৃহস্থকে বিতরণ করিলেন। প্রত্যেক উপহার প্রদান কালে তিনি মধুর সম্ভাষণে বলিয়া পাঠাইতেন "ইহা আমার জননীর জন্য, ইহা আমার পিতার জন্য; ইহা আমার ভ্রাতার জন্য" ইত্যাদি এইরূপে প্রত্যেক বয়সানুযায়ী বিশাখা সম্মান প্রদান পূর্ব্বক যেন সমগ্র নগরবাসীকে তাঁহার আত্মীয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন রাত্রিশেষে তাঁহার এক পালিতা ঘোটকী সন্তান প্রসব করিল। মশাল হস্তে সখী সমভিব্যাহারে বিশাখা অশ্বশালায় গমন করিয়া স্থিরভাবে বাজিনীর উষ্ণজলে স্নান ও তৈলমর্দ্দন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোষাধ্যক্ষ মিগার অনেক দিন হইতেই উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। সন্নিকটস্থ মঠে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব অবস্থান করা সত্ত্বেও মিগার তাঁহাকে পুত্রের বিবাহোৎসবে কোন প্রকার সম্বর্দ্ধনা না করিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাহাদিগকে পায়সান্ন ভোজন করাইবার মানসে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা গৃহে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ বিশাখার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "এই সকল সাধু সেবা করিবার জন্য বধূ মাতাকে আসিতে বল।"

যখন বিশাখার কর্ণকুহরে "সাধু" এই শব্দ প্রবেশ করিল, বুদ্ধিমতী বিশাখা আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে গমন করিলেন। তাহাদের ভোজনান্তে বিশাখা উপনীত হইলেন; উলঙ্গ সাধুগণকে দেখিয়া বিশাখা ক্ষুব্ধচিত্তে স্বপুরে এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন "যে এই সকল অধর্ম্মচারী সাধুনামের যোগ্য নহে। আমার শ্বশুর মহাশয় কেন বৃথা ডাকাইয়া পাঠাইলেন?'

উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ যখন বিশাখাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা কোষাধ্যক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিল;—

"ওহে বাপু! আর কাহাকেও তোমার পুত্রবধূ করিতে পার নাই? তুমি তোমার গৃহে দুর্ভাগা সন্ন্যাসী গৌতম শিষ্যকে আনয়ন করিয়াছ, সত্বর ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।"

কোষাধ্যক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলেন; "ইহাদের কথামত বিশাখাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ বিশাখা উচ্চবংশ সম্ভূতা, অবশেষে মিগার এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন "হে মহাত্মাগণ! যুবক যুবতীগণ অনেক সময় পরিণাম না জানিয়া কখন কখন কায করে, আপনারা শান্ত হউন, আমার পুত্রবধুর কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

অতঃপর বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ স্বর্ণপাত্র হইতে সুস্বাদু পায়সান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। সেই সময় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষা করিতে করিতে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিশাখা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্বশুরকে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে ছিলেন, তিনি ভিক্ষুকে চিনিতে পারিলেন। "শ্বশুর মহাশয়ের নিকট ইহার পরিচয় দেওয়া আমার উচিত নয়" এই ভাবিয়া সুন্দরী এরূপ ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন যাহাতে ভিক্ষু সহজেই বৃদ্ধের নয়ন পথে পতিত হইতে পারে। কিন্তু মিগার যেন তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইলেন না; এরূপ ভাবে মাথা হেঁট করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষুকে দেখিয়াও যখন বৃদ্ধ কোন অভিবাদন করিলেন না তখন বিশাখা বলিল, "মহাশয়? চলিয়া যান, আমার শ্বশুর মহাশয় এখন বাসি ভোজ্যদ্রব্য আহার করিতেছেন।"

যদিও মিগার উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের প্রতি তীব্র উক্তি সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিশাখা বলিলেন, "বাসি" বৃদ্ধ ভোজন পাত্র হইতে হাত তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,

"এই প্রসাদ লইয়া যাও এবং বিশাখাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দাও। তাহার এতদুর সাহস যে উৎসব কালে আমাকে অশুচি ভোজনের দোষারোপ করে।"

কিন্তু গৃহের দাস দাসী সকলেই বিশাখার। কে তাহার কর বা পদস্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে? বাক্যস্ফুট করিতে পারে এমন কাহারও সাহস নাই।

তাঁহার আদেশ শুনিয়া বিশাখা বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন "(পিতঃ

ইহা আমার স্বামী গৃহ, আপনি যেমন মনে করেন এত সহজে আমি গৃহ পরিত্যাগ করিব না। আমি, নদীতট বা অন্য কোন স্থান হইতে সংগৃহীত সামান্যা স্ত্রীলোক নই। যে বালিকাদের পিতা মাতা বর্ত্তমান তাহাদের বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া তত অনায়াসসাধ্য নহে। এই বিষয়ের জন্য আমার পিতাও উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমি এখানে আসি তিনি আটজন সম্রান্ত ব্যক্তির উপর এই বলিয়া ভার অর্পণ করেন, "যদি কেহ আমার কন্যার নামে কোন অপবাদ দেয় তোমরা তাহার অনুসন্ধান করিবে। ঐ সকল লোককে ডাকিয়া আমার দোষ ও নির্দ্দোষের বিচার করুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন "ভাল কথা।" তিনি আট জন গৃহস্থকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

গৃহস্থগণ উপস্থিত হইলে মিগার কহিলেন, "এই উৎসব কালে আমি যখন ভোজন করিতেছিলাম এই বালিকা আমাকে অপবিত্র ভোজনের অপবাদ দিয়াছিল। আপনারা ইহাকে দোষী বিচার করিয়া গৃহ হইতে দূর করিয়া দিন।

"মা! সত্যই কি তুমি এই রকম বলিয়াছ?"

"আমি ঠিক উহা বলি নাই, কিন্তু যখন ভিক্ষা করিতে করিতে একটী ভিক্ষু আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, শ্বশুর মহাশয় তখন ভোজন করিতে ছিলেন এবং তিনি ভিক্ষুর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি করেন নাই। তখন আমি ভাবিলাম, "আমার শ্বশুর মহাশয় এ জীবনে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন না, কিন্তু পুরাতন পুণ্য কেবল ক্ষয় করিতেছেন। সুতরাং আমি বলিলাম "মহাশয়! চলিয়া যান, শ্বশুর মহাশয় পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন।" ইহাতে আমার কি দোষ?

"কিছু নহে। বালিকা অতি সাধ্বী। মহাশয় আপনি ইহার প্রতি এত ক্রুদ্ধ কেন?"

"মহাশয় ধরিলাম ইহা দোষ নয়, কিন্তু একদিন নিশীথে এই বালিকা তাহার দাস দাসী লইয়া গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছিল।"

"মা, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের কথা কি সত্য?"

"মহাত্মাগণ, যখন এই বাটীতে একটী গর্ভিণী অশ্বিনী আনা হইয়াছিল আমি

নীরবে থাকিতে পারি নাই। আমার সহচরীদের সহিত মশাল হস্তে ঘোটকীর প্রসবকালীন ব্যবস্থা করিতে গমন করিয়াছিলাম।'

"মহাশয়, আমাদের বালিকা, কৃতদাসী যা করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহা করিয়াছে। ইহাতে দোষ কি বলুন ?

" মহাশয়গণ, ধরিলাম ইহা দোষ নয়, কিন্তু এইখানে আসিবার সময় ইহার পিতা দশটী কি গুপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন আমি তাহার অর্থ বুঝি নাই। বালিকাকে তাহার যথার্থ্য ব্যাখ্যা করিতে বলুন। মনে করুন ইহার পিতা বলিয়াছেন "অভ্যন্তরের অগ্নি যেন বাহিরে প্রকাশ না হয় ;" কিন্তু প্রতিবেশী-দের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইলে সাংসারিক ব্যক্তিদের পক্ষে এই নীতি পালন করা কি সম্ভব ?

" মা, ইহার কথা কি সত্য ?"

" সাধুগণ, উনি যাহা বলিতেছেন আমার পিতা সে অর্থে বলেন নাই। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই, 'যদি তুমি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কোন দোষ দেখিতে পাও তাহা বাহিরের অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

" আচ্ছা তাহাই হইল। "বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিতে নাই," ইহার অর্থ কি ? যদি আমরা ভিতরের অগ্নি বাহিরের লোককে দিই আমরা বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিব না কে কেন ? ইহাও কি সম্ভব" ?

"ইহা কি সত্য" ?

বিশাখা উত্তর করিল "ভদ্রগণ, আমার পিতা এইরূপ ভাবে বলেন নাই। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই, 'যদি তোমার প্রতিবেশী কেহ স্ত্রী হউক পুরুষ হউক তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা পতির নিন্দা করে তাহা গৃহে আসিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না"।

বালিকা নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইল। নিম্নে অবশিষ্ট নীতি বাক্যের তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত করা গেল।

তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, "যে প্রতিদান করে তাহাকেই দান করিও ;" ইহার অর্থ " যাহারা ঋণ করিয়া পরিশোধ করে তাহাদের কেবল দান করিবে।"

"যে প্রতিদান করে না তাহাকে দান করিও না" অর্থাৎ "যাহারা ঋণ লইয়া তাহা পরিশোধ করে না।"

"যে প্রতিদান করে কিম্বা করে না তাহাদের দান করিও" ইহার ব্যাখ্যা, "যখন কোন বিপন্ন আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ আগমন করিবে তাহার প্রতি-দানের সামর্থ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাদের দান করিও।"

"সুখে উপবেশন করিও" অর্থাৎ "যখন তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামী আসিবেন তখনই গাত্রোত্থান করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে বসিতে নাই।"

"সুখে আহার করিও" অর্থাৎ তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর পূর্ব্বে ভোজন করিও না। তাঁহাদের আহারের পর আহার করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সর্ব্বদা পালন করা উচিত"।

"গৃহদেবতাদের ভক্তি করিবে" অর্থাৎ "তোমার শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে।"

যখন কোষাধ্যক্ষ দশবিধির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসারিত হইল না। নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন অনন্তর গৃহস্থগণ বলিলেন—

"কোষাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বালিকার কি কোন অপরাধ আছে?"

"না। কিছু মাত্র নাই।"

"তবে সে নির্দ্দোষী। মহাশয়! এই নির্দ্দোষী সরলা বালিকাকে আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন কেন?"

এই সময়ে বিশাখা বলিল "ভদ্রগণ, যদিও শ্বশুর মহাশয়ের ক্রুদ্ধ আদেশে গৃহ পরিত্যাগ করা বিধেয় হইত না কিন্তু আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি শ্রবণ করিয়া আমাকে নির্দ্দোষী বিচার করিলেন। পিতা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আপনারাও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আমি এখন পিতৃগৃহে প্রস্থান করি।"

এই বলিয়া বিশাখা যান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে দাস দাসীদিগকে আদেশ করিলেন।

উপস্থিত গৃহস্থগণকে ও বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ মিগার কহিলেন "আমি অজ্ঞানতা বশতঃ ঐরূপ বলিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা কর।"

"পিতঃ যাহারা ক্ষমা করিবার উপযুক্ত তাহারা ক্ষমা করিবে। আমি শ্রীবুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবারস্থ কন্যা। শ্রমণ সভায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মউপদেশ শ্রবণ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছামত যদি শ্রমণ সভায় যাইতে পারি তাহা হইলে আমি এখানে থাকিব।"

"মা, তোমার ইচ্ছামত সাধুদের সেবা কর।"

বিশাখা শশুরের আদেশ পাইয়া ভগবান্ তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জলন্ত মূর্ত্তি শুদ্ধোধন পুত্র ভগবান্ গৌতম স্বীয় পদস্পর্শে বিশাখার গৃহ পবিত্র করিলেন। উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ যখন শ্রবণ করিলেন জগতের আলোকাধার সত্যের উজ্জল মণিময় স্তম্ভ শ্রীবুদ্ধদেব মিগার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন তখন তাহারা কোষাধ্যক্ষের গৃহ সম্মুখে একত্রিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পদপ্রক্ষালনার্থ জলদানের পর বিশাখা শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল "আহারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক। শ্বশুর মহাশয় আসিয়া দশবলের অধীশ্বর মায়াতীত শাক্যসিংহের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করুন।"

যখন বৃদ্ধ যাইতে উদ্যত হইলেন, উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা বাধা দিয়া বলিল, "ওহে বাপু! গৌতম সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিও না।" ইহাতে কোষাধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার পুত্রবধূ স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনা করুন"

ভগবান বুদ্ধদেব ও তাঁহার সঙ্গী শ্রমণদিগের আহার ও সেবা সমাপ্ত হইলে বিশাখা পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন "উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমার শ্বশুর মহাশয়কে আসিতে বল।"

মিগার কহিলেন, "আমি এখন না গেলে ভাল হইবে না।" বৃদ্ধের নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীভগবান্ মারজিতের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন।

উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দেখিল বৃদ্ধের ইচ্ছা হইয়াছে সুতরাং তাহারা বলিল "ভাল, ভিক্ষু গৌতমের ধর্ম্মমত শুনিতে পার, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে তোমাকে উপবেশন করিতে হইবে।" তাহারা মিগারের সঙ্গে গিয়া চারিদিকে আচ্ছাদন টাঙ্গাইয়া তাহারা অন্তরালে সকলে উপবিষ্ট হইল।

ইহাতে শাক্যসিংহ বলিলেন "ইচ্ছা হয় আচ্ছাদন কিম্বা প্রাচীরের অন্তরালে অথবা অত্যুন্নত পর্ব্বতের বাহিরে বা পৃথিবীর শেষ সীমায় অবস্থিতি কর; আমি বুদ্ধ, আমার স্বর তোমার নিকট পৌঁছিবে"। সুমহান্ জম্বু বৃক্ষতলে

যেমন অগণিত সৌরভপূর্ণ পুষ্পরাশি বিকীর্ণ থাকে সেইরূপ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃত নিস্যন্দনী সুমধুর উপদেশাবলী বর্ষিত হইল।

যখন সিদ্ধার্থ তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছিলেন, যাহারা সম্মুখে, পার্শ্বে, শত সহস্র পৃথিবী হইতে দূরে এমন কি দেবলোকেও অবস্থিতি করে তাহারা সকলেই বলিয়াছিল "দয়াল ঠাকুর আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন; শ্রীগুরুদেব আমাদের সনাতন ধর্ম্মমত শিক্ষা দিতেছেন।" প্রত্যেকেরই বোধ হইত যেন তিনি প্রত্যেককেই সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করিতেছেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেন; পৃথিবীর প্রত্যেক জীবই যেমন মনে করে, শশধর ঠিক আমার শিরোপরে শোভা পাইতেছে সেইরূপ জগতের আলোকাধার শাক্যবংশ শশী বুদ্ধদেব প্রত্যেকের সম্মুখে দণ্ডায়মান বলিয়া প্রতীত হইত। যাহারা লোক হিত কল্পে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে যাহারা জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল, নর নারীর প্রতি প্রেম বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

কোষাধ্যক্ষ মিগার যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তথাগতের উপদেশ মনে মনে বার বার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ও স্রোতাপত্তি* অবস্থার সহস্ররূপ সুদৃশ্য ফললাভ করিয়া ত্রিরত্নে তাঁহার অসন্দিগ্ধ ও অটল বিশ্বাস হইল। যবনিকা তুলিয়া বৃদ্ধ পুত্রবধুর সমীপে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তুমি মিগারের মা।" এই রূপে মাতৃপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বালিকা "মিগারের মাতা নামে অভিহিত হইলেন। পরে বিশাখার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে শিশুর নাম রাখা হইল মিগার।"

* বৌদ্ধধর্ম্মে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের চারিটি অবস্থা আছে, যথা—অর্হত, অনাগামি, সকদামি, স্রোতাপত্তি। জীবন্মুক্তদিগকে অর্হৎ বলে। যাঁহাদিগকে আর পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্ত্তমান দেহান্তরের সহিত নির্ব্বাণ ফল লাভ করিবে তাহাদিগকে অনাগামি বলে। যাঁহারা এক জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করিবে, তাঁহাদিগকে সকদামি বলে। ধর্ম্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম স্রোতাপত্তি। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

৪র্থ ভাগ। { আশ্বিন ১৩০৭ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দুর্গাস্তবরাজঃ।

(১)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

প্রণমি করুণাময়ি! শরণদায়িনি!
জগতব্যাপিনি শিবে বিশ্বস্বরূপিনি!
ত্রিভুবন পূজে তব শ্রীপদনলিনী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি! ১॥

(২)

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

নিখিলজগতচিন্তেস্বরূপ তোমার
প্রণমি চরণে তব নমি অনিবার
তুমি মা মহাযোগিনি জ্ঞানস্বরূপিনী
প্রণমি তোমারে মাগো জগতজননি!
সদানন্দহৃদে তুমি আনন্দরূপিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি॥ ২॥

(৩)

অনাথস্য দীনস্য তৃষাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

দীন হীন তৃষাতুর অনাথজনের
ভীত সশঙ্কিত বদ্ধ জগতজীবের,
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তারকারিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি॥ ৩॥

(৪)

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ-
-নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

বনে রণে শত্রু মধ্যে রাজ নিকেতনে
অনলে জলধিজলে প্রান্তর বিজনে,
তুমি দেবি! একমাত্র গতি নিস্তারিণি!
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি ॥ ৪ ॥

(৫)

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অপার দুস্তর ঘোর অতীব ভীষণ
বিপদসাগরে জীব হতেছে মগন,
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তারকারিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি! ॥ ৫ ॥

(৬)

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
-লসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বিস্তারি প্রচণ্ডলীলা চণ্ডিকে! তোমার
নাশিলে ইন্দ্রের ভয় অশেষ প্রকার,
তুমি একমাত্র গতি বিপদনাশিনি!
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি ॥ ৬ ॥

(৭)

ত্বমেকাঽজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

তুমি মা অপরাজিতা ত্রিলোক পূজিতা
সুনৃতবাদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিতা
তুমি মা পিঙ্গলা ইড়া সুষুম্নারূপিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি ॥ ৭ ॥

(৮)

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমি দেবি দুর্গে শিবে ভীম নিনাদিনি!
সরস্বতি অরুন্ধতি অমোঘরূপিনি!
তুমি শচী সিদ্ধি সতী কালনিশীথিনী—
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি ॥ ৮ ॥

(৯)

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

তুমি মা শরণ দেব দৈত্য মানবের
সিদ্ধ বিদ্যাধর মুনি তপস্বীজনের
নৃপগৃহগত কিম্বা ব্যাধি প্রপীড়িত
অথবা দস্যুর হস্তে যাহারা পতিত,
তুমি দেবি! সকলের দুর্গতি নাশিনী
দীনজনে সুপ্রসন্ন হওগো জননি! ৯ ॥

ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

সমুদ্রমন্থন।

কল্পের সময় ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে চলিল। প্রথম মন্বন্তর, দ্বিতীয় মন্বন্তর, তৃতীয় মন্বন্তর, চতুর্থ মন্বন্তর, পরে পঞ্চম মন্বন্তরও অতীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। আর এক মন্বন্তর অতিবাহিত হইলেই, কল্পের মধ্যে আসিয়া পড়িব। আসুরিক বৃত্তি বলে ভেদের চরম সীমা উপনীত হইয়াছে। ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা জীব যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পঁহুছিয়াছে। এখনও যদি অসুরের প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে, কল্পের চরম উদ্দেশ্য, কিরূপে সাধিত হইবে। কিরূপে জীব ভেদজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জিত সংস্কার আধ্যাত্মিক মার্গ দ্বারা ঘরে লইয়া যাইতে পারিবে। পথের জটিলতা অনেক হইয়াছে। আসুরিক মোহ দ্বারা অন্ধীভূত জীব একবারে না আত্মহারা হয়। কোথায় পিতৃদত্ত ধন পরিবর্জ্জিত করিয়া পিতৃদেবকে প্রত্যার্পণ করিবে। না আত্মহারা হইয়া আপনাকেই বিসর্জ্জন দিবে।

দেবতাদিগের প্রাধান্য হইলেই আসুরিক মোহ ক্রমে দূর হইতে পারে। কিন্তু আসুরিক ভাবের এত প্রাবল্য অসুরদিগের এত আধিপত্য, একি দেবতার কায, ভগবানের সাহায্য বিনা অসুরদিগকে পরাজয় করে।

ভেদবুদ্ধি দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না, তাহা নহে। আনন্দই আমাদের উন্নতির মূল। চিৎশক্তির যতই বিকাশ হয়, ততই আমরা আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে প্রয়াস পাই; বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারাও আমরা জানিতে পারি, যে ভগবদ্ভজন দ্বারাই প্রকৃষ্ট আনন্দ হয়। তাই প্রহ্লাদেই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ (প্র + হ্লাদ)। তাঁহার ভ্রাতাদিগের "হ্লাদ" প্রকৃষ্ট নহে। কিন্তু দৈত্যকুলে কয়টি প্রহ্লাদ? ডাক কথাই হইয়া গিয়াছে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

আবার দৈত্য কুলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবসমাজে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। ভেদের তারতম্য জ্ঞান দ্বারাই বুদ্ধির বিকাশ। ভেদের জ্ঞান প্রথমে না হইলে, সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না।

জ্ঞান মার্জ্জিত জীব উপাসনার পথ দিয়া সংসারের বেচা কেনা শেষ করিয়া নিরাপদে নিজ গৃহে ফিরিতে পারে।

যেমন দেবতারা আমাদের পরম বন্ধু সেইরূপ অসুরেরাও আমাদের পরম উপকারী। আজ যে আমরা বুদ্ধিবল দ্বারা অনেক কষ্টে পথ চিনিয়াছি ও পথে চলিবার উপযোগী হইয়াছি, সে অধিকাংশ অসুরদিগের সাহায্যে। কিন্তু আসুরিক প্রবলতা যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমরা ভেদের মধ্যেই থাকিয়া যাই। তাহা হইলে এই সংসার মধ্যে যতই বুদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত হই না কেন, সংসারের সীমা অতিক্রম করিতে পারি না। আসুরিক "স্ব" এবং "স্বার্থের" জ্ঞান তিরোহিত না হইলে, আমরা নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক স্বরূপ ঊর্দ্ধলোকে যাইতে পারি না।

অসুরকে ছাড়িলেও চলিবে না। অসুরের প্রবলতা থাকিলেও চলিবে না। নির্বুদ্ধি জীবে অসুরের প্রবলতা থাকুক। ক্রমে সে বুদ্ধিমান্ হউক। কিন্তু বুদ্ধি প্রাপ্ত জীবের জন্য অসুরের প্রবলতা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশের বাধক। জ্ঞানীর জন্য অসুরের অস্তিত্বই বিড়ম্বনা মাত্র। গাছে উঠিবার জন্য সিঁড়ির আবশ্যক হয়। কিন্তু গাছে উঠিলে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না।

বিষম সমস্যা। এ সমস্যার ভগবান্ মীমাংসা করুন্।

দেবতাদিগের বুদ্ধিতে কুলাইল না। তাঁহারা মেরুর শীর্ষ স্থানীয় ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন ইন্দ্র, বায়ু, আদি দেবতাসকল শ্রীহীন, নিঃসত্ব ও বিগতপ্রভ। তিনি তাহাদিগকে লইয়া বিষ্ণুর সদনে গমন করিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,

হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্ব্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্যথাসুরাঃ॥

হে ব্রহ্মন্, হে শম্ভো, হে দেব সকল, অবধান পূর্ব্বক আমর বাক্য সকলে শ্রবণ কর, যাহাতে তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে।

যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্।
কাব্যেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্বো ভব আত্মনঃ॥

তোমারা যাও এবং দৈত্য দানবের সহিত সন্ধি বিধান কর। তাহারা

শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে এখন প্রভূত বলশালী। যে পর্য্যন্ত তোমাদের আপনা হইতে অর্থাৎ অন্যের সাহায্য না লইয়া বৃদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ থাক।

অরয়োঽপিহি সন্ধেয়াঃ সতি কার্য্যার্থগৌরবে।

অহি মূষিকবদ্দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ।

যখন গুরুতর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তখন কার্য্য সিদ্ধির জন্য শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে হয়। সর্পকেও সময় পড়িলে মূষিকের সহিত সন্ধি করিতে হয়।

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্।

যস্য পীতস্য বৈজন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ॥

অবিলম্বে অমৃত উৎপাদন করিতে যত্ন কর। অমৃত পান করিলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়।

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্ব্বা বীরুত্তৃণ লতৌষধীঃ।

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম॥

সহায়েন ময়া দেবা নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতা।

ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ॥

ক্ষীর সমুদ্রে সকল প্রকার তৃণ, লতা, ওষধি নিঃক্ষেপ কর। মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড কর। বাসুকিকে রজ্জু কর। হে দেব সকল, আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত ভাবে তোমারা সমুদ্র মন্থন কর। দৈত্যেরা কেবল ক্লেশভাগী হইবে তোমরা তাহার ফল লাভ করিবে।

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ।

ন সংরম্ভেণ সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা॥

হে সুরগণ, অসুরেরা যাহা ইচ্ছাকরে তোমরা তাহার অনুমোদন করিও। সামমার্গ দ্বারা সংভ্রমে যেরূপ কার্য্য সিদ্ধি হয়, অন্যমার্গ দ্বারা সেরূপ হয় না।

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ।

লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্ত বস্তুষু॥

জলধি সম্ভূত কালকূট বিষ হইতে ভয় পাইও না। কদাচিৎ লোভ করিও না; কদাচিৎ ক্রোধ করিও না এবং কোন বস্তুতে কামনা করিও না।

এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। এখন একবার আমরা ভাবিয়া দেখি, ভগবান্ সমস্যার কি মীমাংসা করিলেন। দৈত্যের সহিত সন্ধিস্থাপন যে সৎ যুক্তি তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থন হইয়াছে। আজ সপ্তম মন্বন্তরের অর্দ্ধকাল অতীত প্রায়। এখনও আসুরিক ভাব যায় নাই। এখনও আসুরিক ভাব অনেকের উপযোগী। তবে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহারা আসুরিক ভাব পরাজয় করিয়াছেন। অধিকাংশ মনুষ্যের মধ্যে জয় পরাজয়ের সংগ্রাম চলিতেছে। ইহাও বুঝিতে পারি, আসুরিক ইচ্ছার অনুমোদন না করিয়া দেবতারা আপন অধিকার স্থাপন করিতে পারেন না। যে মাংসাসী তাহাকে একেবারে মাংস ছাড়ান চলে না। তাই বেদের বিধি, যে বৃথা মাংস খাইও না। মনুষ্য একেবারে গ্রাম্যভোগ ত্যাগ করিতে পারে না। তাই, নিয়মদ্বারা সেই ভোগকে আবদ্ধ করা যায়।

নিবৃত্তি প্রবৃত্তির অনুগামী। বিধি নিষেধ বাক্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সন্ধি স্থল।

কিন্তু এ সন্ধির প্রয়োজন কি? অমৃতের উৎপাদন? অমৃত কি? জীব যাহাতে অমর হয় তাহাই অমৃত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারের পর, আমাদের কি আর জানিতে বাকি আছে যে জীব কিসে অমর হয়। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীব অমর হয়। ত্রিলোকী সকাম ধর্ম্মের বিপাক। উর্দ্ধতন লোক সকল নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক। ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে ত্রিলোকী মধ্যে আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আমরা মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিতে পারি।

ধর্ম্মস্ত হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ। ৩—১০—৯

এই সত্যলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক।

উপলক্ষণমেতৎ সত্যলোকস্য মহঃপ্রভৃতিলোকানাং তদ্বাসিনাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য কাম্য কর্ম্ম ফলত্বাৎ প্রতিকল্পমুৎপত্তিবিনাশৌ ভবতঃ মহঃপ্রভৃতীনাত্নুপাসনাসমুচিতনিষ্কামধর্ম্মফলত্বাৎ দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্তং ন নাশঃ তত্রস্থানাঞ্চ ততঃ পরং প্রায়েণ মুক্তিরিতি ভাবঃ। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

সত্যলোক কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই চারিলোক এবং এই চারিলোক বাসী জীব, ইহারা সকলেই নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক।

ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের বিপাক। এই জন্য প্রতি কল্পে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহঃ প্রভৃতি উর্দ্ধতন লোক উপাসনার দ্বারা সম্যক্ অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। এই ঐ সকল লোকের দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত নাশ হয় না। ঐ সকল লোকবাসীদিগের দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে প্রায় মুক্তি হয়।

মহর্লোক আদিতে গমনই অমৃত লাভ। তাই সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সুক্তে কথিত আছে—ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অস্য ঈশ্বরস্য সম্বন্ধি ত্রিপাদমৃতং নিত্যসুখং দিবি উর্দ্ধ্বলোকেষু ন ত্রিলোক্যমিত্যর্থঃ।

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নিত্যসুখ রূপ ত্রিপাৎ অমৃত মহর্লোকের উপর উর্দ্ধ লোকে আছে, ত্রিলোকীর মধ্যে নাই।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নাহধায়ি মূর্দ্ধসু॥ ২—৬—১৮

নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই অমৃত লাভ হয়। দেবগণ নিজে অমরত্ব লাভ করিয়া জীব সকলকে অমৃত লাভের পথে আনায়ন করিবেন। তাই তাঁহাদিগকে নিজে নিষ্কাম হইতে হইবে। তবে সে নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রবাহ এই মর্ত্যলোকে আগমন করিবে।

দেবসকল নিষ্কাম না হইলে অমৃত লাভের কোন উপায় নাই। তাই ভগবান্ বলিলেন

লোভঃ কার্য্যো নবো জাতু রোষঃ কামস্ত বস্তুষু।

যাঁহারা এখনও অমৃত লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই এই উপদেশ। কখনও লোভ করিও না, ক্রোধ করিও না, কোন বস্তুর কামনা করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ বর্জ্জিত কে আছ? অমৃত তোমার হস্তগত।

এখন ত্রিলোকীর মধ্যে এই অমৃতের আবির্ভাব করাইতে হইবে। তাই এক বৃহৎ ব্যাপার সমুদ্রমন্থন।

সমুদ্রমন্থনের স্থান—ক্ষীরদসমুদ্র। জীবের পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ক্ষীরদ সমুদ্রে বাস করেন। তাই ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন। ক্ষীর সমুদ্র হইতেই জীব সংস্থিতির সকল পদার্থ উদ্ভূত হয়।

দেবতারা পূর্ব্ব কল্পে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই এই কল্পে

তাঁহাদের ফল গ্রহণ। আবার অসুরেরা এই কল্পে ত্যাগকরিতে করিতে দেবত্বের অধিকারী হইবে। অসুরেরা দেবতাদিগের অমৃত লাভের জন্য যে শ্রম করিল তাহা তাহাদিগের সহস্র ফলদায়ী হইল। ত্যাগ যদি নিষ্ফল হয়, তবে এ জগতে সফল কি আছে? ষষ্ঠ মন্বন্তরে অসুরেরা যে ত্যাগ স্বীকার করিল, সেই পূণ্যবলে বিরোচন পুত্র বলি সহস্রাধিক ত্যাগী হইল। এ জগতে কে আছে, যে বলির তুল্য ত্যাগী হইবে? বলির ত্যাগে অসুরকুল উজ্জ্বল হইল, স্বয়ং ভগবান্ তাহার দ্বারে আবদ্ধ হইলেন। আবার সেই দৈত্য বলি অষ্টম মন্বন্তরে, দেবতাদিগের রাজা হইবে। ত্যাগই ধর্ম্ম, ত্যাগই কর্ম্ম। ত্যাগই নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। নিষ্কাম কর্ম্মই উপাসনার সোপান। উপাসনাই জীব ঈশ্বরের মিলন দ্বার।

সমুদ্রমন্থনের দুই প্রধান ফল অমৃত ও বিষ। প্রথমে বিষ, পরে অমৃত। জগতের এই স্থির রহস্য। কোনও প্রস্তর খণ্ডে যদি সোণার রেখা দেখা যায়, তাহা হইলে প্রথমে সেই প্রস্তর খণ্ডকে চুরমার করিতে হয়। পরে অনেক যত্নে সেই বহু মূল্য ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা প্রস্তরে পূর্ণ। আমাদের স্তরে স্তরে প্রস্তর। অমারা অমর হইতে গেলে, আমাদিগকে বিষে জর্জ্জরিত করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তর সকলকে চুরমার করিতে হইবে। মৃত্যু যেমন আমাদের মঙ্গলকর, এমন অন্য কিছু নহে। কত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা সৎ পথে চলিতে প্রয়াস করি। কিন্তু বন্ধনের জন্য এক পা অগ্রসর হইতে পারি না। মনের বেগ মনেতেই থাকিয়া যায়। ভাগ্যক্রমে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বন্ধনযুক্ত দেহের নাশ করে। আমরা নূতন দেহ পাইয়া কতক অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু কত জন্মের কত বন্ধন। মৃত্যুর পর মৃত্যু আসিয়া জ্ঞানের পথিককে বন্ধনমুক্ত করে। কি সাধ্য, মৃত্যু না থাকিলে আমরা অমৃত্যু লাভ করিতে পারি। কি সাধ্য আমরা বিষ না থাকিলে অমৃত লাভ করি।

বিষের কর্ত্তা মহাদেব। অমৃতের কর্ত্তা হরি। হরিহরের মিলিত কার্য্য দ্বারাই জীবের মুক্তি। ভক্তিভাবে আমরা হরিহরকে প্রণাম করি।

"সহায়েন ময়া দেবা নির্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ"

আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত হইয়া মন্থন কার্য্য সম্পন্ন কর।

এই সমুদ্র মন্থন ব্যাপারে ভগবানের সাহায্যই মূল। ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে সমুদ্রমন্থন ব্যাপার আপনাদের পৃষ্ঠের উপর ধারণ করিলেন। কূর্ম্মরূপে তিনি সত্ত্বের বিস্তার করিলেন। সেই সত্ত্ববলে সকলে সত্ত্ববান্ হইল। সেই সত্ত্ববলে পৃথিবী বৈবস্বত মন্বন্তরে রাম কৃষ্ণাদির চরণ রজে পবিত্র হইল। কূর্ম্মরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন বলিয়াই, বৈবস্বত মন্বন্তরের কার্য্য সম্ভব পর হইল। তাই কূর্ম্ম একজন প্রধান অবতার। জয় বিজয় তিন জন্মে ছয় অসুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবণ কুম্ভকর্ণ, এবং শিশুপাল দন্তবক্র। তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রধান অবতার। বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও রামকৃষ্ণ। কূর্ম্ম অবতার সত্ত্বের সঞ্চার দ্বারা রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনিও প্রধান অবতার।

সমুদ্র মন্থন যেরূপে হইয়াছিল, তাহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার সবিশেষ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ব্রাহ্মণের উপবীত।

জন্মনাজায়তেশূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজউচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্ বিপ্রেব ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

যখন জীব পিতা মাতার রজঃবীর্য্য সংযোগে উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে শূদ্র বলা হইয়া থাকে, যখন সেই জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সংস্কার হয়, তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া চিত্তশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি করেন ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তখন তিনি বিপ্রনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ ক্রিয়াকে সাধারণতঃ উপনয়ণ বলা হইয়া থাকে। ইহা দশবিধ সংস্কারের প্রধান এক সংস্কার। যিনি উপবীত গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বলে উপনীত, অর্থাৎ স্বীয় গুরু সন্নিধানে আনীত।

ব্রাহ্মণের উপনয়ণ সংস্কার হইলে তাঁহাকে দ্বিজ বলে। দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ হইয়াছে যাহার, তিনিই দ্বিজ নামের যোগ্য।

পিতা মাতার শুক্র শোণিতে মাতৃগর্ভে জীবের সঞ্চার হইয়া কাল পূর্ণ হইলে ভূমিষ্ট হওয়াকে জন্মগ্রহণ করা বলে। আবার দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করা কাহাকে বলে ?

শম, দম, তপস্যা, অন্তর ও বাহির পরিশুদ্ধি, অহিংসা, ক্ষমাগুণ, সরলতা, পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান এবং পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল বিষয়ের অভ্যাস ও শিক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মণ যখন উপযুক্ত অধিকারী হন, তখন গুরুদেবের মন্ত্রবলে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া সংস্কৃত করেন। ইহা কোন রূপ বহিঃ স স্করণ নহে ; ইহা অধ্যাত্ম সংস্কার ; ইহা লাভ হইলে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত হয়। সদ্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ এইরূপ দীক্ষা প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে সক্ষম নহেন।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার ; 'রু' শব্দের অর্থ তেজ। যিনি জ্ঞানরূপ তেজ (আলো) দ্বারা অজ্ঞানন্ধকার দূরীভূত করেন, তিনিই গুরু। সেই গুরুদেব ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রেরপ্রমাণে। গুরু রূপে কৃষ্ণকৃপা করেন জীবগণে।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এমন যে গুরুদেব, তাহার তুল্য শ্রেষ্ঠ এই ভব সংসারে আর কে আছে ? তিনি পিতা মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন,

শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরো গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে ॥

হে দেবি ! পিতা হইতে দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুদেব জ্ঞান দান করেন, অর্থাৎ তাঁহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং এই দুঃখময় সংসার সাগরে গুরু হইতে প্রধান আর কেহই নাই।

গুরুদেব হইতে এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ, ইহাই প্রকৃত দীক্ষা; ইহাইপ্রকৃত অধ্যাত্ম সংস্কার, এবং এই সংস্কার সম্পন্ন হইলেই প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করা হয়। এই গূঢ়ার্থ অভিব্যঞ্জক দ্বিজত্বের বাহ্যিক চিহ্নই উপবীত ধারণ।

এই উপবীতের অপর নাম যজ্ঞসূত্র। যজ্ঞ অর্থে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, সূত্র অর্থে সূতা বা বন্ধন রজ্জু। যাহা মানবকে তাহার আত্মার সহিত সমবদ্ধ করে তাহাই যজ্ঞসূত্র।

ইহা ত্রিবৃৎ, তিনটী তন্তু একত্র গ্রন্থন করিলে একটী সূত্র হয়। এইরূপ তিনটী সূত্র একত্র বর্ত্তুলাকারে গ্রথিত করিলে একটী উপবীত হয়। ব্রহ্ম অনন্ত ও অসীম। অনন্তের এবং অসীমত্বের চিহ্ন বৃত্ত; তাই যজ্ঞসূত্র বৃত্তাকারে গ্রথিত ও ধৃত হইয়া থাকে। তন্তুত্রয় দ্বারা জীবাত্মার তিনটী তত্ত্ব মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে বুঝায়। মন আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক। বুদ্ধি আবার প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও অনুমিতি, এই ত্রিগুণযুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান (Perception)। বস্তু পরস্পরের উপমা দ্বারা যে সাদৃশ্য জ্ঞান ইহাই উপমিতি (Analogy); এবং অনুমান বা হেতু দ্বারা যে বস্তু নিশ্চয় জ্ঞান, ইহাকে অনুমিতি (Inference) কহে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এই তিন গুণ অহঙ্কারে বিরাজিত। যিনি অবগত বা জ্ঞাত হন তিনি জ্ঞাতা (The knower), যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় বা যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয় (The known), এবং যদ্দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায় তাহা জ্ঞান (The knowledge)। প্রত্যেক তত্ত্বে তিনগুণ করিয়া জীবত্মার তিনটী তত্ত্বে নয় গুণ বিদ্যমান। প্রত্যেক সূত্রে তিন গুণ (তন্তু) করিয়া যজ্ঞসূত্রের তিনটী সূত্রে ও নয় গুণ (নব তন্তু) বিরাজিত আছে।

উপবীতের অপর নাম ত্রিদণ্ডি। 'ত্রি' অর্থে তিন, দণ্ড অর্থে শাসন বা দমন। যিনি বাক্যসংযম, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় বা দেহসংযম, এই তিন প্রকার সংযমে অভ্যস্ত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে ত্রিদণ্ডি ধারণের উপযুক্ত।

দেহের পৃষ্ঠভাগ স্থিত মেরুদণ্ডকে ব্রহ্মদণ্ড কহে। এই মেরুদণ্ডের বামাংশে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা ইড়া, দক্ষিণাংশে সূর্য্যাধিষ্ঠিতা পিঙ্গলা এবং ঠিক্ মধ্যভাগে অগ্ন্যধিষ্ঠিতা সুষুম্না, এই প্রসিদ্ধ নাড়ী ত্রয় বিদ্যমান আছে। ইহারা মস্তিষ্কের নিম্ন-

ভাগে যে স্থানে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থানকে ত্রিবেণী কহে। ইড়া ও পিঙ্গলার চিন্তনে যোগবহ্নি প্রজ্জলিত হয়। সুষুম্না নাড়ীতে মূলাধার চক্রে ইষ্টদেব স্বরূপিণী, সূক্ষ্মা, কোটি সৌদামিনী সমপ্রভা কুলকুণ্ডলিনী বলয়াকারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া নিদ্রিতা আছেন। তিনি জাগ্রতা না হইলে, অমরত্ব লাভ করিয়া নিত্য পরমানন্দ সুধারস পান করিবার অধিকার জন্মে না। ব্রাহ্মণের উপবীত এই নাড়ীত্রয় জ্ঞাপক বলিয়াও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যিনি এই তিনের কার্য্য অবগত আছেন, তিনিই উপবীত ধারণের উপযুক্ত;

ব্রাহ্মণের উপবীত এইরূপ নানার্থ বোধক; ইহা ব্যতীত ইহার আরও গুহ্য অর্থ এবং উদ্দেশ্য আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই জাতিত্রয়ের উপবীত ধারণের অধিকার আছে; শূদ্রের এই অধিকার নাই। পূর্ব্বোক্ত তিনজাতির উপবীত পূর্ব্বে স্ব স্ব জাতির ব্যবসায়ব্যঞ্জক ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে গর্ব্বিত হইবার নিয়ম ছিল। সত্বগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উপবীত বিশুদ্ধ কার্পাস সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবার বিধি। শৌর্য্যবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী, শণের দ্বারা তাহাদের ধনুকের গুণ নির্ম্মিত হইত; তাই তাহাদের উপবীত শণসূত্রে নির্ম্মিত হওয়ার নিয়ম। কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যজাতির ব্যবসায়, তাই তাহাদের ত্রিদণ্ডি মেষলোম বা পশমের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ার বিধি।*

জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁহাদের স্বভাবজাত প্রকৃতি নির্ম্মল, তদনুযায়ী কার্য্যকল্পে পরিশুদ্ধ, অথচ কর্ত্তব্য পরায়ণা কঠোর। গীতায় আছে:

> ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
> কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥
> শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
> জ্ঞানং বিজ্ঞান মস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥
> শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
> দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

---

* কার্পাসমুপবীতং স্যাধিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ!
শণশূত্র ময়ংরাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ মনুসংহিতা।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সকল কর্ম্ম স্বভাব প্রসূত গুণত্রয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা দান, ঈশ্বরভাব (নিয়ম শক্তি,) এ সকল ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

কৃষি, গোরক্ষণ-(পশুপালন) এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। এবং অপর জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যা করা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

প্রত্যেক সমাজে এইরূপ জাতিভেদ বা শ্রেণী বিভাগানুসারে কার্য্য বিভাগ এক রকমে না এক রকমে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ বিভাগ না থাকিলে সমাজের কোন কার্য্যই সুচারু ও সুশৃঙ্খল রূপে চলিতে পারে না। অন্ন উৎপন্ন না হইলে, লোকে আহার্য্যাভাবে জীবন ধারণে অক্ষম; তাই শস্যোৎপাদনের জন্যে কৃষকের প্রয়োজন। জাত শস্য সর্ব্বত্র বিভক্ত হওয়া এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী। স্বভাবজাত ও শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের পরস্পর বিনিময় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাই বাণিজ্য ব্যবসায়ীর প্রয়োজন। সমাজে ও দেশে কলহ বিবাদ ভঞ্জন করা, বিদ্রোহের দমন করা, শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, অশান্তির প্রশমন করিয়া সুনিয়ম ও সুশাসন প্রচলনে প্রজাপালন ইত্যাদি কার্য্যের জন্য শৌর্য্যবীর্য্যশালী যুদ্ধব্যবসায়ী সৈন্য পরিবেষ্টিত রাজার প্রয়োজন। আবার ধর্ম্ম, নীতি ও অধ্যাত্ম জ্ঞান শিক্ষা দিয়া রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলকে সৎপথে ও স্বধর্ম্মে রাখিবার জন্যে অধ্যাপক ও ধর্ম্ম যাজকের প্রয়োজন।

প্রবল কাল প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় জাতি বিভাগানুরূপ কার্য্য বিভাগ আর এখন সমাজে বর্ত্তমান নাই; অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি, মূলতঃ তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না; আছে কেবল বাহ্যাচরণে ও বাহ্যাড়ম্বরে। এই অধঃপতনের ও পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ কি? কারণ এই; সমাজের শাসন-রজ্জুবন্ধন বর্ত্তমান শিথিল হইয়া যাওয়াতে প্রত্যেক জাতিই এখন স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনে এবং স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে

বিমুখ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই মহাবাক্যের গূঢ়ার্থ ভুলিয়া গিয়া স্বীয় স্বীয় জাতি, বর্ণ ও স্বভাবজাত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এইরূপ পরিবর্ত্তনের ও অধোগতির জন্যে প্রধাণতঃ দায়ীকে? তদুত্তরে অবাধে বলা যাইতে পারে, ব্রহ্মণই তজ্জন্য বিশেষ রূপে দায়ী। "বর্ণনাং ব্রাহ্মণো গুরু:"; ব্রাহ্মণ বর্ণ সকলের গুরু, কারণ তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন, তাঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র। তিনি সর্ব্বভূত হিতে রত, তিনি নিঃস্বার্থবান্. উদার নিরভিমানী, সদাসন্তুষ্ট; পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার আকর স্বরূপ। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রপ্রণেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। একাধারে এত গুলি গুণের একত্র সমাবেশ থাকাতেই ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আধুনিক হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণগণ কি তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পালনে তৎপর থাকিয়া পূর্ব্বেকার আদর্শ চরিত্র বজায় রাখিতে পারিয়াছেন? কখনই না!

যে সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পবিত্র অধ্যাত্মজীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও আসক্তিশূন্য হইয়া পার্থিব ধন ও ক্ষণস্থায়ী যশ ও গৌরব লাভে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন হইতেই সমাজে অধোগতির সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার পবিত্র উপবীতের মর্য্যদা রক্ষা না করিয়া, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখিতে লালায়িত! আমি ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইব, অথচ অপর লোকে আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে! ইহা কি কখনও হয়? জন্মান্তরিন কর্ম্মানুসারে এজীবনে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ বংশে জাত হইতে পার। গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" কর্ম্মের গতিও ফলাফল বোঝা ভার! ব্রাহ্মণ বংশে জাত হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ নন, যদি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ব্রহ্মকর্ম্মের অনুকূল না হয়।

শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন তিনিই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তবে সেই জীব শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে।

মনু বলেন,

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ!
যশ্চবিপ্রোঽনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি॥

কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদবিহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ দেখিতে সুন্দর হইলেও যেমন তদ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ জীব উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জাত হইয়াও যদি শাস্ত্রবিহীন হয়, তবে তাহা দ্বারা সমাজের শিক্ষালাভকার্য্য সম্পন্ন হয় না। যে ব্রাহ্মণ সমাজকে শাস্ত্র ও বিদ্যা শিক্ষা দানে অসমর্থ তিনি ব্রাহ্মণ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী জীব ব্রাহ্মণ দেহধারী হইলেই সোণা সোহাগার সংযোগ হয়; তখন তাঁহার মুক্তির পথ আর সুদূর পরাহত থাকে না।

শাস্ত্রে বিধি ব্যবস্থার অভাব নাই। তাহাদের ভাব গ্রহণ করিয়া প্রকৃত রূপে কার্য্যকালে প্রয়োগ ও সম্যক প্রতিপালন করাই দুরূহ ব্যাপার। ভগবানের অসঙ্খ্য নিয়মের বশে যখন লোকের স্বভাবজ প্রবৃত্তি অনুসারে সমাজে কর্ম্ম বিভাগ বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী, তখন এক আকারে না এক আকারে সমাজে জাতি বিভাগও বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে সমাজ হইতে উন্মুলিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া মূর্খতার কার্য্য। ইহার জীর্ণ সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হইয়া, কঠোর কর্ত্তব্য ব্রত পালনে বিমুখ হইয়া, শম দমাদি গুণ বিবর্জ্জিত হইয়া, পবিত্র উপবীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেও অধোগামী হইয়াছেন এবং সমাজকেও অধঃপাতিত করিয়া বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কবে পুনরায় পবিত্র উপবীতের গূঢ় রহস্য বুঝিতে ও প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিতে পারিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইবেন? কবে তাঁহারা বিদ্যা বিনয়াদি গুণ সমপন্ন হইয়া সমাজের আপামর সাধারণকে যথাযোগ্য রূপে শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া, সমাজের সাক্ষাতে, সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে,

এমন কি, সমস্ত মানব জাতির সমক্ষে সেই পুরাতন আদর্শ চরিত্রের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া ভারতের ও হিন্দু সমাজের এবং সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মুখোজ্জল করিবেন! কবে সেই নষ্ট রত্নের পুনরুদ্ধার হইবে? সেই দিন কি ভারতে, হিন্দু সমাজে, পুনঃ ফিরিয়া আসিবে না?

শ্রীসুদর্শন দাস।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরিদাস একজন অসামান্য ভক্ত; তাঁহার জীবন পবিত্র ও মহত্বে পূর্ণ; তাঁহার এক একটি বিষয় বর্ণন করিতে গেলেও এক একখানি পুস্তক হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কালি প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "ভক্তির জয় বা হরিদাসের জীবন যজ্ঞ" গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কেবল স্থূল ঘটনা গুলি ক্রমশঃ বর্ণনা করিয়া আসিতেছি। নচেৎ বিশদ রূপে বর্ণন করিতে গেলে পত্রিকায় স্থান ও পাঠকের ধৈর্য্য উভয়ই সংকুলান না হইতে পারে। অদ্য হরিদাস সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অধুনা শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন আবার অনেকেই তাঁহার ভগবত্তা উড়াইয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু হরিদাসের সময়ে অতি অল্পমাত্র লোকেই তাঁহার ভগবত্তায় সন্দিহান হইত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় এই অল্প লোকের সন্দিহানে যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় আঘাত পড়িত এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ শ্রীভগবানের প্রতি অবতারেই তদীয় শত্রু থাকে। শ্রীষ্ট শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি কোন্ অবতারের শত্রু ছিল না? এরূপ শত্রু থাকা স্বাভাবিক নিয়ম। ভগবান সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এরূপ শত্রু না থাকিলে শ্রীভগবানের ভগবত্তা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না; তাঁহার নিয়মের শৃঙ্খলা থাকে না।

ভগবান আবির্ভাব হইয়াছেন বলিয়া সকলেই সশরীরে স্বর্গলাভ করিবে এরূপ কোন কারণ নাই। যদি এরূপ ঘটনা সম্ভব পর হয় তবে কর্ম্ম ফলের নিত্যতা থাকে না। যাহাদের যেরূপ কর্ম্ম তাহারা সেই অনুযায়ী পরিচালিত হয় ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই জন্য কেহ ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস কেহ অর্দ্ধ বিশ্বাসবান, কেহ বা নাস্তিকও হইয়া থাকে।

যৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রায় সর্ব্বত্রই ভগবান বলিয়া পূজিত হইতে-ছিলেন তখন অসামান্য ভক্ত হরিদাস যে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি!

প্রভুর ভাবাদি দর্শনে হরিদাস বুঝিলেন প্রভু শীঘ্রই লীলা অপ্রকট করিবেন। তিনি সর্ব্বদা যে প্রভুর পবিত্র চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার স্নেহ প্রদত্ত স্বহস্তে বণ্টিত প্রসাদান্ন ভক্ষণ প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন; তিনি কোন্ প্রাণে প্রভুর বিরহ সহ্য করিবেন। তিনি যতই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বয়সের আধিক্য সহ এই কঠোর মর্ম্মভেদী চিন্তা তাঁহাকে বড়ই আকুল করিয়া তুলিল ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিল। এই সময় প্রভুর ভৃত্য একদা প্রসাদান্ন লইয়া তদীয় কুটীরে আগমন করিলেন হরিদাসের হৃদয় দেহ তখন বড়ই অবসন্ন, তিনি বলিলেন অদ্য উপবাস করিব। কিন্তু প্রসাদান্ন উপেক্ষা করা মহাপতকের কার্য্য, ভক্ত হরিদাস তাহা কিরূপে করিবেন। সুতরাং এককণা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া সেদিন অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসের সম্মিলনে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন প্রভো! আমার শরীর মন বড়ই অবসন্ন, আমার নিয়মিত সংখ্যা কীর্ত্তন আর পূর্ণ হইতেছে না। প্রভু বলিলেন হরিদাস তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সংখ্যা অল্প কর; তুমিও সিদ্ধ হইয়াছ নামের মহিমাও বহু প্রকার বর্ণন করিয়াছ তখন আর সংখ্যা পূরণের জন্য এত আগ্রহ কেন যথা,——

প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন কর॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার। চৈঃ চঃ।

তাহাতে হরিদাস নিবেদন করিলেন প্রভো! তোমার স্নেহে কৃতার্থ হইয়াছি। অস্পৃশ্য অধম যবন কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও দয়াময় তুমি দয়া করিয়া আমাকে বৈকুণ্ঠে চড়াইয়াছ; ম্লেচ্ছ হইয়াও বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করিয়াছি; তোমার কৃপায় ধন্য হইয়াছি। এক্ষণে তোমার চরণে আমার এই নিবেদন আমার মনে হইতেছে তুমি শীঘ্রই লীলা সমাধান করিবে; হে করুণাময় দয়া করিয়া আমাকে সে লীলা দেখাইওনা। তোমার অগ্রে আমার এ দেহ পাত কর, ইহাই আমার নিবেদন। আমি তোমার কমল চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমার বদনচন্দ্রে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া জিহ্বায় তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভবধাম হইতে বিদায় লইব, হে প্রভো আমার এই বাসনা পূর্ণ কর! ভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র কহিলেন, তোমার প্রার্থনা আমি অবশ্য পূর্ণ করিব, কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে ইহাই কি তোমার উচিত? তোমাকে লইয়া যে আমার সমস্ত সুখ হরিদাস! সে স্নেহময়ের স্নেহস্বরে পাষাণও বিগলিত হয়। হরিদাসের হৃদয়ের উপর কি একটা উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। কহিলেন, প্রভো আর মায়া বাড়াইও না, অধমকে দয়া কর! আমাপেক্ষা বহু ভক্ত তোমার লীলার সহায় আছেন, আমি গেলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; একটি পিপীলিকা বিনষ্ট হইলে বিশাল বিশ্বের কোন রূপ ক্ষতি হয় না। অতএব হে করুণাময়! আমার বাসনা পূর্ণ কর। অনন্তর প্রভু স্বীয় বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। হরিদাস বলিলেন যেন কল্য মধ্যাহ্নে দর্শন পাই। তাহাই হইল। ভক্তের বাসনা পূর্ণের জন্য যথা সময়ে প্রভু আসিয়া দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন কি সমাচার! হরিদাস বলিলেন তোমার যে আজ্ঞা; প্রভু ভৃত্যের ইঙ্গিত অন্য কেহ অনুধাবন করিতে পারিলনা। হরিদাসের ইচ্ছামত প্রভু ভক্তবৃন্দ লইয়া সেই স্থানে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এবং স্নেহ গদ গদ কণ্ঠে ভক্ত মণ্ডলীর নিকট হরিদাসের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন; ভক্তগণ হরিদাসের চরণ বন্দিলেন। অনন্তর হরিদাস ভক্তগণকে বন্দনা পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ে প্রভুর চরণ ধারণ ও তাঁহার শ্রীমুখে নয়ন স্থাপন এবং জিহ্বায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভবধাম হইতে বিদায় লইলেন। যথা,——

সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল।

নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল।
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ।

ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু ভক্ত বিরহও তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। প্রভু ভক্ত হরিদাসের দেহ ক্রোড়ে লইয়া বিহ্বল প্রাণে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভক্তগণও তৎসঙ্গে মিলিত হইয়া পুনরায় নৃত্য কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। অনন্তর নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাসকে লইয়া সমাধিস্থ করিবার জন্য সকলে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। প্রভু হরিদাসকে সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া কহিলেন, ভক্ত সম্মিলনে সমুদ্র আজ মহা তীর্থে পরিণত হইল। সকল ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক লইয়া পান করিলেন। অনন্তর যথা হরিদাসকে সমাধিস্থ করা হইল। প্রভু স্বয়ং সমাধিতে বালুকা প্রদান করিলেন। সমাধি বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অহো হরিদাসের কি সৌভাগ্য!! অনন্তর সমুদ্রে স্নানাদি করিয়া সকলে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর হরিদাসের মহোৎসবের দিন প্রভু স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণের মনস্থ করিলে, স্বরূপ গোসাঞী তাহাতে বাধাদিয়া বহু প্রসাদাদি প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মরি মরি কি অপূর্ব্ব ভক্ত বাৎসল্য! অদ্যাপিও সমুদ্রের সন্নিকটে হরিদাসের পবিত্র সমাধি অক্ষত ভাবে রহিয়া ভক্তহৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভক্ত বাৎসল্য ও হরিদাসের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আমরাও ভক্ত প্রবর হরিদাসের পবিত্র চরণে প্রণতি পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

পাগলের প্রলাপ।

"The lunatic the lover and the poet,
Are of imagination all compact;
One sees more devils than vast hall can hold;
That is the mad man: the lover all as frantic
Sees Halen's beauty in a brow of Egypt:
The poet's eye, in a fine phrengy rolling
Doth glance from heaven to Earth, from Earth to heaven,
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen,
Turn them to shape and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

Shakespeare, Mid-summer Nights Dream.
ACT V.

মন্তব্য।

পাগলের মুখে যাহা আসে তাহাই বলে, তাই বলিয়া জগতের লোক ত আর পাগল হয় নাই যে তাহার সকল কথাই শুনিবে; আর পাগল যখন যা' বলে সে কিছু লোককে শুনাইবার জন্য বলে না, সে আপনার মনে প্রলাপ বকে; তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করুক বা না করুক তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপ থাকে না; তবে যদি সহসা তাহার কোন কথা কাহারও কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রবেশ করে তাহা হইলে তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হউন না কেন, তাঁহাকে

পাগল করিয়া তুলিবেই তুলিবে। কারণ পাগলীমায়ের সকল ছেলেরই হৃদয়ে পাগলের ছিট্ অপরিস্ফুট ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। নিজের ইচ্ছায় কেহ কখন ত পাগল হয় না এবং হইতেও পারে না, পাগলেই মানুষকে পাগল করিয়া তুলে সেই ভয়ে "পাগলের প্রলাপ" এতদিন অপ্রকাশিত ছিল কিন্তু পাগলের মুখে বেশী দিন আর হাত চাপিয়া রাখা চলিল না।

প্রকাশক।

---

(১)

মা! এ জনমে বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল, যে তোর মুখখানি একবারও ভাল করিয়া দেখা হইল না; যতবারই দেখি, দেখিয়া আর আশ মিটিল না। যতই দেখি ততই মনে হয় বুঝি ভাল করিয়া দেখা হইল না, আর একবার যেন একটু ভাল করিয়া দেখিলে ভাল হইত। দয়াময়ি মা! তুই কত লোকের কত কামনা পূর্ণ করিস্ মা, আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ করিস্ যেন ইহজীবনে অন্ততঃ একবারও তোর মুখখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই, তাহলে আমার মরিয়াও সুখ, নতুবা আমার জীবন মরণ দুইই সমান।

(২)

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মাগো মনের মরণ হয় না কেন? মন পাপ করিবে, করাইবে, অনুতাপ অনলে দিবানিশি পুড়িবে, জগৎকে পোড়াইবে তবু মরিবে না। মনের মরণ হইলে বাঁচি, উহার সঙ্গে আর জড়িত থাকিতে পারি না; হৃদয় ছারখার হইল, প্রাণ বিষময় হইয়া উঠিল, মা দয়াময়ি! একবার চাহিয়া দেখ।

(৩)

ভোলানাথ যাঁর চরণ ধূলা পাইয়া কালকূট হলাহলের জ্বালা ভুলিয়াছেন, ভোলা মন! তুমি সেই চরণ ভুলেও ভাবিলে না, তবে ভবের জ্বালা ভুলিবে কিরূপে?

(৪)

উদয়োন্মুখ রবির আরক্তিম মুখছবি দেখিলে, দয়াময়ি মার চরণ কমলের

সৌন্দর্য্যরাগ হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই জগতের লোক প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে।

(৫)

গুয়ে মাছিগুলি দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু সুমিষ্ট-সন্দেশভোজী মক্ষিকার রূপ নাই; সেইরূপ সাধক ভক্তের বাহিক চাকচিক্য নাই, তাঁহার দেহ ছাই পাঁশ মাখা, আর যাহারা সংসারের পুরীষাসক্ত তাহারাই সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত।

(৬)

ঘড়ির প্রত্যেক ঘরে ছোট কাঁটাটী প্রত্যহ দুইবার আইসে। সেইরূপ প্রত্যেক মানবের জীবনে সুখ দুঃখ যে একবার আসিয়াই ক্ষান্ত হইবে এমন নহে, ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আসিবে। এ কলের এই মজা।

(৭)

অনেক সময় কাণে কলম গুঁজিয়া আমরা চারিদিক খুঁজিয়া মরি; সহসা কাণে হাত পড়িলে বা কেহ দেখাইয়া দিলে আমরা মনে মনে কিরূপ লজ্জিত হই তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝেন। আমাদের হৃদয়ধনকে হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়া আমরা সংসারময় হাতড়াইয়া বেড়াই, পরিশেষে যখন মনে হয় যে তিনি ত আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন বা যখন কেহ চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় তখন আমাদের লজ্জায় আর মুখ দেখাইবার যো থাকে না।

(৮)

একখণ্ড অঙ্গারে (Carbon stick) বৈদ্যুতিক তেজ (Electricity) প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুভ্র ও সমুজ্জ্বল (Incandescent) করিয়া তুলে, তখন তাহার দীপ্তিতে দশদিক সমুদ্ভাসিত হয়। আমাদের হৃদয় পাপানলে পুড়িয়া অঙ্গার হইলেও তাহা ভগবৎ প্রেম তড়িৎস্পর্শে নিমেষের মধ্যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে জ্বলিতে থাকে ও তাহার আভায় দশদিক প্রভাসিত হয়।

(৯)

তোপের সহিত মিলান থাকিলে সব ঘড়িই এক রকম চলে ও এক সময়ে বাজে। সেইরূপ দয়াময়ের অভিপ্রায় ও আদেশমত কার্য্য করিলে সকলেই সমভাবাপন্ন হয়।

(১০)

সহযাত্রী পথিকগণের ভিতর পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে সহানুভূতি ও সহৃদয়তা দৃষ্টি হয় তাহার স্বাভাবিক কারণ তাহাদের সকলেরই গন্তব্যের দিকে লক্ষ্য। তবে কেন এই ভবযাত্রার পথিক মানবগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর বিবাদ করে তাহা ত বলিতে পারি না। ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও পরিতাপজনক।

(১১ (

ফল পাকিলে তাহাতে রং ধরে, সেইরূপ হৃদয় পরিপক্ক হইলে তাহাতে অনুরাগ জন্মে। কাঁচা বেলায় রং ধরিলে ভিতর মিষ্টি হয় না।

(১২)

একটী লৌহদণ্ডকে পিটিয়া সরু তার করিলে তবে তাহা হইতে সুর নির্গত হয় সেইরূপ স্থূল মনকে পিটিয়া সূক্ষ্ম করিতে পারিলে তবে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে নতুবা সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণে চিরবঞ্চিত থাকিবে।

(১৩)

আতসবাজী রাত্রে অতি সুন্দর দেখায় কিন্তু দিনমণির উদয়ে তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না তখন তাহা ধূম ধুসরিত হয়। আমাদের হৃদয়ও যতদিন মায়া তিমিরাচ্ছন্ন থাকিবে ততদিন এ ভবের বাজী সকলেই সুন্দর ও উজ্জল দেখাইবে কিন্তু চৈতন্যের বিকাশে সে সমস্তই নিষ্প্রভ ও বিলীন হইয়া যায়।

(১৪)

পৃথিবীর যেখানে খুঁড়িবে সেইখানেই দেখিবে যে সমস্ত জলই এক সমতলে রহিয়াছে যেখানে বা আপাততঃ নাই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন তথায় একসমতলবর্ত্তী হইতে প্রবণতা রহিয়াছে। উপরের উচু নীচুতে কিছু আসে যায় না ভিতরে চিরকাল অভিন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেইরূপ মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল খুঁড়িয়া দেখ সমস্তই একভাবে রহিয়াছে সকলেই এক উপাদানে গঠিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত, এক জীবনীশক্তিতে পরিচালিত, এক নিয়মের বশীভূত। বাহিরের ছোট বড় কোনও কাজের নয়।

(১৫)

দয়াময়! সর্পের মস্তকে মনি, পঙ্কিল সরোবরে পদ্ম, কণ্টকিত পল্লবে ফুল, এসব দেখিয়া তুমি যে পাপীর হৃদয়ে আসিবে না ইহা বিশ্বাস হয় না।

(১৬)

সকল রকম তরকারিও মসলা দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিলে তাহাতে লবণ না থাকিলে তাহার যেমন কোন আস্বাদন হয় না, সেইরূপ ইহসংসারে সহস্র সুখসম্পদ থাকিলেও ভগবৎ প্রেম সংস্পর্শ বিনা সকলি বিস্বাদ হয়।

(১৭)

চাঁদের দিকে চাহিয়া চলিতে থাক চাঁদও তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক সেও স্থির থাকিবে। সেইরূপ ভগবানের মুখপানে চাহিয়া সংসারের কার্য্য কর তিনিও তোমার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে নামিবেন ও তোমার সহায়তা করিবেন আর তুমি স্থির থাকিলে তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

(১৮)

গাধা আস্তাকুড়ে চরিয়া বেড়ায়, যা' তা' অপবিত্র জিনিষ খায় কিন্তু উহার দুগ্ধ নাকি শুনিয়াছি বড় উপকারী ও পুষ্টীকর। দয়াময়! তোমার এই সংসারের আস্তাকুড়ে যে সব গাধা চরিয়া বেড়ায় ও পাপের পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনা রাশি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে তাহাদের ভিতর হইতেও বুঝি ঐরূপ কিছু না কিছু ভাল সামগ্রী বাহির করিয়া লইবার তোমার অভিপ্রায় আছে।

(১৯)

দয়াময়! তোমার সংসার যেন নান্খেতাই, ইহাতে সুজি আছে, চিনি আছে, ঘি আছে, মরিচ আছে, মসলা আছে কিন্তু জল নাই কট্ কট্ গরম! ইহাতে সুখ আছে, সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে সবই আছে কিন্তু শান্তি নাই বলিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন ও কর্কশ বোধ হয়।

(২০)

অমৃত পিতলের পাত্রে রাখিলে তাহা বিকৃত ও কলঙ্কিত হয়। প্রেমামৃত ও তদ্রূপ অপাত্রে (এই সংসারে) ন্যস্ত হইলে তাহা কলঙ্কিত ও বিস্বাদ হয়। যদি প্রেমের স্বাভাবিক স্বর্গীয় মধুরিমা আস্বাদন করিতে হৃদয়ে সাধ থাকে

তাহা হইলে সেই প্রেমময় হৃদয়েশের সহিত প্রেম করিও, তিনিই বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আধার ও উৎস।

(২১)

নারিকেল কচিবেলায় জল পূর্ণ থাকে, ক্রমে যত ঝুনো হইতে থাকে ততই তাহার জল শুখাইয়া শাঁষে পরিণত হয়, অবশেষে কালে তাহা শুষ্ক খড়ুলি হইয়া যায়। আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ; বাল্যে তাহা নৈসর্গিক প্রেমবারি পরিপূর্ণ থাকে, ক্রমশঃ আমরা যত বড় হই ততই আমাদের হৃদয়ের প্রেমরস শুকাইয়া তাহা ঝুনো হইয়া আসে ও সংসারের বিচিত্র পরিণাম বশে তাহা বিশুষ্ক খড়ুলি হয়, তখন তাহাতে একবিন্দুও প্রেম থাকে না।

(২২)

রেলগাড়ী চলিয়া যায়, যাহার যেখানে উঠিতে বা নামিতে হইবে সে সেখানে উঠে বা নামে। কালরূপ কলেরগাড়ীও ছুটিয়া চলিয়াছে, যখন যেখানে যাহার সময় উপস্থিত হয় সে তখনই সেখানে জন্মায় বা মরে।

(২৩)

পাঁজার ছড়ের ইট পুড়ে না, ভিতরের ইট পুড়িয়া ঝামা হইয়া গেলেও পাঁজার বাহিরের ইট কাঁচা থাকে। প্রকৃত মহৎব্যক্তিরও তদ্রূপ হৃদয় দুঃখানলে পুড়িয়া ছাই হইলেও তিনি বাহিরে সদাই প্রসন্ন বদনা।

(২৪)

অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর উপরিভাগ উত্তপ্ত বালুকাময় কিন্তু একটু খুঁড়িলেই স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সুশীতল সলিল প্রবাহ দেখিতে পাইবে। আমাদের হৃদয়ও সংসারের সংস্পর্শে উপরিভাগে সেইরূপ বালুকাময় মরু হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তস্তলে সুবিমল প্রেমবারি নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে, অতি অল্প খুঁড়িলেই দুই এক স্তর নিম্নে তাহা পরিলক্ষিত হয়।

(২৫)

ভগবানের অব্যক্ত লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করিতে জগতে অনেক নির্ব্বাক প্রচারক আছে। পর্ব্বত, প্রস্রবণ, স্রোতস্বিনী, বিটপীশ্রেণী, তারকারাজী, মেঘমালা, রবিশশী—ইহারা অনন্তকাল ধরিয়া প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম কি এক মধুর অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রকাশ করিতেছে! তাহা, ইহাদের এক একটি শত সহস্র বাগ্মী প্রচারকের বাক্‌পটুতাকে উপহাস করিতেছে।

(২৬)

পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টীপাত করিলে নীচের ঘর বাড়ী, গাছ পালা, পথ ঘাট, নদ নদী ও যাবতীয় বস্তু চিত্রপটে অঙ্কিত দৃশ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তখন তাহাদের বস্তুগত সত্ত্বায় সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহারা যে বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে তখন তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ অধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরে উঠিলে জগত প্রপঞ্চ সকলেই অলীক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়, এ বিশ্ব সংসারের বস্তুগত অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় ও তখন তাহা আলেখ্যলিখিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ফলতঃ ধর্ম্মজগতে একটু উচুতে না উঠিলে ভবের ভূর ভাঙ্গিবে না, এজগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হইবে না, মায়া মোহ ভ্রম প্রমাদ অপসারিত হইবে না

(২৭)

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে পৃথিবীর জলরাশি যুগপৎ উছলিয়া উঠে ও সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত, স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত নদীতে জোয়ার উৎপাদন করে। সেই প্রেমময় পূর্ণচন্দ্রও আমাদের হৃদয়ের সন্নিহিত হইলে (অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্য আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে) আমাদের হৃদয়ের সমগ্র প্রেমরাশি সহসা উচ্ছ্বসিত হয় ও নিমেষের মধ্যে দেহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেই প্রেমোচ্ছাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

(২৮)

গুয়ে মাছি গুলা সদাই ভেন্ ভেন্ করে বেড়ায়, কিন্তু মৌমাছি নিঃসাড়ে বসিয়া মধুখায়; সেইরূপ সংসারের পুরীষাসক্ত জীব সদাই হৈ চৈ করিয়া বেড়ায় ভগবৎপ্রেমিকের মুখে কথাটী নাই তাহার মন মধুকর নীরবে সেই প্রেমময়ের পাদপদ্মে বসিয়া মকরন্দ পান করে, আর নড়িতে চায় না।

(২৯)

একটী ছোট ব্রণের যাতনা বড় ফোড়ার যাতনার চেয়ে ঢের বেশী বোধ হয়, সংসারী মানব তাই সেই প্রেমময়ের চির বিচ্ছেদ যাতনা ভুলিয়া থাকিতে পারে কিন্তু কোন পর্থিব প্রিয়সামগ্রীর ক্ষণিক বিরহ তাহার পক্ষে তীব্র ও অসহ্য হইয়া উঠে। দয়াময়! তুমি যাহাদের মর্ম্মস্থানে নিবদ্ধ আছ তাহারা সদাই আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া থাকে ; তুমি নড়িলে চড়িলেই যাতনায় তাহাদের প্রাণ

বাহির হইয়া যায়। তেমাকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াও তাহাদের স্বস্তি নাই, সর্ব্বদা ভয় পাছে তুমি পরিত্যাগ করিয়া পালাও।

(৩০)

সূর্য্যের বিশুদ্ধ শুভ্রজ্যোতি তিনপলে কাঁচের (Prism) ভিতর দিয়া প্রতিভাত হইলে লাল নীল নানা রঙ্গের দেখায়; সেইরূপ পরব্রহ্মের বিমল বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ সত্ত্ব রজো তমোময়ী প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিভাসিত হইয়া বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়।

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি স্বপ্ন।

আমি যে, দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আগে, ঠিক্ বুঝিতাম না। দেহতরু তখন অটল ছিল, এখন দুই একটা ঝাপ্‌টা খাইয়া, সে ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। সেই জন্য সাবধান হইতে খুবই ইচ্ছা; কিন্তু কাজে আসে কৈ? ভবিষ্যতে যদি হয়।

'আমি' জিনিষটি কি জানিবার বড় ঝোঁক হইয়াছিল। ডার্বিন তত্ত্বের আলোচনায় দর্শনের ঘটত্ব পটত্বের ঘন অন্ধকারে আমার ন্যায় বুদ্ধিমানের কোন ফল হয় নাই। বাল্য কালে টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শুনিয়া ছিলাম আমি, কর্ত্তা। ডাক্তারি পড়িবার সময় ব্যাকরণের সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইল আমি ক্রিয়া হইলাম। তিনটি যন্ত্রের ক্রিয়াই আমি। ঐ তিনটির মধ্যে আবর একটিই প্রধান। মোট কথা শেষ বুঝিলাম, দেহ ভাণ্ড বা আধার। ভাণ্ডের মধ্যস্থিত জিনিষের চাকচিক্য করিতে হইলে, ভাণ্ডের পারিপাট্য প্রয়োজন হয় না। জিনিষ মাজা ঘসা করিব কিরূপে? ঠিক্ হইল। মন, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ এই দুইয়ের মধ্যে যোজক। দেবতাদের যেমন অনল ঠাকুর, হোমের ঘৃতটা চরুটা অন্যান্য উপকরণটা দেবতাদের বহিয়া লইয়া দেন; তেমনি মন এই সব বাহিরের জিনিষ ভিতরে লইয়া গিয়া, ভিতরের

অধিবাসীকে দেয়। এই মনের সহিত ভালবাসা করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। পতঞ্জলির উপদেশ মনে হওয়ায় স্থির করিলাম, কৌশলে মনকে বশ করিবার যোগই একমাত্র উপায়। তন্ময় হইয়া জপে সিদ্ধি তন্ত্রের মত ;—
"জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধির্ণসংশয়ঃ।"

গুরুদেবকে ধরিয়া জপবিধি গ্রহণ করিলাম। কিছু দিন পরে ভাবিলাম, যদি এই রকম জপে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে যাঁহারা এই রকমের জাপক, (উদ্ধার হওয়া দূরের কথা) একটা ইন্দ্রিয়ও জয় করিতে পারে না কেন ? তবে নিশ্চয়ই জপের প্রকার অন্য রূপ আছে, যাহা সাধারণ্যে অপ্রকাশিত লুক্কায়িত, এই বিষয় শিক্ষা পাইবার বহু চেষ্টা করিয়া, বহু গ্রন্থাদি দর্শন করিয়াও বিফল হইলাম। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য রাখিলাম। অবশ্য সকলেই, বর্ত্তমানে অকৃতকার্য্য হইলে ঐরূপ পথই আশ্রয় করেন। তবে আমার চেষ্টা চিন্তা তাহার জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিল।

লোকে আগে শয়ন করে, তবে নিদ্রা যায়, আমার কিন্তু বিপরীত, আগে ঘুমাই, পরে শয়ন করি। এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও রাত্রি মধ্যে আর সাড়া শব্দ পায় না। পাছে তুমি, স্বপ্ন লঘু নিদ্রার কারণ বল, এই জন্য, এই ঘুমের খপর দিয়া রাখিলাম।

শান্তমূর্ত্তি অতি রমণীয় কান্তি কোন এক মহাত্মার সহিত কোথায় যাইতেছি। কোথায় কেন যাইতেছি—তাহা জানি না। অগ্রগামী মহাত্মাকে আমার চিরপরিচিত বোধ হইলেও ঠিক চিনিতে পারিতেছি না। যেন কেহ, মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছে। কতদেশ, কত স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রমে একটি অভিনব অতিসুন্দর দেশে উপনীত। যাইতেছি,—হটাৎ দেখিলাম, সম্মুখে একটী সুউচ্চ রজতশুভ্র পর্ব্বত। পর্ব্বতটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। কত লতায় সুগন্ধ কুসুম বিকশিত হইয়া, মধুকরদিগকে আতিথ্যের জন্য ডাকিতেছে। আর আমাদের সেখানে যাইবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া, সমীরণ দ্বারা ধীর গতিতে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছে।

হিংস্র জন্তু যাহাদের পরস্পর শত্রুতা স্বাভাবসিদ্ধ তাহারা, একত্র বিচরণ করিতেছে। ময়ূরের গলদেশে সর্পনৃত্য, কেশরীর হস্তীশুণ্ডে আরোহণ ও হস্তী কর্ত্তৃক উত্তোলন প্রভৃতি দেখিয়া, বড়ই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম,

মোট কথা স্থানটি দেখিয়া মন পবিত্র হইল। ফুল্লান্তঃকরণে পর্ব্বতেরও সেই স্থানের মনোহর শোভা দেখিতে লাগিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় হটাৎ প্রকৃতির মূর্ত্তি, পরিবর্ত্তিত হইল। সে মোহিনী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অকস্মাৎ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি। এদৃশ্য কেন? পর্ব্বতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে গাছের পাখী, পর্ব্বতের পশু, উপত্যকার প্রাণী, অধিত্যকার শ্বাপদ, ভয়ে ছুটিল। প্রবল ঝটিকা। চতুর্দ্দিকের জীব কুলের ভীষণ ভীমরব, দ্রুত ধাবনের উচ্চ শব্দ, বৃক্ষ পতনের বিপুল ভয়ঙ্কর শব্দে, আরও ভয়ঙ্কর হইল। ঝটিকার প্রারম্ভেই, সেই সৌম্য মূর্ত্তি হাওয়ায় মিশিয়াছেন। হটাৎ একটী ঝাপটে, আমায় কোথায় লইয়া গেল। আমি চেতনা হারাইয়া, সেই ঝাপটের সঙ্গে কোথায় যাইলাম জানিনা।

*　　*　　*　　*

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়াছে। কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম, কতক্ষণ প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, জীবকুলকে সংত্রাসিত করিয়াছিল, বলিতে পারি না চেতন পাইয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখি মুষল ধারে বৃষ্টি। ধারা এক একটী গোলার মত। গায়ে যেন শেল আঘাত হইতেছে। জলে বিপন্ন হইয়া ছুটীতেছি কত দূর যাইব। দৌড়িতে দৌড়িতে দেখি এক প্রকাণ্ড নদী। এরূপ নদী জীবনে দেখি নাই।

কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। এত বেগ এরূপ তরঙ্গ এমন ভীষণ আবর্ত্ত যেন পাতাল পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ সোঁ সোঁ শব্দে চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত দেখিয়া স্তম্ভিত। দুইদিক হইতে দুইটী ভীষণ তরঙ্গ জিগীষু মল্লের ন্যায় আসিয়া ভয়ঙ্কর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, চতুর্দ্দিকে ছড়াই পড়িতেছে। আর স্রোতের বেগ অবর্ণনীয়—বাষ্পীয় শকট হইতেও দ্রুত—অপূর্ব্ব শুভ্র ফেণরাশি—যেন সাধুদের হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া, নিমেষে যোজন অতিক্রম করিতেছে।

...　　...　　...　　...　　...　　...

জল থামিয়াছে। আমি, সেই নদীর সৈকতে বসিয়া, সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছি। স্রোতে, কত কি ভাসিয়া আসিতেছে—দেখি-

তেছি। যাহা আসিতেছে, তাহা নিমেষ মধ্যে দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া যাই-তেছে। এইরূপে কত আশ্চর্য্য জন্তু, কত বৃক্ষ, কত অভিনব জিনিষ দেখিলাম।

একদৃষ্টে নদীর প্রতি তাকাইয়া আছি। দেখিলাম, অতিবেগে সেই বিপুলবক্ষ নদীর মধ্য দিয়া ফেণের উপর, একটী সুবৃহৎ অক্ষর,—যেন কেহ তখনি লিখিয়াছে—বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গেল। পলক মধ্যে দেখিয়া লইলাম, অক্ষরটি ——"স" আবার দ্বিতীয় তরঙ্গ, না মিলাইতে মিলাইতেই সমসূত্র পাতে—"মঃ" নক্ষত্র বেগে চলিয়া গেল। পর তরঙ্গে, কিছু মন্দগতিতে দেখি "কঃ" একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে এই অবস্থায় ছুটিল পরে "ত" ক্ষিপ্র গতিতে নদীর উপর আবার তখনি দেখি "স্য" তালে তালে ভাসিতে ভাসিতে,

পর তরঙ্গে ———— "জ"
" ———— "প"
" ———— "নি"
" ———— "ৰ্গোর"
" ———— "ধা"
" ———— "৫"

এই কয়টি এত বেগে প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল; যে কোন অক্ষরের পর কি দেখিয়াছি, তাহাও মনে রাখিতে পারিলাম না। এই বিষয় ভাবিব অমনি দেখি, যেন কে একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের পাতা ভাসাইয়া দিয়াছে। নদীর বিপুল বপু, সমুদায় জুড়িয়াছে। প্রথম, বড় অক্ষরে, "জপ" "জপ" "জপ" এই তিনটি কথা। দেখিলাম, জপের যাহা কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য, গুহ্য, মনুষ্যের নিকট দুষ্প্রাপ্য অথচ সুবোধ্য জপনিয়ম, পূর্ব্বক্রিয়া, পরক্রিয়া, সমকাল ক্রিয়া, বিসর্জ্জন বিধি, নিষেধ বিধি, কত কি, যাহা এত দিবস তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও পাইনাই; অদ্য তাহাই দেখিয়া হৃদয়ে, আনন্দ রসে আপ্লুত হইল, মন প্রসন্ন হইল। অতি নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছি এমন সময় (আমারই দুর্ভাগ্য) একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া কাগজ খানি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল! আমার বহুদিনের সাধের ধন, পাইয়া হারাইলাম বলিয়া

কাঁদিতে লাগিলাম; কিন্তু অবসর অতি অল্প। আবার দেখি, নদীর সিকি অংশ জুড়িয়া, সংহত ফেন—যেন একটা বড় শরতের মেঘ নীল আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে ছেলেদের দাগা দিবার অক্ষরে লেখা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাক শীতি॥

দেখিয়াই বুঝিলাম, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের সেই জীব পরমাত্ম তত্ত্ব টুকু। জানিতে পারিলাম—মন কি, আত্মা কি, শরীর কি, প্রভৃতি আমার মনঃ কল্পিত প্রশ্নের উত্তর। তাহা উঠিয়াই ডুবিল। অন্য কিছুর আশায় তাকাইয়া থাকিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা হইল কিছুই নাই। আশায় চাহিয়া থাকিলাম।

দৃষ্টি অন্য দিকে গেল, বহু দূরে সেই ধবল পর্ব্বতটিকে দেখিতে পাইলাম আর দেখিলাম তাহা হইতেই নদটী প্রবাহিত হইতেছে নির্গমস্থলে, একটি প্রকাণ্ড মেঘস্পর্শী ত্রিশূল প্রোথিত। সেই প্রোথিত ত্রিশূলের মধ্য ফলকে লিখিত আছে—

"বিদ্যানদী"

তাহার নিম্নে বিস্তার বিহীন লম্বা একটী লৌহ ফলকে যেন উহার অর্থ—লিখিত আছে—

"যা প্রাপরতিপরম্পরাবারং নরাযাদাংসি।

আমি ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিলাম,—যে নদী নররূপে জলজন্তুদিগকে সেই পরপুরুষরূপ পারাবার প্রাপ্ত করায়।

ত্রিশূলের মধ্যফলকে শ্বেত, দক্ষিণ ২য় নীল, বাম ২য় রক্ত বর্ণের; মধ্য 'ম'

চিহ্নিত, দ ২য় 'অ', বা ২য় উ। আবার একটী প্রণবে, তিনটি বেষ্টিত। নিম্নস্থ চিত্রে কিছু অনুভূত হইবে।

▭ (লাল ফলকে) "অ"
▭ (রক্ত ফলকে) "উ" বিদ্যানদী। "ম" "অ"
▭ (শ্বেতফলকে) "অ"
ঁ ("যা, পরম্পরাবারং প্রাপয়তি জীবযাদাংসি"

তখন যেন সব বুঝিতে পারিলাম 'জ্ঞানমিচ্ছেচ্চ শঙ্করাৎ' মনে হইল। এইরূপ স্থির করিলাম—পর্ব্বত=কৈলাশ, ত্রিশূল=অজগবধনু, সৌমমূর্ত্তি=গুরুদেব! এ সিদ্ধান্ত করিতেছি অমনি শয়ন গৃহের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কে প্রবেশ করিয়া ডাকিল: "ওঠ, প্রভাত হইয়াছে, নব উদিত দিবাকর করে প্রবুদ্ধ হও, প্রভাত উপদেশ গ্রহণ কর।" চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, আমার কোন সহচর। তিনি কত কি বলিলেন। আর আমিও তাঁহার বাজে কথার উত্তর দিতে দিতে, আমার অমূল্য স্বপ্নটির অনেক অমৃতময় উপদেশ ভুলিলাম।

নমঃ শ্রীগুরবে শিবরূপিণে জ্ঞানদাত্রে সতীশ্বরায়।

শ্রীরামগতি বিদ্যাবিনোদ।

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা।

(৫)

"আমার ও তোমার"

—:×:—

ভক্তপ্রবর রাজযোগী মিথিলাধিপতি মহর্ষি জনক—যাঁহার চিত্ত সতত ব্রহ্মে সমাহিত থাকিত—একদা জনৈক ব্রাহ্মণের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চতুর ছিল, কি প্রকারে ঐ আজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে সে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অনন্তর মনে মনে উপায় স্থিরিকৃত করিয়া নরাধিপ সমীপে উপনীত হইল এবং অতীব বিনীত ভাবে বলিল "মহিপতে আমার অপরাধ গুরুতর হইয়াছে এবং উহার দণ্ডও সমধিক হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং আপনার আজ্ঞানুসারে আমি আপনার রাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে সে জিজ্ঞাস্য এই যে, মহারাজের রাজ্য কত দূর বিস্তৃত?" এই প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ হইলেও জনককে চিন্তাকুলিত করিয়া তুলিল—যে হেতু এ বিষয় পূর্ব্বে তাঁহার মনে কখনই উদিত হয় নাই। এক্ষণে সেই নূতন পথে তাহার চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হইলে—তিনি সহসা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া রাজর্ষি জনক অতীব বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন।—" দ্বিজবর আপনার প্রশ্নে বাস্তবিকই আমার চক্ষুর দ্বার উন্মুক্ত হইল। যে রাজ্য আমি এক্ষণে শাসন করিতেছি, ইহা পূর্ব্বে যখন আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের অধীনে ছিল তখন তাঁহারা আপনাদিগকে ঐ রাজ্যের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায় চলিয়াগিয়াছেন, অথচ সে রাজ্য তাহাই রহিয়াছে। ফলতঃ এ রাজ্য যে তাঁহাদের নহে তাহা

সপ্রমান হইয়াছে। তবে আমিই বা কিরূপে বলিতে পারি যে এই রাজ্যের স্বামী আমি? ইহা নিশ্চয় যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য বিলুপ্ত হইবে না, অথচ আমার স্বামীত্বের বিলোপ হইবে। অধিকন্তু আমার প্রজাগণ প্রত্যেকেই নিজে যে স্বাধিকৃতে ভূমিখণ্ডের অধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া থাকে। আর যে যে স্থানে আমার পুত্রেরা বাস করিতেছে সে সকল স্থানেরই বা অধিকারী কিরূপে। ফলে ইহাতে এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে যে আমি এই রাজ্যের অধিকারী নহি। যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব সে পর্য্যন্ত আমায় দেহের কীটাণু সকলও কি আপনাদিগকে উহার অধিকারী বলিয়া স্থির করিতে পারে না? আবার আমার মৃত্যুর পর এই দেহের অধিকারীত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য শৃগাল ও কুক্কুর পরস্পরে বিবাদ করিবে।

পুনশ্চ প্রথমতঃ আমি যে কে আমি স্বয়ংই: তাহা বলিতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। আমার এই দেহ আমি নহি, মাংসও আমি নহি, শোণিত ও আমি নহি, অস্থি মজ্জা মস্তিষ্কও আমি নহি, ইন্দ্রিয়গণও আমি নহি, এবং মনও আমি নহি। তবেই বুঝা যাইতেছে যে আমি কিছুরই অধিকারী নহি; অধিক কি আমি যে কে তাহাও বলিতেই আমি অসমর্থ! সুতরাং এ রাজ্য হইতে আপনাকে বহিস্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইয়াছিল। হে দ্বিজবর এই রাজ্যে যত দিন ইচ্ছা তত দিন সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকুন।

রাজর্ষি জনকের যে সুমধুর ও জ্ঞানপূর্ণ বাক্যাবলী উপরে বিন্যস্ত হইল আমরা যদ্যপি তদনুসারে ধীর ও শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে সংসারী হইয়াও অনেক পরিমাণে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে "আমার ও তোমার" লইয়া জগতে এত বিবাদ ও বিসম্বাদ সংঘটিত হয় না। এবং এ সংসারের অচিরস্থায়ী ক্রীড়নকের অধীশ্বর হইবার জন্য বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবন ও শক্তির অপব্যয়ও করি না। তাহাহইলে আমাদের প্রকৃত চক্ষু উন্মিলিত হয় এবং আমাদের জীবনের যে কি প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধনে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

বৌদ্ধ যুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ, পুত্রবধুকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পরমদয়াল বুদ্ধের শ্রীচরণে পতিত হইয়া পা জড়াইয়া ধরিলেন, শ্রীপদচুম্বন করিয়া পরে তিনবার কাতর স্বরে বলিলেন "ঠাকুর, আমি মিগার।" "ঠাকুর এতদিন জানিতাম না তোমাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলে পরম পুরস্কার লাভ করা যায়। কিন্তু এখন জানিলাম আমি মুক্ত, আর আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।" "ধন্য বধূমাতা! তুমি আমার মঙ্গলের জন্য এইগৃহে শুভাগমন করিয়াছ। এখন জানিয়াছি দান করিলেই তাহার অতুল পুরস্কার আছে। সেই দিন ধন্য যে দিন বধূমাতা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

পরদিন বিশাখা ভগবান্ সিদ্ধার্থকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সেই দিন তাঁহার শশ্রূদেবীও ঐ ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন। তৎকাল হইতে শ্রীবুদ্ধপ্রবর্ত্তীত ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের গৃহ অবারিতদ্বার ছিল।

কোষাধ্যক্ষ ভাবিলেন, "আমার বধূমাতা মঙ্গলদায়িনী। আমি তাঁহাকে কোন উপহার দিব। আর বাস্তবিক তাঁহার বর্ত্তমান মহালতা আববণী প্রত্যহ পরিধানের যোগ্য নহে। আমি একটী লঘুভার যুক্ত রত্নখচিত ঐ প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিব তাহা হইলে বধূমাতা তাহা, দিনরাত্রি সর্ব্ব সময়েই পরিধান করিয়া থাকিতে পারিবেন।"

অনন্তর তিনি এক সহস্র মুল্যের একটী সুমসৃণ আবরণী নির্ম্মাণ করিতে দিলেন। মহালতা সমাপ্ত হইয়া আসিবার পর বৃদ্ধ শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রমণদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মিগার ষোড়শ সুগন্ধ দ্রব্যে বিশাখাকে স্নান করাইয়া শ্রীগুরু সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। বালিকার শিরোদেশ আবরণীর দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাকে গৌতমের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতে বলিলেন। তৎপরে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া শ্রীসিদ্ধার্থ মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিশাখা ভিক্ষাদান ও অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ষড়ভিজ্ঞ তাহাকে আটটী বর প্রদান করিলেন। সুনীলগগণে যেমন চন্দ্রকলা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বিশাখাও সেইরূপ পুত্র পরিবারে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে তাহার দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের আবার প্রত্যেকের দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা, আবার তাহাদের প্রত্যেকেরও দশটী পুত্র ও দশটী কন্যা ছিল; এই রূপে পুত্র পৌত্রাদিতে আট হাজার চারিশত কুড়িটী বংশধরের দ্বারা বিশাখা পরিশোভিত হইয়াছিলেন।

একশত বিংশতি বৎসরে উপনীত হইলেও বিশাখার একটী কেশ পক্ক হয় নাই; সর্ব্বদা তাঁহাকে ষোড়শীর ন্যায় দেখাইত। যখন জনগণ তাঁহাকে পুত্র পৌত্রাদিতে ভূষিত হইয়া যাইতে দেখিত তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া বলিত "ইহার মধ্যে বিশাখা কোন্‌টী?" যাহারা তাহাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিত তাহারা বলিত "বোধ হয় উনি আরও কিয়দ্দূর গমন করিবেন। চলিতে কি সুন্দর দেখায়।"

যাহারা তাঁহাকে দাঁড়াইতে, বসিতে বা শয়ন করিতে দেখিত তাহারা মনে মনে করিত, "উনি আর একটু শুইয়া থাকেন, শুইলে বেশ দেখায়।" এইরূপ শয়নে উপবেশনে, ভ্রমণে বা দাণ্ডায়মানে এই চারিটী ভাবেই তাঁহাকে সমভাবে সুন্দর দেখাইত।

পঞ্চ হস্তীর ন্যায় বিশাখা বলশালিনী ছিলেন। কোশলাধিপতি তাঁহাকে, পঞ্চহস্তী সমতুল্য বলিষ্ঠা শুনিয়া, পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইলেন। একদিন যখন উপদেশ শুনিয়া মঠ হইতে বিশাখা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, কোশলপতি তাঁহার অভিমুখে একটী হস্তী ছাড়িয়া দিলেন। করীন্দ্র শুঁড় তুলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। পাঁচশত সহচরীদের মধ্যে কেহ পলাইল, কেহ তাহাদের কর্ত্রীর পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। বিশাখা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" তাহারা বলিল "নরপতি, আপনার ভীম পরাক্রম পরীক্ষার্থ একটী মত্তহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশাখা রাজার প্রেরিত হস্তী দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন "পলাইয়া কি হইবে? উহাকে কেমন করিয়া ধরিব ইহাই ভাবিবার বিষয়।" সজোরে ধরিলে পাছে করীন্দ্র পঞ্চত্ব

লাভ করে এই ভয়ে দুটী অঙ্গুলীর দ্বারা শুঁড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিলেন। হস্তী পুনঃ বাধা প্রদান বা স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ না হইয়া একবারে রাজসভায় গিয়া পড়িল। 'দর্শকবৃন্দ "সাধু" "সাধু" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সহচরী সহ বিশাখা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিশাখা তাঁহার পুত্র পরিজন সহ শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র বা পৌত্র প্রভৃতির কাহারও কোন ব্যাধি ছিলনা; তাহাদের মধ্যে কাহারও অকাল মৃত্যু হয় নাই। শ্রাবস্তীতে কোন উৎসব বা পর্ব্ব থাকিলে আগে বিশাখার নিমন্ত্রণ ও ভোজন হইত।

কোন এক আনন্দোৎসবের দিনে নগরের অধিবাসীগণ সুন্দর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য মঠে গমন করিয়াছিল। বিশাখাও কোন নিমন্ত্রিত স্থান হইতে বহুমূল্য মহালতা আবরণী পরিধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে জনগণের ন্যায় মঠে যাইতেছিলেন। তথায় তিনি অলঙ্কার গুলি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার সহচরীদের হস্তে প্রদান করিলেন। এতদ্‌সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে!

"শ্রাবস্তীতে আনন্দ উৎসব ছিল। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জনপদবাসীগণ বাগানে পদচালনা করিতেছিল। মিগারমাতা বিশাখাও নয়নরঞ্জন বেশে সজ্জিত হইয়া মঠাভিমুখে যাইতেছিলেন। পরে স্বীয় আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক একটী পুঁটলী বাঁধিয়া কৃতদাসী করে অর্পণ করিয়া বলিলেন "ইহা সঙ্গে লইয়া চল।"

বোধ হয় বিশাখা ভাবিয়াছিলেন এরূপ বহুমূল্য এবং সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধানে মঠে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। তাই বোধ হয় বিশাখা অলঙ্কারের পুঁটুলী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে পঞ্চহস্তী সমতুল্যা বলশালিনী এক সহচরী হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন "সখি ইহা লইয়া চল, সিদ্ধার্থের নিকট হইতে প্রত্যাগমন কালে আমি ইহা পরিধান করিব।"

সুন্দর আবরণী উন্মোচন পূর্ব্বক বিশাখা মঠে শ্রীবুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিলেন। উপদেশ শেষে তিনি পাদবন্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বালিকা সহচরী ভুল ক্রমে আবরণী ফেলিয়া গেল।

গৌতমের প্রিয় শিষ্য মহাস্থবির আনন্দ সভাভঙ্গের পর, জনসমূহের ভ্রান্তি বশতঃ পতিত জিনিষের তথ্য করিতেন। সেদিন তিনি বৃহতী মহালতা আবরণী দেখিয়া তদীয় শ্রীগুরুদেবের সমীপে নিবেদন করিলেন "ঠাকুর! বিশাখা ভ্রান্তিক্রমে তাহার আবরণী ফেলিয়া গিয়াছে।" সিদ্ধার্থ কহিলেন "উহা একপার্শ্বে রাখিয়া দাও। শিষ্যপ্রধান উহা স্বহস্তে তুলিয়া সোপানাবলীর একপার্শ্বে রাখিয়াদিলেন।

অতঃপর সহচরী সুপিয়াকে সঙ্গে লইয়া বিশাখা অতিথী, অভ্যাগত ও পীড়িত ব্যক্তিদের নিমিত্ত স্থান দেখিতে মঠের চারিপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। যুবা শ্রমণ ও ব্রহ্মচারিদের প্রথা ছিল যে কোন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক ঘৃত, মধু, তৈল এবং অন্যান্য ঔষধাদি লইয়া আসিলে তাহারা নানা পাত্র লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইত। সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেতালা।

কি ভাবনা ভাবরে মন ভাবরে শ্রীকালী চরণ।
ভব রণে কি ভয় তা'র অভয় পদে যে লয় শরণ॥
সংসারের দাবানলে, সদা তব প্রাণ জ্বলে,
নিবাও রে সে অনলে, সাধন বারি করি সেচন॥
গুরু দত্ত কবচ প'রে, মহাবিদ্যা অস্ত্র ধ'রে,
সেই রাঙ্গা পা হৃদে স্মরে, অবিদ্যা পাশ কর ছেদন॥
হৃদয় গ্রন্থি খুলে যাবে, সংশয় দূরে পলা'বে,
আনন্দ নীরে ভাসিবে, ঘুচে যা'বে ভব ভ্রমণ॥
শ্রীকুঞ্জ বলে ভাই সকলে, আর কেন দিন যায় বিফলে,
কালী ব'লে বাহু তু'লে, (মা মা ব'লে বাহু তুলে)।
(তারা ব'লে বাহু তুলে) নেচে নাচাও এ তিন ভুবন॥

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

৪র্থ ভাগ। { কার্ত্তিক ১৩০৭ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্ঞানের দুয়ারগুলি দিলাম খুলিয়া,
কে অভাব, কে যে ভাব, গেছে মিলাইয়া,
পাইনা সন্ধান; উপপত্তি সমাধান
দেখি শুনি ম্রিয়মাণ; মীমাংসা যুক্তিরে
ল'য়ে গেল পলাইয়া। ভাবাভাব দুটী,
পড়েনা কিছুরি ছায়া প্রাণে। ভাবদিয়া
অভাবে আহ্বান; ভাব নাই, অভাবের
পায় কেবা পাতা? কেবলি তাহাই নয়।

যে জানে ছটার খেলা, ছটার জন্মারে
আছে যার আনুগত্য নিত্য গতাগতি,
করে সে পরের ঘর একেরে ধরিয়া।
কেবল একেই যার আলাপকুশল,
এক প্রাণ, এক ধ্যান, একে মাখামাখি,
কি আছে পরের ঘরে, জানিবে সে কিসে?
যে রৌদ্রে বার্ত্তাকুদগ্ধ উচ্চ গিরিচূড়া,
(মূর্দ্ধাসিক্ত তাই বা তুষারে!) নাহি যথা
দিবারাত্রিভেদ, নিত্য সমারোহ যথা,
উৎসব ছটার, জানে কি সে শৃঙ্গবাসী,
অন্ধকার উপাদান কিবা? সিন্ধুগর্ভে,
গহ্বরের অন্ধতমিশ্রায় জ্যোতিষ্কের
সার্থকতা কিবা? আঁধার আভার ভেদ
জন্মান্ধ জানে না। সেইরূপ, নাই যার
অভাব-ভাবেতে খেলাধুলা, কিম্বা শুধু
অন্তরে, নহে দু'হে, গলাগলি যার,
পশিতে পরের ঘরে সাধ্য কি তাহার?

ব'সে আছি বসাইয়া দশটী প্রহরী
—দশটী ইন্দ্রিয়, মনঃপ্রাণ মুহ্যমান
শূন্যে ভর দিয়া। ভবের স্বপন স্তব্ধ,
ভাব সুপ্ত নিমীলিত অভাবে লইয়া,
অন্ধীভূত বিশ্বছবি, অন্ধ আঁখি তারা।
এ এক সমাধি, সমাপি শরব্যহীন
—নিদাঘের লুপ্তপ্রায় লক্ষ্যহীন মেঘ,
কিম্বা জীর্ণ শারদীয় শৈবাল নির্ম্মূল।
এ হেন সমাধিযোগে আত্মহারা হ'য়ে
কে আছে জাগিয়া? আমি? "তুমি" নাই,—নাই
বিশ্বলেখা, আমিত্বে কে দিবে জাগাইয়া?

ভাব হারায়েছে; আছে কি অস্তিত্বে জাগি—
সেই সে ভাবের ভাবী আমিত্বখানিটী?
তবে কি অভাব শুধু জাগিছে বসিয়া?
ভাবেরিত নাস্তিকতা আকাশ, অভাব;
আমি নাই, নাই বিশ্ব, যেইত অভাব।

ভাবের অতীত বটে অভাবের খেলা!
কিন্তু ভাবই ভাবুক তাহার! আমিই
—আমার আমিত্ব সেই রসের রসিয়া।
ইন্দ্রিয়ের হট্টগোলে আপনা হারায়ে,
কেমনে পাইব ভাবঅভাবের দেখা?

বিষম প্রহেলী; বাহ্যজগতের শিক্ষা
আকর্ষণ করি আনিনু আমিত্বে ধরি;
ভাবিনু আমিই সৎ, অসৎ সংসার।
কিন্তু যুক্তি দিব্যজ্ঞানে গেল বিচারিয়া
অলীক অস্তিত্বহীন যেমতি জগৎ—
আমিত্ব উপাধিমাত্র মিথ্যা অনুভূতি!
জিজ্ঞাস্য, সে অনুভূতি, উপাধিটী কার?
হ'ক ভাব, হ'ক বা অভাব সত্বাহীন,
অবশ্য পূর্ব্বানুবৃত্তি আছে কিছু পাছে;
প্রতীতি উপাধি কভু আপনি জাগেনা।

প্রতীতি মনের ভাব, উপাধি বাস্তব;
বস্তুগত পার্থক্যের পরিচয় নামে,
প্রতীতির পুণ্যপীঠ নাম আর ধামে।
ধৃতির অনধিগম্য সূক্ষ্ম উপাদান,
সেই ধাম, গুণের আবাস গৃহ; ভেদ
অদ্রব্যের, গুণের পর্য্যায় শত শত।

উপাধি একত্ববাচী; উপাধিকে দিয়া
সমষ্টির হট্টগোলে ব্যষ্টির বিকাশ।
উপাধি প্রতীতি তবে নিরপেক্ষ কিসে?
নিরপেক্ষ নহে আমিত্ব উপাধিখানি।
নহে তাহা মিথ্যা অনুভূতি। অবশ্যই
—অবশ্য সার্থক কিছু জাগিছে পশ্চাতে।—
প্রতীতি দেখায়ে দেয় পদার্থে যেমন
বাছিয়া মথিয়া তার গুণাগুণ যত,
দেখায় তেমতি মথি আমিত্বে আমার
নির্ভরের বস্তু মম। জগৎ যেমতি
উত্তর সাধক মোর, আমিত্ব নিশ্চিৎ
উত্তর সাধক কোন অদৃশ্য বস্তুর;
সেই আমি, আমিত্বের অধিষ্ঠাতা সেই।
সংসারের সহ সে যে সম্বন্ধ পাতায়
খাদক খাদ্যের ভাবে, আমিত্ব তাহাই।

জগৎ জাজ্জ্বল্যমান জীবন্ত বিকাস।
অথচ দুর্ভিক্ষ তার শিরায় শিরায়,
—আশায় নৈরাশ্য খেলে, আলোকে আঁধার,
চর্ম্মচক্ষে সংসারের নিত্য এই রাশ,
মনশ্চক্ষে সত্বাহীন অলীক উচ্ছ্বাস!
দেখি স্বপ্ন, দেখি তথা বিশ্বচিত্রলেখা,
নিদ্রায় স্বপন দুশ্চিন্তার মাদকতা,
যকৃতের যান্ত্রিক বৈকৃত্য-পরিণাম।
কে বলিল নহে তথা জাগ্রতের খেলা?
বিংশাধিক শতেক বৎসরে ছেদবিন্দু
মানব জীবনে; কাটে কাল খেলা ধুলা
জাগ্রতে নিদ্রায়। নিদ্রার স্বপন মিছে।
কেন না অস্তিত্ব তার জাগ্রতে হারায়।

মিথ্যা নয় কেন জাগ্রতের চটুলতা?
নিদ্রায় জাগৃতি-ছন্দ রহে কার কোথা?

ক্রমশঃ।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ মিত্র কবিরত্ন।

সাধনা।

১০ম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি নিষ্কলং গগনোপমম্।
প্রবুদ্ধং শক্তিসংবেগাৎ নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে॥"

মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের সমষ্টিই লিঙ্গদেহশব্দবাচ্য। মনোবুদ্ধ্যাদির প্রত্যেকেই উৎপন্ন পদার্থ, অতএব পাঞ্চভৌতিক জগতের কোনওরূপ পরিবর্ত্তনের কারণীভূত নহে। নিরবয়ব আত্মাও কেবল সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলিয়া নিষ্ক্রিয়তাহেতু পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তনের কারণ নহেন। পাঞ্চভৌতিক জৈব স্থূলদেহও উৎপন্ন পদার্থ বলিয়া স্বয়ং পরিবর্ত্তিত ও ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের কারণ স্বয়ং ক্রীয়াশীল বা অন্তরসংবেগবিশিষ্ট শক্তি; এজন্যই সর্ব্বজীবগণই শক্ত্যাধীন। শক্তি অসীমত্বপ্রযুক্ত পাঞ্চভৌতিক সসীম দেহের ন্যায় গতিশীল নহেন, ইহার অন্তরসংবেগমাত্র স্বীকার্য্য। সদ্‌গুরূপদেশানুযায়ী সাধনায় শক্তিসংবেগ স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সদ্‌গুরূপদেশানুযায়ী সাধনা ব্যতীত শক্তিসংবেগের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না এবং বাক্যদ্বারাও উক্ত সংবেগ বিষদরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি গভীর অতলস্পর্শ অকুল সমুদ্রের সমস্ত জলরাশি এককালে সহসা প্রকম্পিত ও নানাভাবে তরঙ্গায়িত হয়, তাহা হইলে উক্ত তরঙ্গায়িত অবস্থার সহিত শক্তিসংবেগের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের মহেশ্বর

অবস্থায় যে স্তিমিত গম্ভীর ভাব থাকে, সেই ভাব শক্তির প্রথম স্ফুরণে ভঙ্গ হইবা মাত্র মহত্তত্বাদি ভূতান্ত জগৎ শক্তিসংবেগে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই উক্ত শক্তি; ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগদ্বীজ ও আদ্যাশক্তি; মহদাদি জগৎ ইহারই অংশ; ইনিই মহামায়া। ইনি যখন মহদাদি জগৎপ্রসবোন্মুখী হয়েন তখন মহেশ্বর হইতে ইহার আবির্ভাব হয়, এরূপ কথিত আছে।

"হেতু সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সেহরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।)

"অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষর স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরাৎ নির্গতা সাহি প্রকৃতির্গুণবন্ধনাৎ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র।)

১১শ পরিচ্ছেদ।

"জীবঃ প্রকৃতিতত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিতি বিধীয়তে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।)

এই নব তত্বই তন্ত্রে নবকুল বলিয়া অভিহিত। এই নব তত্বের স্বরূপ যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন তন্ত্রমতে তিনিই তত্বজ্ঞানী এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তির সম্পূর্ণ অধিকারী। আকাশাদি সপ্ত তত্ব প্রকৃত্যাধীন বলিয়াই জীব সম্পূর্ণরূপে শক্ত্যাধীন, এবং এইজন্যই পাঞ্চভৌতিকদেহধারী জীবগণ সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে শক্তিরূপিণী ও শক্তিস্বরূপা আনন্দময়ী মা তারার কর্ত্তৃত্বাধীন, এবং তদ্ধেতুই তিনি জীবগণের আরাধ্যা ও উপাস্যা এবং

তাঁহাদের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। আরাধনা ও উপাসনার জন্ত তাঁহার স্বরূপাবগতি ভক্ত সাধকগণের নিতান্তই আবশ্যক, কিন্তু তাঁহারস্বরূপাবগতি তত্বজ্ঞান সাপেক্ষ। তত্বজ্ঞান ব্যতীত কেহই পরাভক্তির অধিকারী নহেন। তত্ব জ্ঞানাভাবে যে ভক্তি তাহা সামান্যা ভক্তি বলিয়া গণ্য এবং উহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপজ্ঞান হয় না বলিয়াই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সামান্য ভক্তির সহিত ও যদি সরলান্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে এবং পরে তাহা হইতেই কালে তাঁহারস্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। সামান্যা ভক্তি ত্রিবিধ, যথা,—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

অভেদজ্ঞানে সর্ব্বোত্তমা সাত্বিকী পরাভক্তি সহকারে উপাস্য দেবতার আরাধনাই সাক্ষাৎ মুক্তিফলপ্রদায়িনী।

"অহমেব পরো বিষ্ণুর্ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ।
ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্॥
সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণ সনাতনঃ।
ইত্যভেদপরাভক্তিঃ সাপূজা পরিকীর্ত্তিতা॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

"অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বা যজেদ্বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুরহং স্থিতঃ॥"

(প্রহ্লাদোক্তি—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।)

ভক্তির পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান; জ্ঞান ও পরাভক্তিতে কোনওই পার্থক্য নাই। শক্তিরূপিণী মা তারাও সর্ব্বজগৎব্যাপী যে অসীম চৈতন্য, পাঞ্চভৌতিক জড়-দেহধারী জীবও সেই সর্ব্বজগৎব্যাপী অসীম চৈতন্য; চৈতন্যাংশে উভয়েই সমান। মহাপ্রলয়ে শক্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্চভৌতিক জড় জগৎ শক্তিতে লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। জীবের স্থূল ও লিঙ্গদেহ শক্ত্যাধীন বলিয়াই জীব মা তারার অধীন। লিঙ্গদেহ শক্তির কার্য্যমাত্র; এবং স্থূলদেহও শক্তিসংবেগে শক্তি হইতেই উৎপন্ন। যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন তাহা তাহারই অধীন, এবং তাহাতেই লীন হয়, যেমন অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বায়ু

কর্ত্তৃক স্থিতিপ্রাপ্ত, এবং বায়ুতেই লীন হয়। "যো যম্মাৎ নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে।" (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।)

এইরূপ জ্ঞান শক্তিসংবেগে যাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইয়াছে,তিনিই পরা-ভক্তি লাভ করিয়াছেন। এবম্বিধ পরাভক্তিমান সাধকগণ সদ্‌গুরূপদেশানুযায়ী সাধনপ্রণালী অবলম্বনে অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও দৃঢ়তার সহিত ভূতশুদ্ধি করিতে করিতেই পরম মাতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুরূপদেশে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সাধনায় দৃঢ়তা এবং মাতৃদর্শনার্থ ব্যাকুলতা প্রভৃতিতেই মা তারা অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ সাধারণতঃ প্রথমে সাধকের মস্তকোপরি দর্শনদানে তাহাকে চরিতার্থ করেন। তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তির কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই দর্শনপ্রাপ্তির অনেক পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে;—

১ম লক্ষণ;—মাঝে মাঝে সাধকের সর্ব্বশরীর আপনা আপনিই ঋজুভাবে স্থিত হয়।

২য় লক্ষণ;—সাধকের চক্ষু হঠাৎ আপনা আপনিই সময়ে সময়ে উর্দ্ধদৃষ্টি হয়।

৩য় লক্ষণ;—মাঝে মাঝে আপনা আপনিই সাধকের চেষ্টা ব্যতীত তাহার দেহস্থ বায়ু কুম্ভকাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪র্থ লক্ষণ;—সাধককে সময়ে সময়ে, "আমি স্বাধীন নহি, আমি কাহারও অধীন," এইরূপ ধারণা বাধ্য হইয়া করিতে হয়।

৫ম লক্ষণ,—কোন কোন সময়ে সাধকের হঠাৎ বাক্‌রোধ ও সর্ব্বশরীর নিশ্চল হইয়া যায়, এবং কাহারও সম্পূর্ণ অধীনতা জ্ঞান হইবা মাত্র হঠাৎ মুখ হইতে "মা" শব্দ নিঃসৃত হয়।

৬ষ্ঠ লক্ষণ;—কোন কোন সময়ে সাধক কোনদিকে যাইতে ইচ্ছা করিলে, অন্যদিকে অনিচ্ছা সত্বেও শরীর চালিত হয় এবং বোধ হয় যে সর্ব্বজগৎ-ব্যাপী এমন কোন পদার্থ আছে, তাড়িত প্রবাহের ন্যায় তাহার প্রবাহ সর্ব্ব-দিকে নানাভাবে রহিয়াছে;—এই অবস্থাতেই সাধক প্রথমে শক্তিসংবেগ বুঝিতে পারেন এবং এই শক্তিসংবেগ নিজ শরীরে বিশেষরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই অবস্থাতেই সাধকের নিয়তিবিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে সমুদায় জীবই এই শক্তিপ্রবাহের বা শক্তিসংবেগের অধীন,

হিংস্রক জন্তু সকল স্বাধীনভাবে তাহার কোনওই অপকার করিতে সক্ষম নহে, শক্তিসংবেগেই সমুদায় ঘটিয়া থাকে এবং এই শক্তিসংবেগ যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী উদিতা হইয়াছেন, তাহার আর কোন হিংস্রজন্তু হইতে ভয়ের কোনওই কারণ নাই।

৭ম লক্ষণ ;—সময়ে সময়ে সাধকের শরীরে মূলাধারপদ্মস্থ কুণ্ডলিনীদেবী হঠাৎ জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েন। সাধক কুলকুণ্ডলিনীদেবীর উত্থান অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। কুলকুণ্ডলিনীদেবী মণিপুরে উত্থিত হইলে সাধকের মন হইতে লজ্জা ও ভয় সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয় ; অনাহত চক্রে উপনীত হইলে, অহংকার দূর হইয়া যায় ; আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হইলে, সাধকের মন স্থির হয় এবং তখন তিনি প্রকৃত যোগস্থ হয়েন।

৮ম লক্ষণ;—সাধকের শরীরে আপনা আপনিই সময়ে সময়ে নানা প্রকার হঠযোগপ্রক্রিয়া ঘটিতে থাকে।

৯ম লক্ষণ;—সাধকের মস্তক সময়ে সময়ে আপনা আপনিই অবনত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং তখন সাধককে বাধ্য হইয়া মা তারাকে প্রণিপাত করিতে হয়।

১০ম লক্ষণ;—মাঝে মাঝে সাধক মা তারাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকেন।

১১শ লক্ষণ;—পিতৃবাক্য মাতৃবাক্য ও গুরুবাক্য মা তারার বাক্য বলিয়া সাধককে বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয়; পিতৃমাতৃ ও গুরুভক্তি এবং অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য, বাধ্য হইয়া সাধককে এরূপ বিশ্বাস করিতে হয়।

১২শ লক্ষণ;—যে কোন কার্য্যের প্রবৃত্তি মনে উদিত হয় সেই কার্য্যই মা তারার অভিলষিত, বাধ্য হইয়া এরূপ বিশ্বাস করিতে হয়।

১৩শ লক্ষণ;—কোন কোন সময়ে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনে শান্তি হয়।

১৪শ লক্ষণ;—প্রবৃত্তিমার্গই সহজ ও অনুকূল মার্গ, বাধ্য হইয়া এরূপ বিশ্বাস করিতে হয়।

১৫শ লক্ষণ;—সময়ে সময়ে আপনা আপনিই অনেক শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং তাহাদের সার মর্ম্ম অনায়াসে অবগত হওয়া যায়।

১৬শ লক্ষণ; সময়ে সময়ে মনে অত্যন্ত ভয় হয় এবং সময়ে সময়ে ভয় অন্তঃকরণ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

এবম্বিধ আরও অনেকানেক লক্ষণ আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদায় লিপিবদ্ধ করা হইলনা। মূলকথা এই যে, যে সাধক বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না এবং কিছুই করেন না, তিনি মা তারার দর্শন পাইবার যোগ্য ব্যক্তি। জীব যে স্বয়ং কিছুই করে না এবং কিছুই করিতে পারে না ইহা অনায়াসেই বিচারে অবগত হওয়া যায়। মনেকর আমি বশীরহাট হইতে কলিকাতা যাইব। দেখা-যাউক আমি কলিকাতা যাইতে পারি কি না এবং আমার পক্ষে কলিকাতা যাওয়া সম্ভব কি না। আমি কি তাহা দেখাযাউক। আমি জানি আমি আছি এবং আমার হস্তপদাদি বিশিষ্ট স্থূল শরীর আছে, আমার অন্তঃকরণ আছে এবং এই অন্তঃকরণে ইচ্ছাহয়, চিন্তা হয় এবং অনেকানেক বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়। ইহা ভিন্ন আর আমার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি একটী জীব, আমার পাঞ্চভৌতিক একটী জড়দেহ আছে, আমার মন আছে, এবং আমি আছি এজ্ঞান আমার আছে। প্রথমে দেখা যাউক আমি জড় পদার্থ কি না। আমি দেখিতে পাই এবং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে জড় পদার্থ জানে না যে সে আছে অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান তাহার নাই। আমি আছি আমি জানি, এজন্যই আমি জড়পদার্থ নহি। আমি যদি জড় পদার্থ না হইলাম, তাহাহইলে আমি জড়াতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ হইব।

এখন দেখা যাউক আমি দেহ মধ্যে স্থিত কি আমার মধ্যেই আমার দেহ আছে। আমি যদি আমার দেহমধ্যে থাকি তাহাহইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমার আকার আছে এবং আমি সাবয়ব পদার্থ, যেহেতু দেহমধ্যে স্থিত বলিয়াই আমি সসীম পদার্থ এবং সীমাবিশিষ্ট পদার্থের অবয়ব অবশ্য স্বীকার্য্য কারণ অবয়ব না থাকিলে কিরূপে সীমা নিরূপিত হইবে? এবং অবয়বহীন আকার অসম্ভব। এজন্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যদি আমি দেহমধ্যে স্থিত থাকি তাহাহইলে আমি সাকার ও সাবয়ব পদার্থ। কিন্তু অবয়ব ও সসীম আকার পাঞ্চভৌতিক পদার্থেরই গুণবিশেষ এবং

পাঞ্চভৌতিক পদার্থ জড়, আমি যখন জড় নহি তখন আমার অবয়বও নাই এবং আকারও নাই। আমি যদি নিরবয়ব নিরাকার পদার্থ হইলাম, তবে আমি সসীম পদার্থ নহি, অর্থাৎ আমি অসীম। আমি অসীম পদার্থ বলিয়াই আমি দেহ মধ্যে স্থিত নহি, আমি সর্ব্বজগৎব্যাপী নিরাকার ও নিরবয়ব পদার্থ এবং নিরাকার ও নিরবয়ব হেতু আমি অবিনাশী, যেহেতু নিরবয়ব ও নিরাকার পদার্থের বিনাশ সম্ভব্য নহে। আমি যদি অসীম ও সর্ব্বজগৎব্যাপী হইলাম, তবে আমার মধ্যেই আমার দেহ আছে, আমি আমার দেহমধ্যে স্থিত নহি, বিশেষতঃ নিরবয়ব বলিয়া আমি অচল অর্থাৎ গমনাগমন আমার পক্ষে অসম্ভব, আমার মধ্যস্থিত জড় পাঞ্চভৌতিক পদার্থগুলিরই চলাচল সম্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমি কলিকাতা যাইতে পারি না এবং আমার কলিকাতা যাওয়া সম্ভব্যও নহে; আমি যখন সর্ব্বজগৎব্যাপী তখন আমার কলিকাতা যাওয়ার কোনওই অর্থ নাই। তবে এই দেহটা কলিকাতা যাইতে পারে এবং তাহাহইলেই আমি বোধ করি বা মনে ভাবি যে আমি কলিকাতা যাইলাম। কিন্তু দেহটা পাঞ্চভৌতিক জড়পদার্থ, আপনা আপনি চলিতে পারে না; আমিও নিরবয়ব পদার্থ বলিয়া অন্তরসংবেগহীন। তবে কাহা কর্ত্তৃক এই দেহ চালিত হয়? অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সচরাচর সাধারণ চক্ষে অদৃশ্য এমন কোন অলৌকিক অসীম স্বয়ং ক্রিয়াশীল সাবয়ব পদার্থ আছে যাহা কর্ত্তৃক দেহ চালিত হয়, এবং এই পদার্থের এবম্বিধ ক্রিয়া আছে বলিয়াই ইহাকে শক্তি নামে অভিহিত করা যায়। যদি বল আমি দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহি, কোন নিরবয়ব অসীম পদার্থের সহিত এই দেহের সংযোগ বা সসম্বন্ধ হইলেই আমি দেহ ও উক্ত নিরবয়ব পদার্থের সমষ্টি স্বরূপ জীব; তাহাহইলেও বলিতে হইবে যে উক্ত নিরবয়ব পদার্থ অচল, কেবল উহার মধ্য দিয়াই দেহটা চালিত হইয়া থাকে। এখন দেখাযাউক উক্তনিরবয়ব পদার্থটা কি। আমি আছি আমি জানি, এজন্য আমার জ্ঞান বা চৈতন্য আছে। জ্ঞান বা চৈতন্য কাহার সম্ভবে? জড়ের জ্ঞান বা চৈতন্য আছে, এরূপ বলিতে পার না। চৈতন্যের বা জ্ঞানের চৈতন্য বা জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু জ্ঞানের জ্ঞান কি চৈতন্যের চৈতন্য, এরূপ বাক্যের কোনওই অর্থ নাই; জ্ঞান ও চৈতন্য একই অর্থবোধক।

জ্ঞান বা চৈতন্য বলিয়া একাধিক পদার্থ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে আমিই জ্ঞান বা চৈতন্য। আমি যদি একটী অসীম জগৎব্যাপী নিরবয়ব পদার্থ ও পাঞ্চভৌতিক জড় দেহের সমষ্টিস্বরূপ হই তাহা হইলে আমি জ্ঞান বা চৈতন্য কিরূপে হইতে পারি? দেহটা যে জড় ইহা স্বীকার্য্য, এবং জড় বলিয়া দেহটা চৈতন্য নহে; এজন্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে, উপরোক্ত নিরবয়ব পদার্থটাই চৈতন্য এবং আমিই উক্ত নিরবয়ব পদার্থ। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমিই এক নিরবয়ব অসীম সর্ব্বজগৎব্যাপী নিরাকার চৈতন্য বা জ্ঞান পদার্থ। তথাপিও যদি বল আমি চৈতন্য নহি, আমি একটী চেতন পদার্থ অর্থাৎ চৈতন্য ও জড়দেহের সমষ্টিস্বরূপ চেতন পদার্থ আমি; তাহা হইলে টেবলের পায়া বলিলে যেমন পায়াটাকে টেবলের অংশ বলিয়া বুঝিতে হয় সেইরূপ আমার চৈতন্য বলিলেও চৈতন্যকে আমার অংশ এবং তদ্রূপ দেহটাকেও আমার অংশ বলিতে হইবে। যখন মৃত্যু হয় তখন দেহটা পড়িয়া থাকে এবং নিশ্চল হয়, তখনও যখন আমি থাকি তখন দেহটাকে আমার অংশ বলিয়াই বা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? আমার বিনাশ নাই ইহা স্বতঃ সিদ্ধ, যেহেতু আমি আছি এ জ্ঞান আমার আছে। আমার চৈতন্য বা জ্ঞানের লোপ না হইলে আমার বিনাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর যদি আমার বিনাশ সম্ভবই হয় তাহা হইলেও আমার বিনাশ আমি জানিব বা দর্শন করিব কারণ আমার বিনাশ আমি দর্শন না করিলে আমার বিনাশ আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমার চৈতন্য বা জ্ঞান থাকিলেই আমার বিনাশ আমি জানিতে পারি। আমার বিনাশেও যদি আমার চৈতন্য থাকিল তবে আমি বিনিষ্ট কিরূপে হইলাম? ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমি আছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চৈতন্য বা জ্ঞান আছে। আমার চৈতন্য বা জ্ঞানের লোপ যখন কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে, তখন স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমি বিনষ্ট হই না, আমি নিত্য পদার্থ। আমি যদি অবিনাশী হইলাম তবে যখন মৃত্যুতে দেহ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল এবং আমি যেমন তেমনই থাকিলাম, তখন দেহ আমার অংশ, একথা আমি কিরূপে বলিতে পারি? মৃত্যুর পর দেহের সহিত আমার কোনওইত সংস্রব রহিল না? অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে, যে, যাহাকে আমার

চৈতন্য বা জ্ঞান বলিতেছি. আমিই সেই চৈতন্য বা জ্ঞান, এবং এই চৈতন্য বা জ্ঞানই সেই অসীম ও সর্ব্বজগৎব্যাপী নিরবয়ব পদার্থ যাহার মধ্যে দেহ আছে। যদি বল মৃত্যু সময়ে অন্য একটী দেহের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ হয় তাহাহইলেইত আমি দেহ ও চৈতন্যের সমষ্টি হইলাম? মৃত্যু সময়ে যদি চৈতন্যের অন্যদেহের সহিত সংস্রব হয় স্বীকার করি তাহাহইলেও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অন্য দেহের সহিত সংস্রব হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদেহের সহিত সংস্রব বিনষ্ট হয়। পূর্ব্ব দেহের সহিত অগ্রে সংস্রব বিনষ্ট না হইলে পরবর্ত্তী দেহের সহিত কিরূপে সম্বন্ধ সংঘটিত হইবে?

(ক্রমশঃ।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

মানবের সপ্তরূপ

মনস্।

মানবের পঞ্চম্ রূপের নাম মনস্। সংস্কৃত মন ধাতু অর্থে চিন্তা করা; জীব যে ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া চিন্তা শক্তির পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই ক্ষেত্রের নাম মনস্। মনু শব্দটিও মন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; মনুর অপত্য মানব—চিন্তাশক্তির পরিচালনে সক্ষম হইয়াই মানব শব্দ বাচ্য হইয়াছে। এই মনস্ ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি সাধনাই প্রকৃত পুরুষার্থ সাধন। সুতরাং এই মনস্ ক্ষেত্রের তত্ত্ব ভালরূপ বুঝা সাধক মাত্রেরই প্রধান আবশ্যকীয়।

আমরা পূর্ব্বে প্রাণরূপ এবং কামরূপের কথা বলিয়াছি, উহাদের মধ্যে প্রাণরূপ ক্রিয়াশক্তির ক্ষেত্র এবং কামরূপ ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্র। ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তির পূর্ব্বগামী এবং চিন্তাশক্তি আবার ইচ্ছাশক্তির পূর্ব্বগামী; মনস্ এই চিন্তাশক্তির ক্ষেত্র। ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে যে আমরা একটির পর একটিকে পূর্ব্বগামী বলিলাম ইহার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা যখনই কোন কার্য্য করি তাহার প্রথমে মনে একটী চিন্তা

উদিত হয়, তার পর সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত করার ইচ্ছা হয়, তার পর সেই ইচ্ছা নিষ্পন্ন ইন্দ্রিয় সঞ্চালন রূপ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। চিন্তাশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ধারাহিকত্ব লক্ষ্য করিলেই উক্ত তিন শক্তির ক্ষেত্র মনস্। কামরূপ ও প্রাণরূপের সহিত পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পরাবিদ্যার্থী সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ব্লাভাটসকি বুঝাইয়াছেন যে এই মনস্ পদার্থ বুদ্ধিযুক্ত হইলে, তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনস্ পদার্থের তিন ভাগ ও বুদ্ধি এই চারিটির রহস্য সাধন মার্গের অতি গুহ্য রহস্য; শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে যে চতুর্ব্যূহ উপাসনার উল্লেখ আছে সেই চতুর্ব্যূহের রহস্যই ত্রিধাবিভক্ত মনস্ এবং বুদ্ধিরূপের রহস্য।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কপিল দেবহুতি সংবাদে যে সাংখ্য তত্ত্ব বুঝান আছে উহাতে অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। চিত্ত, অহঙ্কার মন ও বুদ্ধি এই চারি তত্ত্ব সেই চারি ভাগ। ভাগবত গ্রন্থ মতে প্রকৃতি প্রথমে চিত্ত তত্ত্ব প্রসব করেন, এই চিত্ত হইতে অহংকার, এবং অহংকার হইতে মন ও বুদ্ধি তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে।

কপিলসূত্রে এবং তত্ত্বকৌমুদী ইত্যাদি সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রসূত প্রথম তত্ত্বের নাম মহতত্ব; এই মহত্তত্বকেই কখন কখন বুদ্ধিতত্ব বলা হইয়াছে; কপিল সূত্র ও তত্ত্ব কৌমুদীর ভাষায় এই বুদ্ধি তত্ব হইতে অহংকার এবং অহংকার হইতে মন প্রসূত হইয়াছে; এই মন উভয়াত্মক অর্থাৎ অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই উভয়বিধ।

ভাগবত গ্রন্থের কথা এবং অন্য সাংখ্য শাস্ত্রের কথার মধ্যে প্রথমেই একটু বৈষম্য দৃষ্ট হয় কিন্তু উভয় কথার সার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেই উভয়ের কথাই যে এক ইহা আমরা বুঝিতে পারি। ভাগবত গ্রন্থের চিত্ত তত্বই কপিল-সূত্র কথিত মহত্তত্ব বা বুদ্ধিতত্ব ভাগবতের অহংকার তত্ব এবং কপিল সূত্রের অহংকার তত্ব একই পদার্থ। ভাগবতের মন, কপিল সূত্রের অন্তর্মুখ মন এবং ভাগবতের বুদ্ধি তত্ব কপিল সূত্র কথিত বহির্মুখ মন। এই বহির্মুখ মনকে ভাগবত গ্রন্থে বুদ্ধি তত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে এই বহির্মুখ মনই বাহ্যবিষয় সংস্পর্শ জনিত সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বোধের কারণ। বোধ—লক্ষণ

তত্ত্বের নাম বুদ্ধি; সেই জন্য সুখ দুঃখ বোধাত্মক বহির্মুখ মনকে ভাগবত গ্রন্থে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত যে আনন্দ পদার্থ মহত্তত্ব সেই আনন্দ বোধাত্মক তত্ব সেই জন্য কোন কোন সাংখ্য শাস্ত্রে মহত্ত্বকেই বুদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীমতী ব্লাভাট্‌সকি মানবের যে ষষ্ঠরূপকে বুদ্ধিরূপ বলিয়াছেন উহাই আনন্দ বোধাত্মক মহত্তত্ব এবং তিনি মনস্ রূপকে যে তিন ভাগে বিভক্ত বলেন, অহংকার তত্ব, অন্তর্মুখ মন এবং বহির্মুখ মন সেই তিন ভাগ। তিনি এই তিনের ইংরাজী নাম দিয়াছেন Higher manas, Lower manas, Kama manas।

শ্রীমতী ব্লাভাটসকির উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা এবং অন্য সাংখ্য শাস্ত্রের কথার মধ্যে কোনটির সহিত কোনটির মিল তাহা এক জায়গায় দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিলাম।

শ্রীমতী ব্লাভাটসকির উপদেশ।	ভাগবতের কথা।	অন্য সাংখ্য শাস্ত্রের কথা।
Buddhi	চিত্ত	মহৎ বা বুদ্ধি।
Higher manas (The thinker)	অহংকার (কর্ত্তা)	অহংকার।
Lower manas	মন	অন্তর্মুখ মন
Kama manas	বুদ্ধি	বহির্মুখ মন

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহুতি সংবাদে চিত্তের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চিত্তকে রাগাদি রহিত, বিশদ, সত্ব গুণযুক্ত বাসুদেবাখ্য তত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এই চিত্তই মহত্তত্বের স্বরূপ ইহাও বলা হইয়াছে; অহংকার তত্বকে সঙ্কর্ষণাখ্য পুরুষ, মন তত্বকে অনিরুদ্ধ এবং বুদ্ধি তত্বকে প্রদ্যুম্ন শব্দের অর্থ কাম; প্রদ্যুম্ন শব্দের এই অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলেই শ্রীমতী ব্লাভাট্‌সকি কথিত কাম-মনস্ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রদ্যুম্নাখ্য বুদ্ধি তত্ব যে একই পদার্থ সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম শাস্ত্রে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চারি দেবতার উপাসনাকেই চতুর্ব্যূহ উপাসনা বলা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ আমরা এক্ষণে

এই বুঝিতে পারি যে অন্তঃকরণ যে চারি তত্ত্ব বিভক্ত সেই তত্ত্বাধিষ্ঠিত দেবতার উপাসনাই চতুর্ব্যূহ উপাসনা।

মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিরূপে অধিষ্ঠিত পুরুষকে বৈষ্ণবগণ বাসুদেব বলিয়া থাকেন, শৈব ও শাক্ত তাঁহাকেই মহাদেব বলিয়া থাকেন বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই আদি বুদ্ধ বলেন। এই মহত্তত্ত্বাধিষ্ঠিত পুরুষই খ্রীষ্টিয়ানদের The Father in heaven এবং ইনিই মুসলমানদের আল্লা। ইনিই মানবের উপাস্য। এই দেবতার উপাসনা রূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা অহংকার, অন্তর্মুখ মন এই ক্রিয়ার করণ কারক। অহংকার অন্তর্মুখ মনের সহিত মিলিত হইয়া এই উপাস্য দেবের উদ্দেশে বহির্মুখ মনকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেই বুদ্ধ সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। বহির্মুখ মন বিসর্জ্জন জন্য অহংকারের যে চেষ্টা ও অভ্যাস উহারই নাম সাধনা। এই সাধনারই নাম যোগ অভ্যাস।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগ শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহার অর্থটি ঠিক না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যোগ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন। পাতঞ্জল দর্শনে যোগ শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা এই –

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তের বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। ব্যাসদেবের টীকা অবলম্বনে বুঝা যায় যে এই যোগ শব্দের অর্থ সমাধি। এই সমাধি বা যোগ শব্দের সংজ্ঞা পাতঞ্জল দর্শনে যাহা দেওয়া আছে তাহা বুঝিতে গেলে ভগবান পতঞ্জলি চিত্ত শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। পতঞ্জলি বলেন যে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। শ্রীমদভাগবত গ্রন্থে কপিল দেবহূতি সংবাদে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটিকে বুদ্ধি তত্ত্বের বৃত্তি বলা হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বুদ্ধিতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীমতী ব্লাভাটস্কি কথিত কাম-মনস্ এবং পতঞ্জলির চিত্ত একার্থবোধক। অতএব চিত্ত বৃত্তি নিরোধ কথার অর্থ, বহির্মুখ মন অর্থাৎ কাম-মনস্ বিসর্জ্জন। বহির্মুখ বৃত্তিকে পাতঞ্জল দর্শনে ব্যুত্থান শক্তি এবং অন্তর্মুখ বৃত্তিকে নিরোধ শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে; এই ব্যুত্থান শক্তির তিরোভাব এবং নিরোধ শক্তির

আবির্ভাব হওয়ায় মনে যখন বাহ্যবিষয় সংস্পর্শ জনিত সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বোধ আর থাকে না তখন বুদ্ধিরূপের দর্শন হয় এবং অন্তরে বিশুদ্ধানন্দ বোধ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মনের এই অবস্থার নাম যোগ বা সমাধি।

পাতঞ্জল দর্শনে যাহাদিগকে ব্যুত্থানশক্তি ও নিরোধশক্তি বলা হইয়াছে তন্ত্রের ভাষায় উহাদেরই নাম বামাশক্তি ও দক্ষিণাশক্তি। বহির্মুখশক্তির নাম বামাশক্তি (প্রতিকূলশক্তি) এবং নিরোধশক্তির নাম দক্ষিণাশক্তি (অনুকূলশক্তি)। অহংকার এই দ্বিবিধ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা স্বরূপে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। এই অহংকার তত্ত্বকে যিনি চিনিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান শেষ হইয়া গিয়াছে; তিনি আর কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হইবেন না।

আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে যাবতীয় কর্ম্ম মনের ভাবনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভাবনা হইতে ইচ্ছা জন্মে ইচ্ছা হইতে ক্রিয়ার সংবেগ উপস্থিত হয়। সুতরাং কর্ম্মের মূলে যে ভাবনা আছে সেই ভাবনার ভাবুক যিনি অর্থাৎ যিনি সেই ভাবনা ভাবিয়াছেন তাঁহাকেই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রে অহংকার তত্ত্বই কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পরাবিদ্যার্থী সমিতি এই অহংকারতত্ত্বকেই ইংরাজীতে Thinker বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে সাধক নিজের মূর্দ্ধজ্যোতি মধ্যে এই অহংকার-তত্ত্বকে দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন যে তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সাধিত হয় এই অহংকারতত্ত্বই সেই সমস্ত কার্য্যেরই কর্ত্তা, এবং এই কর্ত্তাকে চিনিলেই নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ঘুচিয়া যায়। এই অহংকারতত্ত্ব ব্যুত্থানশক্তি অবলম্বনে বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া বাহ্যবিষয়ক ভাবনা ভাবিয়া থাকেন এবং নিরোধশক্তি অবলম্বনে সমাধি ভাবনা ভাবিয়া থাকেন এবং আনন্দময়ের সংস্পর্শে বিশুদ্ধানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। অন্তর্মুখী মন ও বহির্মুখী মন যেন অহংকারদেবতার দুই হস্ত; এক হস্ত দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করেন এবং আর এক হস্ত দ্বারা মহতত্ত্বের পূজা করিয়া থাকেন। অন্তর্মুখ মন এবং বহির্মুখ মন যেন কশ্যপ মুনির দুই স্ত্রী অদিতি ও দিতি। কশ্যপ কথাটির সহিত অহংকার কথাটির একটী সম্বন্ধ

আছে; তাহা এই খানে বলিয়া রাখি। উপনিষদ্ শাস্ত্রে কথিত আছে যে কশ্যপ (কচ্ছপ) এবং কূর্ম্ম একার্থবোধক; কূর্ম্ম শব্দটি কৃ ধাতু নিষ্পন্ন পদ; 'স অকরোৎ' তিনি করিয়াছেন এই অর্থে কৃ ধাতু হইতে কূর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপনিষদের উপদেশ অনুসারে কশ্যপ শব্দের অর্থই কর্ত্তা। পুরাণ শাস্ত্র হইতে কশ্যপ মুনির ইতিহাস, শ্রীমতী ব্লাভাটস্কির Secret Doctrine লিখিত উপদেশ সহ মিলাইয়া চিন্তা করিলে এই অহংকারদেবতা সম্বন্ধীয় অনেক রহস্য আমরা বুঝিতে পারিব।

মনস্বরূপের তিন ভাগের রহস্য, দীক্ষার গূঢ় রহস্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই জন্য সকল কথা বাহিরে বলা যায় না তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে মনস্বরূপ, মনুষ্যের হৃদয়রূপ গর্ভমধ্যস্থ গর্ভোদকে ভাসমান অণ্ডস্বরূপ। মহাকাশ* এই গর্ভোদক। পুরুষের বীজ সংস্পর্শে স্ত্রীর গর্ভস্থ অণ্ড যেমন চেতনা লাভ এবং গর্ভমধ্যে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মনস্বরূপও ঠিক সেই প্রকার গুরুশক্তি সংস্পর্শে চেতনা লাভ করে; তখন এই অণ্ডের যে স্পন্দন আরম্ভ হয় উহাই মন্ত্রধ্বনি। গুরুশক্তি বুদ্ধিতত্ত্বের রশ্মি। বুদ্ধিতত্ত্বের রশ্মি সংযুক্ত হইলে চেতনাযুক্ত অণ্ডস্বরূপ মনস্বরূপ ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে, তখন এই অণ্ড মধ্যস্থ পদার্থ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মনস্বরূপ অণ্ড মধ্যে তখন সাধকের জন্ম হয়; মনস্ অণ্ডে জন্মগ্রহণ হইলেই সাধকের দ্বিজত্ব লাভ হয়। এই দ্বিজত্ব লাভের নামই দীক্ষা। সাধক তখন প্রকৃত মানব শব্দ বাচ্য হন অর্থাৎ দীক্ষালাভ হইলেই তাঁহাকে মনুর সন্তান বলা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে মনু শব্দের অর্থ মন্ত্র। মনস্ অণ্ডে মন্ত্র সঞ্চারিত হইয়া যাঁহার জন্ম হয় তিনিই মনুজ। তদ্ভিন্ন অন্য কেহই মনুজ বা মানব শব্দ বাচ্য হইবার উপযুক্ত নহেন। পুরাণে জলপ্লাবনের যে গল্প আছে তাহা অনেকেই পড়িয়াছেন; সেই জলপ্লাবন সময়ে মৎস্যরূপী ভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বৈবস্বত মনু যে বীজ রক্ষা করিয়াছিলেন মনুর সেই বীজই মন্ত্রবীজ এবং ঐ মন্ত্রবীজই তন্ত্র শাস্ত্রের মনু শব্দের অর্থ। এই মন্ত্র লাভ এবং তজ্জনিত মনস্বরূপের পরিস্ফুটন কার্য্যই সাধনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

---

* পন্থায় প্রকাশিত উপাদানতত্ত্ব প্রস্তাবে মহাকাশ শব্দের অর্থ কথিত হইয়াছে।

মদালসার উপদেশ।

পুরাণ, অমৃতের সাগর, রত্নের আকর, অজ্ঞানী অন্ধজীবের উজ্জ্বল আলোক, জ্ঞানীর সুদৃঢ় সহায়। হৃদয় যদি আনন্দ রসে রসিত করিতে চাও, যদি মন, বিশুদ্ধ করিয়া ভগবানে নিবিষ্টজনিত অপার শান্তিপারাবারে ভাসিতে চাও, আর এই পাপের কোলাহলময় সংসারে থাকিয়াও পুণ্যধামের অবস্থান আনন্দ উপভোগে বাসনা থাকে, তবে পূজনীয় আর্য্যঋষিদিগের সুবর্ণিত উপাদেয় পৌরাণিক উপাখ্যান পাঠ কর, আলোচনা কর, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তাঁহাদিগের অনুকরণে গঠিত করিতে যত্নবান হও।

মহাত্মা শিবি, দয়াবৃত্তির অনুশীলনে মহত্ত্বের চরম সীমাধিরূঢ় দধিচী প্রভৃতির উপাখ্যান অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু অদ্য একটি সাধারণের অবিদিত কোন দয়াবীরের উপাখ্যানের অবতারণা করিব। পূর্ব্বেকার ভাই, বন্ধু, জনক, জননী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনই বা পুত্রাদির কিরূপ উপকার সাধন করিতেন. তাহারও স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আর স্ত্রীলোকেরা চিরদিনই অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এই প্রবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইবে। যাজ্ঞবল্ক পত্নী, গর্গপত্নী, জাবালদয়ীতা প্রভৃতির মুখের কথা শুনিয়া কে বলিতে পারে স্ত্রীলোক চিরদিনই অশিক্ষিত ? জাবালী গার্গীর বাক্যে, তত্ত্ব সিদ্ধান্তে অনেক ঋষিবরকে চমকিত হইতে হয়। কেবল যে অঙ্গুলি সংখ্যেয় এই কয়টি রমণীই ঈদৃশ ছিলেন, তাহা নহে; অন্বেষণে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে চন্দ্র বংশে বৎস নামে কোন রাজা ছিলেন। ইঁহার আরও দুইটি গুণজ নাম ছিল, ঋতধ্বজ ও কুবলায়শ্ব। বৎস নৃপতি বিশ্বাবসু নামক কোন গন্ধর্ব্বের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই গন্ধর্ব্ব দুহিতার নাম মদালসা। মদালসা রূপে গুণে বিভূষিতা, তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্না, সমুদায় সংসারের কার্য্যাদির মধ্যেও মদালসা স্বকীয় ব্রহ্মানন্দে সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন। আর ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহিতেন না।

মদালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বৎস রাজের আনন্দের সীমা নাই।

মহাসমারোহে উপযুক্ত সময়ে পুত্রের নামকরণ হইল। নাম হইল বিক্রান্ত। নাম শুনিয়াই মদালসা হাস্য করিয়া উঠিলেন। পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আর মদালসাও পুত্রের হস্ত পদ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই, তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন; বিক্রান্তের বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে মদালসাও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের বৃদ্ধি করিলেন। আর কয়দিন যাইবে? মদালসার শিক্ষায় শিক্ষিত বিক্রান্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই, সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করিলেন। পুত্র সংসার ত্যাগ করিল, গৃহী হইয়া সংসার সুখ উপভোগ করিল না রাজযোগ্য অট্টালিকায় বাস করিল না; বনে ফল মূল খাইবে, তৃণ কণ্টকের উপর শয়ন করিবে; মদালসার তাহাই বাঞ্ছিত। রাজা দুঃখিত বা শোকতপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু রাণীর হৃদয়, ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজসংসারের শোক কোলাহল কিছুদিন গত হইলে ক্ষান্ত হইল।

রাণী পুনর্ব্বার গর্ভবতী। রাজার আহ্লাদের সীমা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, বিক্রান্ত কোন কারণে গৃহত্যাগী হইয়াছে, কিন্তু এবার পুত্র হইলে আমার এ বিপুল রাজ্য রক্ষা হয়, বংশ অক্ষুন্ন থাকে। পুত্রও হইল। রাজবাটীতে আনন্দ ধ্বনি পথে ঘাটে মাঠে সকলেই রাজসন্তোষে সন্তুষ্ট।

মদালসার দ্বিতীয় পুত্র ভুমিষ্ঠ হইল। বৎস রাজের আনন্দের সীমা নাই। নামকরণ সময়ে নৃপতি পুরোহিত দ্বারা "সুবাহু" নাম রাখিলেন। মদালসা এ নাম শুনিয়াও হাস্য করিলেন। ক্রমে বিক্রান্তের ন্যায় সুবাহুও জননীর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া, শৈশব ত্যাগ করিবার সঙ্গেই সংসার ত্যাগ করিলেন।

পরে তৃতীয় পুত্র উপন্ন হইলে, তাহার নাম-"শত্রুমর্দ্দন" হইল। মদালসা ইহা শুনিয়াও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মদালসার তত্ত্বজ্ঞান উপদেশে শত্রুমর্দ্দন বাল্য অতিক্রম না করিয়াই গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

মদালসার চতুর্থ পুত্র উৎপন্ন হইল। এবারে আর সকলে সেরূপ উৎফুল্ল নহে। তবে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন মদালসে! আমি পুত্রগণের যে যে নাম রাখিয়াছি, তুমি তাহা শুনিয়াই হাস্য করিয়াছ। আমার বোধহয় তোমার কোন নামই মনোমত হয় নাই; এ পুত্র সংসারে থাকুক, বা না থাকুক, ইহার নাম করণ এবার তুমিই সম্পাদন কর। মদালসা বলিলেন তবে ইহার নাম

থাকিল "অলর্ক"। এবারে রাজা হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন মদালসে! একি নাম! ইহারত কোন অর্থই হয় না। রাণী বলিলেন রাজন্! আপনার হাসিতে আমার আরও হাসি আসিতেছে। "অলর্ক" নামটী অসম্বন্ধ অর্থহীন, আর আপনি যাহা যাহা রাখিয়াছিলেন, সে নাম গুলি কি সম্বন্ধ অর্থযুক্ত? না—সে গুলি আপনি রাখিয়া ছিলেন বলিয়া সম্বন্ধসার্থক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? আমি স্ত্রীলোক বলিয়াই আপনি অবজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রথম পুত্রের নাম। "বিক্রান্ত" রাখিয়াছেন, নামটি কেমন অর্থসঙ্গত দেখাইতেছি।—ক্রান্তি শব্দের অর্থ—একদেশ হইতে অন্য দেশে গমন। এখন দেখুন যে পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, তাহার আবার অন্যদেশ কোথায়? আর যাহার অন্যদেশ নাই, স্বয়ং সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকিল, তবে আর একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন অর্থাৎ ক্রান্তি কিরূপে হইবে? অতএব "বিক্রান্ত" নাম যে অর্থশূন্য ও অসঙ্গত তাহা স্থির হইল। দ্বিতীয় নাম "সুবাহু" যাহার দেহ সম্বন্ধ নাই, মূর্ত্তি নাই তাহার আবার সুবাহু নাম কিরূপে হইবে? অন্ধ পুত্রের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ অথবা পদ্মপলাশলোচন কেমন হয়? আর তৃতীয় পুত্রের নাম "শত্রুমর্দ্দন" যে পুরুষ সর্ব্ব শরীরে বিদ্যমান, সর্ব্বস্থানেই আছেন, তাহার শত্রু মিত্র কিরূপে সম্ভবে? গঠিত মূর্ত্তিবিশিষ্টের ধ্বংস, মূর্ত্তিবিশিষ্ট দ্বারাই হইয়া থাকে; অমূর্ত্তের ধ্বংস কিছুতেই হইবার নয়। ধ্বংস আর মর্দ্দন কি পৃথক? তবে শত্রুমর্দ্দন কি করিয়া সঙ্গত হইল? তবে নাম কেবল ব্যবহার জন্যই রাখা হয়, আর নাম মাত্রই কল্পিত। তবে সুবাহু বিক্রান্তও যেমন, অলর্কও সেইরূপ; একটা হইলেই হইল। বাচালত্বগণং।

বৎসরাজ মহিষীর এইরূপ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; বলিলেন, মূর্খে! করিয়াছ কি? এইরূপেই তুমি আমার সেই তিনটী পুত্রকেই বনে দিয়াছ, হায়! একি তোমার দুর্বুদ্ধি হইল, তুমি জননী হইয়া কি করিয়া পুত্রদিগকে বনে যাইবার শাস্ত্র, নিবৃত্তিমার্গ শিক্ষা দিলে? যাই হউক, ক্ষমা কর, ক্ষান্ত হও, এ পুত্রটিকে প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ দিয়া সংসারে রাখ। মদালসা স্বামীর বাক্যে তাহাই করিলেন। অলর্ক কর্ম্মযোগে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিছুকাল গত হইলে নৃপতি, পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া মদালসার

সহিত বন গমনে ইচ্ছুক হইলেন। মদালসা গমনকালে পুত্র অলর্ককে ডাকিয়া, একটি অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া বলিলেন;—বৎস। এই অঙ্গুরীয়কটি সযত্নে রক্ষা করিবে।

যখন তোমার মহৎ কষ্ট উপস্থিত হইবে, যখন কোন ইষ্টবিয়োগ শোকে অথবা ধনক্ষয়ে অত্যন্ত মুহ্যমাণ হইবে, যখন তোমার চতুর্দ্দিকে বিঘ্নরাশি ও বিপদসমূহ ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখনই এই অঙ্গুরীরকটি ভগ্ন করিবে। দেখিতে পাইবে;—ইহার মধ্যে কি অমূল্য স্বর্গীয় ধন লুক্কায়িত আছে। মদালসা এইরূপ উপদেশ দিয়া পতির সহিত বন গমন করিলেন। অলর্কও ধর্ম্মমতে রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন অলর্ক রাজাসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ একজন অন্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া অলর্ককে বলিলেন "রাজন্! আমার একটি প্রার্থনা আছে, যদি স্বীকার করেন, তবে প্রকাশ করি"। অলর্ক বলিলেন "হে বিপ্র! তোমার ঈপ্সিত নিশ্চয়ই পাইবে। আমি স্বীকার করিলাম; তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব"। তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বলিল; "নৃপতে! আমার দুইটি চক্ষু নাই। দেবতার প্রত্যাদেশ "যদি কোন রাজা নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমার চক্ষুকোটরে সন্নিবেশিত করিয়া দেয়, তবেই তুমি দর্শন শক্তি পাইবে, এইজন্য আপনার চক্ষু দুইটি প্রার্থনা করিতেছি"। সত্যপ্রতিজ্ঞ অলর্ক কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার দুইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বিপ্রকে দান করিলেন। দানশীলতার পরাকাষ্ঠা ও নিজের সত্যে বিশ্বাস দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিলেন। অন্ধকে ভাল করিয়া অলর্ক নিজে অন্ধ হইলেন। কিন্তু এরূপ সত্যব্রত লোকের কষ্ট কোথায় বা কতদিন? অগস্ত্যপত্নীর বর প্রভাবে তিনি পরম সুন্দর শরীর ও স্থির যৌবন হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুবাহু গৃহত্যাগের পর, সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি দেখিলেন কনিষ্ঠ ঘোর সংসারে আসক্ত, কোনরূপে সংসারে বিরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিলেন। একদিন কাশীর রাজার নিকট যাইয়া এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে আমি বৎস রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র অলর্ক কনিষ্ঠ। আমিই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। অলর্ক আমায় রাজ্য দিতে সম্মত হইবে কি না জানিনা। আপনি অলর্কের নিকট হইতে আমায় রাজ্য লইয়া দিউন। কাশীরাজ

অলর্ককে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অলর্ক ঘোর আসক্ত, সম্মত হইলেন না। সুবাহু সৈন্য সংগ্রহ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; যুদ্ধস্থল শোণিতস্রোতে ভাসিল। অলর্কের সমুদায় সৈন্য নিহত হইল। সমুদায় ধন ক্ষয় হইল। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, অলর্কের হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইল। তিনি দুঃখের অন্ত দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন আমার ন্যায় হতভাগ্য জগতে কেহ নাই। কোথায় রাজা ছিলাম, আর অদ্য পথের ভিক্ষুক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার সেই মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কের কথা মনে পড়িল। স্থির করিলেন;—অঙ্গুরীয়ক ভাঙ্গিবার ইহাই উপযুক্ত কাল। অতি উৎকণ্ঠিত ও উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীয়কটি ভগ্ন করিলেন। ভগ্ন করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে। যত্নের সহিত দেখিলেন সূক্ষ্মাক্ষরে দুইটি শ্লোক লিখিত আছে;—

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেত্ত্যক্তুংনশক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহি ভেষজম্॥
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুঞ্চেচ্ছক্যতেন সঃ।
মুমুক্ষাং প্রতি তৎকার্য্যং সৈবতস্যাপি ভেষজম্॥"

"সঙ্গ, সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ করিবে, যদি ত্যাগ করিতে না পার, তবে সাধুসঙ্গ করিবে, কেননা সাধুসঙ্গই সঙ্গরোগের ঔষধ।

কাম সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে, যদি পরিত্যাগ করিতে অসক্ত হও তবে তাহা মোক্ষের প্রতি করিবে, মোক্ষকামনাই কামনারোগনাশের ঔষধ।"

অলর্ক শ্লোক দুইটি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বার বার পাঠ করিলেন। তাঁহার শোণিতশূন্য চক্ষে জল আসিল। বিনতভাবে জননীর শ্রীচরণ উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে বহির্গত হইলেন। সুবাহুও কাশীরাজের নিকট যাইয়া বলিলেন, রাজন্! আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অনুমতি করুন, তপস্যায় গমন করি। সুবাহু অত্যাসক্ত কনিষ্ঠকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার নিজ সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। অলর্ক ক্রমে সাধু সঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সঙ্গ সযত্নে ত্যাগ কর, যদি অশক্ত হও সাধুসঙ্গী হও।
কামনা সযত্নে ত্যাগ কর, যদি অশক্ত হও মোক্ষকামী হও।

শ্রীরামগতি বিদ্যাবিনোদ।

পৌরাণিক কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবাসুর সংগ্রাম।

স্বর্গ ত্রিলোকীর শীর্ষ স্থানীয়। স্বর্গে যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারই তরঙ্গ স্তরে স্তরে ভূতলে অবনীত হয়। স্বর্গে যে আলোক জ্বলিতে থাকে, ভূতলে তাহারই আভাস পতিত হয়। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রথমে ত্রিদিবরাজ্যেই অভিনীত হয়।

পৃথিবী এখন দিন দিন স্বর্গ তুল্য হইবে। পার্থিব জীব স্বর্গের সীমা অতিক্রম করিবে। মহর্লোক হইতে জনলোক গমন করিবে। ক্রমে জনলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিবে। সেখানে হিরণ্যগর্ভের সহকারী হইয়া দ্বিপরার্দ্ধকাল অবসানে মুক্তি লাভ করিবে। কেহ বা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। কেহ বা ভগবানের আত্মজন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

স্বর্গে তাহার বৃহৎ আয়োজন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অমৃত লাভ করিয়া দেবতারা প্রবল। কিন্তু অসুরেরা এখনও নির্জ্জীব নহে। এখনও তাহারা অত্যন্ত প্রবল। তাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী। যদিও স্বার্থপরতা দৈত্যের জাতীয় সম্বল তথাপি যে সকল দৈত্য উপাসনা বলে স্বার্থকে অত্যন্ত নিস্তেজ করে, যাহারা দানদ্বারা ত্যাগকে স্বভাবসিদ্ধ করে, সে সকল দৈত্যরাজ দেবতাদিগকে এখনও সহজে পরাজিত করিতে পারে।

দেবতারা আত্মহারা। "আমি" এই জ্ঞান তাহাদের নাই। এ মন্বন্তরে এখনও দৈত্যের আমিত্ব যায় নাই।

"আমিত্বের" শিক্ষা মনুষ্যের যথেষ্ট হইয়াছে। এইবার নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম হইলে মনুষ্য উর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারিবে।

এই জন্য মহাপ্রবল ও মহাধর্ম্মপরায়ণ হইলেও অসুরের পতন। ভগবান্ এখন দেবতাদের সহায়ক।

বৈবস্বত মন্বন্তরে দুইটি মহাকাণ্ড স্বর্গমধ্যে অভিনীত হইয়াছিল। তাহার প্রবাহ আমরা এই পৃথিবীমধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সেই প্রবাহ এখনও প্রবল বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক বৃত্রবধ, দ্বিতীয় বলির ত্রৈলোক্যহরণ।

ত্বষ্টা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রবধের জন্য যজ্ঞ করিলেন।

"ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্।"

হে ইন্দ্রশত্রোঃ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, শত্রুকে শীঘ্র সংহার কর। কিন্তু মানুষ মনে ভাবে এক, হয় আর এক। মন্ত্র উচ্চারণ অনুসারে ফলপ্রদ হয়।

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

"ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দে প্রথম ইন্দ্রপদে উদাত্তস্বর। এই জন্য "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" এই সূত্র অনুসারে 'ইন্দ্র শত্রু যাহার' এই সমাসের অর্থ হইল। ইন্দ্রের শত্রু এ অর্থ হইল না।

ঘোরদর্শন বৃত্রাসুর উৎপন্ন হইল।

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ॥

ত্বষ্টার তপোমূর্ত্তি দ্বারা যিনি এই তিন লোক আবরণ করিয়া আছেন, সেই পরমদারুণ পাপ পুরুষের নাম বৃত্র।

নিরুক্তশ্রুতিতেও এই কথা আছে -

"স ইমান্ লোকানাবৃণোদেতদ্‌বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্।"

এই ভয়ানক আবরণকারী কে? কে আমাদের বৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া আছে?—অহঙ্কার, আমিত্ব, দেহাভিমান। সঙ্কর্ষণের উপাসক বৃত্র সেই দেহাভিমান।

অহঙ্কার নাশ করা সামান্য কথা নহে।

দেবতারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন—

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্॥
যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতঃ।
যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজউপবৃংহিতঃ॥

হে ইন্দ্র! দধীচি ঋষির গাত্র যাচ্ঞা কর। সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি নিজের অঙ্গ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা বজ্রনামক আয়ুধ প্রস্তুত করিবেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তুমি বৃত্রের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে।

কে আছে, যে যাচ্ঞামাত্র গাত্র দান করিতে প্রস্তুত? কাহার দেহে অহং-জ্ঞানের লেশ নাই? কাহার দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যা দ্বারা এত মার্জ্জিত যে, তাহাতে অভিমানের বীজ নষ্ট হইয়াছে।

দধীচি ঋষি বলিলেন—

এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥

প্রাণিদিগের শোকেই শোক, প্রাণিদিগের হর্ষেই হর্ষ, এই ধর্ম্মই অবিনাশী ধর্ম্ম। ঋষির আত্মপর জ্ঞান নাই; তাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজিত। তিনি সকলের প্রাণে আপন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি আর দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। অহংবৃত্তির সীমা তিনি অতিক্রম করিয়াছেন।

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

যদি শ্বশৃগালাদিভক্ষ্য স্বার্থোপযোগশূন্য ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি দ্বারা অন্যের উপকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কি কষ্ট ও কি ধিক্কার হয়।

আজ ত্রিদিবমধ্যে যে মহাযজ্ঞ সংঘটিত হইল, তাহারই বলে কত মহাত্মা

পরের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিবেন, কত জীবনবলির রক্তস্রোতে এই পার্থিব জগৎ পবিত্র হইবে!

ইন্দ্র বলির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই ত্রিলোকী বলির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বলির সহিত সংগ্রাম করিতে, ভগবান্ দেবতাদিগকে নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহাকে নিজে অবতীর্ণ হইয়া বলির নিকট ত্রিলোকী যাচ্ঞা করিতে হইয়াছিল। বলির যেরূপ ভাগ্য, এরূপ কোন দেবতারও ভাগ্য আছে কি না, সন্দেহ।

বলি দানে বলী, বলি ধর্ম্মে বলী। বলির অধিকার ত্রিলোকীরাজ্যে না থাকিবার কারণ কি? বলি অসুর হইয়াও দেবতা হইতে ভিন্ন কিরূপে? বলির অভিমান এখনও যায় নাই। তিনি অতিদানী, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আপনাকে একবারে ভুলিতে পারেন নাই। বলির শিক্ষার কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। তাই বলির উপর দয়া করিয়া ভগবান্ বলিলেন, তুমি এই মন্বন্তরের জন্ত ত্রিলোকী প্রত্যর্পণ কর এবং পাতালবাস দ্বারা অভিমানশূন্ত হইয়া পর মন্বন্তরে স্বর্গের রাজত্ব লাভ কর।

তস্মাত্বত্তো মহীমীষদ্বৃণেঽহং বরদর্ষভবাৎ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সংমিতানি পদা মম॥

বলি ত্রিপাদ ভূমি দিতে সংকল্প করিলেন, অমনি তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন—

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥

বলি বলিলেন—

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥

গুরুর তিরস্কার, আত্মজনের তিরস্কার, কিছুতেই বলি সত্য ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। তিনি প্রশান্ত, স্থির ও গম্ভীর। বরুণদেব পাশ দ্বারা বলিকে আবদ্ধ করিলেন। তথাপি তাঁহার লজ্জা কি ব্যথা হইল না।

ব্রহ্মা ভগবানের বাক্য জগৎকে শুনাইবার জন্তই যেন তাঁহাকে বলিলেন,

হে দেবদেব! হে জগন্ময়! বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, আর বলির প্রতি কেন নিগ্রহ করেন। তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দেন।

ভগবান্ বলিলেন –

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহি, তাহার ধন প্রথমে হরণ করি; কারণ ধনমদেই মত্ত হইয়া পুরুষ লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে।

যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরন্নিজকর্ম্মভিঃ।
নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ॥
জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥

জীবাত্মা নিজ কর্ম্ম দ্বারা অবশভাবে নানা যোনি ঘুরিতে ঘুরিতে যদি কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে, এবং মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি তাহার জন্ম, কর্ম্ম, বয়ঃ, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, ধন ইত্যাদি দ্বারা গর্ব্ব ও অভিমান না হয়, তবে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ॥

আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে, অভিমান ও গর্ব্বের নিমিত্তভূত, সকল মঙ্গলের প্রতিকূল, জন্মাদি দ্বারা জীব মোহপ্রাপ্ত হয় না।

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি॥

দানবদৈত্যের অগ্রণী কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই বলি দুর্জ্জয় মায়া জয় করিয়াছেন। অবসাদের মধ্যেও ইহার মোহ নাই।

ক্ষীণরিকৃথশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্॥

আজ বলি ধনশূন্য, স্থানচ্যুত, শত্রুপাশবদ্ধ, জ্ঞাতিপরিত্যক্ত, যাতনামগ্ন, গুরু দ্বারা ভর্ৎসিত ও শাপপ্রাপ্ত। তথাপি বলি সত্য ত্যাগ করে নাই। আমি তাহাকে ছলনা করিয়া ধর্ম্মকথা বলিয়াছি, কিন্তু সত্যবাদী বলি, সে ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ॥

আমি ইহাকে দেবদুর্ল্লভ স্থান প্রদান করিব। সাবর্ণি মন্বন্তরে ইনি আমাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন।

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেক্ষয়া॥

সে কাল পর্য্যন্ত সুতলমধ্যে বলি বাস করুন। আমার ইচ্ছায় সেখানে আধি ব্যাধি ইত্যাদি কোন উপসর্গ থাকিবে না।

রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্॥

হে রাজন্! আমি সর্ব্বোতোভাবে তোমাকে এবং তোমার সম্বন্ধীয় সকলকে রক্ষা করিব। তুমি সেখানে আমাকে সর্ব্বদা সন্নিহিত দেখিতে পাইবে।

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি॥

সেখানে দৈত্যদানবের সঙ্গবশতঃ তোমার যে আসুরিক ভাব, তাহা আমার অনুভাব দর্শনে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ভগবন্! বলির দ্বারী হইয়া তোমার ছলনার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইল। এবং বলির ভাগ্যেরও আর সীমা থাকিল না। বলি অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অসুরের সহবাস করিয়াও, আজ দেবতার রাজা হইতে চলিল। আর এই পৃথিবীতলে আমরা কি অসুরই থাকিব? আমাদের আসুরিক ভাব কি বিনষ্ট হইবে না? এইবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া, আমরা পৃথিবীমধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের কার্য্য অনুসরণ করিব।　　ক্রমশঃ।

শ্রী পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩১)

শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যদুগ্ধ যেমন আবশ্যকীয়ও বালকের তেমন আর কিছুই নহে; অন্যদুধ খাওয়াইলে সে শীঘ্রই দুর্ব্বল ও পীড়িত হইয়া পড়ে, তাহা কখনই তাহার পুষ্টির উপযোগী হয় না। সেইরূপ আমাদের মনকে প্রথম হইতেই সেই জগজ্জননীর প্রেম পীযূষ পিয়াইতে হইবে নতুবা একবার তাহাকে সংসারের চোকা দুধ ধরাইলে ইহজীবনে সে আর কখনই স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিবে না। ভগবৎপ্রেম জীর্ণ হইলে অমৃত হয় আর পার্থিব প্রেম পরিপাকে কালকূট হলাহলের ন্যায় কার্য্য করে।

(৩২)

কুলোয় করিয়া চাউল দাল ঝাড়িতে সবাই সমান পারে না, কেহ বা এমন সাবধানে ঝাড়িতে পারে যে সমস্ত কুঁড়ো তুঁষ ভূমিতে পড়িবে আর চাউল দাল সমস্ত কুলোয় থাকিয়া যাইবে তাহার এককণা বা একটী চোকরও মাটিতে পড়িবে না। আর কেহ কেহ চাল দাল ঝাড়িতে গিয়া আসল জিনিষই ভূমিতে ফেলিয়া দেয় আর কুলোয় কেবল খোসা তুঁষ কুঁড়ো থাকিয়া যায়। এই সংসারে দুই প্রকারেরই লোক আছে একপ্রকার লোক বেশ অসার অপদার্থ বাছিয়া ফেলিয়া সুন্দর ও সার বস্তু সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করে আর অন্য প্রকারের লোকেরা কেবল অসার লইয়া পড়িয়া থাকে, তাহারা ভাল মন্দ বাছিতে গিয়া ভালই পরিত্যাগ করে।

(৩৩)

কঠিন প্রস্তরময় শৈলরাজিও অতি দূর হইতে মেঘবৎ লঘু ও অন্তঃসার হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু যত তাহার কাছে যাইবে ততই তাহার সারবত্ত উপলব্ধি হইবে; সেইরূপ ভগবানের সন্নিহিত না হইলে দূর হইতে তাঁহাকে নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়া বোধ হয় পরন্তু যিনি যত তাঁহার নিকট অগ্রসর

হইতে পারিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে তাঁহার জীবত্তসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

(৩৪)

সকল গাছের বীজ রাখিবার জন্য একটী ভাল সুপুষ্ট ফল যত্ন করিয়া গাছে রক্ষা করে; বাকী আর সমস্ত ফল ছিঁড়িলেও সে ফলটী কখনও ছিঁড়ে না। গাছ শুকাইলে সে ফলটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুকায় তখন ঐ ফলের এক একটী বীজ ঐ প্রকার শত শত ফল সমন্বিত বৃক্ষ উৎপাদনে সমর্থ হয়। তাই বলি ভাই মানব! তোমার যাবতীয় সদ্গুণের মধ্যে অন্ততঃ একটীও (মনে কর সততা, প্রেম বা সরলতা) ঐরূপ আজীবন অটুট অক্ষত রাখিও তাহা হইলে কালক্রমে তাহা ফলিত হইয়া তোমার বিনষ্ট সদ্গুণ রাশি পুনরুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে।

(৩৫)

কোন ভাল সামগ্রী খাইলেই পুষ্টি হয় না, তাহা জীর্ণ করিতে পারিলে তবে তাহা অমৃতবৎ কার্য্যকারী হয় নতুবা বিষ তুল্য অপকার করে। প্রেম পদার্থও তদ্রূপ; উহা পরিপাক করিতে পারিলে স্বর্গ সুধাপেক্ষা মধুর ও উপকারী। স্বর্গের সুধা জীবকে শুধু অমরত্ব দেয় কিন্তু পরিপক্ক প্রেম জড়কে চৈতন্য দেয়, জীবকে জীবন্মুক্ত করে, অমরকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করে। পরন্তু ইহা জীর্ণ করিতে না পারিলে বিষের ন্যায় হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও চিরকালের মত মানবকে জারিয়া ফেলে।

(৩৬)

এক ঘটী জলে একটী মাছ থাকিলে সে জল আঁস ও অপবিত্র হয় কিন্তু পুষ্করিণীতে কত শত মাছ রহিয়াছে তবু তাহার জল অপবিত্র হয় না কারণ তাহা প্রশস্ত পাত্র। পাত্র সঙ্কীর্ণ হইলে স্বভাবতঃ তাহা সামান্য দোষেই কলুষিত হয়। বৃহৎ বিস্তৃত আধারে আধেয়ের দোষ শীঘ্র স্পর্শ করিতে পারে না। তাই বলি ভাই হৃদয় পবিত্র রাখিতে হইলে অগ্রে তাহা প্রশস্ত কর।

(৩৭)

যে জাঁতা ঘুরায় তাহাকে কেহ অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও সে শুনিতে পায় না। দয়াময়, আমরা নিয়তই এই ভবের জাঁতা ঘুরাইতেছি, জাঁতার

শব্দে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া রহিয়াছে তাই তোমার অমিয় মধুর স্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাই না। দীননাথ! আমাদের ভাগ্যে কি কখনও এই জাঁতা পেষা বন্ধ হইবে না? দেহ মন চূর্ণ বিচূর্ণিত হইল কবে আর দয়া করিবে?

(৩৮)

গাছের ফুল বা ফল ভাল হইবার জন্য জোড় কলম বাঁধে। আসল গাছটী একটু বাড়িলেই খারাপ গাছটী কাটিয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহা খুব সতেজ হয় ও তাহাতে ভাল ফুল বা ফল জন্মায়। সেইরূপ প্রথমে সংসারের সহিত প্রেম করিয়া পরে যখন প্রেমপাদপ একটু বর্দ্ধিত হইবে সেই সময় সংসার বন্ধন কাটিয়া ফেলিতে হইবে নতুবা তাহাতে সুফল ফলিবে না। আগাছা বাড়িয়া গেলে আসল গাছের আর তেজ হয় না।

(৩৯)

হিন্দু মুসলমান প্রায় সকল জাতিই দেখি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ভস্মাবশিষ্ট বা সমাহিত শবদেহোপরি সলিল সিঞ্চন করে তাই বলি ভাই! তোমার হৃদয়ের কামক্রোধাদির দাহ বা সমাধি না হইলে তাহার উপর শান্তিবারি সিঞ্চন কিরূপে আশা কর?

(৪০)

ভিজে কাপড় পরিয়া থাকিলে শরীর অপবিত্র হয় না; যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই দয়াময়ের প্রেমবারিসিক্ত তাঁহারা সংসারের সংস্পর্শে কখনই কলুষিত হয় না।

(৪১)

ম্যাগ্‌নেটের পজিটিভ সীমান্তে যাহা লইয়া যাইবে তাহা নেগেটিভাইজ্‌ড হইবে আর নেগেটিভ দিকে যাহা লইয়া যাইবে তাহা পজিটিভাইজ্‌ড হইবে; সেইরূপ যখন এই সংসার সেই সৎবস্তুর সন্নিকটে লইয়া যাইবে তখন ইহ অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, আর সেই নিত্য সৎ বস্তুকে যখন জগতে আভাসিত দেখিবে তখন তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

(৪২)

ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বালকদের পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় পরন্তু সকল বিদ্যালয়েরই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অভিন্ন। সেইরূপ

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীতে কেহ বা বেদ, কেহ বা বাইবেল, কেহ বা কোরাণ, কেহ বা জেন্দাভেস্ত পড়েন! কিন্তু ধর্ম্ম বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে উঠিলে সকলকেই তাই একই পাঠ্য পড়িতে হইবে একই পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৪৩)

সর্ব্বদা একঘরে রুদ্ধ থাকিলে শরীরের স্বাস্থ্য বা স্ফূর্ত্তি হয় না, মধ্যে মধ্যে ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে বাহির হওয়া আবশ্যক; সেই জন্য বলি চিরকাল এই দেহ মধ্যে সমাহিত থাকিলে মনের স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষিত হইবে কিরূপেই বা তাহার স্ফূর্ত্তি হইবে? মধ্যে মধ্যে মনকে এই দেহাবরোধ হইতে মুক্ত করা উচিত। সর্ব্বদা দেহাবদ্ধ থাকিলে তাহার নৈসর্গিক পুষ্টি বা বিকাশ কথনই হইবে না।

(৪৪)

বিজলীর রূপ, মধুর রস, মৃগমদের গন্ধ, তুহিনের স্পর্শ, কোকিলের শব্দ যেমন ভালবাসার ভালও তেমন। সকলগুলিই তীব্রতা দোষে অসহনীয়।

ক্রমশঃ।

প্রণব, ছবি ও গান।

বংশী ও বীণা।

——:×:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সপ্ত-বর্ণ-বিভাসিত ইন্দ্রধনু যাঁহার শিখিচূড়ায়, সপ্তস্বরধ্বনিত বংশী যাঁহার করকমলে, যাঁহার গলদেশে বনমালা, চরণে নূপুর, ও যাঁহার গতি ত্রিভঙ্গ সেই হৃদয়স্থিত পুরুষই আনন্দময় ব্রজবিহারী শ্যাম। তিনি জ্ঞেয়।

তিনি ঋষিগণের কল্পনাসম্ভূত নহেন। তিনি সত্য। বহুযুগের পর কারণ-শরীরের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে মানব তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেমন শত সূর্য্যের আভা হীরক খণ্ডে প্রতিফলিত হইলে সপ্তধা হয়, তেমনি তাঁহার আভা সহস্রারে সপ্তধা হইয়া শিখিচূড়ারূপে দেখা দেয়। যেমন প্রাণবায়ু প্রতি চক্রে

আহত হইয়া একটী একটী স্বর উৎপাদন করে তেমনি তাঁহার আনন্দময় বংশী রব সপ্তধা হইয়া কারণশরীরকে পাগল করিয়া ফেলে।

যেমন পঙ্কজ মলিনপঙ্ক ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মিতে প্রস্ফুটিত হয় তেমনি মানব কামনা ক্ষেত্র ভেদ করিয়া তাঁহার জ্যোতি দর্শন করে।

কুৎসিত গানও কুৎসিত কথা হইতে মধুর, সে মধুরতা কোথা হইতে আসে? গান ও ছবি, শব্দ ও বর্ণ হইতে মধুর, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর তাঁহার ছবি ও গান। সেই মধুরতার স্পন্দনের নাম ভক্তি।

ভক্তি চিন্তনীয় নহে। ভক্তি বিলাসের সামগ্রী নহে। ভক্তি প্রামাণ্য নয়। ভক্তি বিশ্বাস নয়। ভক্তি পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন। কারণদেহে তাঁহার জ্যোতি ও শব্দ সঞ্চার হইলে যে আনন্দ হয় তাহাই ভক্তি। সেই সুরজ জ্যোতিই বীণাপাণি।

বীণাপাণি শক্তি। রাগিণী শক্তি সম্ভূত। গান কেবল রাগিণী নয়। ভাবিয়া দেখুন আরও কি যেন আছে। বীণাধ্বনিপ্রসূত বহুদূর ব্যাপিনী আনন্দময় তরঙ্গ কোথায় গিয়া প্রত্যাহত হয়? এই আশ্চর্য্য ঐক্যতান বংশী ও বীণা মিলিয়া হয়।

বীণাতন্ত্রী নিম্নে ঝঙ্কারিত হয়। বীণাপাণি ঊর্দ্ধ হইতে প্রত্যেক চক্র (ঠাট কিম্বা পর্দ্দা) বামকরে আহত করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে থাকেন। বংশীধর দক্ষিণ করে প্রত্যেক রন্ধ্র উদ্ঘাটন করিয়া উর্দ্ধগামী হন। বিশেষ চিন্তা করিলে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে।
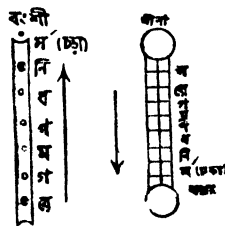
অর্থাৎ বীণার সুর নিম্নগামী হইলে প্রবল হয়, বংশীরব উর্দ্ধগামী হইয়া প্রবল হয়। ইহার কারণ এই যে বীণাতন্ত্রীর শক্তি মুলাধারে কিন্তু বংশীতে ঊর্দ্ধে বায়ু পূরণ করিতে হয়।

তেমনি কারণদেহে বীণার ঝঙ্কার মূলশক্তি। উর্দ্ধ হইতে বীণাপাণি বাম

করে বংশীরব লইয়া আসেন এবং পুনরায় বীণাতন্ত্রী আনন্দময় করিয়া উর্দ্ধে যান।

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বীণাপাণি লীলা ষষ্ঠ (Sixth notrace) কল্পজাত মানবে বিকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে বহুযুগ ধরিয়া মুলশক্তির প্রত্যেক চক্রের আবর্ত্তন হয় এবং প্রত্যেক চক্রে বংশীধারি বহুকাল বাস করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে অপসৃত হইতে থাকেন। এই আবর্ত্তনে কোন জীব কোন স্থানীয় তাহার রহস্য প্রস্তর, ধাতু, উদ্ভিদ ও পশুদিগের শব্দবিজ্ঞান সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেকটা স্তম্ভিত হইতে হয়।

গানের কুহকে পশু মোহিত হয়, সেই বংশীরবে কল্পে কল্পে মানব পাশব-শক্তি বিস্মৃত হইয়া বীণাধারণ করিয়া গান করে। শক্তি যায় কোথায়?

ছবির মধ্যে তিনি বসন্তের ছবি। ঋতুর মধ্যে বসন্ত। গানের মধ্যে তিনি বসন্তরাগ। বসন্তের গান মধ্যম। মধ্যম হৃদয়ে। হৃদয় হইতেই বর্ণ ও শব্দ বিভাসিত হয়। ইহার মর্ম্ম পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হৃদয়ের ছন্দ কি? হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাত কিম্বা আকুঞ্চন প্রসারণ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে Systoles, Diastoles ও বিশ্রাম ইহার সম্পূর্ণ কাল তিন মাত্রার কিছু বেশী। সাধারণতঃ ৩॥ মাত্রা বলিয়া খ্যাত। যদি হৃদয়স্থিত শক্তিকে একটী গোলকের Diameter করিয়া লওয়া যায় তবে সম্পূর্ণ পরিধি চক্র (Circle) পরিভ্রমণ করিতে সেই শক্তির ৩॥ গুণ সময় লাগিবে (3.14159)। এই সার্দ্ধ তিন মাত্রার তালকে "তেওরা" কহে। ইহাই দ্বিগুণ (এবং চতুর্গুণ ইত্যাদি) করিলে ৭ মাত্রার ধামার হয় ধামার তাল অতি বক্র গতি এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ইহা কখনই মানবের স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহার মূলে যে নিগূঢ় হৃদয়ের ছন্দ আছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেই এই ছন্দে নৃত্য করে এবং কোথা হইতে সেই গতির স্পন্দন প্রতিঘাত হইয়া Diatonic Scale এ তিনটী সুর উৎপাদন করে। "হরি ওঁ" একটী মন্ত্র।—

হ র ই — অ উ ম—

১ ২ ৩ ½ ১ ২ ৩½

এই মন্ত্র অতি বিচিত্র। ইহাতে সাতটী মাত্রা (তাল) সাতটী সুর ও সাতটী

স্বর রহিয়াছে প্রত্যেক কথায় ২॥ মাত্রা আছে। হরি ত্রিভঙ্গ, প্রণবও ত্রিভঙ্গ হরি পুরুষ প্রণব তাঁহার প্রকৃতি। ইহাই বংশী ও বীণার সম্মিলন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বৌদ্ধ যুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

কোন পীড়িত শ্রমণকে দেখিয়া সুপিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কি কোন পথ্য দ্রব্যের প্রয়োজনে এখানে দাঁড়াইয়া আছেন?" শ্রমণ উত্তর করিল আমার কিছু "মাংসের সুরুয়া চাই।"

আমি আপনার নিকট উহা পাঠাইয়া দিতেছি।

পরদিন সুপিয়া কোথাও সুকোমল মাংস না পাইয়া পরিশেষে তাহার জানুদেশজাত মাংস হইতে সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিল। পরে সিদ্ধার্থের বরে তাহার জানু পূর্ব্ববৎ হইল।

বিশাখা সমস্ত পীড়িত ব্রহ্মচারিদের পরিদর্শন করিলে পর মঠ হইতে বহির্গত হইলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি! আমার মহালতা কোথায়?" তখন সহচরীর মনে পড়িল যে সে মঠে আবরণী ভুলিয়া আসিয়াছে। বালিকা বলিল,

"আমি ভুলিয়া আসিয়াছি।"

"তবে যাও, এক্ষনে এখানে লইয়া আইস। কিন্তু যদি আমার গুরুদেব মহাস্থবির আনন্দ উহা স্পর্শ করিয়া কোথাও রাখিয়া থাকেন তবে উহা আনিও না। তাহা হইলে আমি ঐ আবরণী শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিলাম।" বিশাখা জানিতেন যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কোন দ্রব্য ভ্রান্তি বশতঃ ফেলিয়া গেলে

আনন্দ তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। উহা জানিয়াই তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। যখন স্থবির আনন্দ বালিকা সহচরীকে দর্শন করিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন পুনরায় আসিলে? বালিকা উত্তর করিল "আমার সহচরী বিশাখার আবরণী ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছি।"

আনন্দ বলিলেন 'আমি সোপান পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছি। যাও, লইয়া আইস।"

বালিকা বলিল "প্রভু! আপনি যাহা একবার স্পর্শ করিয়াছেন সখী তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না।" সুতরাং সে শূন্য হস্তে প্রত্যাগমন করিল।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল সখি?"

বালিকা সমস্ত কাহিনী তাঁহাকে খুলিয়া কহিল।

"সখি! আমার গুরুদেব যে দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছেন আমি তাহা কখনও পরিধান করিব না। আমি উহা তাঁহাকে উপহার দিলাম। কিন্তু ঐরূপ বহুমূল্য পরিচ্ছদের যত্ন করিতে হইলে গুরুদেবকে কষ্ট পাইতে হইবে; আমি উহা বিক্রয় করিব। পরে বিক্রয়ের মূল্যে তাঁহার শ্রীচরণে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমর্পণ করিব। যাও, মহালতা লইয়া আইস।"

বালিকা আনিতে চলিল।

বিশাখা আবরণী পরিধান করিলেন না। মূল্য নিরূপণের জন্য স্বর্ণকারের নিকট প্রেরণ করিলেন।

স্বর্ণকার কহিল "ইহার মূল্য নবতীলক্ষ মুদ্রা এবং নির্ম্মাণের ব্যয় হইয়াছে দশ লক্ষ টাকা।

বিশাখা কহিলেন "শকটে আবরণী স্থাপন করিয়া বিক্রয় কর।" এত মূল্য দিয়া কেহ লইতে পারিল না। আবরণী পরিধানের উপযুক্ত সুন্দরী রমণীর মধ্যে বিরল। এই জগতে তিনটী ললনার ঐ প্রকার আবরণী ছিল। বুদ্ধশিষ্যা বিশাখা, মল্ল সেনাপতি বন্ধুলের স্ত্রী এবং বারানসী কোষাধ্যক্ষের কন্যা মল্লিকা। সুতরাং বিশাখা স্বয়ংই মূল্য দিয়া রাখিলেন পরে এক গোশকট এককোটী মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া মঠে গমন করিলেন।

শ্রীবুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া বিশাখা বলিলেন "ঠাকুর! প্রভু আনন্দ আমার আবরণী স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় উহা পরিধান করা আমার

পক্ষে অসম্ভব। আমি ভাবিলাম ইহার পরিবর্ত্তে আবরণী বিক্রয় করিয়া শ্রমণদিগের ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিব। কিন্তু যখন দেখিলাম কেহ ইহা ক্রয় করিতে পারিল না, আমি স্বয়ংই ইহার যথোচিত মূল্য দিয়া মহালতা গ্রহণ করিলাম। এই এককোটী মুদ্রা আপনার সম্মুখে লইয়া আসিয়াছি। ঠাকুর! কোন্ অনুষ্ঠানে এই মুদ্রা প্রদান করিব?

বুদ্ধদেব কহিলে "বিশাখা! শ্রাবস্তীনগরের পূর্ব্ব তোরণে সঙ্ঘের* নিমিত্ত বসত বাড়ী নির্ম্মাণ কর।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বিশাখা নবতীলক্ষ মুদ্রা দিয়া একটী জমি ক্রয় করিলেন। অপর নবতীলক্ষ দিয়া একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

একদা উষাকালে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন ভাদিয়া নগরের কোষাধ্যক্ষগৃহে স্বর্গ হইতে কোন দেবতা, পুত্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নাম ভাদিয়া। তিনি নির্ব্বাণলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য। অনাথপিণ্ডকের গৃহে ভোজন করিয়া তিনি নগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথাগতের এইরূপ রীতি ছিল যে তিনি যদি বিশাখার গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে দক্ষিণতোরণে নগর ত্যাগ করিয়া জেতবন বিহারে বাস করিতেন। যদি অনাথপিণ্ডকের গৃহে ভিক্ষা লইতেন তিনি পূর্ব্ব-তোরণ দিয়া পূর্ব্বোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। যদি সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেন তাহা হইলে লোকে বুঝিত তিনি দেশভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন।

যখন বিশাখা শুনিলেন তিনি উত্তর দিকে গমন করিয়াছেন তিনি সত্বর তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেবের পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন "ঠাকুর আপনি কি দেশভ্রমণে চলিয়াছেন?"

"হাঁ।"

"ঠাকুর! আপনার জন্যই এতব্যয় করিয়া মঠ প্রস্তুত করিয়াছি। দয়া করিয়া ফিরিয়া চলুন।"

---

* বৌদ্ধসন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে সঙ্ঘ বলে।

"বৎসে, আমি এই যাত্রা পরিবর্ত্তন করিয়া পুনঃ প্রত্যাগমন করিব না।" বিশাখা ভাবিল "নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর এই কার্য্যের কিছু উদ্দেশ্য আছে।" অনন্তর তিনি বলিলেন "অনাথ বন্ধু! যদি একান্তই যাইবেন, তবে কয়েকজন শ্রমণকে এখানে বাস করিতে অনুমতি করুন। তাঁহারা জানেন কিরূপে কার্য্য চালাইতে হইবে।

"বিশাখা, যাঁহার কমণ্ডলু ইচ্ছা লইয়া যাও।'

বিশাখা, যদিও আনন্দের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন, তথাপি মোদ্‌গালনের (মুগ্গল পুত্র) মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিনীশক্তির বিষয় তিনি আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন 'ইহার সহায়ে কার্য্যস্রোত দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইবে। বিশাখা তাঁহার কমণ্ডলু (ভিক্ষাপাত্র) গ্রহণ করিলেন।

ভিক্ষু প্রধান মোদ্‌গালন শ্রীগুরুর মুখপানে তাকাইলেন।

ভগবান্ সিদ্ধার্থ কহিলেন "মোদ্‌গালন! তোমার সঙ্গে পাঁচশত শ্রমণ লইয়া প্রত্যাগমন কর।"

মোদ্‌গালন তাহাই করিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে তাহারা কাষ্ঠ ও প্রস্তর জন্য ১০।৮০ ক্রোশ ব্যবধানে গমন করিত। যে দিন তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাইত সেই দিনই তাহারা উক্ত গৃহে আনয়ন করিত। যাহারা শকটে স্থাপন করিত, তাহারা এক দিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ করে নাই এবং শকটের ও কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যায় নাই। অনতি বিলম্বে ধীরে ধীরে উচ্চ ভিত্তির উপর দ্বিতল অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। অট্টালিকার সহস্র গৃহ ছিল—নীচে পাঁচশত উপরে পাঁচশত।

প্রায় নয়মাস ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধদেব পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই নয়মাসই বিশাখা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। অট্টালিকামধ্যে জলপাত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছিল এবং উহা সুকঠিন লোহিত সুবর্ণে মণ্ডিত করা হইয়াছিল।

বিশাখা শুনিতে পাইল শ্রীবুদ্ধদেব জেতবন বিহারে যাইতেছেন; পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া সুন্দরী ভগবান্ অমিতাভকে মঠে লইয়া আসিলেন। বিশাখা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করাইলেন —

"ঠাকুর! শ্রমণ সঙ্গে চারিমাস বাস করুন আমি অট্টালিকা ইহার মধ্যে সমাপ্ত করিব।"

সিদ্ধার্থ স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতে বিশাখা বুদ্ধদেব ও সঙ্গী শ্রমণাদিগের ভিক্ষাদান ও সেবা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে বিশাখার কোন সখি এক সহস্র মূল্যের বস্ত্র আনায়ন করিল। সুন্দরী বলিল "সখি! আমি সভাপ্রাঙ্গনের মর্ম্মরতলে কতকগুলি আবরণের পরিবর্ত্তে ইহাই বিস্তার করিতে আনায়ন করিয়াছি।"

বিশাখা। ক্ষুব্ধ চিত্তে উত্তর করিলেন "অট্টালিকায় তিল মাত্রও স্থান নাই। তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে বস্ত্র বিছাইতে দিব না। কিন্তু তাহা নহে। তুমি দুইটী প্রাঙ্গন ও সহস্র গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ যদি কোথাও ইহা বিস্তার করিতে পার।"

সহচরী বস্ত্র সমূহ লইয়া সমগ্র অট্টালিকা সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও তাহার অপেক্ষা অল্প মূল্যের বস্ত্রাবরণ দেখিতে পাইল না। অবশেষে দুঃখিত চিত্তে ভাবিত লাগিল "এই অট্টালিকা নির্ম্মাণের যে পূণ্যফল তাহার কি আমি কিছুই পাইব না।" স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

দয়ার অবতার বুদ্ধের অপার কৃপা। ঠিক সেই সময় প্রিয় শিষ্য আনন্দ দৈবেক্রমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দ বলিলেন "বৎসে! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" স্ত্রীলোকটী সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিল।

আনন্দ বলিলেন "সুন্দরী! ব্যথিত হইও না। আমি তোমার ঐ বস্ত্র বিস্তার করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। ইহাতে একটী পদপরিস্কৃত করিবার আসন প্রস্তুত কর; সোপান ও পদ প্রক্ষালন স্থানের মধ্যস্থলে উহা রাখিয়া দাও। শ্রমণগণ মঠে প্রবেশ কালে চরণ ধৌত করিয়া পদ মার্জ্জিত করিবে। তাহা হইলে তোমার অতুল পুণ্যসঞ্চয় হইবে। বোধ হয় এই স্থান বিশাখা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।"

ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

৪র্থ ভাগ। { অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

গঙ্গাষ্টকং।

(১)

মাতঃ! শৈলসুতা-সপত্নি! বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি!
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি! ভগবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষতঃ
ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥

শৈলসুতা-সপত্নিনি! গঙ্গে মা আমার!
বসুন্ধরা হৃদে শুভ্র বিভ্রমের হার।
বিজয় পতাকা তুমি স্বর্গ আরোহণে
ভাগীরথি! এই ভিক্ষা তোমার চরণে—

তব তটভূমে যেন পাই বাসস্থান
তোমার বিমলা বারি করি যেন পান,
তোমার তরঙ্গে সুখে দিয়া সন্তরণ
করি যেন তব নাম সতত স্মরণ,
অন্তিমে তোমায় মাগো! দেখিতে দেখিতে
পারি যেন এই জড় শরীর ত্যজিতে ॥১॥

(২)

ত্বত্তীরে তরু কোটরান্তর্গতো গঙ্গে! বিহঙ্গোবরং
ত্বন্নীরে নরকান্ত কারিনি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটাসংঘট্ট-ঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্ত-সমস্ত বৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥

গঙ্গে! তব তীরে তরু কোটর ভিতর
বিহঙ্গ হইয়া থাকি সেও শুভতর
তব নীরে হে জননী! নরকবারিণি!
মীন কূর্ম্ম হই যদি সেও শ্রেয় মানি,
তবু যার মদমত্ত মাতঙ্গের গলে
দোলায়িত কিঙ্কিনীর রুণু রুণু রোলে
ত্রস্ত হ'য়ে স্তুতি করে অরাতি ললনা
তবদূরে হেন নৃপ হইতে চাহিনা ॥২॥

(৩)

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি! ত্রিপথগে! ভাগীরথি! স্বং বপুঃ

কবে মা তোমার জলে ত্যজি এই প্রাণ
দেবযানে স্বর্গপানে করিব প্রয়াণ?

অমর অঙ্গনাগণ আসিয়া যখন
সুচারু চামর করে করিবে বীজন,
ত্রিপথগামিনি! গঙ্গে! তরঙ্গে তোমার
হেরিব কবে মা! হর্ষে তনু আপনার
হেলিতে দুলিতে স্রোতে পবনহিল্লোলে
ভাসিতে ভাসিতে গিয়া লাগিতেছে কুলে,
কভু বা কুক্কুর আসি করিছে ভক্ষণ
শৃগালে বা কভু টেনে করে পলায়ন,
উপর হইতে কাক পক্ষী অগণন
অবসর বুঝে আসি করিছে দংশন,
ও মা! গঙ্গে! ভাগীরথি! পরমাঈশ্বরি!
কবে গো সে দিন মোরে দিবে কৃপা করি ॥৩॥

(৪)

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতী পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মাঃ
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুণাতু ॥

হরিপাদপদ্মে তব শোভা অনুপম
নব অঙ্কুরিত শুভ্র মৃণালের সম,
মালতী কুসুমমালা সদৃশ সুন্দর
শম্ভুশিরে ধর শোভা কিবা মনোহর,
মোক্ষরাজলক্ষ্মী দ্বারে তুমি মা জননি!
অপূর্ব্ব অব্যক্ত জয় পতাকারূপিণী,
জয় মা জাহ্নবি! কলিকলঙ্কনাশিনি!
পবিত্র করগো মোরে পুণ্যপ্রবাহিনি!

(৫)

ষত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা চ্ছন্নং
সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।

গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥

তমালসরল শাল তাল তরুতলে
আবৃত চঞ্চলশাখা লতাগুল্মদলে,
রবিকর বিরহিত সদা সুশীতল
শঙ্খ ইন্দু কুন্দ সম শুভ্র সমুজ্জ্বল,
গন্ধর্ব্বকিন্নর সিদ্ধ সুরবনিতায়
তুঙ্গস্তন-আস্ফালিত যাহা অনিবার
সেই নিত্য নিরমল ভাগীরথী নীরে
পাই যেন প্রতিদিন স্নান করিবারে ॥৫॥

(৬)

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুণাতু মাম্ ॥

মুরারি চরণচ্যুত অতি মনোহর
ত্রিপুরারি শিরে যাহা ভ্রমে নিরন্তর
পরশে নিমেষে সর্ব্বপাপতাপহারি
পবিত্র করুণ মোরে সেই গঙ্গাবারি ॥৬॥

(৭)

পাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাত্বনুদিনং শুভকারি বারি ॥

শ্রীহরি চরণরজে সদা বিহরিছে
বেগে গিরিরাজ গুহা বিদীর্ণ করিছে,
তরঙ্গে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে
ধায় যাহা সিন্ধুসনে সুদূরে মিশিতে,

দুরিতনাশন শুভকারি পাপহারি
পবিত্র করুন নিত্য সেই গঙ্গাবারি ॥৭॥

(৮)

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥

কৃকলাস, কাক, কৃশ কুকুর তনয়
হয়ে যদি তব তীরে পাই মা! আশ্রয়,
সেও ভাল তবু তব দূরে নাহি যাই—
কোটী গজরাজ সহ রাজ্য যদি পাই ॥ ৮ ॥

(৯)

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥

সর্ব্বসুমঙ্গলকর বাল্মীকি রচিত
সুপবিত্র গঙ্গাষ্টক স্তোত্র সুললিত,
প্রভাতে যে পাঠ করে প্রয়ত অন্তরে
পড়ে না সে কভু পুনঃ সংসার সাগরে
কলির কলুষ রাশি করি প্রক্ষালন
অচিরে নির্ব্বাণ মুক্তি লভে সেই জন ॥৯॥
ইতি বাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

প্রণাম।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রীসর্ব্বদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

নিমেষে দুরিতরাশি বিনাশেন যিনি
সদ্য সর্ব্বদুঃখ তাপ দুর্গতি হারিণী
ভবে সুখদাত্রী অন্তে মুক্তি প্রদায়িনী
জাহ্নবী পরমাগতি জীবের জননী ॥

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবের সপ্তরূপ।

(মনস্)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

বেদান্তদর্শনে অহংকার পদার্থকে কোন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ধরা হয় নাই কিন্তু বুদ্ধিতত্ত্বের রশ্মি সংযুক্ত মনস্তত্বকে বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বেদান্তসার গ্রন্থে এই বিজ্ঞানময়কোষকেই কর্ত্তা বলা হইয়াছে এবং বেদান্তদর্শনের কোন কোন স্থলে এই কর্ত্তাকেই জীব শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যিনি কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং কর্ম্ম নিবন্ধন যাঁহার জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্মাদি ভোগ হইয়া থাকে তিনিই এই জীবাভিমানী জীবাত্মা। পরাবিদ্যার্থী সমিতি এই জীবাত্মাকে Reincarnating Ego বলিয়া ইংরাজী নামকরণ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত ও শ্রীমতী ব্লাভাটসকীর উপদেশ একত্রে মিলাইলে আমরা বুঝিতে পারি যে সাংখ্যের অহংকার, বেদান্তের বিজ্ঞানময়কোষ বা জীবাভিমানী জীবাত্মা এবং শ্রীমতী ব্লাভাটসকি কথিত Higher Manas বা Reincarnating Ego একই পদার্থ। এই অহংকার তত্ব সম্বন্ধে শ্রীমতী ব্লাভাটসকি বলেন "It is according to our philosophy, the Manasputras or the sons of the Universal mind (Mahat) who created or rather produced the thinking man, Manu by incarnating in the third race mankind in our round."

তিনি এই তত্ব সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছেন—

"It is the real incarnating and permanent spiritual Ego, the INDIVIDUALITY, and our various and numberless personalities only its external masks.

Key to Theosophy (on Individuality & Personality).

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে সপ্তম অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই :—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ! ।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ! ॥
যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥

হে ভারত, পরন্তপ ! রাগ দ্বেষ সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব মোহে সম্মোহিত হইয়াই ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ।

পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদিগের পাপ অন্তর্গত (বিনষ্ট) হইয়াছে তাঁহারা দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥

জরা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবার জন্য যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া যত্ন করেন তিনি, সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, যাবতীয় কর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারেন ।

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত যিনি আমাকে জানিতে পারেন যোগযুক্তচিত্ত তাঁহারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব কাহাকে বলে এবং এই দেহ মধ্যে অধিযজ্ঞই বা কে ? এই খানে গীতার অষ্টম অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ভগবান বলিলেন—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥

যাহা পরম অক্ষর তাহাই ব্রহ্ম ; স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হয় ; ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) তাহারই নাম কর্ম্ম।

যাহা ক্ষরভাব তাহাই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত এবং হে দেহভৃদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।

ভগবদ্গীতার উপদেশ হইতে আমরা বুঝিলাম যে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞতত্ত্বের রহস্যজ্ঞ হইয়া ভগবানকে জানিতে হইবে তাহাহইলেই কর্ম্ম, অধ্যাত্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইবে। যিনি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন তিনি মৃত্যুকালেও ভগবদ্ভাব ভাবিত হইয়া মরিতে পারিবেন। এইরূপ মরিতে পারিলেই আর জন্মাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

এখন, এই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম কথার কি অর্থ আমরা বুঝিলাম তাহা ভাবা যাউক।

একটি রঙ্গালয়ে প্রত্যহ রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে; গোপাল নামে এক ব্যক্তি প্রতি রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া অভিনয় করিয়া থাকেন; কোন রাত্রে বা লক্ষ্মণ সাজেন, কোন রাত্রে বা চৈতন্য সাজেন কোন রাত্রে বা নারদঋষি সাজেন। গোপালের এই যে লক্ষ্মণ বা চৈতন্য বা নারদরূপ ধারণ উহা ক্ষণিকরূপ; ভিতরে তিনি যে গোপাল সেই গোপালই আছেন এবং দিবসে যখন তাঁহার কোন সাজ থাকে না তখন তিনি গোপাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষও সেইরূপ এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য এক এক সাজ সাজিয়া জন্ম গ্রহণ করে; মৃত্যুর সময় সেই সাজ ছাড়িয়া যে মানুষ সেই মানুষ হইয়া থাকে। ভৌতিকদেহ ঐ সাজ। এই ভৌতিকদেহ ছাড়িলে মানুষের যে অহংভাব থাকে উহাই স্থায়ীভাব এবং উহাই Permanent Ego বা Individuality; ভৌতিকদেহরূপ সজ্জায় সজ্জিত থাকাকালীন মানুষের যে অহংভাব থাকে উহা অল্পকালস্থায়ী ক্ষরভাব। ক্ষর শব্দের অর্থ নশ্বর। এই অল্পকালস্থায়ী অহংভাবকে শ্রীমতী ব্লাভাটসকি ইংরাজীতে Personality বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় যাহাকে অধিভূত বলা হইয়াছে সেই ক্ষরভাবই ইংরাজী Personality কথার অর্থ।

এইবারে আমরা দেখাইব যে গীতার অধিদৈব এবং শ্রীমতী ব্লাভাটসকি কথিত Individuality একই পদার্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল দেবহুতি সংবাদে সাংখ্যযোগ কথন প্রস্তাবে অহংকার তত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে অহংকারতত্ত্বের কর্ত্তৃত্বই অহংকারতত্ত্বের দেবত্বরূপ। অন্য অন্য শাস্ত্র হইতেও বুঝা

যায় যে কর্তৃত্বই দেবত্ব। যিনি আমার পূজাগ্রহণ করেন ও ইষ্টফল প্রদান করেন তিনি সেই পূজার গ্রহীতা দেবতা। এই গ্রহীতৃত্ব অহংকার অহংকার-তত্ত্বেই আছে সেই জন্য অহংকারতত্ত্বকেই অধিদৈব বলা যায়। এই অহংকার বা Individuality নশ্বর পদার্থ নহে; ইহা কল্পান্তস্থায়ী অমর পদার্থ। অমর শব্দেরই এক অর্থ দেবতা। এই অমর ভাবই অধিদৈব ভাব। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে অহংকার অমর বটে, কিন্তু কল্পের শেষ মহা-প্রলয়কালে অহংকারতত্ত্ব মহৎতত্ত্বে লয় পাইয়া থাকে এবং মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়, সেই জন্য অহংকারতত্ত্ব বা মহৎতত্ত্বকে পরম অক্ষরতত্ত্ব বলা যায় না। যাহা পরম অক্ষরতত্ত্ব তাহাই তৎশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম পদার্থ।

ভগবান বাসুদেব গীতাতে বলিয়াছেন যে দেহ মধ্যে তিনিই অধিযজ্ঞরূপে অধিষ্ঠিত। মহত্তত্ত্বই বাসুদেববাচ্যতত্ত্ব; এই মহত্তত্ত্বই অধিযজ্ঞরূপে দেহে অধিষ্ঠিত। অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ যজ্ঞের অধীশ্বর। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড আলোচনায় ইহা শিখা যায় যে শাস্ত্র মতে দেবতা অনেক আছেন; কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া যায় উহাই এক একটি কর্ম্ম এবং একই সময়ে শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে শৃঙ্খলা অনুযায়ী যে কতকগুলি কর্ম্ম করা যায় তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের এই কর্ম্মশৃঙ্খলা যিনি শিখাইয়া দেন তিনিই যজ্ঞেশ্বর, বা অধিযজ্ঞ দেবতা। যজ্ঞ শব্দটি যজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সংহতিকরণ ও দেবপূজন এই দুইটি যজ্ ধাতুর অর্থ। সংহতিকরণ অর্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের একত্র সন্মিলন করা। যজধাতুর এই দুই অর্থই যজ্ঞ শব্দের অন্তর্নিহিত। দেবপূজারূপ অনেক গুলি কর্ম্ম শৃঙ্খলা অনুসারে একত্রে সম্পাদন করাই যজ্ঞ ক্রিয়া। এই যাবতীয় কর্ম্মের শৃঙ্খলার স্বভাবিক বিধি আছে; এই স্বভাবিক বিধির নামই বেদ। এই বেদের অধিষ্ঠাতা পুরুষই অধিযজ্ঞশব্দ বাচ্য; ইনিই ঈশ্বর, ইনিই হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষ, ইনিই যাবতীয় জীবের হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনিই যাবতীয় দেবমণ্ডলীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের দিকে লক্ষ রাখিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা, বিধি অনুসারে আপন আপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধিদৈবপুরুষ বহুসংখ্যক। অধিযজ্ঞপুরুষ একসংখ্যক। এই বহু ও এই এক, একা প্রকৃতির ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। এই প্রকৃতিই

স্বভাব রূপা; ইনি অব্যক্ত এবং যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠান রূপ অনন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র স্বরূপ। এই অব্যক্ত গর্ভোদকে যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া রহিয়াছে এবং তাই সজীব রহিয়াছে। প্রকৃতিই জীবন স্বরূপা। গীতাতে এই প্রকৃতিকেই জীবভূতা পরাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতির চেতনাই স্বভাবশব্দ বাচ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব। এই স্বভাবের বিধি বশেই সংসার চক্র ঘুরিতেছে। এই সংসারচক্রের অন্য নাম কালচক্র। ইহা স্বভাবের চক্র, সেইজন্য অধ্যাত্ম-স্বভাবই কালশব্দ বাচ্য। কালের বিধিই ধর্ম্মশব্দ বাচ্য অর্থাৎ যে বিধিবলে কালচক্র অর্থাৎ সংসারচক্র ঘুরিতেছে সেই বিধিই ধর্ম্মশব্দ বাচ্য। ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সংঘ এই তিন তত্ত্বের উপসনা বৌদ্ধরা করিয়া থাকেন এই তিনের অর্থ অধ্যাত্ম। অধিযজ্ঞ ও অধিদৈবের উপাসনা। ধর্ম্ম বা স্বভাবই অধ্যাত্ম শব্দ বাচ্য। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বাধিষ্ঠিত পুরুষই অধিযজ্ঞ বা বুদ্ধ এবং অহংকারতত্ত্বাধিষ্ঠিত অধিদৈব পুরুষগণের সংহতিই সংঘশব্দবাচ্য। বৌদ্ধগ্রন্থে যাহাদিগকে বোধিসত্ত্ব বলা হয় তাঁহারাই অধিদৈবপুরুষ।

অহংকারতত্ত্ব শুদ্ধ হইলে সাধক যে কায়া লাভ করেন উহার নাম নির্ম্মাণচিত্ত।

নির্ম্মাণ চিত্তান্যস্মিতা মাত্রাৎ
পাতঞ্জল দর্শন।

এই কায়াকে বৌদ্ধগণ নির্ম্মাণকায়া বলেন।

বুদ্ধিতত্ত্বাধিষ্ঠিত পুরুষের যে শান্ত জ্যোতির্ম্ময় কায়া উহাকে বৌদ্ধগণ সম্ভোগ-কায়া বলেন।

বৌদ্ধগণ যাহাকে ধর্ম্মকায়া বলেন উহাই প্রকৃতিলীন পুরুষের কালরূপ। এইরূপই ঐশ্বররূপ। ভগবান অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন উহাই এই কালরূপ। এই কালরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, দেবাপ্যস্তবপস্য নিত্যদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। দিব্য দৃষ্টি না পাইলে এই কালরূপ দর্শনের যোগ্যতা হয় না। এই কালরূপের তেজ ধারণ ক্ষমতা যখন সাধকের হয় তখনই তিনি শুদ্ধ অমর অহংকারতত্ত্বে আপনাকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান এবং তখন তিনি নির্ম্মাণকায় বোধিসত্ত্ব স্বরূপ হন। তন্ত্রের তাঁহার এইরূপ বোধিসত্ত্ব গণকে ভৈরব বলেন। পরাবিদ্যা সমিতি ইহাঁদিগকে মহাত্মা বা মহাপুরুষ

বলিয়া থাকেন। কালরূপ দর্শনের যোগ্যতা অর্থাৎ কালরূপ দর্শনের শক্তি লাভ জন্য যত্ন ও চেষ্টাই শক্তি সাধনা শব্দের অর্থ। দিব্য দৃষ্টিরূপ এই শক্তিলাভ করিয়া কালরূপের তেজ ধারণ করিতে পারিলে সাধক যে বিদ্যা লাভ করেন উহার নাম কালীবিদ্যা এই বিদ্যাই কৈবল্য দায়িনী পরাবিদ্যা। মনস্‌রূপের তিন ভাগের রহস্য যিনি সম্যক বুঝেন নাই তিনি এই পরাবিদ্যা লাভের অধিকারী নহেন; সেইজন্য আমরা পুনরায় বলিতে ইচ্ছা করি যে সাধন মার্গে পদার্পণের পূর্ব্বে এই মনস্‌রূপের তিন ভাগের রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আজ কাল‑কার পাশ্চাত্য Materialistic Philosophers যাঁহাকে মন বা Mind বলেন। সেই মনই আমার ভাবনার কেবল মাত্র সহায় এই জ্ঞান যতদিন থাকিবে ততদিন পরাবিদ্যাতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পাশ্চাত্য জড়‑বাদীরা যাহাকে মন বলেন, উহা আমাদের মনসরূপের একাংশ মাত্র। বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ বশতঃ যে সমস্ত ভাবনা আমরা ভাবি সেই ভাবনার শক্তিকেই জড়বাদীরা মন বলিয়া থাকেন; অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই মনকে বহির্মুখ মন বলেন এবং এই মন ছাড়া আমাদের অন্য একটি মন আছে বলেন যাহা অন্তর্মুখ, যাহা আশ্রয় করিয়া আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ সকল অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা বহির্মুখমনের বৃত্তি সকল ক্ষীণ করিতে পারিলে অন্তর্মুখ মন শক্তিশালী হয়, তখন সেই অন্তর্মুখমনের ভাবনা দ্বারা আমরা অতীন্দ্রিয় পদার্থ ধারণা করিতে পারি। এই যত্ন ও অভ্যাসের নাম যোগ সাধন।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎগণের এই শিক্ষা এবং পশ্চাত্য জড়বাদীদের নিকট হইতে মন সম্বন্ধে যাহা শিখিয়া ছিলাম। এই শিক্ষাসম্বন্ধে যখন ভাবি তখন মনে হয় যে পশ্চাত্য জড়বাদীদের দর্শন শাস্ত্রে কি সর্ব্বনাশা শিক্ষাই শিখাইয়াছিল। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া শিখিয়া ছিলাম যে আমি মরিব, মস্তিক জীবদ্দশায় ভাবিতেছিল, আমি মরিলেই আমার ভাবনাও ফুরাইল; আমিও চিরকালের জন্য গেলাম। এই শিক্ষার কথাটি মনে হইলে এখন ভয় হয়। শ্রীমতি ব্লাভাটসকির চরণতলে নমস্কার; তাঁহারই অনুগ্রহে এই কুশিক্ষার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। এখন বুঝিয়াছি যে আমি অমর; দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি ফুরাইয়া যাইব না। আমার অন্তর্মুখ‑

মন আছে; অন্তর্জগতে ভাব আছে; মৃত্যুর পর অন্তর্মুখমন দ্বারা আমি সেই সমস্ত ভাব গ্রহণ করিতে পারিব; এখন এই সব কথা শিখিয়াছি এখন শিখিয়াছি যে এই অন্তর্জাগতীয় ভাব সমূহের বাহ্য জাগতীয় যাবতীয় ক্রিয়ার মূল বীজ; এখন শিখিয়াছি যে এই ভাব সমূহ এক বিশ্বাত্মার অন্তরের ভাব; এখন বুঝিয়াছি যে, ঋষিগণ অন্তর্মুখমন দ্বারা; নানা বর্ণের জ্যোতি স্বরূপ, বিশ্বাত্মা প্রসূত নানাবিধ ভাব ধারণ করিয়', বিশুদ্ধ বহির্মুখ মন দ্বারা যাহা বাক্যরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বেদবাক্য। এখন হিন্দুর ছেলে হিন্দু হইয়াছি। তাই শ্রীমতী ব্লভাটসকির ও তাঁহার গুরুদেব বোধিসত্ত্ব—এর চরণে নমস্কার করি।

ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা; ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে ম্লেচ্ছের পায়ে নমস্কার; তোমরা আমাকে হয়ত এই কথা বলিবে। আমি ইহার উত্তর দিব। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে জন্মিয়াছি বটে কিন্তু পশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ব্রাহ্মণত্বটুকু হরিয়া লইয়াছিল। জাতহরণী বলিয়া এক জাতীয় অপদেবতার কথা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছিলাম তাহারা করে কি, এই ছোট ছোট ছেলেদের বর্ণ চুরি করে একের বর্ণ অন্যে সমাবেশ করে। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান যেন সেই জাতহরণী; আমার ব্রাহ্মণ বর্ণটুকু হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শ্রীমতী ব্লভাটসকির কৃপায় সেই বর্ণটুকু ফিরিয়া পাইয়াছি! এমন উপকারী সুহৃদকে নমস্কার করিব না তবে কাহাকে করিব। আরও একটি বলি, তোমারা সকলেই শ্রীতী ব্লভাটসকিকে নমস্কার করিতে পার। গুরুদীক্ষারূপ অগ্নিতে তাঁহার ম্লেচ্ছত্ব দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বয়ং বোধিস্বত্ব স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। "করিয়া ছিলেন" কথাটা ভুল হইল কারণ তিনি এখন বোধিসত্ত্ব স্বরূপ লাভ করিয়া আছেন।

পরাবিদ্যার্থী সমিতিতে প্রবেশ করা সম্বন্ধে অনেক হিন্দুর সন্তান বলেন যে ইংরাজের কাছ থেকে ইংরাজীবই পড়িয়া হিন্দুধর্ম্ম শিখিতে হইবে এ বড় লজ্জার কথা। ইহার উত্তর এই—

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে"।

ইংরাজী শিক্ষাতেই পতন হইয়াছে ইংরাজের শিক্ষা ধরিয়াই উঠিতে হইবে। হাঁ গা; বলি, এই পড়াটা লজ্জার কথা নহে; উঠাটাই কি লজ্জার কথা? মনের সংবেগ বশতঃ গুটিকত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

মানবের সপ্তরূপ প্রবন্ধের এই পঞ্চমরূপ অর্থাৎ মনস্বরূপ সম্বন্ধে লেখার ভার আমি লইয়াছিলাম কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিতেছি যে ভারটি বড় গুরুভার! সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইলে তবেই মনস্বরূপের অর্থটা কতক বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু অবসর অভাবে সংক্ষেপে গুটিকত কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। এই প্রবন্ধের কোন অংশ যদি দুর্বোধ্য হইয়া থাকে তবে আমাকে লিখিলে আমি ভবিষ্যতে সেই অংশ পরিষ্কার করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিব। গুরুবে নমঃ।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মের হাট।

কোন বন্ধু গাহিতে ছিলেনঃ—

জেনেছি, জেনেছি, তারা,
তুমি জান ভোজের বাজি,
যে ভাবে যে চায় মা তোমায়,
সেই ভাবেতে হও মা রাজি॥
মগে বলে ফরা তারা,
গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা বলে ডাকে তোমায়,
মোগল পাঠান্ সৈয়দ্ কাজি॥"

সেখানে একজন দেশীয় খৃষ্টীয়ান উপস্থিত ছিলেন। "গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা" শুনিয়াই একেবারে গরম। বলিলেন, "কালী, খোদা, গড্ সবই কি এক? এ গান কোন বর্ব্বরের রচনা। আমি কালী মানি না, ব্রহ্ম মানি না, মানি কেবল সদা প্রভু।" বন্ধু বলিলেন, "মহাশয় যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সদা প্রভু।" খৃষ্টীয়ান নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু ভারি গরম। আর একদিন আর

একটি রহস্য জনক ঘটনা হইয়াছিল। কোন পাদ্রি সাহেব প্রচার করিতে ছিলেন, "হিন্দুরা বড় খারাপ, উহারা জাতিভেদ মানে।" শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "হাঁ সাহেব, বড়ই খারাপ। আমি খৃষ্টীয়ান হইতে চাহি। সাহেব প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "ভাল কথা। তুমি আমার বাটীতে আসিও।" ভদ্র লোকটি বলিলেন, "কিন্তু সাহেব একটি কথা আছে। আমি খৃষ্টীয়ান হইলে আপনার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারেন কি না?" সাহেবের প্রফুল্ল চিত্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। উত্তরে বলিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে। তুমি বাঙ্গালী আমি ইংরাজ।" ভদ্রলোক বলিলেন, "তবে সাহেব তুমি কেমন করিয়া জাতিভেদ মানিলে না? যত দোষ কি হিন্দুর? সাহেব ইতস্ততঃ করিয়া ধর্ম্মপুস্তক বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস তাহাদের ধর্ম্মই সত্য এবং অপরের ধর্ম্ম সয়তানের সৃষ্ট। যাহারা প্রভু যীশু খৃষ্টে বিশ্বাস করে তাহারাই স্বর্গে যাইবে এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীলোকেরা অনন্ত নরক ভোগ করিবে। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা পর ধর্ম্মের নিন্দা করে এবং যে প্রকারেই হউক অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণকে আপনার ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করেন। খৃষ্টানদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন। কাফেরকে মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত করা, পুণ্য কার্য্য। হিন্দুরা পরধর্ম্ম সহিষ্ণু হইলেও আপনাদিগের ধর্ম্মে নানা প্রকার সাম্পদায়িক বিরোধ উপস্থিত করেন। শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ চির প্রসিদ্ধ। দ্বৈত অদ্বৈতের বিবাদ, সাকার নিরাকার বাদীর বিরোধ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক কলহের বিষয় সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যেখানে এই সকল বিরোধ সেখানে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতির অভাব। বিদ্বেষ বৈরীভাব ধর্ম্মের লক্ষণ নহে, অধর্ম্মের পরিচায়ক। যিনি পরধর্ম্মে-দ্বেষ করেন তিনি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিদ্বেষ ভাব আসিলেই তাঁহার চিত্ত কলুষিত হইবে এবং ধর্ম্ম সাধারণের ব্যাঘাত হইবে। সার্ব্ব-ভৌমিক মৈত্রী ধর্ম্ম সাধনের মূল। মৈত্রীভাব না থাকিলে নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম্মালোচনা সম্ভব নহে। নিজের যাহা বিশ্বাস তাহা করিতে হয় এবং অপরকে তাহার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিতে দিতে হয়। সদুপদেশ

সেবা কর্ত্তব্য কিন্তু কদাচ নিন্দা বা গ্লানি সূচক ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। অনাদি কাল হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলকে কেহ কখন একধর্ম্মী করিতে পারেন নাই। জগতে মত ভেদ চিরকালই আছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু নানক প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন কিন্তু কেহ সমস্ত জগতবাসীকে আপনার মতাবলম্বী করিতে পারেন নাই। কত কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জল বুদ্বুদের ন্যায় সমুত্থিত হইল এবং কাল স্রোতে মিশাইয়া গেল; কত কত ধর্ম্মসম্প্রদায় এখনও জগতে বর্ত্তমান আছে এবং কালে কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে। ভূমণ্ডলে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা চিরকাল আছে ও থাকিবে। যে দেশের যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান উপযোগী সেই দেশে সেই ভাবেই ধর্ম্ম প্রচার হয়। মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি বিভিন্ন। কেহ বা ভক্তি প্রধান, কেহ বা জ্ঞান প্রধান; কেহ সাকার উপাসনার পক্ষপাতী, কেহ নিরাকার-বাদী। যাঁহার যেরূপ রুচি তিনি সেই প্রকারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন, কালে জ্ঞানোদয় হইলে দেখিতে পাইবেন সকল ধর্ম্মের মূল সত্য এক। যে পর্য্যন্ত না সেই জ্ঞানের উদয় হয় সেই পর্য্যন্ত যিনি যেরূপ ভাল বাসেন তিনি সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যান। সকলের অধিকার সমান নয়। ভগবদ্বিষয়ে যিনি যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন ততটুকুই ভাল। পরস্পর বিদ্বেষ করা ভাল নয়। জগতের সকল লোক এক রকম বুঝে না। পরধর্ম্ম সহিষ্ণু হওয়া ভাল। পরধর্ম্ম সহিষ্ণু লোকেই নিজ ধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝেন। ধর্ম্ম বিদ্বেষে জগতে যে কত অনর্থ ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ লোক মাত্রেই অবগত আছেন। কত কত মহাসমরে কত শত লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। সকলেই বুঝিয়াছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেছেন কিন্তু হয়ত প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব কেহই বুঝেন নাই। তাহা বুঝিলে নর-রক্তে ধরাতল প্লাবিত হইত না। মনের সংকীর্ণতা দূর করিতে না পারিলে সার্ব্বভৌমিক প্রীতি জন্মিবে না। আমারই গৃহে যত ধন রত্ন আছে আর আমার প্রতিবেশীর গৃহে কিছুই নাই এরূপ বিবেচনা করা ভালনয়। মন নির্ম্মল করিতে পারিলে সকলেরই গৃহে অল্পাধিক ধনরত্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভগবান পক্ষপাতী নহেন। যাহার যেমন রুচি, যাহার যেমন অধিকার তাহার জন্য সেইরূপই অনুষ্ঠান করা আছে। নিরপেক্ষ ভাবে

দেখিলে সকল ধর্ম্মেই সত্যের আভাস পাওয়া যাইবে এবং হংসের ন্যায় নীর পরিহার করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে সকল ধর্ম্মেরই মূল সত্য এক। সৌভাগ্যের বিষয় অধুনাতন খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ কেহ কেহ একথা এখন বুঝিতেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার বোষ্টন নগরে যে ধর্ম্ম মণ্ডল (Congress of Religion) সমবেত হইয়াছিল তাহাতে Rev. Dr. Hiber Newton বলিয়াছিলেন :—"Religions are many, religion is one. Essential christianity is Essential Judaism, Essential Hinduism."

ধর্ম্ম সম্প্রদায় বহু, ধর্ম্ম এক সার খৃষ্টীয় ধর্ম্মই সার য়িহুদী ধর্ম্ম, সার হিন্দু ধর্ম্ম। সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক যদি এইরূপ বুঝিতেন তাহা হইলে পৃথিবী আনন্দ কাননে পরিণত হইত। হিন্দু ধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিকতা বেশ আছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধও যথেষ্ট আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক কি একই বস্তু এই কুতর্ক লইয়া কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, কত বিরোধ কত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই। ভগবত্তত্ত্ব বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। পরমেশ্বর হইতে অনন্তকাল পৃথক্ থাকিতে হইবে কি তাঁহার অঙ্গে মিশাইয়া যাইতে হইবে ইহা লইয়াই মহা গণ্ডগোল। যিনি নিজের পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিতে পারেন না, তিনি এই বিষয়ের মীমাংসায় ব্যস্ত। ইন্দ্রিয় জয় না করিতে পারিলে ভগবত্তত্ত্ব বুঝা যায় না। পরমেশ্বরের অঙ্গে মিশাইয়া যাওয়া যদি মনুষ্যের চরম গতি হয় তাহাই হউক, আর যদি অনন্ত কাল তাঁহার উপাসনা করা শেষ ফল হয় তাহাই হউক। যাহা সত্য তাহা স্থির করা আছে, কালে প্রকাশ পাইবে। এখন ঐ বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? এই সকল কুতর্ক সাধন পথের বিরোধী। এই ধর্ম্মের হাটে, এই আধ্যাত্মিক চীনাবাজারে সকলেই আপনার দিকে অন্যকে আকৃষ্ট করিতে চায় কিন্তু অতি অল্প লোকেই আপনার ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করে। তাহা করিলে এত গোলযোগ উপস্থিত হইত না। হিন্দু ধর্ম্মে সাকার নিরাকার উভয় ভাবই আছে। যাঁহার যে ভাবে রুচি তিনি সেই ভাবেই কার্য্য করুন। পরস্পর বিরোধ করিয়া ফল কি? পরমেশ্বর সাকার কি নিরাকার এই একটা মহাতর্কের বিষয়, কিন্তু ইহার শেষ মীমাংসা গালাগালি ও মনান্তর। তিনি

সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি সাকার; যাঁহার যে ভাব ভাল লাগে তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে থাকুন, কি আকার সঙ্গে দেখা যাইবে। একই সত্য দেশ কাল ভেদে নানারূপ ধারণ করে; সেই সত্য আবিষ্কার করা সাধনসাপেক্ষ। সাধনের প্রথম সোপান "সার্ব্বজনীন মহা-মৈত্রী।" পরধর্ম্ম সহিষ্ণু হওয়া চাই, নতুবা সাধনা হয় না। মনে বিদ্বেষ ভাব থাকিলে বিদ্বেষের সাধনা হইবে; ধর্ম্ম সাধনা হইবে না। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরঙ্গ এক। বাহ্যিক বিভিন্নতা দেখিয়া পরধর্ম্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার একটী উদাহরণ মনে পড়িল, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার কোন বন্ধু তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে অদূরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই আলোকের দিকে গমন করিয়া দেখিলেন কয়েক জন রামায়ত বৈরাগী তথায় ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। আমার বন্ধু একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তিনি তথায় "হরি বোল হরিবোল" বলিয়া উপস্থিত হইবা মাত্রেই কয়েকজন রামায়ত আসিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোলযোগ শুনিয়া মোহন্ত মহারাজ ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ একটী অভ্যাগত পথিককে প্রহার করিতেছে। আমার বন্ধু প্রাণের দায়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মোহন্ত মহারাজ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া চেলাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া আমার বন্ধুকে বলিলেন "বাবা, তোমার এখনও ভূতের ভয় আছে, তুমি রাম নাম কর।" ব্যাপারটা বুঝিয়া বন্ধু "রাম, রাম" বলিতে লাগিলেন। তখন যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল তাহারাই আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িল এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিয়া গাত্র বেদনার লাঘব করিবার চেষ্টা করিল এইরূপে রাত্রে যথেষ্ট সেবা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে দিয়া বন্ধুকে বিদায় দিল। তাহারা রাম নাম ভিন্ন অন্য নাম শুনে না। হরি নামে প্রহার করে এবং রাম নামে পাদস্পর্শ করে। এটা

রামভক্তির পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু যিনি রাম তিনিই হরি এই বোধ থাকিলে অকারণ আগন্তুক অতিথিকে প্রহার করিত না।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ করিলে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; অধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের বিনাশক। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি মোটামুটি এক প্রকার সকলেই জানে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করে না। মনুষ্য হৃদয় এক মহান্ শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র পাঠ করিলে অপর শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

সর্ব্বধর্ম্ম নিহিত মহাসত্যের কোন নাম নাই। উহা নামরূপের অতীত। নানা দেশে নানা নামে অভিহিত, কিন্তু প্রকৃত উহার কোন নাম নাই। যাহা পরিমিত তাহারই নাম আছে, যাহা অপরিমিত, যাহা অনন্ত তাহার কোন নাম নাই। একই সূর্য্যকিরণ নানা বস্তুতে পড়িয়া নানা রূপ ধারণ করে। একই অনন্ত সত্য নানা ভাবে লোকের নিকট প্রকাশিত হয়। একটী পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া গান করিতেছিল; একজন মুসলমান বলিল "আহা পাখিটী বলিতেছে,—"আল্লা, রসুল, হজরত্।" একজন হিন্দু সেই পথে যাইতেছিল, সে বলিল, তাহা নয়; পাখী বলিতেছে, "রাম, লছমন্, ভরত।" একজন পালওয়ান যাইতেছিল সে বলিল,—তোমরা জান না। পাখী বলিতেছে,—"তাল, মুগ্দর, কসরত্।" একজন বাবুর্চ্চি বলিল তাহা নয়, পাখী বলিতেছে "পেঁয়াজ রস্থণ, অদরক্।" একই স্বাভাবিক স্বর চারি জনের হৃদয়ে চারি ভাবে প্রতিধ্বনিত হইল; যাহার যেমন মন, সে সেই ভাবে শুনিল। একই অনাহত শব্দ নানারূপ ধারণ করিয়া নানা শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যাহার যেমন প্রকৃতি তাহার নিকট সত্য সেই ভাবে প্রকাশিত হয়। যে যেমন চায় ভগবান তাহার নিকট সেই ভাবেই আবির্ভূত হন। তিনি এক, লোকে তাঁহাকে বহু ভাবে দৃষ্টি করে এবং বহু নামে অভিহিত করে। "একং সৎ, বিপ্রাঃবহুধা বদন্তি।" প্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

"কালী হলি মা রাসবিহারী,
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব, নানারূপ তব,
কে বুঝে একথা, বিষম ভারি!
নিজ গুণে আধা, গুণবতী রাধা,

কথন পুরুষ কথন নারী ;
ছিল বিবসন কটি এবে পীতধটি,
এলো চুলে চূড়া বংশীধারী ॥
ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদুহাসে ভোলে ব্রজকুমারী ;
শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ ভাষিছে, সুরসে হাসিছে,
জেনেছি জননী হৃদে বিচারি ;—
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামাতনু,
একই সকলি বুঝিতে নারি ॥

ধর্ম্মের হাটে নানারূপ দেখিলাম। একদিকে মালা তিলকধারী বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের চরণযুগল সেবা করিতেছেন এবং হরি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নিজে মাতোয়ারা হইতেছেন এবং অন্যকে মাতোয়ারা করিতেছেন। অপর দিকে শক্তি উপাসক রক্ত চন্দন জবাকুসুম দ্বারা জগদীশ্বরীর পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। শৈবকে দেখিলাম রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ও বিভূতি ভূষিত হইয়া বম্ বম্ শব্দে ভূতভাবনের আরাধনা করিতেছেন। সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসকেরা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা করিতেছেন। বেদপাঠী ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃ স্নান করিয়া ভক্তিভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, নাথপন্থী প্রভৃতি বিবিধ উপাসকেরা স্ব স্ব উপাসনা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অপর দিকে, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকেরা যীশুপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইসলামও উদাসীন নহেন। মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে নানাযুক্তি প্রদর্শন করাইতেছেন। অন্য দিকে দেখিলাম বৌদ্ধ যোগীগণ নির্ব্বাণ পথের পথিক হইয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। লোকে বলিয়া উঠিল নাস্তিক, নাস্তিক। ভিতরে দেখিলাম নাস্তিকতা কিছুই নাই, আস্তিকতার রূপান্তর মাত্র। মহাধর্ম্মমণ্ডলে কত কত সাধক ও কত কত উপাসক দেখিলাম, যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস তিনি সেইরূপ

পথের পথিক হইয়া সাধন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সকলের ভিতর একটি সূত্র দেখিতে পাইলাম। ইচ্ছা হইল সেই সূত্রে সকলগুলিকে মাল্য রচনা করিয়া গলদেশে ধারণ করি। কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে রাখি, সকলেই যে আমারই আরাধ্য দেবতাকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করে। আমি কাহাকেও ছাড়িতে পারিব না; সকলেই আমার আপনার, কেহ পর নহে। সকলেরই মধ্যে আমার দেবদেবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। সকলেরই মূল সেই—"এক"। "একোদেবঃ ; সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতিবেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্য নাথো হরিঃ॥"

যাঁহাকে শৈবেরা শিবরূপে উপাসা করেন, বেদান্তিরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন বৌদ্ধেরা বুদ্ধ বলেন, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকেরা যাঁহাকে কর্ত্তা, জৈনেরা অর্হণ, এবং মীমাংসকেরা কর্ম্ম বলিয়া জানেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি আপনাদের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রী প্রণবানন্দ শর্ম্মা।

মানবীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব।

শাস্ত্রদর্শী হিন্দুকে আমাদের ক্ষণবিধ্বংসী নশ্বর স্থূলদেহের এবং ঐ নশ্বর স্থূলদেহের অধিকারী নিত্য অবিনাশী আত্মার পার্থক্য বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের স্থূলদেহ যে কিছুই নয়, উহার সহিত আত্মার অতি অল্প কালের জন্য সংশ্রব থাকে; এবং এক স্থূলদেহের বিনাশ হইলে আত্মা অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে, এই মহান্ তত্ত্ব হিন্দুর প্রাণে ওতঃপ্রোত ভাবে গ্রথিত হইয়া আছে। হিন্দুর এমন কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ নাই, যাহাতে

এই মহান্ সত্য বিশেষ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। সকল শাস্ত্রের সার শাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই মহান্ তত্ত্ব বিশেষ পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
নন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

অর্থাৎ মনুষ্য যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর (স্থূলদেহ) পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধরণ করে।

এইরূপ বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, দেহ ও তদধিষ্ঠিত আত্মার পার্থক্যজ্ঞান হিন্দুর অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত হইয়া আছে। অশিক্ষিত হিন্দুও বুঝে যে, তাহার দেহ ও আত্মা এক পদার্থ নহে, এবং তাহার নশ্বর দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করিবে।

আমরা অদ্য এই স্থূলদেহ ও আত্মার সহিত উহার কি সম্বন্ধ এবং ইহাদের মধ্যে কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় নিয়মপরম্পরা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকবর্গকে দিব।

আমাদের স্থূলদেহ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতি দিবস, প্রতি প্রহর, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল, এমন কি প্রতি মুহূর্ত্তে উহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতি সাত বৎসর অন্তর আমাদের স্থূলদেহ একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইয়া যায়। অর্থাৎ সাত বৎসর পূর্ব্বে আমার দেহ যে উপকরণদ্বারা গঠিত ছিল, অদ্য তাহার কিছুই নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন পরমাণু দেহকে আশ্রয় করিতেছে এবং সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত পুরাতন উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ একটী নূতন দেহ গঠিত হইয়া উঠে।

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের স্থূলদেহ অসংখ্য কোষাণু (Cells) দ্বারা নির্ম্মিত। আমাদের সমস্ত স্থূলদেহটী কোষাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক কোষাণুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বাহির হইতে কোষাণু

সকল নিয়তই আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের শরীরের কোষাণু নিয়তই বহির্গত হইয়া অন্য প্রাণী এবং বস্তুতে প্রবেশ করিয়া উহাদের শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। মোট কথা, প্রতিনিয়তই আমাদের সহিত বহির্জগতের এই কোষাণুর আদানপ্রদান হইতেছে। এই আদানপ্রদান হইতেছে বলিয়াই মনুষ্যের দায়িত্ব এবং ইহার জন্যই আমাদের শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

কথাটী একটু পরিস্ফুটরূপে বলি। কোষাণু সকল বহির্জগৎ হইতে আমাদের শরীর আশ্রয় করিলে আমরা উহাদিগকে আমাদের আহার এবং চিন্তার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে থাকি। আমাদের আহার দ্বারা এবং প্রধানতঃ আমাদের চিন্তাস্রোত দ্বারা কোষাণু সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া কালক্রমে আমাদের শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য শরীর আশ্রয় করে। আমাদের শরীর হইতে বাহির হইবার সময় উহারা আমাদের প্রকৃতির যেন একটী ছাপ্ লইয়া যায়। আমরা যদি সুভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা এই কোষাণু সকলকে সুস্থ ও পবিত্র রাখি এবং নিয়ত সচ্চিন্তা দ্বারা উহাদিগকেও সচ্চিন্তাপ্রবণ করিয়া তুলি, তাহা হইলে উহারা নিয়ত সৎকর্ম্মের উত্তেজক না হইয়া থাকিতেই পারিবে না। এই সকল পবিত্রিত ও সৎকর্ম্মপ্রসূ কোষাণু সকল অন্যের দেহ আশ্রয় করিয়া অন্যকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিবার চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে আমারা কুভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা কোষাণু সকলকে রোগযুক্ত ও অপবিত্র করিলে উহারা অন্যের শরীর আশ্রয় করিয়া তাহাকে কুকর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া নানাবিধ অনিষ্টের সূত্রপাত করিবে। এ সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম এই যে, লোকে মনে করে, অসৎকর্ম্মের ফলভোগ কর্ত্তা স্বয়ংই করিবে, উহার সহিত অন্যের কোনই সংশ্রব নাই। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, "আমি অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবা করিলাম ও মদ্যপান করিলাম, তাহাতে যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা আমার নিজেরই হইবে, অন্যের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না!" মদ্যপের এই কথাটী সত্য নহে। মদ্যপের কোষাণু সকল সুরাসারসিক্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া যায় এবং ঐ সকল কোষাণু অন্যদেহ আশ্রয় করিয়া সেই দেহীকেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই জন্যই ত আহারে, বিহারে, এমন কি প্রতি চিন্তায় আমাদের অত্যন্ত অবহিত হইয়া

বিশেষ বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংপন্থা অবলম্বন করা উচিত; এবং এই নিমিত্তই প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতঃ প্রত্যেক পরাবিদ্যার্থীর আহারে, বিহারে, এবং চিন্তাকার্য্যে সংযম আবশ্যক; এবং এই মহোদ্দেশ্য সাধনজন্য ইন্দ্রিয়সংযমের এত কঠোর ব্যবস্থা।

স্থূলশরীরের পরই পিণ্ডদেহ বা ছায়াশরীরের (Etheric doubleএর) বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই ছায়াশরীর আমাদের স্থূলশরীরের অবিকৃত অনুরূপ মাত্র। ইহা আমাদের স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাদানে (Etheric Matterএ) গঠিত, এবং ইহার সমস্ত কার্য্যই সূক্ষ্ম জগতে বা ভুবর্লোকে (Astral planeএ) সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের এই সূক্ষ্মদেহ মানসিক ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

এই সূক্ষ্ম উপাদান প্রত্যেক বস্তুকে ছটারূপে বেষ্টনকরিয়া আছে। দিব্যদৃষ্টিদ্বারা (Clairvoyance) প্রত্যেক পদার্থের এই সূক্ষ্ম বহিরাবরণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সূক্ষ্ম আবরণকে ওজঃ বা Aura বলা হয়। প্রত্যেক মনুষ্যশরীরই এই প্রকার ওজঃ বা Aura দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আহার, বিহার, এবং চিন্তাস্রোতের প্রকারভেদে এই ওজঃশরীর ও বিভিন্ন দেখা যায়। দিব্য দৃষ্টিশালী এই ওজঃশরীর দেখিয়াই দেহীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা অবগত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক বক্তির ওজঃশরীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। আমাদের এই ওজঃশরীর আমাদের নিজের চিন্তা দ্বারা এবং অন্যব্যক্তির চিন্তা দ্বারা বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা যখন অন্য ব্যক্তির সংশ্রবে আসি, তখন আমাদের ওজঃশরীর অন্যব্যক্তির ওজঃশরীরের সহিত সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের সহিত সমাগত ব্যক্তির নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত করে। এইরূপেই আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকি। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কোনও নূতন ব্যক্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হইলে, হয়ত আমরা তাহার কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করি, এবং পক্ষান্তরে কাহাকেও দেখিয়া হয়ত বিনা কারণে উহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। সাধারণ লোকে এই বিস্ময়কর ব্যাপারের তথ্য অবগত না থাকাতে বিস্ময়সাগরে ভাসিতে থাকে। কিন্তু ওজঃশরীর

এবং ইহার কার্য্যের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ওজঃশরীরের স্পন্দনভেদই উপরোক্ত রূপ প্রভেদের প্রধান কারণ। আমাদের ওজঃশরীরের স্পন্দনপ্রবাহ (Waves of vibration) যদি অন্যের ওজঃশরীরের স্পন্দনপ্রবাহের সমঞ্জস (Harmonious) হয়, তবেই আমরা সমাগত ব্যক্তিকে "সুনয়নে" দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে পারি। পক্ষান্তরে—আমাদের স্পন্দনের সহিত সমাগত ব্যক্তির স্পন্দন অসমঞ্জস (Discordant) হইলে, আমরা সমাগত ব্যক্তিকে "বিষনয়নে", দেখিয়া উহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকি।

ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

বৌদ্ধ যুগে ভারত-মহিলা

বা

বিশাখার উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চারি মাস পর্য্যন্ত বিশাখা স্বীয় মঠে শ্রীসিদ্ধার্থের ও শ্রমণদিগের সেবা করিয়াছিলেন। অবশেষে সুন্দরী শ্রমণদিগকে পরিচ্ছদের বস্ত্ররাশি উপঢৌকন দিলেন এবং বালব্রহ্মচারীদের প্রায় এক সহস্র মুদ্রার দ্রব্য প্রদান করিলেন। প্রত্যেকের কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া ঔষধাদি ও অন্যান্য দ্রব্য দিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় নবতি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এইরূপে মঠের জমির জন্য নবতিলক্ষ, মঠ নির্ম্মাণে নবতিলক্ষ মঠ স্থাপনের উৎসবে নবতিলক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ দুইকোটি সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা ধর্ম্ম প্রচারের নমিত্ত বিশাখার ব্যয় হইয়াছিল। অন্য ধর্ম্মাশ্রিতা কোন রমণীই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় দানশীলা নহে।

যে দিন মঠ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল, যখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যাচ্ছায়া যামিনীর গাঢ় তিমিরে মিশিতে ছিল; বিশাখা, পুত্রপৌত্রাদি ভূষিতা হইয়া মঠগৃহে পাদ চালনা করিতে ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার পূর্ণ পরিণতি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অতুল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। উচ্ছাসের বেগে বিশাখা মধুর কণ্ঠে এই পঞ্চশ্লোকাত্মক গীতি গাহিল—

(অহো) যবে এ হর্ম্ম্য করিব দান,
কর্দ্দম মর্দ্দিত বালু চুণ লিপ্ত—
ফুল্লময় শান্ত সাধুবাস স্থান;—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ?

(অহো) যবে দিব আমি গৃহশোভা বলী,
উপবিষ্ট হ'তে কাষ্ঠ সুশোভিত
উপাধান আদি শয়নের স্থলী
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥২

(অহো) যবে দিব আমি ভোজ্য দ্রব্য যত
সুমিষ্ট নির্ম্মল আহার দীক্ষিত,
নানা মিষ্ট রসে করি সিক্ত কত,—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৩

(অহো) যবে দিব আমি শ্রমণের বেশ
বারাণসী বাসে বসন ভূষিত—
তুলা বস্ত্র আদি করি সন্নিবেশ,—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৪

(অহো) যবে দিব আমি ভেষজ সকল
সুস্বাদু নবনী দুগ্ধ জাত ঘৃত,
মধু গুড় আদি অকৃত্রিম তৈল ;—
মম কাম তবে হইবে পূর্ণিত ॥৫

"যখন শ্রমণেরা তাঁহার সুধাকণ্ঠ শুনিল তাহারা তখন ভগবান্ অমিতাভের শ্রীচরণে নিবেদন করিল,—"গুরুদেব! এতদিন আমরা জানিতাম না যে বিশাখা এমন সুন্দর গাহিতে পারেন। কিন্তু এখন পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া মঠগৃহে গাহিয়া বেড়াইতেছে।"

বুদ্ধদেব কহিলেন "শ্রমণগণ, বিশাখা গান গাহিতেছে না; তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে।

"শ্রমণগণ জিজ্ঞাসা করিল বিশাখা কখন উহা বাসনা করিয়াছিল?"

"বৎসগণ! তোমরা উহা শুনিতে চাও?"

দয়াময়! আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা—

বহু প্রাচীন কাহিনী শ্রীবুদ্ধদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভিক্ষুগণ, শত সহস্র যুগযুগান্তরের পূর্ব্বে পদুমাত্তর নামে বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কাল একলক্ষ বৎসর ছিল, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক বিন্দু মলিনতা বা পাপ প্রবেশ করে নাই, ও তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটী ছিল। হংসাবতী নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা সুনন্দ, মাতার নাম সুজাতা। এই লোক শিক্ষকের প্রধানা মঙ্গলকারিণী নাম্নী শিষ্যা অষ্টাঙ্গমার্গে অধিরূঢ় হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে মঠে তাঁহার সেবা করিত। ঐ স্ত্রীলোকের একটী সহচরী ছিল। সে ভাবিত "সখি শ্রীগুরুদেবের কত অনুগত ও আপনজনের ন্যায় আলাপ করিয়া থাকে। ভগবান্‌ও কত ভালবাসিয়া থাকেন। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বুদ্ধগণের প্রেম ও কৃপা লোকে কিরূপে লাভ করিতে পারে।" একদিন বালিকা বদ্ধ উচ্ছ্বাসের বাঁধ খুলিয়া শ্রীবুদ্ধ পদুমাত্তরকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! ঐ স্ত্রীলোকটী আপনার কে?

"সে মঙ্গলকারিনীগণের প্রধানা!"

"ঠাকুর! কি উপায়ে প্রধানা হওয়া যায়?

"শত সহস্র যুগযুগান্তরের সাধনে, ও এক জন্মেও হইতে পারে।"

"ঠাকুর! আমি সাধন করিলে কি এই অবস্থার উপনীত হইতে পারি?"

"নিশ্চয়ই তুমি পারিবে।"

" যদি তাহাই হয়, দয়াময় তোমার শত সহস্র শ্রাবক সঙ্গে আগমন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার দান গ্রহণ করুন।"

ভগবান্ বুদ্ধ স্বীকার করিলেন, ক্রমাগত সাতদিন ধরিয়া সে অন্ন বিতরণ করিতে লাগিল, পরে পরিচ্ছদের জন্ত বস্ত্র দান করিল। অনন্তর শ্রীবুদ্ধ পদ্মুত্তরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বালিকা প্রার্থনা করিল—

" ঠাকুর! আমি দেবলোক চাহিনা, এই দান ফলে ওরূপ কোন সুখে সুরক্তা হইতে চাহিনা। আপনার ন্তায় কোন বুদ্ধের অবতার কালে যেন অষ্টাঙ্গ মার্গে* অধিরূঢ় হইয়া মাতৃপদে অধিষ্ঠিতা হইতে পারি।"

শ্রীভগবান পদ্মোত্তর অন্তর্দৃষ্টি বলে ভাবি শত সহস্র যুগযুগান্তর দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"কোটি যুগান্তরের পর গৌতম নামে একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। তুমি তাঁহার নারীশিষ্যা হইবে এবং তোমার নাম থাকিবে বিশাখা।

"......সাধু কার্য্যে একজীবন অতিবাহিত করিলে পর, দেবলোকে তাহার জন্ম হয়। দেব ও নর জগতে কত জন্ম পরিগ্রহের পর কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে সেই সহচরী বারাণসী অধীশ্বর কিকিরের সপ্ত কন্তার কনিষ্ঠা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিল; তখন তাহার নাম ছিল ভক্তদাসী। বিবাহানন্তর বহু দিন যাবৎ ভিক্ষা দান ও নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের পর কাশ্যপ বুদ্ধের শ্রীচরণে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিল ভাবি জীবনে তোমার ন্তায় বুদ্ধের কৃপা লাভ করিয়া আমি যেন মাতৃপদে বরণীয়া হই এবং চারিটী বিশ্বাসের বিশ্বাসীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিতা হইতে পারি। দেব ও নরলোকে কত জন্মের পর এই জন্মে কোষাধ্যক্ষ মেন্দকার পুত্র ধনঞ্জয়ের দুহিতারূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছে। আমার ধর্ম্মপ্রচারে কত সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে শ্রমণগণ! বিশাখা গান গাহিতেছে না, তাহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে তাই হৃদয়ের উচ্ছসিত বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছে না।"

---

* বুদ্ধধর্ম্মের সত্যে উপনিত হইবার জন্য বুদ্ধদেব আট প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করেন, তাহার নাম অষ্টাঙ্গ মার্গ। (১) সম্যক্ ধারনা, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সৎ কার্য্য, (৪) সৎ আচার, (৫ সৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, (৬) সাধু চেষ্টা, (৭) ইন্দ্রিয় সংযম, (৮) চিত্ত বৃত্তি নিরোধ জনিত আনন্দ লাভ।

† চারি আর্য্য সত্য :—

শ্রীবুদ্ধ আরও কহিলেন—

"শ্রমণগণ! সুনিপুণ মালী যেমন নানা বর্ণের পুষ্পরাশি পাইলে কত মনোহর মাল্য গ্রথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশাখার মন নানা সাধুকার্য্যের বাসনা সৃজন করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

"নানা বর্ণ পুষ্পরাশি হলে একত্রিত,
কতরূপ মাল্য তায় হয় সে গ্রথিত;
সারা বর্ষ ধরি এই মানব জীবনে—
নিয়ত উচিত রত সুকার্য্য সাধনে।

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা করিয়া মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুশলং বহুং

অন্বয়—যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা বহু মালাগুণে
কায়িরা, এবং জাতেন মচ্চেন বহুং কুশলং কত্তব্বং

সংস্কৃত—যথা পুষ্পরাশেঃ বহুন মালাগুণান্ কুর্য্যাৎ (কোইপি মালাকার ইতি শেষঃ) এবং জাতেন মর্ত্ত্যেন বহুং কুশলং কর্ত্তব্যং

অনুবাদ—যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মালা গাঁথা যাইতে পারে, তেমনি যে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে।

ধর্ম্মপদ, চতুর্থ অধ্যায় ১০ম শ্লোক।

সমাপ্ত। শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৫)

যেমন ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় আমরা অতর্কিতভাবে স্বর-বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করি সেইরূপ এই জগৎ স্বীকার করিলেই আমরা তাহার

সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর স্বীকার করিয়া লই। যেমন "ক" বলিলেই "অ" বলা হয়, "অ" না থাকিলে যেমন 'ক' বলা যায় না তদ্রূপ জগৎ বলিলেই তাহার অন্তরনিহিত ও আধারভূত ঈশ্বর বলা হইল। ঈশ্বর বিনা জগতের অনপেক্ষ বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব।

(৪৬)

বৃক্ষের ফল তাহার নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই, সে তাহা ভোগ করে না তথাপি পরের জন্য ফল প্রসব করা তাহার ধর্ম্ম, চিরকাল পরকে সুখী করিবার প্রয়াস ও প্রবণতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। সেইরূপ সাধু ব্যক্তিও আজীবন পরের মঙ্গলের জন্য পাগল, সততই পরের ইষ্ট সাধনে ব্যতিব্যস্ত, পরকে তুষ্ট করিবার জন্য সদাই লালায়িত। তিনি যাহা কিছু সৎকার্য্য করেন তাহা কেবল জগতের মঙ্গল কামনায়, সর্ব্বজনহিত সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত। বৃক্ষ যেমন শিশির রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত সহ্য করিয়া পরের জন্য ফলপ্রসূ হয় সেইরূপ সাধু ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়া, আত্মহারা হইয়া জগতের হিতসাধন করেন, তিনি ফলের প্রত্যাশা রাখেন না।

[৪৭]

ভূত বাস্তবিক থাকুক বা নাই থাকুক "ভূত' 'ভূত' করিয়া অনেক সময় লোকে ভূত দেখিতে পায় সেইরূপ ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন "ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করিলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

(৪৮]

বরযাত্র অনেক ব্যক্তি যায়, কেহ বা বরকে পঁহুছাইয়া দিয়াই চলিয়া আইসে, কেহ বা পান তামাক খাইয়াই পরিতৃপ্ত হয় আর অবশিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তিই লুচি মণ্ডার লোভ চরিতার্থ করিয়া আইসে; কিন্তু বর সমস্তদিন উপবাস করিয়া, কত কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, কত মন্ত্র পড়িয়া, অনাহারে অনিদ্রায় অভিভূত না হইয়া অভিলষিত কন্যা রত্ন লাভ করে। সেইরূপ এ ভবযাত্রায় অনেক লোক আইসে, কাহারও পক্ষে বা শুধু আসা যাওয়ার কষ্ট ভোগই সার হয়, কেহ বা তুচ্ছ বিষয় রসে মজিয়া মনে মনে কৃতার্থ হয়, পরন্তু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি কত কষ্ট কত বিপদ প্রলোভন সহ্য করিয়া, কত অনাহার অনিদ্রা কত অপমান নির্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া কত ব্রত অনুষ্ঠান মন্ত্রজপ উপস্যা

সাধন করিয়া সেই প্রিয়তম পরম পদার্থ লাভ করেন; যে জন্ত ভবে আগমন যে উদ্দেশ্য তাঁহারই কেবল সাধন হয়, অপরে হাঁ করিয়া থাকে।

(৪৯)

প্রবাসে বা বিদেশে থাকিলে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্ত প্রাণ যেরূপ সদাই ব্যাকুল হয় এই সংসার বিদেশে নিবাস কালে সেইরূপ জীবের অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ সদাই হু হু করিয়া জ্বলিতেছে মোহনিদ্রাবেশে তাহা অনুভূত হয় না। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রাণের যে নিরন্তর প্রবণতা রহিয়াছে তাহা অনুভব হইলেই মানব মন উদাস হইয়া উঠে আর তাহার এ ভবে থাকিতে ভাল লাগে না।

(৫০)

ত্রিতন্ত্রীর তিনটী তারে যেমন বাজাইবার কৌশলে নানা প্রকারের স্বর নির্গত হয় সেইরূপ নিপুণ বিধাতার করকৌশলে মানবহৃদয়ের সত্ব রজো তমোগুণাত্মিকা ত্রিতন্ত্রী হইতে বিবিধ বিচিত্র স্বর নির্গত হয়।

(৫১)

সতী সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণীগণ পরপুরুষের সান্নিধ্যে যাদৃশী ভীতা চকিতা ও সশঙ্কিতা হন, ভগবানের প্রিয় ভক্ত সাধুজন সংসারের সংস্পর্শে সর্ব্বদা তাদৃশ ত্রস্ত ও সশঙ্কিত থাকেন; কতক্ষণে অব্যাহতি পাইবেন এই চিন্তায় তাঁহাদের প্রাণ সদাই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত থাকে।

(৫২)

যে ছেলে খেলা ধুলা করিয়া ভুলিয়া থাকে তাহার জন্ত জননী নিশ্চিন্ত থাকেন, আর যে ছেলের খেলা ধুলা ভাল লাগে না তৃষিত ও ব্যাকুল হইয়া অবিরাম "মা" "মা" বলিয়া কাঁদে, মা সকল কর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া অগ্রে তাহাকে কোলে তুলিয়া লন; আমাদের জগজ্জননীও সেইরূপ তাঁহার যে সব ছেলে সংসারের ধুলাখেলায় ভুলিয়া থাকে তাহাদের জন্ত নিশ্চিন্ত থাকেন আর যে ছেলেদের সংসারের খেলা ভাল লাগে না, মায়ের স্তন্যসুধা পান করিবার জন্ত যে সব ছেলে সদাই হা হা করে তাহাদিগকেই তিনি অগ্রে আসিয়া কোলে তুলিয়া লন এবং স্তন্তদানে সান্ত্বনা করেন। তৃষিত ও ব্যাকুল না হইলে মার দেখা পাইবে না; তুমি ধুলা খেলায় মত্ত থাকিলে মা নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

(৫৩)

রাস্তায় কুকুরগুলা পেছু পেছু ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে, তুমি যদি ভয় পাইয়া পলাও তা'হ'লে তাহারাও ধাইয়া আসিয়া তোমাকে কামড়াইতে যাইবে কিন্তু তুমি যদি পেছন ফিরিয়া দাঁড়াও বা তাহাকে খেদাইয়া যাও অমনি তাহারা লেজ গুটাইয়া পলাইবে। সেইরূপ এই সংসার পথে অনেক পাপ প্রলোভন রূপ খেঁকী কুকুর তেড়ে আইসে তাহাদের ভয়ে পলাইও না একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চোক রাঙ্গাইয়া দাঁড়াইও তা'হ'লে তাহারা ভয়ে পলাইবে নতুবা তুমি ভীত হইলে তাহারা আসিয়া তোমাকে দংশন করিবেই করিবে।

(৫৪)

কোন রকম হার জিতের খেলায় প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যক্তি তত চালাক চতুর নয় তাহারই ভাগ্যে জিত হয়। সেইরূপ এভবের খেলায় হাবা গোবা লোকই জিতে; বেশী চাতুরী করিতে গেলেই হার হয়, ধীর নিশ্চিন্তভাবে থাকিলেই বাজী জিতিবে, হৈ চৈ করিলে হারিয়া মরিবে।

(৫৫)

ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল ধরে পড়ে উঠে শতবার চেষ্টা করে তাহার আয়ত্তাধীন খাদ্য আত্মসাৎ করে কিন্তু যাহা শিকায় তোলা আছে তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মাকে ডাকে। তাই বলি ভাই, যতক্ষণ হাঁচড়ে কামড়ে পার ততক্ষণ মাকে ডাকিও না, যখন কোন কার্য্য তোমার ক্ষমতার বহির্ভূত বোধ হইবে তখন মাকে ডাকিও।

(৫৬)

গৃহে সর্পের বাস হইলে সে গৃহের লোকেরা কি কখন শান্তিসুখাস্বাদন করিতে পায়? আমাদের হৃদয়ে শত শত কালকূট বিষধর সতত কিল বিল করিয়া বেড়াইতেছে তাই আমাদের মন সদাই সশঙ্কিত ভীত ব্যাকুলিত ও শান্তিহীন। গৃহে সর্পকে আশ্রয় দিয়া শান্তি শান্তি করিয়া পাগলের মত বেড়াইলে কে আর তাহার দুঃখ দূর করিতে পারে? গৃহের আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিলেই সর্প আপনি পলাইবে আর সেখানে পুনরায় আসিতে সাহস করিবে না; তাই বলি ভাই, হৃদয় পবিত্র ও পরিষ্কার রাখিলে সেখান হইতে পাপরূপ সর্প পলায়ন করে ও পুনঃ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না।

(৫৭)

ভাতে চিনি (Sugar) আছে আর রসগোল্লায়ও চিনি আছে। ভাতে চিনি আছে আমরা না জানিলেও তাহা আমাদের উদরস্থ হইয়া কেমন সহজে জীর্ণ হয় এবং দেহের উপাদান বল ও পুষ্ট বৃদ্ধি করে, কিন্তু রসগোল্লার তীব্র মধুরতা পরিপাক বিষম এবং অনেক সময় জীর্ণ না হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। তাই বলি ভাই, রসগোল্লায় লোভ করিও না, ভাতের মধুরতার পুষ্টি সাধনে যত্নবান হও। প্রেম কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে কেন্দ্রীভূত করিয়া উপভোগ করিলে তাহা জীর্ণ করিতে পারিবে না সম্ভবতঃ ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। উহা বিশ্বজনীন করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে ভাতের ন্যায় তোমার অন্তরাত্মার পুষ্ট সাধন করিবে। প্রেমের সমষ্টি ভাব হইতে ব্যষ্টিভাব সাধারণ মানবের পক্ষে সমধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

(৫৮)

মানব দেহে বিবিধ প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী ও ক্রমশঃ ক্ষয়কারী ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ভবরোগের আজীবন দীর্ঘ প্রতিক্ষণ ক্ষয়কারী, অননুভূত অথচ নিশ্চয়, বিলম্বিত অথচ তীব্র সার্ব্বজনিক রোগ আর দেখা যায় না। এই রোগের হাত কেহ কখনও এড়াইতে পারেন নাই। ইহা আমরণ স্থায়ী এবং বোধ হয় মরণের পরও ইহার হাত অতিক্রম করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আমরা টের না পাইলেও প্রতিমুহূর্ত্তে ইহা আমাদের দেহ প্রাণ ক্ষয় করিতেছে তথাপি মূঢ় মানব (যে সামান্য রোগ হইলে শত শত বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করায়) এমনি অন্ধ যে এরূপ ভীষণ রোগ জানিয়া শুনিয়া উপেক্ষা করে ও ভুলিয়াও একবার সেই ভবরোগ বৈদ্য ভগবানের অন্বেষণে বাহির হয় না। যে কুষ্ঠরোগী যক্ষারোগী বাতব্যাধিগ্রস্ত সেও বাঁচিতে চায়, রোগের চিকিৎসা করায় কিন্তু মানব সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট !!।

(৫৯)

যতদিন মানব অসহায় শিশু থাকে, জননীর উপর যতদিন সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারে ততদিন তাহাকে তাহার আহারের জন্য স্বচ্ছন্দের জন্য ভাবিতে হয় না, তাহার সকল অভাব জননী মোচন করেন, সকল ভাবনা জননীই ভাবিয়া থাকেন ; তখন সে জননীর স্নেহের পুতলী ; সে কিসে সুখে থাকিবে,

কিসে তাহার ভাল হয় সে বিষয়ে জননীই সদা চিন্তাকুল; সে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে ঘুমায় মা জাগিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকেন, ক্ষুধা পাইলে মা মনে বুঝিয়া নিজেই আসিয়া খাওয়াইয়া থাকেন, জননী তাহার একদণ্ডও কাছ ছাড়া হন না। কিন্তু ক্রমশঃ যখন সে বসিতে, হামাগুড়িদিতে, দাঁড়াইতে শিখে পরতন্ত্রতার সীমা অতিক্রম করিতে অগ্রসর হয়, আপনি খাইতে চায় খাবার দেখিলে হাত বাড়াইতে আরম্ভ করে, আর সর্ব্বদা মার কোলে থাকিতে ভালবাসে না, মা কোলে করিয়া থাকিলে আগ্রহে ভূমে নামাইয়াদিতে ইঙ্গিত করে তখন হইতে তাহার সুখসাগরে তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হয়; এতদিন সে স্থির সুখের সমুদ্রে ভাসমান ছিল এখন হইতে তাহা ক্রমশঃ উদ্বেলিত হইতে চলিল, তাহার স্বাধীনতা স্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সংগ্রাম ক্রমশঃ ভীষণতর হইতে লাগিল। প্রকৃতির এমনি নিয়ম যে ক্রমে তহার জননীর স্তনে দুগ্ধ শুকাইয়া আসিল, তাহাকে আর বড় একটা কেহ কোলে করে না, খাবার না চাহিলে কেহ আর তাহার খাবার হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, তাহাকে আর কেহ ঘুম পাড়ায় না; এই প্রকারে তাহার জীবনের যাবতীয় আবশ্যক কর্ম্মগুলি ক্রমশঃ তাহাকে নিজেই করিয়া লইতে হয়, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জননীও তাহার আর তত মুখ চান না। জগজ্জীবেরও সেইরূপ যতদিন জগজ্জননীর উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ থাকে, যতদিন তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি স্বাধীনতার আস্বাদন না পায়, ততদিন তাহার দুঃখ বা অভাব বোধ হয় না, ততদিন তাহার হৃদয় মন পরিপূর্ণ ও সরস থাকে, ভাবনা চিন্তার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই থাকে না, ততদিন সে সুখে ভাসিয়া বেড়ায়; আর যেই সে স্বপ্রধান ও স্বাধীন হইতে যায় অমনি মা একটু সরিয়া দাঁড়ান, আর তাহার নিজ বুদ্ধিদোষে শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই স্বতন্ত্রভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ ও অভাব বোধ বৃদ্ধি হয়। সে পুনরায় যখন স্বীয় অকর্ম্মণ্যত্ব অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদে, করুণাময়ী মা আবার অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

(৬০)

প্রিয়তম পতির প্রতি প্রেমের পূর্ব্বরাগাবস্থায় রমণীগণ দেহের নানারূপ বেশভূষা করে; কেহ বা সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হয়, কেহ বা কেশবিন্যাস

করে, কেহ বা চন্দন মাখে, কেহ বা পুষ্পরেণু মাখে, কেহ বা মাল্য ধারণ করে—সকলই প্রাণপতির সোহাগ প্রত্যাশায় করে; পরন্তু যখন তাহাদের পতি অনুরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আইসে ও পতিপ্রেমাস্বাদন সুখ লাভ করে তখন তাহাদের আর দেহের বেশভূষার প্রতি তত আস্থা থাকে না। সেইরূপ প্রিয়তম প্রাণনাথের প্রতি প্রথম প্রেম সঞ্চার হইলে তাঁহার প্রেমামৃত লাভের প্রত্যাশায় সাধুগণ নানারূপ বেশভূষা করেন—কেহ বা গৈরিক বসন পরিধান করেন, কেহ বা জটাবিন্যাশ করেন, কেহ বা ছাই ভস্ম মাখেন, কেহ বা রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন কিন্তু যখন তাঁহারা সেই প্রাণপতির পবিত্র প্রেমাস্বাদন প্রাপ্ত হন তখন আর তাঁহাদের ছাই ভস্ম ভাল লাগে না।

ক্রমশঃ।

পৌরাণিক কথা।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মানববংশ আছে, তাহার মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ প্রধান। এই দুই বংশই মনুষ্যজাতির অগ্রণী। কত মহাপুরুষ, কত অবতার, কত মহর্ষি, কত রাজর্ষি এই দুই বংশ পবিত্র করিয়াছেন! এই দুই বংশের রাজা, এই দুই বংশের পুরোহিত, দৈববলে বলী। স্বয়ং ভগবান্ এই দুই বংশের অধিনায়ক। আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির যে ইতিহাস, তাহা এই দুই বংশ লইয়া। মন্বন্তর মধ্যে অন্য যে সকল মনুষ্যজাতি প্রাদুর্ভূত হইবে, তাঁহারা সকলে এই দুই বংশের আলোক অনুসরণ করিবে।

মনুষ্য এক জন্মে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জন্মে জন্মে মনুষ্য কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়। শেষে কর্ম্মফল অনুসারে উন্নতির মার্গ সরল হয়, ও উন্নতির গতি দ্রুততর হয়। তখন মনুষ্য বিনা আয়াসে, দৈব বলে, ঋষিদিগের সহকারিতায়, ভগবানের অনুগ্রহে পরমপদ অভিমুখে চালিত হয়। মনুষ্য ভাগবত ও পরে ভগবানের সহকারী হয়। কিন্তু ইহাত চরম কথা। ভগবানের শেষ অনুগ্রহের জন্য মনুষ্যকে উপযোগী হইতে হয়। নানা ধাক্কায় মনুষ্য সেই উপযোগ লাভ করে। সেই ধাক্কার শিক্ষা দিবার জন্য গ্রহ সকল ভগবানের আদেশ পালন করিতেছেন। কখনও তাঁহারা মনুষ্যকে অধস্তলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, কখনও তাঁহারা তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন। কখনও ঝঞ্ঝাবাতে মনুষ্য আকুল, কখনও শীতল মন্দসমীরণে তাহার চিত্তশান্তি। কখনও উদ্বেল তরঙ্গ, কখনও কূলের নিশ্চলতা। কখনও বিশ্বাসঘাতকতার তীব্রবাণে মর্ম্মাঘাত, কখনও পবিত্র প্রণয়ের শান্তিমাখা মৃদুশ্বাস। হায়রে, "দ্বন্দ" বলিয়া মনুষ্য ভাষায় কি শব্দটি ঈশ্বর দিয়াছেন। "দ্বন্দের" জ্বালায় আজ মনুষ্য অতি ব্যাকুল। দয়াময় ঈশ্বর, দয়াময় দ্বন্দাতীত গুরুদেব, কালস্রোতের অভিমুখ গমনাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যদিগকে, "দ্বন্দের" শাসন হইতে রক্ষা কর। কিন্তু কি বলিয়াই বা এ প্রার্থনা করিব। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এখনও এত জটিলতা, এখনও এত কুটিলতা, এখনও এত হিংসা, এখনও এত দ্বেষ, এখনও এত ভেদবৃত্তির উপাসনা। যেমন ব্যাধি, তেমন ঔষধ। প্রস্তর সংলগ্ন স্বর্ণ ধূলিকে, প্রস্তর না ভাঙ্গিয়া কে উদ্ধার করিতে পারে। এই ভীষণ দ্বন্দযুদ্ধে, ভগবান্ মনুষ্যকে যেন বল দেন্।

দ্বন্দযুদ্ধের নিয়ম আছে। সুখ দুঃখের কাল আছে। কখনও রৌদ্রের হাঁসি, কখনও মেঘের অন্ধকার, গ্রহণোদিত হইয়া মনুষ্য জীবনে মেশামেশি করিতেছে।

বিংশোত্তরী মতে নয়টি গ্রহ এবং অষ্টোত্তরী মতে আটটি গ্রহ আমাদের জীবন অধিকার করিয়া আছে। বিংশোত্তরী মতে নিম্নলিখিত ক্রম ও কাল অনুসারে গ্রহসকল আমাদের জীবন কাল ভোগ করেন। রবি ৬, চন্দ্র ১০, মঙ্গল ৭, রাহু ১৮, বৃহস্পতি ১৬, শনি ১৯, বুধ ১৭, কেতু ৭ ও শুক্র ২০, সর্ব্বসমেত ১২০ বৎসর। অর্থাৎ যদি মনুষ্য ১২০ জীবিত থাকে, তাহা হইলে

নয়টি গ্রহই তাহার জীবন কাল যথাসময়ে আপন আপন অধিকার ভুক্ত করে। আবার প্রতি গ্রহের ভোগকালে, নয়টি গ্রহেরই অবান্তর ভোগ হয়। মনুষ্য জীবন বুঝিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম জানিতে পারিলে, মোটামুটি মনুষ্যের সুখদুঃখের কথা বলা যায়। অষ্টোত্তরী মতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শণি, বৃহস্পতি, রাহু, ও শুক্র ১০৮ বৎসর ভোগ করে। শতাধিক আট ও বিশ বলিয়া এক মতকে অষ্টোত্তরী ও এক মতকে বিংশোত্তরী বলে।

জন্মকালীন যে গ্রহ, সেই গ্রহই মনুষ্যের প্রবল গ্রহ। সেই গ্রহদ্বারাই মনুষ্য অভিহিত হয়।

যেমন মনুষ্য, তেমনই মনুষ্যজাতি। যে নিয়মে মনুষ্য চালিত হয় সেই নিয়মেই মনুষ্যজাতি চালিত হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মনুষ্যজাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অগ্রণী দুইটি মনুষ্যজাতি। তাহার মধ্যে একটি রবির অধিকারে জাত, অন্যটি চন্দ্রের অধিকারে। তাই একটি সূর্য্যবংশ ও একটি চন্দ্রবংশ। এই দুই বংশে বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু, কেতু এবং বুধের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব শুনিতে পাই। শনি মঙ্গলের কথাও শুনিতে পাই। পৌরাণিক কথা এত উপকথায় আবৃত যে সহজে তথ্য জানিবার উপায় নাই। কিন্তু একথা বুঝিতে পারি, যে যে বংশে ভগবান্ স্বয়ং মনুষ্য হইয়া অবতীর্ণ হন্, যে বংশে তিনি স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করেন, সে বংশে গ্রহের অধিকার আর বেশি দিন থাকিবে না, সে বংশ সত্বর ত্রিলোকীর ও ত্রিলোকী সংলগ্ন গ্রহের সীমা অতিক্রম করিবে।

এই দুই বংশের বিশেষ বিবরণ এই সকল ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে পর প্রবন্ধে মোটামুটি বিবরণ দেওয়া যাইবে, এবং সেই বিবরণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই দুই বংশের ধর্ম্মজীবন অনুসরণ করা মাত্র।

এখন এই কথা বলিতে চাহি, যে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের অন্তিম কাল উপস্থিত এই দুই বংশ ক্রমে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। ক্ষত্রিয় রাজবংশগণ অন্তর্হিত হইয়াছে আর সেই বর্ণের আঁটা আঁটি নাই, আর সেই আশ্রমধর্ম্মের আঁটা আঁটী নাই এখন জন্ম দ্বারা মনুষ্য বুঝিতে পারিবে না, যে তাহার কি ধর্ম্ম, কি কর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে। বর্ণাশ্রাম ধর্ম্মের রক্ষাকারী রাজা লুপ্ত হইয়াছে। কলির ভীষণ অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন হইতেছে। ম্লেচ্ছ

শাসনে ম্লেচ্ছ আচারে দেশ পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম ; সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশেরও পুনর্জ্জন্ম হইবে তখন সূর্য্য সতগুণ আলোক প্রদ, ও চন্দ্র সতগুণ কোমলতাপ্রদ হইবে। সেই ভবিষ্যবংশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সেই বংশের যাঁহারা রাজা হইবেন, তাঁহারা প্রভূত যোগবলের অধিকারী হইয়া এখন হইতেই ভবিষ্য প্রজা প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। ঋষিরা এখন হইতেই তাঁহাদের সহায়তা করিতেছেন! ঘোর কলির অন্ধকারে, সত্যযুগের বীজবপন হইতেছে।

দেবাপিঃ শন্তনোর্ভ্রাতা
মরুশ্চেক্ষাকু বংশজঃ।
কলাপ গ্রাম আসাতে
মহাযোগ বলান্বিতো ॥

তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতো।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ১২-২

কলাবুৎসন্নানাং রাজবংশানাং পুনঃ প্রবৃত্তি প্রকার মাহ। শ্রীধর।

কলিতে রাজবংশ উৎসন্ন হইয়াছে। পুনরায় সেই রাজবংশ যাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই কথা বলা হইতেছে। শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি (চন্দ্রবংশীয়) ও ইক্ষাকু বংশজ মরু মহাযোগ বলান্বিত হইয়া যোগীদিগের নিবাস ভূমি কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলির অবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বর্ণাশ্রম যুক্ত ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

সাধনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বদেহের সহিত যখনই সংশ্রব বিনষ্ট হয় তখনইত আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলাম ? এবং দেহ হইতে আমার স্বতন্ত্রতা হেতু আমিই সেই চৈতন্য পদার্থ ইহা স্থিরীকৃত হইল। এইচৈতন্যপদার্থস্বরূপ আমি নিরবয়ব ও অসীম আমি নিশ্চল এবং গতি ও অন্তরসংবেগহীন, আমার কোনরূপ গমনাগমন নাই ; সুতরাং ইহা কেননা স্বীকার করিব যে, আমি জড়দেহের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাই না এবং ইহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরেও চালাই না অর্থাৎ আমি নিষ্ক্রিয়। এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে অন্তরসংবেশবিশিষ্ট এবং স্বয়ং ক্রিয়াশীল এমন কোন অলৌকিক সাবয়ব জগৎব্যাপী পদার্থ আছে, যাহার ক্রিয়ায় আমার দেহের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক আমার অন্তঃকরণ কিরূপ পদার্থ। আমার মনে ইচ্ছা হয়, আমি অন্তঃকরণ দ্বারা চিন্তা করি এবং অন্তঃকরণে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হয়। আমার অন্তঃকরণ দ্বারা আমি ইচ্ছা করি, আমি চিন্তা করি, এবং আমি জানি। আমার অন্তঃকরণ যদি কোন পদার্থ হয় তাহাহইলে উহা হয় সাবয়ব না হয় নিরবয়ব। সাবয়ব হইলে উহা জড়পদার্থ এবং জড় পদার্থ দ্বারা আমি ইচ্ছা করি, আমি চিন্তা করি, আমি জানি, ইহা সম্ভব হইতে পারে না ; তাহা যদি সম্ভব হইত ; তাহাহইলে আমায় টেবল দ্বারাও আমি ইচ্ছা করিতে পারিতাম, এবং আমি জানিতে পারিতাম। অন্তঃকরন যদি নিরবয়ব পদার্থ হয় তাহাহইলে অন্তঃকরণ আমিই হইয়া পড়ি অর্থাৎ অন্তঃকরণ আমাহইতে কোন স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থ নহে, আমিই অন্তঃকরণ। ইহা যদি হয় তাহাহইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তঃকরণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। কিন্তু অন্তঃকরণের যখন পরিবর্ত্তন দেখি এবং আমি যখন নিরবয়ব বলিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, তখন সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, আমিও অন্তঃকরণ নহি, অন্তঃকরণ কেবল ক্রিয়ামাত্র অর্থাৎ যখনই আমি ইচ্ছা করি, কি চিন্তা করি, কি জানি, তখন সেই ইচ্ছা-

করা, চিন্তাকরা, কি জানা, ক্রিয়াকে অন্তঃকরণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।* এখন দেখাযাউক আমার ইচ্ছাকরা, চিন্তাকরা, ও জানা ক্রিয়াতে আমার দেহ স্থানান্তরে নীত হইতে পারে কিনা। আমি ইচ্ছাকরিলাম কলিকাতা যাইব অর্থাৎ কলিকাতায় আমার দেহটা নীত হইবে। কলিকাতায় দেহটাকে নেওয়ার ইচ্ছা হইতে পারে, ইচ্ছাকরা একটী ক্রিয়ামাত্র, এই ক্রিয়ায় কোন পদার্থকে কিরূপে স্থানান্তরিত করিবে? এক বস্তুকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীতে হইলে উক্ত বস্তুকে ঠেলিয়া নীতে হয় অর্থাৎ উক্ত বস্তুর গতি জন্মাইতে হয় বা উহাতে বেগ (Motion) দিতে হয়। কোন বস্তুর গতি জন্মাইতে হইলে গতিশীল কোন পদার্থদ্বারা উক্ত কার্য্য হইবে অথবা অন্তর-সংবেগবিশিষ্ট জগৎব্যাপী কোন পদার্থদ্বারা হইতে পারে। যদি ইচ্ছাতেই দেহ কলিকাতায় নীত হইতে পারে, তাহাহইলে (আমি ইচ্ছা করিলাম আমার টেবলটা কলিকাতায় যাউক,) আমার টেবলটাও কলিকাতায় যাইতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছাসত্বেও যদি টেবল কলিকাতায় নীত না হইল তবে কেন না স্বীকার করিব যে ইচ্ছারূপ ক্রিয়ায় আমার দেহও কলিকাতায় নীত হইতে পারে না? কোনব্যক্তি পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইলে যখন শয্যাশায়ী থাকে তখন কি উঠিয়া গমনাগমন করিবার ইচ্ছা তাহার অন্তঃকরণে উদিত হইতে পারে না? তাহার যদি গমনাগমন করিবার ইচ্ছাই না হইবে তবে উক্ত পক্ষাঘাত পীড়া হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কেন সে ঔষধাদি সেবন করিবে? এবং চিকিৎসারই বা প্রয়োজন কি? যদি বল সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে এজন্যই তাহার ইচ্ছা দেহকে চালিত করিতে পারিতেছে না; আমি বলি যে, কোন একটী সময়ে বা কোন একটা অবস্থায়ও যদি দেহকে ইচ্ছায় চালাইতে না পারে, তাহাহইলে কখনওই ইচ্ছাদ্বারা দেহ চালিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগত তাহার ইচ্ছায় হয়নাই? দেহের রোগে দেহের পরিবর্ত্তন বিশেষই বুঝিতে হইবে। দেহের পরিবর্ত্তন কি তাহার ইচ্ছায় হইয়াছে? ইচ্ছাকরিয়া কি কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে? তবে কে তাহার দেহের পরিবর্ত্তন ঘটাইল? ইচ্ছাদ্বারা যেমন দেহের উক্তবিধাবস্থা ঘটিতে পারে না, সেইরূপ চিন্তা ও

* মৎপ্রণীত কোঽহম্ গ্রন্থে অন্তঃকরণের স্বরূপ বিশেষরূপে বিবৃত ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত আছে।

আনদ্বারাও দেহের উক্তবিধাবস্থা ঘটা অসম্ভব। অতএব বাধ্য হইয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এমন কোন সাবয়ব সচরাচর-অদৃশ্য অসীম জগৎব্যাপী অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ আছে যাহার অন্তর-সংবেগে জড়দেহের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি পঞ্চবিধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তুমি দেখিতে পাইলে যে জীবের চৈতন্য সংজ্ঞক আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তিনি পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের কোনরূপ সংকোচনাদি অবস্থা ঘটান না এবং স্বয়ংও গমনাগমনশীল নহেন, এবং তাঁহার কোন অন্তর-সংবেগও নাই। জড়দেহও আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত কি চালিত হইতে পারে না। অন্তঃকরণ দ্বারা ও দেহের অবস্থান্তর ঘটিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, জীব যখন দেহের পরিবর্ত্তনানুযায়ী সুখদুঃখের ভোক্তা, তখন উক্ত দেহের পরিবর্ত্তনের কারণীভূত শক্তিরই জীবের উপর কর্ত্তৃত্ব আছে এবং জীব সর্ব্বতোভাবে শক্তির অধীন। এই শক্তিকে প্রতিবিম্বই বল, আর মায়াশক্তির সাকার অবতারই বল, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পাঞ্চভৌতিক জগতের লয় পর্য্যন্ত এই শক্তির বর্ত্তমানতা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং প্রত্যেক মহাপ্রলয়ান্তে যে এই শক্তিরই আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবিষয়েও কোনওই সংশয় নাই; এজন্য শক্তিকে নিত্যা বলিতে কোনওই বাধা দেখি না। প্রতি মহাপ্রলয়ান্তে যখন শক্তি ও জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে তখন মহাপ্রলয়ে শক্তি ও জগৎ বিনষ্ট হয় একথা বলিলেও যাহা এবং মহাপ্রলয়ে শক্তিতে জগৎ লীন হয় এবং শক্তি চৈতন্যে অব্যক্ত থাকেন ইহা বলিলেও তাহা,যেহেতু উভয়েরই ফল তুল্য; যেমন সূর্য্যই ঘুরুক আর পৃথিবীই ঘুরুক, দিন রাত্র হইবেই। শক্তি আত্ম-প্রতিবিম্বই হউন, আর আত্মাহইতে আবির্ভূতই হউন, পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের উপর যে শক্তিরও কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। শক্তি যথার্থ অস্তিত্ববিশিষ্ঠ পদার্থই হউন আর মায়াশক্তির সাকার অবতার স্বরূপ আত্মপ্রতিবিম্বই হউন, শক্তি যে দৃশ্য এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং শক্তির বর্ত্তমানতা ও স্বীকার্য্য। প্রকৃত অধীনতাই হউক আর মায়িক অধীনতাই হউক, জীবের সম্পূর্ণ শক্ত্যাধীনতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

৪র্থ ভাগ। { পৌষ ১৩০৭ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলি।

সরস্বতীস্তুতি।

(১)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপিতা॥

শ্বেতশতদলোপরি যিনি বিরাজিতা
শ্বেত পুষ্পদামে সদা সুন্দর সজ্জিতা

শ্বেতাম্বরপরিধানা নিত্যা সনাতনী
শ্বেতগন্ধানুলেপিতা শুভ্রা শ্বেতাঙ্গিনী ॥১॥

(২—৩)

শ্বেতাঙ্গী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥
বরদা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্ব্বন্দিতা সুরদানবৈঃ।
অর্চ্চিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥

শুভ্রহস্তা যিনি শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা
শ্বেতবীণাধরা শ্বেতভূষণে ভূষিতা
বরদাত্রী যিনি সিদ্ধগন্ধর্ব্ববন্দিতা
সুরাসুর মুনিঋষি সবার পূজিতা। ২-৩॥

(৪)

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে ॥

সেই দেবী সরস্বতী যিনি জগদ্ধাত্রী
চৈতন্যরূপিণী সর্ব্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী
ত্রিসন্ধ্যা এ স্তোত্রে তাঁরে যে করে স্মরণ
সকল প্রকারে বিদ্যা লভে সেই জন ॥৪॥

ইতি পদ্মপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিককথা।

সূর্য্যবংশ ও ভাগীরথী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূর্য্যবংশের প্রবল প্রতাপ। ইক্ষাকুর পৌত্র পুরঞ্জয় সমরে অসুর-দিগকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। ইন্দ্র বৃষরূপে তাঁহার বাহন হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম ককুৎস্থ।

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চপ্রতিতিষ্ঠতি।
তৎ সর্ব্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥

সূর্য্যের উদয় ও অস্তের সীমা পর্য্যন্ত মান্ধাতার রাজ্য ছিল।

নাগগণ তাঁহাদিগের ভগিনী নর্ম্মদাদেবীকে রাজা পুরুকুৎসকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পুরুকুৎস পত্নীর অনুরোধে রসাতলে গমন করিয়া নাগশত্রু গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত পুরুকুৎসের নাম লইলে সর্পভয় থাকে না।

সূর্য্যবংশের অতুল প্রতাপ। এত প্রতাপে, এত গৌরবে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অভিমান না হইবার কারণ কি? তাঁহাদের দর্পে, তাঁহাদের অভিমানে পৃথিবী কম্পমানা।

রাজা সত্যব্রত তেজোদৃপ্ত হইয়া ত্রিবিধ পাপ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম ত্রিশঙ্কু।

হরিবংশে কথিত আছে—

পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ॥

পরিণীয়মান বিপ্রকন্যা হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপবশত ত্রিশঙ্কু চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেমন সেকালের রাজা প্রতাপী তেমনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রতাপী। তিনি ত্রিশঙ্কুকে প্রতাপী দেখিয়া তাঁহাকে স্বর্গে পাঠাইবেন স্থির করিলেন! ঋষি বিশ্বামিত্র মনুষ্যের ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রবল উদ্যম, অত্যুচ্চ আশা। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া নিজের উদ্যমে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন যে, মনুষ্য স্বর্গের অধিকারী কেন হইবে না, কেন মনুষ্য দেবতা হইবে না। তিনি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলেন। ত্রিশঙ্কুর এখন সময় হয় নাই। মনুষ্য তখন স্বর্গে যাইবার উপযোগী হয় নাই। বিশ্বামিত্র আপনার তেজোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে ঠেলিয়া ফেলিল। তিনি অধঃশিরা হইয়া ঝুলিতে লাগিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারিবে না। তাই তিনি রাজসূয় দক্ষিণার ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন এবং তাঁহাকে নানারূপ যাতনা দিলেন। এই নিমিত্ত বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের তুমুল সংগ্রাম হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জন্মে নাই। তিনি বরুণ দেবতার শরণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমার বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি সেই পুত্রকে পশু করিয়া তোমার যজ্ঞ করিব। বরুণ বলিলেন, "তথাস্তু"। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রোহিত। বরুণ প্রতিশ্রুত পশু যাচ্ঞা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র কোন না কোন আপত্তি করিতে লাগিলেন। রোহিত প্রাণভয়ে বনে পলায়ন করিলেন। তিনি অবশেষে অজীগর্ত্তের নিকট তাহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিলেন এবং প্রতিশ্রুত যজ্ঞের পশু বলিয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই পশু লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। আমরা পরপ্রবন্ধে যজ্ঞের কথা আলোচনা করিব।

রাজা সগর—"গর" অর্থাৎ বিষযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। সূর্য্যবংশ পাপের বিষে জর্জ্জরিত। সূর্য্যবংশীয় রাজগণ ধরাকে সরার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

সগর চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন তখন ইন্দ্র তাঁহার অশ্ব হরণ করিলে তাঁহার ষষ্টি সহস্র দৃপ্ত তনয়গণ অন্বেষণ করিতে করিতে চারিদিগের পৃথিবীখনন করিতে লাগিলেন। সেই খনন দ্বারা সাগরের উৎপত্তি লইল। সগরবংশ হইতে উৎপত্তি বলিয়া, "সাগর" এই নাম। পরে সগরপুত্রগণ মহর্ষি কপিলের নিকট সেই যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ কপিলদেবের ধ্যাননিমীলিত নয়ন। গর্ব্বিত রাজপুত্রগণ বলিয়া উঠিল,

এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ ॥

যখন অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহারা ঋষির অভিমুখে দৌড়িতে লাগিল, তখন মুনিবর নয়ন উন্মীলন করিলেন। মহতের ব্যতিক্রম নিবন্ধন সগরপুত্রগণ তৎক্ষণাৎ আপন আপন শরীরের অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। সূর্য্যবংশের নাশ হইল। যে দেশ এই পাপময় বংশে পঙ্কিল ছিল, সে দেশ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। সেইজন্য বলে সগরসন্তানগণ পৃথিবী খনন করিয়া সাগর উৎপন্ন করিয়াছিল। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের লীলাভূমি সেই বিশাল প্রদেশ যাহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় আট্‌লাণ্টিক বলে, সমুদ্রের গর্ভে লীন হইল। একটু মাত্র ভূমি মস্তক উচ্চ করিয়া রাখিল, যাহার নাম লঙ্কা-দ্বীপ।

যখন এক স্থানের ভূমি সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তখন অন্যস্থানে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূমি ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে। প্রাকৃতিক মহাবিপ্লবে কোথাও সমুদ্র, কোথাও পর্ব্বত। যেমন পাপময় দেশ জলমগ্ন হইল, তেমনি পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির বর্ত্তমান অবয়ব সংগঠিত হইল। হিমালয় উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল এবং পবিত্র ভাগীরথী হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে প্রবাহিত হইল। যেখানকার জল পবিত্র নয়, যেখানে পুণ্যতীর্থ নহে, সে দেশের লোক কিরূপে পবিত্র হইতে পারে। পবিত্র মনুষ্যজাতি পুণ্যভূমি ভারতভূমির বক্ষে লালিত হইবে। সেই পুণ্য বংশে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। সেই দেশের নদী পুণ্য হইতে পুণ্যতম। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বিষ্ণুপাদসম্ভূতা। সগরের পৌত্র অংশুমান্ অশ্বের অন্বেষণে কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ কপিল বলিলেন—

অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ॥

গঙ্গা জল ভিন্ন মনুষ্যজাতির উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।

অংশুমান্ তপস্যা করিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ তপস্যা করিলেন। কিন্তু কেহই গঙ্গা আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। দিলীপের পুত্র ভগীরথ মহাতপস্যা করিলেন। ভগবতী গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে।
অন্যথা ভূতলং ভিত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্॥
কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্
মৃজামি তদঘং কাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্॥

আমি যখন মহীতলে পতিত হইব, তখন আমার বেগ কে ধারণ করিবে। নতুবা হে রাজন্! আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিব। আর ইহাও চিন্তা কর, মনুষ্য আমার জলে পাপ ধৌত করিবে। সে পাপ আমি কোথায় ধৌত করিব। ভগীরথ বলিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥
ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু॥৯।৯

শান্ত ব্রহ্মিষ্ঠ লোকপাবন সাধু সন্ন্যাসী আপনার পাপ হরণ করিবে। স্বয়ং পাপহারী হরি তাঁহাদের মধ্যে বাস করেন। সকল জীবের আত্মা রুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।

গঙ্গাজলের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে। পুণ্যসলিলা সুরনদীর কূলে পবিত্র আর্য্যজাতি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সূর্য্যবংশের যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা এই নূতন দেশে বাস করিয়া পবিত্র হইল। আর পবিত্র চন্দ্রবংশ এই নবীন ভূমিতে নবীন অনুরাগের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মানবের সপ্তরূপ।

পঞ্চমরূপ।

বা

মানসরূপ।*

পূর্ব্বে যে চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাণ্ডদেহ, পিণ্ডদেহ, প্রাণ ও কাম এই প্রথম চারিটি রূপ চতুর্ভুজের বাহুস্বরূপ; এই রূপ-চতুষ্টয় নশ্বর। এবং আত্মা, বুদ্ধি ও মনস্ এই তিনটি রূপ ত্রিভুজের তিনটি বাহু-স্বরূপ; ইহারা অবিনশ্বর। মানুষের ক্রমোন্নতির বিচার করিলে দেখা যায়, ভাণ্ডদেহ হইতে পিণ্ডদেহে, তাহা হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়া দেহপ্রাণধারী জীব, জ্ঞানবুদ্ধিশূন্য হইয়া কেবল কামের প্ররোচনায় ইতস্তত পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রমোন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়া তবে পঞ্চমরূপ মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ উন্নতি হইতে কত যে যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ সহজে এবং শীঘ্র, দুই, চারি দিনে, বা দুইশত, পাঁচশত, হাজার দুইহাজার বৎসরে প্রকৃত মানুষ হইয়া দাঁড়ায় নাই। এইরূপ যুগযুগান্তরের পর তবে মনস্ আসিয়া এই রূপচতুষ্টয়ে সংযুক্ত হওয়াতেই চিন্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বর্ত্তমান মানুষরূপে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা বিবেকবুদ্ধিবিহীন কেবল সংজ্ঞাশালী ভূতবিশেষ মাত্র ছিল।

মনস্ অর্থে চিন্তা বা বিচার করা। মানুষ অর্থে মন আছে যাহার অর্থাৎ যিনি যুক্তিবিচার দ্বারা ভালমন্দ হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করেন, তিনিই মানুষ।

এই পঞ্চম রূপটী বড় দুরূহ ও জটিল। এই রূপটীকে এবং অন্যান্য রূপের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিশেষ মনোনিবেশ করা

---

* আমার লিখিত "মনস্‌রূপ" প্রবন্ধ অনেকের কাছে দুরূহ বোধ হওয়ায়, 'মনস্‌রূপ' সম্বন্ধে 'যুগল সেবক' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা এই মনসকে সাধারণতঃ মন (Mind) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত মন ধাতু হইতেই এই পঞ্চম রূপ মনস্ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ চিন্তাশালী বা যিনি চিন্তা করেন। পরা বিদ্যা মনস্‌কে চিন্তাশীল, বোধকারী (Thinker) কর্ত্তারূপেই ব্যবহার করিয়াছেন; তিনিই প্রকৃত "আমি"। তিনিই পুনঃপুন জন্মমরণ দ্বারা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা এই সংসারে যাতায়াত করিতেছেন। তিনিঃ—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

বায়ু যেমন পুষ্পাদির গন্ধ লইয়া যায়, তিনি (জীব) সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মাংশ সংস্কারসমূহ (Experiences) গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ বা দেহ প্রতিগ্রহ করেন। তিনি অর্থাৎ মনস্‌ই সেই জীব। জীবের জন্ম দেহান্তরপ্রাপ্তিমাত্র। এই "জীব" শব্দ দ্বারা যাহা বুঝায়, এই পঞ্চম রূপ মনস্ দ্বারা ঠিক তাহাই বুঝায়, কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই।

সংস্কৃত ভাষায় "অধিভূত ভাব" শব্দে যাহা বুঝায়, ইংরাজিতে তাহাকে পার্সোনেলিটি (Personality) কহে; এবং জীব বা প্রকৃত আমিত্ব শব্দে যাহা বুঝায়, ইংরাজিতে তাহাকে ইন্‌ডিবিডুয়ালিটি (Individuality) কহে এই অধিভূত ভাব (Personality) এবং আমিত্ব (Individuality) মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে; এই প্রভেদ ভালরূপে বুঝিতে পারিলেই যিনি পুনঃপুন নানা দেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যু উপভোগ করেন, সেই জীব বা মনস্ যে কি বস্তু, তাহা সহজে বোধগম্য হইবে। এই মনস্ বা জীবকেই ইংরাজিতে হিউমেন্ ঈগো (Human Ego) কহে।

মনে কর, কোন এক রঙ্গমঞ্চে 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'সীতার বনবাস' এই দুইটি পালার ক্রমান্বয়ে দুই রাত্রে অভিনয় হইবে; তাহাতে মাধব নামে একজনা অভিনেতা প্রথম রাত্রে বিল্বমঙ্গলবেশে রঙ্গমঞ্চোপরি দর্শকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করিলেন। দৃশ্যপটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিল্বমঙ্গলের পালা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই বিল্বমঙ্গলবেশধারী মাধব উপস্থিত হইয়া অভিনয়কার্য্য দ্বারা

দর্শকমণ্ডলির মন মোহিত করেন। কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন আমোদ-প্রমোদে বিগলিত, কখন রাগদ্বেষে উন্মত্ত; কখন বিষয়মদে মাতোয়ারা, তৎপরেই আবার বিষম বিষয় বিষে জর্জ্জরিত। কখন আবার বিষয় বৈরাগ্যের চরম ফল প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম সুধারসে নিমজ্জিত। পূর্ব্বে ছিলেন কৃষ্ণবেম্বা নদীতটে, শেষে গেলেন যমুনাপুলিনস্থ মধুর বৃন্দাবনে!

সেই রাত্রের মতন উক্ত পালা সমাপ্ত হইল! বিল্বমঙ্গলের বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আবার যেই মাধব সেই মাধব।

পর দিবস 'সীতার বনবাসের' পালা আরম্ভ হইলে সেই মাধব ধনুর্ব্বাণ হস্তে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ তনয় রাজবেশধারী লক্ষ্মণ ধানুকীরূপে আসিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিলেন। অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তপোবন পরিভ্রমণব্যাপদেশে শ্রীরামঘরণী জনকরাজনন্দিনী জানকীকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে বনবাস দিয়া বিষণ্ণ মনে অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পালা শেষ হইল, মাধব লক্ষ্মণের রাজবেশ ও হস্তের ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। আবার যেই মাধব সেই মাধব। এই দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে যিনি মাধব তিনিই প্রকৃত জীব বা মনস্ (Individuality)। জীবন নাট্যশালার আমি পদ বাচ্য এই জীব প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিবধ আকারে অভিনয় করিয়া থাকে। আর এই মাধবের বিল্বমঙ্গলবেশ ও লক্ষ্মণবেশ, দুই রাত্রে দুই বেশ ধারণকেই অধিভূত ভাব (Personality) কহে। এই অধিভূত ভাব ভাণ্ডদেহ, পিণ্ডদেহ, প্রাণ ও কাম, এই নশ্বররূপ চতুষ্টয়ের সমষ্টীমাত্র; মৃত্যুরপর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কালে তাহারা ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই অধিভূত সম্বন্ধেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় 'শরীরং ক্ষণবিধ্বংশি,' এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেলে বলে Dust thou art to dust returnest. অর্থাৎ, মানব তোমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ মৃত্তিকায় গঠিত, সময়ে কালপূর্ণ হইলে তাহা পুনরায় মৃত্তিকায়ই পর্য্যবসিত হইবে, তাহার জন্য এত যত্ন কেন?

এই পঞ্চমরূপ মনস্ বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চিদাভাস স্বরূপ। ইনিই জীব। এই জীব কর্ম্মবন্ধনে পতিত হইয়া পুনঃপুন. জন্ম মৃত্যু ভোগ করত দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। মূলতঃ এই মনস্ সৃষ্টি কার্য্যের একত্ববোধক মহত্তত্ত্বের

অংশমাত্র 'মহদাত্মমাদ্যং কার্য্যংতন্মনঃ'। এই মহত্তত্ত্বই (The Universal Intelligences) পুরাণাদিতে বহুত্ববোধক মানসপুত্র বা ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে অভিহিত। মহত্তের এই অংশ আত্মাবুদ্ধিযোগে অস্থি মজ্জা মাংস শোণিতবিশিষ্ট দেহে আবদ্ধ হইয়াই জীবোপাধি লাভ করেন। মনোহীন মানবের ক্রম পরিণতিতে কাল সহকারে এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানস্‌পুত্রেরাই একে একে এই মনোহীন মানবদেহে আসিয়া আবির্ভূত হওত যুগযুগান্তর কাল ব্যাপিয়া জীবরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ ও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া সংস্কার (Experiences) সংগ্রহ করিতে থাকেন, এবং পরে ক্রম পরিণতিতে সেই মানস্‌পুত্ররূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তায় উপনীত হন। তাই পরা বিদ্যা বলেন, Spirit (God) thou art to spirit returnest, অর্থাৎ, হে জীব, ছিলে তুমি দেবতা (শুদ্ধ মুক্ত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ) কর্ম্মবশে দেহকারাগারের গভীর অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যারূপ আবরণে তোমার জ্ঞান চক্ষু আবৃত হওয়াতে তোমার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার পরিণামও সেই শুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্য স্বরূপে। যে পর্য্যন্ত তাহা প্রাপ্ত না হইতেছ, সেই পর্য্যন্ত পুনঃপুন জঠর যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। মন সাধারণতঃ যেরূপ কর্ম্মপদবোধক বস্তু (Object) বুঝায়, পঞ্চমরূপ মনস্‌ তাহা নহে; মনস্‌ কর্ত্তৃপদ বাচ্য প্রকৃত "আমি" (Ego) এখন এই আপত্য উত্থাপিত হইতে পারে যে মনস্‌ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, যাহার বসতি স্থান এই স্থূল-জগতের বহু উর্দ্ধে, তখন তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু সমষ্টী হইয়া তাহার বাসোপযোগী এই স্থূলদেহে নিজ ক্রিয়াশক্তির পরিচালনা করেন কিরূপে? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, দেহরূপ আবাসে বাস করার জন্য মনস্‌ তাহার কতক অংশ বা রশ্মিকণা প্রেরণ এবং প্রতিবিম্বিত করেন এই রশ্মিকণা তাহার প্রেরক মনসের সঙ্গে উর্দ্ধদিগে সংযুক্ত থাকিয়া সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম উপাদনে (Astral matter এ) আবৃত হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত স্নায়বিক মণ্ডলির স্তরে স্তরে প্রত্যেক স্থানে ওত-প্রোতভাবে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের দেহ যত পরিপক্ক ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মনস্‌ কর্ত্তৃক প্রেরিত উক্ত অংশটী ও দেহমধ্যে বোধসত্তারূপে পরিণত হইতে থাকে। মনসের এই প্রেরিত অংশটিকেই বলে অন্তর্ম্মুখীমন (Lower Manas)।

মনস্ শব্দটী সংস্কৃত ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদান্তের সংকল্প বিকল্পাত্মিক বৃত্তির নাম 'মন' সাংখ্য দর্শনে অন্তঃকরণ তিন ভাগে বিভক্ত; মন, অহংকার ও বুদ্ধি। কিন্তু অহংকার তত্ত্ব বেদান্তে কোন পৃথক তত্ত্ব নহে। সাংখ্যের মন ও অহংকার একত্র মিলিত হইয়া যাহা হয়, তাহাই বেদান্তের মন বা মনোময় কোষ।

কর্তৃত্ব ও করণত্বের পার্থক্য অবলম্বনে সাংখ্য দর্শনে অহংকার ও মনের পার্থক্য ধরা হইয়াছে। বেদান্তে ঈশ্বর কর্ত্তা, সেইজন্য অহংকার বলিয়া পৃথক কোন তত্ত্ব ধরেন নাই। তবে বেদান্তের মন ও বুদ্ধি মিলিত বিজ্ঞানময় কোষেই কর্তৃত্ব থাকা দেখা যায়। তাহাতে বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

সাংখ্য দর্শনমতে মন উভয়াত্মক।

উভয়াত্মক মত্রমনঃ সংকল্পমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ পরিণাম বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ ॥

মনে ইন্দ্রিয় ধর্ম্মও আছে। সেই জন্য মন উভয়াত্মক; অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া কার্য্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন সংকল্পক। সংকল্প অর্থে বিবেচনা করা। বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম্ম।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরংমনঃ," চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নির্দ্ধারণ করে। এই জন্য মনও এক ইন্দ্রিয়, তবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠেন্দ্রিয়; "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"।— গীতা। মনস্ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, অহংকার (Higher Manas) অন্তর্ম্মুখীমন (Lower Manas) এবং বহির্ম্মুখীমন (Kama Manas)

সাংখ্যমতে সমুদায়ে পঁচিশটী তত্ত্ব।—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ
প্রকৃতে র্মহান্ মহতোঽহংকারোঽহংকারাৎ
পঞ্চ তন্মাত্র্যুভয়মিন্দ্রিয়ং
তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥　　১।৬১

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামে অভিহিত।

এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের কার্য্য বা পরিণাম অহংকারতত্ত্ব। অহংকারতত্ত্বের পরিণাম দ্বিবিধ। তন্মাত্রা পাঁচ ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়। তন্মাত্রা হইতে পঞ্চ স্থূলভূত। এইরূপে প্রকৃতি-সহ প্রাকৃত পদার্থ চব্বিশটী ও পুরুষ পদার্থ এক। সর্ব্ব সমস্তে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব। এই অহংকারতত্ত্বই ইংরাজি ফ্রিউইল (Free will বা স্বাধীনেচ্ছা)। I will do this "অহংকরিষ্যে," ইহা যিনি বলেন তিনি অহংকার তত্ত্ব। সংকল্প কর্ত্তা (The Thinker, the Planner) হইয়াছেন অহংকার তত্ত্ব। অহংকারের ক্রিয়ার করণ (দ্বার) হইয়াছেন 'মন'। অহংকার যে সংকল্প (plan) করেন, মন অন্যান্য করণ (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা তাহা সাধিত করিয়া সেই কর্ম্মফল যাহাকে সমপ্রদান করেন তিনি বুদ্ধিদেবী। এই জন্যেই ইন্দ্রিয়-গণকে মনের দ্বার স্বরূপ কহে। তাই মনস্ বুদ্ধির সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট। অন্তর্মুখীমন (Lower manas) অহংকারের একটী রশ্মি। অহংকার উর্দ্ধতন সূক্ষ্মজগতের অবিনশ্বর, নিত্যশুদ্ধ পদার্থ, কাজেই তাহার অংশ স্বরূপ অন্তর্মুখী মন ও তদনুরূপ সূক্ষ্ম ও নিত্য পদার্থ। এই অন্তর্মুখী মন একটী শিশুর ন্যায় এক হস্ত উর্দ্ধাভিমুখে এবং অপর হস্ত নিম্নাভিমুখে প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। উপরের হস্ত অহংকাররূপ তাহার জনকের হস্ত ধারণ করিয়া আছে, অপর হস্তে মায়াবিনী কাম কর্তৃক প্রলোভিত ও আকৃষ্ট হইয়া নিম্নদিগে কামকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। উক্ত বালকরূপী অন্তর্মনস্ হয় কামসাগরে নিমজ্জিত হইয়া অহংকারতত্ত্ব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, নয়ত কাম জয়ী হইয়া জন্মে জন্মে সংস্কার আহরণক্রমে তাহার পিতা অহংকারের সঙ্গে কালে গিয়া মিলিত হইবে। এই জীবন সমস্যার সুমিমাংসা করাই পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কারণ। প্রত্যেক জীবনে কাম এবং অন্তর্মুখী মন (Lower manas) পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকে। কাম মাত্রেই পাশববৃত্তি সমূহের প্ররোচকে। অন্তর্মুখী মন কামকে বশে আনিয়া নিয়মিত করে, তাই আমাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির ও মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। কামের অপ্রতিহত প্রভাব, ফল উশৃঙ্খলতা। অন্তর্মুখী-মন কামকে সংযত করেন বলিয়াই মানুষ ধীশক্তির পরিচালনা করিয়া গভীর

তত্ত্বের গবেষণা করিতে সমর্থ হন। একটী দীপশিখা হইতে অপর দীপশিখা প্রজ্জলিত করিলে মূলতঃ উভয়ে কোন রূপ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু উক্ত দীপ সমূহ যে সকল পাত্রমধ্যে রাখা হয়, তাহাদের বর্ণের তারতম্যানুসারে যেমন একটি দীপ লালবর্ণ, একটি নীলবর্ণ ও অপরটি সবুজ দেখায়, সেইরূপ মনস্ মূলতঃ এক প্রকার। কিন্তু মানবদেহের ইতর বিশেষানুসারে কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ প্রভূত ধীশক্তিসম্পন্নকার বা গভীর চিন্তাশীল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, আবার কেহ নিরেট মূর্খ। যেমন কোন স্বচ্ছ কাঁচপাত্রের ভিতরে আলো রাখিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহিরে পরিস্কার রূপে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ পবিত্র দেহে, এবং সুমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ মস্তিস্কে ও হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। অপবিত্র হৃদয়ে জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না, কারণ সমল মুকুরে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। কোন মৃৎপাত্রে আলো রাখিলে তাহার মুখবন্ধ করিয়া দিলে যেমন তাহার কিরণ বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে না, সেইরূপ ভোগ বিলাসে আসক্ত, কাম ক্রোধাদির বশীভূত জড়ভাবাপন্ন মনে ও অপবিত্র দেহে বিশুদ্ধ মনস্ উদ্ভাশিত ও প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না।

যমাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোক ছায়াত পয়োরিব ব্রহ্মলোক॥ কঠোপনিষৎ।

যেমন নির্ম্মল দর্পণে আপনার প্রতিরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা নির্ম্মল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নকালে সর্ব্ববিষয়ে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও আপনার প্রতিরূপ স্পষ্টরূপে দর্শন হয়, সেইরূপ পরলোকে স্ব স্ব কর্ম্ম ফলভোগের জ্ঞানানুসারে অস্পষ্টরূপে আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয়; যেমন জীবগণ জলে আপনার প্রতিরূপ দেখিতে পায়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বাদিলোকে আত্মতত্ত্বের অনুভব হয়; আর যেমন ছায়া ও তেজের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয়; সেইরূপ এই জগৎ ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা প্রতীত হইয়া আত্মতত্ত্বের বোধ হয়। অন্তর্মুখীমন (Lowermans) স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, কিন্তু অপবিত্র ও মলিন জড়দেহে আবদ্ধ থাকাতে তাহার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। ইহাব্যতীত এই অন্তর্মুখীমন আবার দৃঢ় নিগড়ে পার্থিব জগতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উচ্চাভিলাষ, সুখ্যাতি ও যশঃ-

লাভের আশা, রাজনৈতিক বীর ও প্রতিভাশালী লোক বলিয়া সমাজে প্রশংসা ভাজন হওয়া ইত্যাদির প্রবল তৃষ্ণা উৎপাদন করে। বিশুদ্ধ মনস্ কামের দ্বারা কলুষিত থাকা পর্য্যন্তই লোকের মনে "আমি," "আমার" ইত্যাকার জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। আমি বিদ্বান, আমি বুদ্ধিমান, আমি জ্ঞানী, আমি পণ্ডিত, আমি দাতা, আমি ত্রাতা, আমি ধার্ম্মিক, আমি ভক্ত ইত্যাকার আমিত্ব বোধক জ্ঞান ও অভিমানের এক কণার সহস্রাংশের একাংশকেও আবার সহস্রাংশে বিভক্ত করিয়া যদি তাহারও কোন অংশ হৃদয় কন্দরের অতি নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত আছে বলিয়া জ্ঞাত থাক, তবে তখন পর্য্যন্ত মন কামগন্ধের কলুষিত ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিও। জগতের সঙ্গে পৃথকত্ব বোধক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইয়া একত্ব বোধক জ্ঞান মনে উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত মনকে কামমুক্ত বলা যাইতে পারে না। যখন জগতের প্রাণীমাত্রের সঙ্গে আপনার অভেদ জ্ঞান মনে উদিত হইবে তখন জানিবে যে তোমার মন কামের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে ও তুমি দুর্লভ অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভে উপযুক্ত ও অধিকারী হইয়াছ।

ক্রমশঃ।

শ্রীযুগলসেবক।

পালিভাষার জাতক গ্রন্থ।

পালিভাষায় যে সকল প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে জাতক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেব স্বয়ং এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রথম বোধিসংগমকালে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে এই গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। চীনদেশীয় বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় ২৮৫ খৃঃ অব্দে চিঙ্ বংশের রাজত্বকালে জাতক নামক পালি গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ হইতে হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া কোপনহেগেন্

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার ফজ্‌বোল্ জাতক গ্রন্থ ১৮৮১ খৃঃ অব্দে রোমান্‌অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের দুকনিপাত নামক অধ্যায়ের দলহবগ্‌গের সারাংশ নিম্নে অনুবাদিত হইলঃ—

একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে কোশলরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাকে একটী দুর্বিনিশ্চয় বিষয়ের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান্ উত্তর করেনঃ—

"হে রাজন! ধর্ম্ম ও শান্তির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থবিনিশ্চয়ই শ্রেয়স্কর। আপনি যে আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও শান্তির পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না ইহাতে আশ্চর্য্যের কি বিষয় আছে? কিন্তু পুরাকালে অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বচন শ্রবণ করিয়াও অনেক নৃপতি দশ রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও মরণান্তর স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন ইহাই সবিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি আপনার নিকট অতীত বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুনঃ—

অতীত কালে বারাণসী নগরীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত কুমার নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত পুত্র তক্ষশিলায় গমন করিয়া সমগ্রবিদ্যা ও শিল্পশাস্ত্রে সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করেন ও পিতার মৃত্যুর পর বারাণসী নগরীর অধীশ্বর হন। তিনি রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রাজ্য পালন করিতেন এবং তাঁহার অমাত্যগণও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ব্যবহার বিনিশ্চয় করিতেন। কিয়ৎ কাল মধ্যে সমগ্র রাজ্যে তাঁহার প্রশংসাবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা তখন ভাবিলেন "আমার কোন দোষ আছে কি না ইহা অবগত হওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" তদনুসারে তিনি অন্তর্জনপদ ও বহির্জনপদের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সারথিসমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিয়া প্রত্যন্ত জনপদের রাজমার্গে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন তাঁহার সম্মুখ দিক্ হইতে মল্লিক নামক কোশলরাজ রথে চড়িয়া আসিতেছেন। উক্ত রাজমার্গ সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া দুইখানি রথ যুগপৎ দুইদিকে চলিতে পারে নাই। তখন কোশল রাজের সারথি বারাণসী রাজের সারথিকে

বলিল "ওহে, রথ অপসারণ কর, বারাণসী রাজ্যস্বামী ব্রহ্মদত্ত মহারাজ গমন করিতেছেন"। তখন উভয় সারথিতে বাগ্‌যুদ্ধের পর স্থির হইল যে উভয় রাজার মধ্যে যিনি ক্ষুদ্রতর তিনি নিজের রথ ফিরাইয়া লইয়া মহত্তর রাজার রথ চলিতে দিবেন। কিন্তু উভয় রাজার বয়স, রাজ্যপরিমাণ, বল, ধন, যশঃ, জাতি, গোত্র, কুল, পদ ইত্যাদি বিচার করিয়া দৃষ্ট হইল যে উভয়েই পরস্পর সমান। তখন বারাণসীর রাজার সারথি কোশলরাজ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের রাজার শীলাচার কি প্রকার?" কোশল রাজার সারথি উত্তর করিলঃ—

দল্‌হং দল্‌হস্‌স খিপতি মল্লিকো মুদুনা মুদুং
সাধুং পি সাধুনা জেতি অসাধুং পি অসাধুনা।
এতাদিসো অয়ং রাজা মগ্‌গা উয্‌যাহি সারথীতি॥

কোশলরাজ মল্লিক বলশালী ব্যক্তিকে বলদ্বারা, মৃদুলোককে মৃদুদ্বারা, সাধুকে সাধুতার দ্বারা এবং অসাধুকে অসাধুতা দ্বারা জয় করিয়া থাকেন। আমাদের রাজার শীলাচার এই প্রকার। হে সারথে পথ ছাড়িয়া দাও।

তখন বারাণসীরাজ সারথি বলিল "ওহে মহাশয় কোশলরাজের যদি এই গুণ হয় তবে তাঁহার দোষগুলি কি প্রকার?

কোশলরাজ সারথি উত্তর করিল আমাদের রাজার এগুলি দোষই হউক আর গুণই হউক, তাহাতে তোমার প্রয়োজন নাই। আমি জিজ্ঞসা করি তোমাদের রাজার শীলাচার কি প্রকার?" বারাণসী-রাজের সারথি তখন উত্তর করিলঃ—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনম্‌
এতাদিসো অয়ং রাজা মগ্‌গা উয্‌যাহি সারথীতি॥

বারাণসীরাজ অক্রোধ দ্বারা ক্রোধীকে জয় করেন, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করেন, কদর্য্য ব্যক্তিকে দানদ্বারা এবং অলীকবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিয়া থাকেন। আমাদের রাজা এই প্রকার। হে সারথে পথ ছাড়িয়া দাও।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কোশলরাজ ও তাঁহার সারথি উভয়েই রথ হইতে অবতরণ করিয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর মল্লিক শীলাচার সম্পন্ন হইয়া দানাদি দ্বারা মরণানন্তর স্বর্গে আরোহণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীসতিশ চন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

সন্তোষ।

সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে কয়েকটি সদ্‌গুণ সাধকের পক্ষে আয়ত্ত করা আবশ্যক। আয়াস ও অভ্যাস দ্বারা সাধককে ঐ সকল গুণ নিজস্ব করিতে হইবে; তবেই সাধক সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। এই সকল গুণের মধ্যে সন্তোষ একটি প্রধান। কি কর্ম্মযোগী কি জ্ঞানযোগী কি ভক্তিযোগী সকলের পক্ষেই ইহা অত্যাবশ্যক। সেইজন্য গীতাতে ভগবান্ ইহার বহুশঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্মযোগীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি চ নিবধ্যতে।

যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, যিনি দ্বন্দ্বাতীত ও বৈরহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করেন তিনি কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হয়েন না।

অন্যত্র স্থিতপ্রজ্ঞ (জ্ঞান যোগীর) লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

হে পার্থ যখন সাধক সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জন করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

পুনশ্চ ভক্তের পরিচয় স্থলেও ভগবান্ সন্তোষের নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখা যায়।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

আমার যে ভক্ত সদাই সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ় নিশ্চয় এবং যে আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয়।

এই সন্তোষ কি এবং কিরূপেই বা ইহাকে লাভ করিতে পারা যায়?

সন্তোষ চিত্তের একটা স্থায়ী প্রশান্ত ভাব; ঘটনার বিপর্য্যয়ে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে ভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। সে ভাব নিজ নিজ অনুভব গম্য; চিত্তবৃত্তিকে কথায় কিরূপে বুঝাইব? ইংরাজিতে যাহাকে Fretfulness বলে ইহা তাহার ঠিক বিপরীত ভাব।

এই সন্তোষের একটা জাল মূর্ত্তি আছে, কেহ যেন তাহা দ্বারা প্রতারিত না হন। ইহার স্বরূপ হইতেছে নিশ্চেষ্টতা নিরুদ্যম। ইহা তামস সন্তোষ। অতি হেয় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। প্রকৃত সন্তোষের তুলনায় ইহাকে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বলা উচিত। ইহার কিছুমাত্র উপকারিতা বা উপযোগিতা নাই। অনেক অসভ্য এবং মৃতকল্প জাতির মধ্যে এই তামস সন্তোষের বহুল প্রচার দেখা যায়। ইহাদের প্রকৃতিতে ইহা বিলক্ষণ বদ্ধ মূল হইয়া আছে। তাহার ফলে তাহারা পার্থিব অবস্থার উন্নতি বিধানে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। পার্থিব উন্নতির প্রতি তাহাদের যে আকর্ষণ নাই তাহা নহে, পূর্ণ মাত্রাতেই আছে। সম্পদ ও সুখের প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত রহিয়াছে। কিন্তু তাহার অধিগম জন্য যে যত্ন ও আয়াস আবশ্যক, আলস্য বশতঃ তাহা স্বীকার করিতে তাহারা একান্ত পরাঙ্‌মুখ। তাহাদের প্রকৃতিতে এতই তমোগুণের প্রভাব।

গুল্‌ফ দেশে খেজুর আসিয়া পড়িয়াছে, গুল্‌ফ স্বামী তাহা গলাধঃকরণ করিতে কিছুমাত্র নারাজ নহেন, কিন্তু শ্রম স্বীকার করিয়া হস্ত প্রসারণ তাঁহার সাধ্যের বহির্ভূত। যদি কোন দয়ালু কৃপা করিয়া খেজুরটি তাঁহার মুখ বিবরে একবার নিক্ষেপ করিয়া দেন তবে অবশ্য তাহার আর নির্গমনের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ঐরূপ কৃপা বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় তিনি আপাততঃ কর সঞ্চালনে বিরত রহিয়াছেন। ইহাই তামস সন্তোষের চরম দৃষ্টান্ত।

কখন কখন এই তামস সন্তোষ দার্শনিকের মুখস পরিয়া আমাদিগকে বিভীষিকা দেখায়। সে উপদেশ দেয়—'দেখ কর্ম্মের গতি অনতিক্রমণীয়। কে এমন আছে যে ভগবতী ভবিতব্যতার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে! যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। তুমি চেষ্টা করিলেও ঘটিবে, না করিলেও ঘটিবে। শুন নাই কি অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ ইত্যাদি ইত্যাদি! তবে কেন বৃথায় আয়াস

করিয়া মর, অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই! অতএব এস পা ছড়াইয়া নিদ্রা যাই।" দার্শনিকতার ভাণ করিয়া ইনি অনেক প্রজ্ঞাবাদ বলেন বটে কিন্তু ইহাকে আমরা চিনিয়াছি অতএব ইহার কথায় ভুলিব না।

বাস্তবিক এরূপ ভাবের কথা একবারে যুক্তিহীন। ইহা হিন্দুর অদৃষ্ট বাদ নহে—আরবীয় কিসমৎ। ইহার লৌহ নিগড়ে নিষ্পেষিত হইয়া জাতি ও ব্যক্তি অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আর্য্য ঋষিদিগের উপদিষ্ট কর্ম্মবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী। তাহাতে পুরুষকারের যথেষ্ট স্থান আছে। কর্ম্ম সঞ্চিত পুরুষকার মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মানুষ পুরুষকার দ্বারা যে কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাই অদৃষ্টরূপে ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়। সুকৃতের ফলে জীব সুখ ভোগের অধিকারী হয় এবং দুষ্কৃতের ফলে তাহাকে দুঃখভোগী হইতে হয়। যদি জীব ইহ জন্মে পুরুষকার ব্যয় করিয়া বিপরীত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে পূর্ব্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃত প্রশমিত হইতে পারে। ইহার সুন্দর উদাহরণ আমরা ধ্রুবচরিত্রে দেখিতে পাই। ধ্রুব যোগভ্রষ্ট সাধক। সুকৃতের অভাবে সে পিতার অনাদরের পাত্র হইয়া রাজ সিংহাসনের অনধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু বিমাতার অপমানে উদ্দীপ্ত হইয়া ধ্রুব পুরুষকারের সাহায্যে এরূপ তীব্র তপানুষ্ঠান করিল যে সমস্ত দুরদৃষ্ট বিদলিত করিয়া সে ত্রিলোকীর সর্ব্বোচ্চ স্থান যে ধ্রুবলোক সেই লোকে কল্পান্ত নিবাসের অধিকার অর্জ্জন করিল। ধ্রুব যদি তামস সন্তোষের মোহে অদৃষ্টবাদে নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত তবে আমরা তাঁহার এই অতি দুর্লভ সমৃদ্ধিলাভ দেখিয়া বিস্মিত হইবার অবসর পাইতাম না।

অবশ্য ইহাদ্বারা আমি রাজস প্রবৃত্তির পক্ষপাত করিতেছি না। তামস সন্তোষ যেমন হেয়, রাজস প্রবৃত্তিও তেমনি পরিহার্য্য। অনেকের জীবনে কর্ত্তব্যশূন্য উদ্দেশ্যহীন চাঞ্চল্য দেখা গিয়া থাকে। তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, উৎসাহ নিবন্ধন। প্রয়োজন ভিন্ন ও তাহাদের প্রবৃত্ত লক্ষিত হয়। য়ুরোপে এই শ্রেণীর উদ্যম যথেষ্ট দেখা যায়। তাহার ফলে জগতে যথেষ্ট অশান্তি ও উপদ্রবের সঞ্চার হয়। এসিয়া খণ্ডে যেমন তামস সন্তোষের উৎপাত, য়ুরোপে তেমনি রাজস প্রবৃত্তির উপদ্রব। সাধকের পক্ষে উভয়ই বর্জ্জনীয়।

তামস সন্তোষের আরও একটি প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তাহা আধ্যাত্মিক

স্ফূর্তিতে সাধকের চিত্তকে অধিকার করে। ইহার পারিভাষিক নাম 'তুষ্টি'। সাংখ্যাচার্য্যেরা ইহার নয় প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্তঃ, সলিল, মেঘ, বৃষ্টি, পার, সুপার, পারাপার ইত্যাদি তাহাদিগের আখ্যা দিয়াছেন। এ বিষয়ের এ স্থলে সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটা প্রকারের বিবরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। "বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভ হয়। সেই জ্ঞান যখন প্রকৃতির পরিণাম মাত্র, আর সৃষ্টির লক্ষ্যই যখন ঐ জ্ঞানোৎপাদন, তখন ধ্যান অভ্যাস প্রভৃতি উপায় অবলম্বনের আয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি আপনিই সেই জ্ঞান উৎপাদন করিবে। আমি নিশ্চেষ্ট থাকি" এইরূপ বুদ্ধি বৃত্তির নাম অন্তঃতুষ্টি। বলা বাহুল্য ইহা তামস সন্তোষের রূপ ভেদ মাত্র। সাধকের পক্ষে ইহা বিষম অন্তরায়; অতএব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

প্রকৃত সন্তোষ অর্জ্জনের উপায় কি?

প্রথম উপায় বৈরাগ্য সাধন। বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে সকল অসন্তোষের মূল কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তি কিম্বা হানি। যদি বিষয়ের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হয়, যদি কামনার তীব্রতা কমিয়া যায়, যদি কাম্য বস্তুর পরিমাণের লাঘব হয়, তবে ক্রমশঃ অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ হইতে থাকে। যাহার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন তাহার অভাবে আমাদের চিত্তের শান্ত ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অতএব সাধকের উচিত ধীরে ধীরে বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার করা। এই অসৎ জগতের পশ্চাতে এক নিত্য বস্তু আছে, এখানকার তমসের পরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আছে, মর্ত্ত্যের মরণের পর পারে এক চিরন্তন অমরতা বিরাজ করিতেছে—সাধকের চিত্তে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়, তখন আর পার্থিব সুখ দুঃখে তাহার কোন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। সে বুঝিতে পারে যে এ ক্ষণিকের ছায়াবাজির অপেক্ষা স্থায়ী আলোকেরই অনুসন্ধান করা ভাল। এই ক্ষুদ্র প্রমোদের অপেক্ষা ভূমানন্দের আস্বাদন লওয়া শ্রেয়ঃ। তখন ক্রমশঃ বৈরাগ্যের জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সে অনাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা আয়ত্ত করে। তখন সুখ, দুঃখ, নিন্দা স্তুতি, লাভ হানি, সংযোগ বিয়োগ সিদ্ধি অসিদ্ধি, জয় পরাজয়—তাহার পক্ষে তুল্য জ্ঞান হয়। সে কামনা রহিত, দ্বন্দ্বাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া প্রকৃত সন্তোষের অধিকারী হয়।

সন্তোষ অর্জ্জনের আর এক উপায় কর্ম্মবাদে বিশ্বাস। মানুষ যদি ধারণা করিতে পারে যে তাহার সুখ দুঃখ নিজ কৃত কর্ম্মেরই ফলাফল, তবে আর তাহার অসন্তোষের অবসর থাকে না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যেমন বীজ তেমনি বৃক্ষ হইবেই হইবে; ইহাতে আপত্তি করা নিষ্ফল। কাকের গর্ভে কোকিল হইল না, নিম্ব বৃক্ষে আম্র ফলিল না—ইহাতে খেদের কারণ কি? এইরূপে সাধক যখন কর্ম্ম বিধাতার মঙ্গল বিধানে বিশ্বাসপর হইতে পারে, তখন আর তাহার সুখ দুঃখে প্রবল উৎসাহ বা তীব্র উদ্বেগ উৎপন্ন হয় না। তখন সে প্রশান্ত চিত্তে বিধাতাকে নমস্কার করিয়া বলে—

যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং!

নিজ নিজ কর্ম্মফলে যে কিছু বিত্ত লাভ করিয়াছ তাহাতেই চিত্ত বিনোদন কর—তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ম্মবাদে বিশ্বাস, উদ্যম প্রযত্ন উৎসাহের বিরোধী নহে। বরং পুরুষকারের প্রবর্ত্তক। তবে সাধারণতঃ মানুষ যেরূপ উদ্দাম ও উচ্ছৃ-ঙ্খল ভাবে ঘটনার সহিত অন্ধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্মবাদী তাহা করে না। কারণ কর্ম্মবাদী বুঝে যে অবস্থা অদৃষ্ট সাপেক্ষ। অর্থাৎ তাহার নিজেরই সুকৃত দুষ্কৃতের ফলে সে সুখ অথবা দুঃখের ভাজন হইয়াছে। অতএব তজ্জন্য ব্যাকুলতা বা চাঞ্চল্য নিরর্থক। ধীর শান্ত ভাবে অদৃষ্টের কশাঘাত বা পুষ্পবৃষ্টি শির পাতিয়া লওয়া উচিত। এইরূপ ধারণা হইতে ক্রমশঃ সাধকের চিত্তে প্রগাঢ় সন্তোষের ভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়।

সন্তোষের চরমরূপ পরাভক্তির অধিকারী সাধকের কর্ম্ম সংন্যাসে পরিব্যক্ত হয়। ঐরূপ সাধক নিজের স্বাতন্ত্র্য ভগবানে নিমজ্জিত করিয়া ঈশ্বরের করণ মাত্র হয়েন। তিনি বুঝেন জগৎ জগদীশ্বরের লীলাক্ষেত্র। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা তিনিই; জগতে নানা রূপে নানা ভাবে তিনি বিলাস করিতেছেন। জগতে যাহা আছে, যেমন হইতেছে, মঙ্গলের জন্যই। কারণ তিনি মঙ্গলময়। এই বুঝিয়া সাধক 'যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট' হয়েন—যেমনই হউক, যাহাই ঘটুক না কেন কিছুতে বিচলিত হয়েন না। সে অবস্থায় তাঁহার নিজের

প্রযত্ন সংকল্প আরম্ভ কিছুই থাকে না। সেই জন্য তিনি সর্ব্ব সন্ন্যাস করিয়া শম অবলম্বন করেন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যোগী যত দিন না যোগ সিদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারেন, ততদিন কর্ম্ম তাঁহার অবলম্বা হয়; কিন্তু যোগারূঢ় অবস্থায় শমই তাঁহার আশ্রয়নীয় হইয়া থাকে। এরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কারণ সে অবস্থায় তিনি ভগবানের ভাবে বিভোর হন। ভগবানের আবেশে আবিষ্ট হন। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করেন, সর্ব্ব স্থানে ঈশ্বরের বিলাস প্রত্যক্ষ করেন। তখন আর তাঁহার আত্মপর, শত্রু, মিত্র, দ্বেষ্যপ্রিয়, হেয় উপাদেয় ভেদ থাকে না। কারণ তিনি দেখেন 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'; তিনি বুঝেন 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'। সে অবস্থায় আর তিনি কাহার উপর কিসের জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন? তখন পরম সন্তোষ সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। মহাত্মা প্রহ্লাদের এই ভাব হইয়াছিল। তিনি পরাভক্তির ভাগ্যবান্ অধিকারী ছিলেন। তিনি জগৎ বিষ্ণুময় দেখিতেন—সর্ব্বত্র ভগবানের বিলাস প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই জন্য তাঁহার শত্রু মিত্র দ্বেষ্যপ্রিয় ভেদ ছিল না। তিনি সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরের ভাবে বিভোর থাকিতেন। সেই জন্য সর্পের বিষদন্তে, বহ্নির জ্বালামালায়, গিরিচূড়ার নিপীড়নে নাগপাশের বন্ধনে, দিকহস্তির পদতলে অপার জলধিজলে' কখন ও কোনমতে সন্তোষ হারান নাই। ইহাই চরম সন্তোষ। জন্ম জন্মের সাধন ফলে যেন আমরা এইরূপ সন্তোষের অধিকারী হইতে পাই!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

হিন্দুধর্ম্ম।

উদার হৃদয়ে নিবিষ্ট চিত্তে একবার মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অনায়াসে অনুমিত হয়।

"এই ধর্ম্ম যাজন কর নতুবা নরকে যাইতে হইবে" হিন্দুধর্ম্ম একথা বলেন না অথচ সকলকে সৎপথে আনিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম সততই ব্যস্ত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

হিন্দুধর্ম্ম নানা শাখায় বিভক্ত—যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর প্রভৃতি কিন্তু ইহা যত ভাগেই বিভক্ত হউক না কেন ইহার মূলভিত্তি সেই এক মাত্র সনাতন ধর্ম্ম।

আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই সনাতন ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—সর্ব্ব জীবের হিত সাধন।

হিন্দুর মধ্যে বোধহয় এমন কেহ নাই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার না করেন। সর্ব্বজন আরাধ্য দেবতা সেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব জীবের শ্রেয় সাধন দ্বারাই সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেয় সাধনের জন্যই রঘুকুল তিলক শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুর হৃদয় রাজ্যে ভগবৎ অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। আর এই পাপময় কলিযুগে জীবের শ্রেয় সাধন করিয়াই নবদ্বীপ-বাসী জগন্নাথ মিশ্রের চঞ্চল পুত্রটি অনেকের নিকটেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপে আদৃত ও পূজিত হইতেছেন।

শ্রেয় সাধনের জন্যই আমরা বিদেশীয় প্রভু যিশুখ্রীষ্টকেও মঙ্গলময় পরমেশ্বর বলিয়া তচ্চরণে প্রণত হইতে পারি। প্রভু যিশু যদি জীবের শ্রেয় সাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ না করিতে পারিতেন, মহম্মদ যদি জীবের শ্রেয় সাধনের জন্য আত্মবলি প্রদান না করিতেন তবে কি আজ সাধারণে তাঁহাদিগের পবিত্র চরণ আশ্রয় করিতে পারিতেন? তবেই দেখা যাইতেছে শ্রেয় সাধনই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। হিন্দুধর্ম্মে যে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা আছে অনেকের চক্ষে তাহা নিন্দনীয়। নিরাকার বাদীগণ সাকার বাদীগণকে দুর্ব্বল বলিয়া উপহাস

করেন আবার সাকার বাদীগণ নিরাকার বাদী দিগেরই দুর্ব্বলতা মনে করেন। কিন্তু এসমস্তই বিবাদের কথা। বিবাদে কার্য্য সুসিদ্ধ না হইয়া মন্দই হইয়া থাকে। একটা গানে আছে,—

"কেজানে তোমারে তারা তুমি জান তোমার বাজী।
রাম ডাকে কর্ত্তারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা,
মোগল পাঠান বলে তোমায় সৈয়দ কাজি॥"

কথাটা মিথ্যা নহে কেননা "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি"—তবে শ্রীভগবানের বেশেষত্ব:। ই হিন্দুর চক্ষে তিনি নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যেমন এক রাজা আমত্যবর্গ বেষ্টিত সভামধ্যে এক রূপ তিনিই মাতা পিতার নিকট অন্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত আবার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকেই স্নেহময় সখারূপে ও প্রিয়তমা মহিষীর নিকট রসময়রূপে বিরাজিত দেখিতে পাই। তবেই দেখ একজন মাত্র নৃপতিকে আমরা কত রূপে দেখিতে পাইতেছি। রাজা একজন কিন্তু তাঁহার কার্য্য এক নহে, এক এক প্রকৃতিতে তাঁহার এক একটি কার্য্য। শ্রীভগবানের পক্ষেও এ নিয়ম খাটে। তিনি যোগীর নিকট পরমাত্মা জ্ঞানীর নিকট পরব্রহ্ম ও ভক্তের নিকট ভগবানরূপে প্রকাশমান হন। আবার ভক্তের সাধনানুসারে তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন!

একটা চলিত কথায় আছে "সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী" যাঁহার ভক্তি বৃত্তি যতই অনুশিলীত হয় তিনি জীবের শ্রেয় সাধনে ততই অগ্রগামী হইতে পারেন। আবার যিনি শ্রেয় সাধনে যতই অগ্রগামী তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম ততই অনুশিলীত হইয়া থাকে। আমরা হিন্দুধর্ম্ম তত্ত্বে মন নিবেশ করিলেই দেখিতে পাই জীবের শ্রেয় সাধনই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি আর ভক্তি বৃত্তির অনুশীলনেই এই ভিত্তি দৃঢ়রূপে সঙ্গঠিত হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্র প্রতিপদ বিক্ষেপে হিন্দু সন্তানকে ভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই ভক্তি বৃত্তি পরিস্ফুরণের জন্যই হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ"।

এই ভক্তি বৃত্তি ক্রমে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া

পরমেশ্বরে পর্য্যবসিত হয়। আর জীবের চিত্ত যখন ভগবচ্চরণে ধাবিত হয়, তখন তিনি বিশ্বময় হইয়া পড়েন। তবেই দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কিছু সকলেরই মূল ভক্তি। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে যে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা আছে তাহাকে কোন মতেই দুর্ব্বলতা বলিতে পারা যায় না। কারণ জীব হৃদয়ে এই প্রতিমাপূজা দ্বারাই ভক্তি বৃত্তি সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

যিনি যেরূপেই যাজন করুন সকলেই সেই চরণ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছেন। যাইবেও সেই খানে তবে পথের কিছু বিভিন্নতা!—কোন মহাত্মা বলিয়াছেন.—

"যে যেমনে পারে, ট্রেনে ষ্টীমারে,
হোক তথা আগুয়ান।

কোন একটা দেশে যাইতে হইলে যেমন ষ্টীমার ট্রেন প্রভৃতি সকল যানেই যাওয়া যায় তবে কোনটা ঘুর আর কোনটা সোজা রাস্তা। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ পক্ষেও সেই নিয়ম খাটে।

"জল" বলিয়া জল খাইলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয় আবার Water বা তোয়, পানী প্রভৃতি বলিয়া জল খাইলেও পিপাসার শান্তি হয় তবে জলটা যতই রিফাইন করিয়া লওয়া যায় ততই উপকারী হয় এই মাত্র। ধর্ম্মরাজের পক্ষেও ঠিক এই কথা বলিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক সনাতন ধর্ম্ম নানা ভাগে বিভক্ত। আর সেই সমস্ত সাধকই সেই এক মাত্র সচ্চিদানন্দ চরণ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই তবে রস লাভের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে কোনটিই কল্পিত নহে। যাহার যতটুকু অধিকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।

হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ তাই হিন্দুর ঘরে "বার মাসে তের পার্ব্বন"। তাই হিন্দু যে কোন গতিকে হউক একটা উৎসবের সৃষ্টি করিয়া ভগবদ্দিকে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বার ব্রত প্রভৃতি হিন্দুর যাহা কিছু এই চেষ্টার অন্তর্গত। হিন্দু চিরদিনই ধর্ম্মের কাঙ্গাল—ধর্ম্মের জন্য পাগল—হিন্দুর ধর্ম্মার্থে সমস্তই উৎসৃষ্ট; সুতরাং হিন্দুর আচার ব্যবহার সমস্তই ধর্ম্মের অনুকূল। হিন্দুর জন্ম মৃত্যু বিবাহ সমস্তই

ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এমতে হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া উপহাস করা ধৃষ্টতার বিষয় বলিয়া মনে হয়।

এই প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা নহে; স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ইহা হিন্দুর জীবন্ত ধর্ম্ম মূর্ত্তি দর্শন। যেহেতু জীবের শ্রেয় সাধনই পবিত্র সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আর এই প্রতিমা পূজায় সেই শ্রেয় সাধনই সম্যক্ হইতেছে।

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা দাসী।

ভূমিকা।

সংসারী মানবের বিবিধ বিষয়বিষের তীব্রজ্বালা জুড়াইতে সাধু-মহাত্মাদিগের বচন সুধা মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্যকারিণী; তাই আজ কাল দর্শন বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসিদ্ধপুরুষদিগের উক্তি ও উপদেশ শুনিতে সুধী সম্প্রদায় সর্ব্বদা এত উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত। বস্তুতঃ সাধুবচন শ্রবণচিন্তনে প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত আনন্দের উদয় হয় তাহা ভুবনে অতুলনীয়, সে শান্তিসুখ অনির্ব্বচনীয় এবং অনুমান-কল্পনার অতীত। সাধু সমাগম সকলের পক্ষে তাদৃশ সুলভ না হইলেও তাঁহাদিগের বচন-রত্নরাজিতে সকল ভাষারই সাহিত্য সতত সমুজ্জ্বল ও সমলঙ্কৃত রহিয়াছে ও চিরদিন থাকিবে।

অধুনা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী সজ্জনগণের মধ্যে হিন্দী ভাষার প্রতি অনুরাগ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে সে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তবৃন্দ রচিত কতিপয় কবিতা “দোঁহাবলী” নামে খণ্ডাকারে কিছুদিন প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর আজ প্রায় আট বৎসর অতীত

হইতে চলিল কবীরদাসের কতকগুলি দোঁহাও সানুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই অবধি সেরূপ সংগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আর হিন্দী হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ হয় নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ হিন্দী ভাষালোচনে প্রেমিক সাধকগণের বদন-বিনিঃসৃত দোঁহাগুলির ভাষার সৌন্দর্য্য ও সরলতায় এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া বিবিধ হিন্দী গ্রন্থের সারভূত কতকগুলি উচ্চ অঙ্গের কবিতা জন সাধারণে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই "দোঁহামৃতলহরী" সঙ্কলন ও অনুবাদে আমার এই প্রথম প্রবৃত্তি ও প্রয়াস। আশা করি সহৃদয় ও সদাশয় পাঠকবর্গ কোথাও ত্রুটি বা ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করিলে তাহা নিজ কৃপাগুণে সম্পূরণ ও সংশোধন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীগোবিন্দলাল শর্ম্মা।

দোঁহামৃতলহরী।

---

(১)

গঙ্গা গঙ্গা কহত হী নির্ম্মল হোত শরীর।

গান আদি ধ্যায়ে সুযশ নহায়ে রহত ন পীর॥

"গঙ্গা" "গঙ্গা" উচ্চারণ করিবামাত্র শরীর পবিত্র হয়; তাঁহার সুযশ কীর্ত্তন ও চিন্তনাদি করিলে অথবা তাঁহার বিমল সলিলে স্নান করিলে সকল দুঃখ সন্তাপ দূরে পলায়ন করে।

(২)

বিভু ব্যাপক সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আদি পুরুষ ভগবান।

সুর নর মুনিবন্দন করৈঁ তাহি নমি চহ কল্যাণ॥

যিনি বিভু বিশ্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী সকলের প্রভু আদিপুরুষ ভগবান্ সুর-নরমুনিবৃন্দ সকলে যাঁহার বন্দনা করে সেই দেবাদিদেবের চরণে কল্যাণ কামনা করিয়া প্রণাম করিলাম।

(৩)

নয়ন সরোজ সুহাবনে নটবর বেশ অনূপ।
খেলত ব্রজ বনিতান সঙ্গ বন্দত্ঁ শ্যামস্বরূপ॥

সেই সুশোভন সরোজ নয়ন অনুপম নটবরবেশধারী শ্যামকান্তি যিনি সতত ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত লীলা করেন তাঁহার শ্রীচরণ বন্দন করিলাম।

(৪)

মন তন ধন সব বারহুঁ কৃষ্ণ বিহারী কাজ।
রাধাবর দুখ অবশি হর হমরী তুমকো লাজ॥

মন দেহ ধন ঐশ্বর্য্য সকলি সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম ; হে রাধানাথ তুমি অবশ্যই আমার দুঃখ হরণ করিবে, আমার লজ্জা তোমারই।

(৫)

জয় ত যশোদা মাত জিন জায়ে প্রভু সো তনয়।
বংশীধর বিখ্যাত যদুবংশী পাছে ভয়ে॥

যশোদা মাতার জয় হউক যিনি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সম তনয়ের জনয়িত্রী, যে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে বংশীধর পশ্চাৎ যদুবংশতিলক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(৬)

বসহু হমারে হৃদয় মেঁ কোটি তেতিসো দেব।
ইচ্ছা যাহী চিত্তমেঁ সুখ দৈ দুখ হরি লেব॥

তেত্রিশ কোটী দেবতা আমার হৃদয়ে বাস করুন ; চিত্তে এই বাসনা হয় যে তাঁহারা আমার দুঃখ হরণ করিয়া সুখ শান্তি দান করুন।

(৭)

বিঘন হরণ গণরায় মূষক বাহন গজবদন।
গণপতি চরণ মনায় তবৈ কাজ কছু কীজিয়ে॥

সর্ব্ব বিঘ্ন হরণ গণপতি মূষিক বাহন গজেন্দ্রবদন শ্রীগণেশচরণ অগ্রে আরাধনা করিয়া তবে যাহা কিছু কার্য্য থাকে আরম্ভ করিবে।

(৮)

আন না ভাবত স্বাদ ইমি পরোাগহো মুকুন্দ ॥
কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দ কো পিয়ত সদা মকরন্দ ॥

ভৃঙ্গ যেমন অরবিন্দ মধ্যে পতিত হইলে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া জগতে এতাদৃশ মধুরাস্বাদন গ্রহণ অন্য বস্তু আছে বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ যাঁহার মনোভৃঙ্গ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে নিপতিত থাকিয়া তাহার বিমল মধু পান করিতেছে সেই ব্যক্তি জগতে অন্য কোনও বস্তু তাদৃশ মধুর বলিয়া মনে করেন না।

(৯)

মমতা ভ্রমতা কে মিটে উপজে সমতা জ্ঞান।
রমে জো রমতা রাম সোঁ জম তা গহৈ ন মান ॥

যাঁহার মমতা মোহ মিটিয়াছে ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং যে ব্যক্তি আত্মারাম রামের সহিত সর্ব্বদা রমণ করেন, যম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

(১০)

সাধ সক্যো ন তু সাধ সঙ্গ লয়ে ন সক্যো সমাধ।
বিষৈ বিষাদ উপাধি তজ হরি আধ পল অরাধ ॥

তুমি যদি সাধু হইতে না পার তবে সাধু সঙ্গ সেবা করিও, যোগসমাধি শিক্ষা করিতে যদি না সক্ষম হও তাহা হইলে বিষয় বাসনা, বিষাদচিন্তা ও ছলনা পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ পল শ্রীহরির আরাধনা করিও।

(১১)

নিগম রু গীতা নে কহ্যে পর্ম পুনীতা নাম।
বীত্যো জন্ম কুজাতি হৈ ভজলে সীতারাম ॥

নিগম (বেদ) এবং গীতায় এই হরিনাম পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ; জীবন যে ফুরাইয়া যাইতেছে সীতারামের আরাধনা করিয়া লও।

(১২)

মন কী মিটৈ মলীনতা হোয় লীনতা সাথ।
নীকী যহৈ প্রবীনতা ভজিয়ৈ দীননাথ॥

(দীননাথের আরাধনা করিলে) মনের মলীনতা ঘুচিয়া যায় ও যুগপৎ ভগবানের সহিত লয় হয়, ইহাই উৎকৃষ্ট চাতুরি, অতএব দীননাথের আশ্রয় গ্রহণ কর।

(১৩)

জিন পায়ো হরিরস মরম মিটৈ ভরম ভয় দোয়।
গহ্যো ধর্ম্ম অপকর্ম তজ মান পরমগতি হোয়॥

যে ব্যক্তি হরি প্রেমরসের মর্ম্ম বুঝিয়াছে তাহার ভ্রম ও ভয় দুইই মিটিয়াছে ; ধর্ম্ম অবলম্বন কর, অপকর্ম্ম ও অভিমান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে পরমাগতি লাভ হইবে।

(১৪)

সুখকারণ তারণ তরণ বারণ লহ্যো উবার।
কংস পছারণ মান হরি নিরধারণ আধার॥

সেই শ্রীহরি সর্ব্বসুখের কারণ, (ভবসাগরে) নিস্তার নৌকা ; তিনি গজেন্দ্রমোক্ষণকারী, কংসদর্পনিসূদন ; তিনি নিরাধার অথচ নিখিল জগতের আধার।

(১৫)

কাম ক্রোধ লাগী সুরত বহৈ অভাগী জান।
হরি অনুরাগী জাসু মতি সো বড় ভাগীমান॥

যাহার স্মৃতি (মতি) কাম ক্রোধে আসক্ত তাহাকেই ভাগ্যহীন বলিয়া জানিবে ; যাহার মন হরিপ্রেমানুরাগী তাহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মান্য করিও।

[১৬]

সুখদায়ক ভায়ক ভগত উপজায়ক আনন্দ।
তীনলোকনায়ক জপো অঘনায়ক ব্রজচন্দ॥

যিনি সর্ব্বসুখদায়ক, বিশ্বপ্রকাশক, ভক্তহৃদয়ে আনন্দজনক, ত্রিভুবননায়ক ও সর্ব্বপাপনাশক সেই বৃন্দাবন চন্দ্র [শ্রীকৃষ্ণের] নাম সর্ব্বদা জপ কর।

(১৭)

গৌরীপদ নির্ব্বাণ কী গৈঁ জ্ঞান কী গাথ।
আজ্ঞা বেদ পুরাণ কী জপৌ জানকীনাথ॥

ইহাই নির্ব্বাণমুক্তির সোপান, জ্ঞানের পবিত্র সঙ্গীত ও বেদ পুরাণের আদেশ যে সর্ব্বদা জানকী নাথ (শ্রীরামচন্দ্রের) নাম জপ কর।

(১৮)

জপৌ গণেশ সুরেশ সেউ মহেশ মুখ আপ।
আনন্দ দেশ বিদেশ মেঁ হৃষীকেশ কে জাপ॥

গণপতি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর সর্ব্বদা যাহা পঞ্চবদনে জপ করেন সেই হৃষীকেশ নাম জপ দেশবিদেশে (ইহপরলোকে) মানবের আনন্দের সামগ্রী।

(১৯)

ঘনে বাজ গজরাজ হৈঁ সুখকে সনে সমাজ।
বনে বনে কিহি কাজ হৈঁ জোন হেত ব্রজরাজ॥

বহুতর গজরাজ তুরঙ্গম ও সুখরসাভিষিঞ্চিত বিবিধ বিলাস বিষয়াদি বাহ্য আড়ম্বরের আবশ্যক কি যদ্যপি তাহা ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত না হইল।

(২০)

উপজাবন আনন্দ উর পতিত সুপাবন রাম।
আবন জাবন জাত মিট জপ বাবন কো নাম॥

শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বজীবের হৃদয়ের আনন্দবিধানকারী ও তিনি পতিতপাবন; যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে এ ভবে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন মিটিয়া যায় সেই বামন দেবের (শ্রীহরির) নাম সর্ব্বদা জপ কর।

সাধনা।

———:×:———

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মা তারা শক্তিরূপিণী এবং শক্তিস্বরূপা বলিয়াই আমরা মা তারার সম্পূর্ণ অধীন শিশু। আমরা কিছুই করি না এবং কিছু করিতেও পারি না। আমরা যখন আমাদিগকে মা তারার অধীন জীব বলিয়া অবগত হইয়াছি, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকি যেহেতু যন্ত্রণার আতিশয্যই মৃত্যু, মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রনাপ্রদ আর কি হইতে পারে? মৃত্যুকে ভয় করিয়া মা তারার চরণে আমরা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, এজন্য মা আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। জন্মই বল আর মৃত্যুই বল, সবই তাঁহার অধীন। আমরা যখন তাঁহাকে চিনিয়াছি তখন কিছুতেই তিনি আমাদিগকে মৃত্যুরূপ যন্ত্রনায় ফেলিবেন না। সংসারের গর্ভধারীণী মাতা সন্তানকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কি না করিতে পারেন? তিনি মা তারার অধীন জীব বলিয়াই মৃত্যুহস্ত হইতে সন্তানকে রক্ষা করিতে পারেন না। যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকিত তাহাহইলে আর শিশুসন্তান মাতৃক্রোড়ে মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিত না। মা আনন্দময়ী তারা স্বয়ং শক্তিস্বরূপা এবং শক্তিরূপিণী; তিনি অসীমশক্তি। তাঁহার পাদপদ্মে শরণ লইয়া মৃত্যুর ভয় হইতে নিস্তার পাইতে একটু বিলম্ব হইতে পারে যেহেতু মা ভয়পাশ যতদিন ছেদন না করিবেন ততদিন ভয় থাকিবেই থাকিবে। আমরা যখন স্বাধীন জীব নহি তখন ভয়াদি অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন সময়ে মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইলে মা তারাকে ব্যাকুলতার সহিত ডাকিলে তিনি যে ভয় হইতে ত্রাণ করেন ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। যাহারা অল্পজ্ঞ মায়াবাদী তার্কিক এবং প্রকৃত মূলতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম তাহারাই উপাসনা, আরাধনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিপদে পতিত হইলে কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব হইতে যে বিপদ হইতে সময়ে সময়ে মুক্তি লাভ করা

যায় ইহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন। ! [illegible] কোন স্থানে [illegible] মায়াবাদী তার্কিক একজন একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; তখন [illegible] স্থানে তাঁহার যদি বন্ধু বান্ধবগণ থাকেন তাহাহইলে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে তিনি বিরত থাকিবেন না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে; [illegible] বন্ধু বান্ধবগণের শরীর যে প্রতিবিম্ব এবং মায়ামূলক এরূপ জ্ঞানসত্ত্বে [illegible] দস্যু হস্ত হইতে নিস্তারার্থ বন্ধু বান্ধবগণকে ডাকিতে প্রস্তুত, [illegible] পরমমাতাকে ব্যাকুলতার সহিত ডাকিলে তিনি যে বিপদ হইতে [illegible] করিয়া থাকেন, ইহা অল্পজ্ঞান ও অজ্ঞানতাবশতঃই অস্বীকার করিবেন। [illegible] তাহার মায়াবাদ! জগৎ মায়িক হইলেও, আমরাও মায়িক জীব এবং মায়িক মাতার অধীন। মায়িক জীবের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথ আছে কি? কেবল মায়া, মায়া, করিলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। মহামায়া জগজ্জননী মাতারার উপর নির্ভর করিলে এবং তত্ত্বত তাঁহাকে জানিলে কাহার ভয়? মাতারার ইচ্ছায় গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে যখন আমরা মাতারাকে চিনিয়াছি তখন কোন না কোন সময়ে আমরা মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্ত হইব। "মৃত্যু" শব্দে আমরা বুঝি? স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক আতিবাহিক দেহে জীবের অহংকারপতনই মৃত্যু।

ক্রমশঃ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

একটি অদ্ভুত গল্প।

(সত্যমূলক ঘটনাবলম্বনে লিখিত।)

[illegible] দিন হইতে আমি একটা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বিস্তর যন্ত্রণা ভোগের পর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজহাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়া পড়ি; তখনও কিন্তু রোগটী সাংঘাতিক হইয়া উঠে নাই। দিনাজপুরের অন্তঃপাতী কোন একটী গণ্ডগ্রাম—আমার জন্মস্থান; রোগাক্রান্ত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি কোন একটী ছাত্রনিবাসে থাকিয়া

সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা খ্যাতনামা কোন এক ইংরাজ কোম্পানীর নৌ বিভাগের ডাক্তার, তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগই জলযানে অতিবাহিত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারাই আমাদিগের সংসার যাত্রা ও আমার পঠন ব্যয় কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। একদা আহারান্তে যেমন গাত্রোত্থান করিব অমনি মস্তক ঘূর্ণিত হইল, জগৎ অন্ধকার দেখিলাম, শ্বাসরোধ হইয়া আসিল, (মনে মনে 'ধর' বলিয়া) বসিয়া পড়িলাম। অবিলম্বে ডাক্তার আনা হইল, ষ্টেথসকোপ যোগে বক্ষঃ পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ পরীক্ষিত হইল, সতীশ বাবু দ্বারা রোগের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিবৃত হইল। ডাক্তার বাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন "রোগ শক্ত কিন্তু সাংঘাতিক নয়, এ রোগের বিষয় আমরা পড়েছিলুম মাত্র, কিন্তু চক্ষে এই প্রথম দেখলুম" এবং একটু পরেই ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "শিশি লইয়া আসুন দেরী করিবেন না" বলিয়া নামিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহার দ্বারা ও অন্যান্য চিকিৎসকের দ্বারা এ যাবৎ চিকিৎসিত হইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু কোনরূপ সুফল দেখিতে না পাওয়ায় ডাক্তার বাবুই আমাকে হাঁসপাতালে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করি। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালবাসী জীবগণের সহিত আমার জীবনেরও তিনটী দিন এইরূপে কাটিয়া গেল; চতুর্থ দিন প্রাতে ডাক্তার বিঃ আসিয়া রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক বলিলেন "অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক" কিন্তু রোগটী তাহার নূতন বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি খ্যাত নামা ডাক্তার সিঃর পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন; পরিশেষে অস্ত্র চিকিৎসাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। "কল্য প্রাতে তোমার অস্ত্রচিকিৎসা হইবে" বলিয়া আমাকে রাত্রে অনাহারে থাকিবার আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। শিশুকাল হইতে আমার অকুতোসাহস থাকায় অস্ত্রচিকিৎসার ভয়ে অভিভূত না হইয়া পরম দেবতা পিতৃদেবের অলৌকিক সাহস ও লোকোত্তর সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক অস্ত্রচিকিৎসার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম। এদিকে প্রিয় বন্ধু সতীশ বাবু ছাত্র নিবাস হইতে যথাকালে আমার পথ্য সামগ্রী লইয়া হাঁসপাতালে উপনীত হইলেন এবং আমিও অনতিবিলম্বে সতীশ বাবুর

হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে খাটিয়া হইতে অবতরণ করিলাম, সতীশ বাবু আমার চিত্ত বিনোদনার্থে নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন, হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি ক্রমে আমিও আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক পাঠিকাগণ, অপনাদিগকে আমার প্রিয় বন্ধু সতীশ বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সতীশ বাবু আদর্শ মানব। স্বার্থের পূতিগন্ধে তাঁহার পবিত্র করুণা কলুষিত হইত না। সঙ্কীর্ণতার অপবিত্র গণ্ডী মধ্যে তাঁহার উদারতা আবদ্ধ থাকিত না। সংশয় কালিমা তাঁহার বিশ্বাস জ্যোতির সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। ভাবিয়াছিলাম অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে সতীশ বাবুকে এবং জনক জননীকে এসংবাদ কিছুতেই জানিতে দিব না। যথাকালে আমার ভোজন শেষ হইল, হাতমুখ ধুইয়া সতীশ বাবুর বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক অতি সাবধানে খাটিয়ায় উঠিয়া বসিলাম, সতীশ বাবু যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। আমার পৃষ্ঠের উপর বাম হস্ত অর্পণ করিয়া সস্নেহে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখিস্ ভাই যেন পর মনে করে আমার কাছে কোনরূপ অভাব গোপন করিস্‌নে— আমি যে তোর বন্ধু আমি যে তোর আপনার আমি যে তোর মা" বলিতে বলিতে সতীশ বাবুর ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়ন প্রান্তে দুটি বিন্দু অশ্রু দেখাদিল, পৃষ্ঠস্থ হস্তখানি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল তিনি নীরবে, অবনতমুখে আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। সেই আরক্তিম ওষ্ঠাধরের মৃদুল-কম্পন-তরঙ্গ আয়ত লোচন প্রান্ত সমুদিত অশ্রু বিন্দু যুগল, নিমেষমাত্রে আমার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া ফেলিল, দৃঢ় সংকল্প বিচলিত হইল, নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলাম, "ভাই তুমি দেবতা - আমর অপরাধ মার্জ্জনা কর, কল্য প্রাতে অস্ত্রচিকিৎসা হইবে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক একথা তোমার নিকট গোপন রাখিবার সংকল্প করিয়া ছিলাম— তুমি আমার দেবতা; তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার মা—তুমি আমার পাষাণ হৃদয় ভাঙ্গিয়াছ, এখন আপনার মনের মত করিয়া গড়িয়া লও, আমার সকল সাধ পূর্ণ হউক—আজ অবধি আমি তোমার হইলাম"। সতীশ বাবু এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিলেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন "আমি তোমার পিতা মাতাকে তার যোগে এই

সংবাদ দিয়া এখানে ফিরিয়া আসিতেছি" [এখন আমার আর নিষেধ করিতে ইচ্ছা হইল না] আমি বলিলাম " যাও " । তিনি নামিয়া গেলেন, আমিও বালিশে মুখ লুকাইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। সতীশ বাবু তারে খবর দিয়া অনতিবিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন এবং হঠাৎ আমার মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন "অমুক তুমি কি কাঁদছিলে" ? "আমি ত ভাই তোমার চক্ষে কখনও জল দেখিনি—তুমি যে ভাই প্রকৃত বীর পুরুষ, তুমি যে ভাই জিতেন্দ্রিয়, আমি যে তাই মনে মনে তোমার বীর ধর্ম্মের পূজা করি কে তাহাকে বিচলিত করিল ভাই ? হরি! হরি! যাক্ ও সব কথা ভুলিয়া যাও, এখন আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি ?" আমি বলিলাম "নিশ্চয়" তখন তিনি পকেট হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া প্রফুল্ল বদনে আমার হাতে দিয়া বলিলেন " আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম তুমি এই বই খানি তোমার Philosophy অপেক্ষা কম আদরের সামগ্রী মনে করিও না ভাল করিয়া পড়িও" বলিয়া প্রস্থান করিলেন ; তাঁহার প্রস্থানে আমি বড়ই অধির হইয়া পড়িলাম এবং ক্ষণকাল পরেই তাঁহার প্রদত্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা খানি আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল অস্ত্র প্রয়োগ জন্য যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইল। ডাক্তার সাহেব আমাকে রাত্রে উপবাস দিতে বলিয়া ছিলেন কারণ অনাহারে থাকিলে ক্লোরাফরমের ক্রিয়া উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। একেবারে অনাহারে থাকিলে পাছে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এই আশঙ্কায় একটু দুগ্ধ ও একটী বেদানা খাইলাম; এবং গীতা খানি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল, সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইল, বিষম শীত, উত্তর দিক হইতে হু হু শব্দে বায়ু বহিতেছে, ঘোর কুজ্ঝটিকা জালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, প্রভাত রবির সুকোমল রশ্মি নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিতে পারিতেছে না, প্রকৃতির এইরূপ বিকৃতি, দেখিয়া মনটাও যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়িল ; ক্রমে ক্রমে কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইয়া গেল, প্রভাত রবির মরীচি মালায় অভিষিক্ত হইয়া জগৎ হাসিয়া উঠিল, কুজ্ঝটিকার সহিত চিত্তের বিষণ্ণতাও ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

এখন বেলা প্রায় ৭॥ টা, ডাক্তার বিঃ ও সিঃ উভয়েই আমার গৃহে প্রবেশ

করিলেন এবং আমার সহিত দুই চারিটী কথার আদান প্রদান করিয়া আমার দেহ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি পরিক্ষা করিলে তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হইল পরীক্ষা সন্তোষ জনক হইয়াছে।

ডাক্তার বিঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে আমাকে নীচে অস্ত্র চিকিৎসার ঘরে লইয়া যাইবার হুকুম দিয়া ডাক্তার সিঃ র সহিত বাহির হইয়া গেলেন। হঠাৎ আমার চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়িল; অনিশ্চিত অজ্ঞাত পরলোক প্রাপ্ত অপেক্ষা পরিচিত জগতে থাকিয়া যন্ত্রনা ভোগ করাই ভাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল অকস্মাৎ সতিশ বাবুর স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় সাহসে বুক বাঁধিয়া বল পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম। অর্দ্ধ ঘটিকা মধ্যে আমাকে নিচের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল; অবিলম্বে একটী সহকারী ডাক্তার আসিয়া ঘড়ি ধরিয়া আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে মিনিটে উহা শতাধিক বার স্পন্দিত হইতেছে; "চিন্তা কি আমি তোমার চঞ্চলতা নিবারণের ঔষধ দিতেছি" বলিয়া ডাক্তার বাবু হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দিয়া আমার বাহুতে অহিফেনবীর্য্য প্রয়োগ করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, চিত্তচাঞ্চল্য মন্দীভূত হইয়া আসিল, অস্ত্র প্রয়োগের কথা বিস্মৃত হইলাম, যেন কোন সূক্ষ্ম জগৎ অভিমুখে গমন করিতেছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ অদূরবর্ত্তী পদ শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল, চাহিতে যাই, চাহিতে পারি না, একবার, দুইবার, তিনবার, চেষ্টার পর যাই চাহিলাম, অমনি অলস-বিহ্বল অর্দ্ধোন্মুক্ত নেত্রে তিনটি সাহেব মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া পড়িল; তন্মধ্যে একটি অতি নিকটে, অপর দুইটী অনতিদূরে দণ্ডায়মান। নিকটস্থ ডাক্তার সাহেবের, সবল শিরাময় রক্ত বর্ণ হস্তদ্বয় কফোনির উর্দ্ধদেশ ব্যাপিয়া উন্মুক্ত রহিয়াছে, ব্রণ কলঙ্কিত, তাম্রবর্ণ মুখ মণ্ডল হইতে মার্জ্জারাক্ষি বিনিঃসৃত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সংহার লোলুপ মশানচারী জহ্লাদ আমার বিনাশ বাসনায় যেন উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে—মর্ফিয়ার অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে এই প্রকার নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল; এমন সময় আবার অদূরে পদ শব্দ শুনিতে পাইলাম চাহিয়া দেখি দুইটী দাই ও দুইটী সহকারী ডাক্তার আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহারা একত্র হইয়া (বোধ করি আমার অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে) কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এখন আমার বেশ

জ্ঞান হইয়াছে, যন্ত্রনারও অনেকটা উপশম হইয়াছে। সহকারী ডাক্তার দুইটী আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "আসুন আপনাকে টেবিলের উপর শয়ন করাই' তাঁহাদের সাহায্যে অতি সহজেই টেবিলের উপর শায়িত হইলাম। ডাক্তার বাবু আমার নাড়ী ধরিয়া, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস করিতে বলিয়া, ক্লোরাফরম প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নাসিকার উপর সজোরে আঘাত করিলে লোকে যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, কিয়ৎক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাসের পর, আমিও প্রায় সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলাম ক্রমে আমার চিত্ত পরিস্কার হইতে লাগিল,ক্লোরাফর্মাদির দুর্গন্ধ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল এবং উহা আমার সর্ব্ব শরীরে ও মস্তিস্কে প্রবিষ্ট হইয়া বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল ; চিন্তাশক্তি যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া মস্তিস্ক মধ্যে সর্ষপ প্রমাণ অতিক্ষুদ্রায়তন স্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়িল তখন বোধ হইতে লাগিল কে যেন কথা কহিতেছে, বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, পরক্ষণেই একটু জ্ঞান হইল, বুঝিলাম আমিই কথা কহিতেছিলাম ডাক্তার বাবু আমাকে ঘুমাইতে বলিয়া পুনরায় ক্লোরাফরম প্রয়োগ করিলেন এবং আমিও একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

আমার অজ্ঞানবস্থার পর হইতে পুনরায় জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কতখানি সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করা সহজ নহে। আবার ক্রমশঃ চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল, যেন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ঘোর ভাঙ্গে নাই বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, পরে ঘোর টুকুও কাটিয়া গেল ; শরীর, খুব হাল্কা বোধ হইল, চক্ষু কর্ণ, বাহ্যবিষয় গ্রহণে অসমর্থ হইল, সুতরাং মন ও অন্তর্ম্মুখীন্ হইয়া পড়িল ; এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর, পুনরায় আশ্চর্য্যরূপ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল এবং একটি অচিন্তিতপূর্ব্ব, অদ্ভূত, বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। অস্ত্র চিকিৎসার্থে যে গৃহে আমি আনীত হইয়াছি সেই গৃহ, সেই সকল ডাক্তার ও সহকারী ডাক্তারগণ, সেই সকল অস্ত্র শাস্ত্র, এক কথায় যেখানে যাহা ছিল ঠিক তাহাই রহিয়াছে, কেবলমাত্র যে টেবিলে আমি শুইয়াছিলাম এখন তথায় আমার পরিবর্ত্তে আমার অপরিচিত অন্য একটি লোক শায়িত রহিয়াছে, যেন ভয় ও যন্ত্রণায় বেচারার মুখ খানি শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার করুণার উদয় হইল, উর্দ্ধদেশ হইতে অবিচলিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, বোধ হইল যেন পূর্ব্বে তাহাকে কোথাও দেখিয়াছি ; হঠাৎ ভয়ের সঞ্চার হইল, মনের অবস্থান্তর ঘটিল, পরক্ষণেই দেখি যে আমিই টেবিলের উপর শুইয়া রহিয়াছি, এতক্ষণ যাহাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিতেছিলাম তাহা ভ্রম। ডাক্তার সাহেব বাম হস্তের দ্বারা আমার বাম পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ফর্সেপ (চিমটা) গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তাঁহার সহকারী ডাক্তারবাবু ক্লোরাফরম ফেলিয়া দিয়া বিষণ্নমুখে পার্শ্বস্থ ডাক্তারকে কি

বলিতেছেন ; তুলা ওজন মাত্র হস্তে দুই জন দাই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চিত্র পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ডাক্তার ডি: "বলিতেছেন হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে—বড়ই দুঃখের বিষয় এরূপ অবস্থা কিন্তু হাজারের মধ্যে একটা।" দেহটা পূর্ব্বের মত স্থির ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, দক্ষিণ পার্শ্বে একটা গভীর ক্ষত বিস্ফারিত হইয়া রহিয়াছে, শোণিতপাত নিবারণ জন্য, কর্ত্তিত ধমনী মুখ, তখনও পর্য্যন্ত ফর্সেপ দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে ; ক্ষতস্থান হইতে নিষ্কাশিত কয়েক খণ্ড ক্ষুদ্রাস্থি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর পতিত রহিয়াছে. বিছানার চাদর স্থানে স্থানে রক্ত বিন্দুতে রঞ্জিত হইয়াছে ; এইরূপ দেখিতেছি মাত্র, মনে মনে কোন রূপ সংকল্প, কোনরূপ বিচার বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারিতেছি না—এইরূপ অবস্থা ঘটিল ; পরক্ষণেই একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম ; কিয়ৎক্ষণ পরেই, চেতনার সঞ্চার হইল, (এই জ্ঞান ও অজ্ঞানবস্থার ব্যবধান কালে যে কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই) পরক্ষণেই বাস্তবিক ঘটনাটী স্মৃতি পথে উদিত হইল. বুঝিলাম—ক্লোরোফরম অবস্থায় আমার মৃত্যু হইয়াছে ; সম্মুখে যে দেহটী পড়িয়া রহিয়াছে উহা আমার মৃত দেহ ; যাহাকে এ যাবৎ আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা আমি নহে—আমার জীবিত অবস্থায়—আমি যে দেহ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস আমার ছিল না, এখন এইরূপ আশাতীত অভাবিত জ্ঞান লাভে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রত্নকণিকা।

দেহের অবসান হইলেও তৃষ্ণার অবসান হয় না। মন অপবিত্র থাকিলে কোন ক্রমেই তৃষ্ণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। যাঁহার কোনও বিষয়ের তৃষ্ণা বা আকাঙ্খা নাই তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ।

যিনি ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ তিনি ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অধীর অপেক্ষা ধীর, নির্দ্দয় অপেক্ষা দয়ালু এবং অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

অপরের নিকট মন্দ ব্যবহার পাইয়া তাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করা উচিত নহে। কেহ তোমাকে বৃথা উত্যক্ত করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকাই

কর্ত্তব্য। ক্রোধ দমন করিতে পারিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, পক্ষান্তরে ক্রোধের বশীভূত হইলে সঞ্চিত পুণ্যেরও ক্ষয় হয়। শারীরিক ক্লেশ, রূঢ়বাক্য এমন কি অহিতজনক চিন্তার দ্বারাও শত্রু দমন করিতে চেষ্টা করিও না। যাহাতে কাহারও মনকষ্ট হয় এরূপ রূঢ়কথা কখনই মুখ হইতে বাহির করিও না। যিনি নিষ্ঠুর, কঠিন এবং কণ্টকের ন্যায় ক্লেশদায়ক পরুষ বাক্য উচ্চারণ করেন তিনি বড়ই দুর্ভাগা।

দুষ্ট লোকের কুবাক্য শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করাই উচিত।

কুবাক্য তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় মনুষ্য অন্তঃতলে প্রবেশ করিয়া দিবারাত্র ক্লেশ দান করে। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই শত্রুর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না।

ত্রিজগতে, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সুকথার ন্যায় আর ভগবানের পূজার উপকরণ নাই। অতএব সর্ব্বদা সুকথা কহিবে কখনও কুবাক্য মুখে আনিও না। শ্রদ্ধাস্পদকে শ্রদ্ধা দিতে বিরত থাকিও না। সর্ব্বদাই দান কর, ভিক্ষা করিও না।

জ্ঞানীগণ বলেন স্বর্গের নিম্নলিখিত সাতটী প্রবেশ পথ। ধ্যান, দয়া, ধৈর্য্য আত্মদমন, সরলতা সাধুতা এবং সর্ব্বজীবে অহিংসা। জ্ঞানীগণ আরও বলেন যে বৃথা গর্ব্ব বা অহঙ্কারের দ্বারা এই সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

হোম, মৌনব্রত, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত ভয়ের বিনাশ হয়। কিন্তু অহঙ্কারের সহিত এই সকল কার্য্য করিলে উহারাই ভয়ের কারণ হইয়া উঠে।

ইষ্ট লাভ হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া কিম্বা অনিষ্ট হইলে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে।

আমি এরূপ দান করিয়াছি, এরূপ যজ্ঞ করিয়াছি, এরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি ইত্যাদি রূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিলে সমূহ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। সকলেরই এইরূপ গর্ব্ব পরিহার করা কর্ত্তব্য।

যে সকল সংযমী মহাপুরুষ সেই ধ্যানগম্য সচ্চিদানন্দময়কে একমাত্র আশ্রয় স্থান বলিয়া জানেন তাঁহারাই ধন্য। পরাৎপর পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহারা ইহকাল ও পরকালে পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।
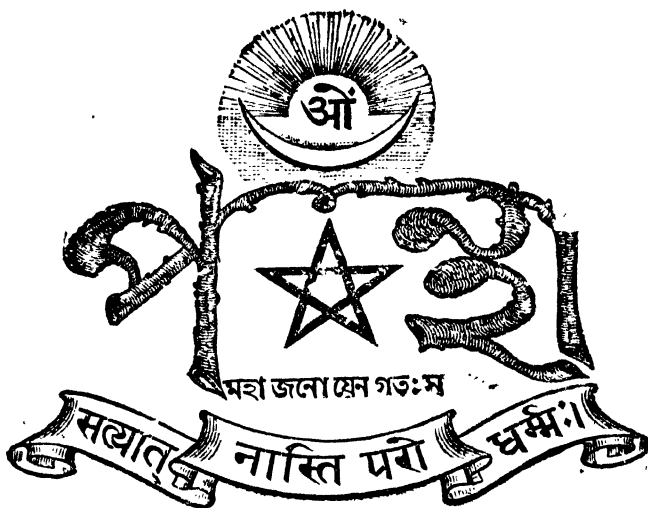
৪র্থ ভাগ। { মাঘ ১৩০৭ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

প্রাতঃস্মরণাষ্টকং।

(১)

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥

শিরে শুভ্র সহস্রার সরোজ আসন
তদুপরি শান্তমূর্ত্তি প্রসন্ন বদন,
দ্বিনেত্র দ্বিভুজ ধ্যান কর গুরুদেবে
প্রভাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে॥ ১॥

(২)

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি রবি শশধর
ভূমিসুত বুধ গুরু শুক্র শনৈশ্চর,
রাহু কেতু আদি যত গ্রহদেব আর
সবে মিলে সুপ্রভাত করুন আমার॥ ২॥

(৩)

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

প্রত্যহ প্রভাতে উঠে যে করে স্মরণ
দুর্গা দুর্গা দু'অক্ষর দুর্গতিনাশন,
আপদ্ বিপদ দুঃখ দূরে যায় তার,
অরুণ উদয়ে যথা যায় অন্ধকার॥ ৩॥

(৪)

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী,
অতি ভাগ্যবতী ভবে এই পাঁচ নারী।
ইহাঁদের নাম মহাপাতক নাশন,
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করিবে স্মরণ॥ ৪॥

(৫)

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

নিরমল পুণ্যকীর্ত্তি নল নরপতি,
পবিত্রচরিত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমতি,
জনক দুহিতা সীতা আর জনার্দ্দন
প্রভাতে এঁদের নাম করিবে স্মরণ ॥ ৫ ॥

(৬)

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেবঃ
শ্রীকান্ত বিষ্ণো র্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রামনুবর্ত্তায়ষ্যে ॥

হে নাথ! চৈতন্যময় প্রভু প্রাণেশ্বর,
লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন জগতঈশ্বর।
তোমারি আদেশ শিরে করিয়া ধারণ
প্রাতঃকালে উঠি তব প্রীতির কারণ,
প্রবেশ করিনু আমি সংসার যাত্রায়
ভক্তি ভরে মনে মনে স্মরিয়া তোমায় ॥ ৬ ॥

(৭)

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবিত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

ধর্ম্ম জানি আমি কিন্তু নাহি তাহে মতি
অধর্ম্মও জানি তাতে না হয় বিরতি,
হৃষীকেশ তুমি হৃদে থেকে অন্তর্যামী
যেরূপ করাও করি সেইরূপ আমি॥

(৮)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বামুস্মৃতিপ্রমাদাৎ।

করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

দেহ আত্মা মনো বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বচনে
স্বভাব সংস্কার বশে অথবা অজ্ঞানে,
সকল করম আমি যা করি যখন
পরব্রহ্ম নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ৮ ॥
ইতি প্রাতঃস্মরণাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবের সপ্তরূপ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পঞ্চম রূপ।

মনস-রূপ।

অন্তর্মুখী মন (Lower Manas) ও বহির্মুখী মনে (কাম মনসে) প্রভেদ। ইহারা এক নহে, পরস্পর বিভিন্ন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্তর্মুখী মন (Lower Manas), অহঙ্কারের (Higher Manasএর) একটী রশ্মিকণা বা অংশকণা বা অংশবিশেষ। ইহা শুদ্ধ, নিত্য বলিয়া স্থূলদেহে স্থূল পরমাণু সহযোগে কার্য্য করিতে অসমর্থ, কাজেই অহংকার (Higher Manas) তাহার অংশ বিশেষকে অধোদিগে প্রেরণ করেন ; উক্ত অংশ ভুবর্লোকে (astral worldএ) উপস্থিত হইয়া স্থূলদেহে কার্য্যক্ষম হইবার আশয়ে সূক্ষ্মভূতে (astral matterএ) জড়িত ও আবৃত হয় ; তৎপর মাতৃগর্ভে ভ্রূণের শরীরে প্রবেশ করিয়া কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাহার বোধ শক্তি রূপে পরিণত হয়। অংশ রূপে অহঙ্কার (Higher Manas)

হইতে বাহির হইয়া সূক্ষ্মভূতে আবৃত হওয়ার পর এবং কামের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনসের ঐ অংশ টুকের যে অবস্থা তাহাকেই অন্তর্মুখী মন (Lower Manas) কহে। কামের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে পর তবে তাহাকে কাম-মনস্ কহে। এই কাম মনসই আমাদের মস্তিষ্কে এবং স্নায়ু মণ্ডলে ক্রিয়া করাতে আমাদের অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির উদ্রেক হয় এবং শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাইলে তদ্দ্বারা দুঃখানুভব এবং কোমল বস্তুর সংস্পর্শে আমাদের সুখানুভব হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ এক জীবনে জীবনান্তরের কথা স্মরণ থাকে না; প্রত্যেক জীবনের ঘটনাবলী মনসে সঞ্চিত হইয়া থাকে। মানুষ মনস্তত্ত্বে উন্নীত হইতে পারিলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কথা ও ঘটনাবলী স্মৃতিপথারূঢ় হয়। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ, এবং সুচিন্তা ও সৎকার্য্য দ্বারা মন পবিত্র ও নির্ম্মল হইলেই ক্রমশঃ অধ্যাত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া শেষে প্রজ্ঞা খুলিয়া গেলেই মনস্তত্ত্বে উপনীত হওয়া গেল বলা যায়। অন্তর্মুখী মন (Lower Manas) এবং অহংকার (Higher Manas) এই উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ একটী সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ-তন্তু রহিয়াছে; উক্ত তন্তু অবলম্বনে যে জীব প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান দ্বারা তন্ময়ভাবাপন্ন হইয়া উক্ত সেতুমার্গে গমনাগমন করিতে শিখেন, তিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। রক্তমাংসময়, এই দেহকারাগারে আবদ্ধ হইয়া কেবল এই জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বনে অন্তর্মুখী মন বা সংকল্প হইতে অহঙ্কারতত্ত্বে পঁহুছিলেই গতজীবনের ঘটনাবলী স্মরণ পথে পতিত হইয়া থাকে।

অন্তর্মুখী মন দেহে কার্য্য করিতে আসিয়া বাসনায় উত্তেজিত হইয়া স্থূল পার্থিব পদার্থের সঙ্গে এরূপ বিজড়িত হইয়া যায় যে, ইহা তাহার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মোহাভিভূত হয়। তখন ইহা অসত্যকে সত্য, বিনশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুরকে অবিনশ্বর ও স্থায়ী ভাবিয়া আত্মহারা হয়; ইহাকেই বলে মহামায়ার মায়া। বাসনাজাত কামকে পরাজিত করিয়া এই মোহিনী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় স্বীয় নির্ম্মল স্বরূপ লাভ করিয়া অহঙ্কারের সঙ্গে মিলিত হওয়াই অন্তর্মুখী মনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করাই তাহার একমাত্র কার্য্য।

জীব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াই জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়; এক দিগে কামের জ্বালায় অস্থির, বাসনার মোহজালে জড়িত, অপরদিগে পবিত্র

স্বর্গরাজ্যের আকর্ষণ, স্বর্গরাজ্যাভিমুখে উর্দ্ধদিগে প্রয়াণ করিতে প্রয়াসী; কিন্তু বিষম অন্তরায় বাসনা, উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম। বনবাসকালে শ্রীরামমহিষী সীতাদেবীকে লঙ্কাধিপ রাবণ হরণ করিয়া লইয়া চলিলে তাঁহাকে উদ্ধার করার মানসে কেবল পক্ষরূপ অস্ত্রের সাহায্যমাত্র অবলম্বনে পক্ষিরাজ জটায়ু যেরূপ অসমসাহসের ও অসীম বিক্রমের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত দশানন সহ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রামের পর পরাস্ত হইয়া ছিন্নপক্ষ, ভিন্নচঞ্চু, রুধিরসিক্ত কলেবরে ভূপতিত হওতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জীববিহঙ্গ নিজকে উদ্ধার করিয়া উর্দ্ধাভিমুখে স্বীয় উৎপত্তি স্থানে গমনের প্রয়াস পাইলে পথে কামরূপ দশানন আসিয়া প্রতিবন্ধক জন্মায় এবং উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের পর শেষে এই দুরাসদ শত্রুর হস্তে জীব পরাভূত হইয়া ধরাশায়ী হয়। এইরূপে, জীব যতবার উর্দ্ধগামী হইতে চেষ্টা করে, ততবারই তাহাকে মায়াবী রাক্ষসস্বরূপ বাসনার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ইহারই ফলে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে থাকে।

এক জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ পোনর শত বৎসর অতিবাহিত হয়।

কাম মানসিক দেহ (Astral body) ও মায়াবী-রূপ (Assumed Manasic Body of the Adepts) সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

কাম মানসিক দেহ সূক্ষ্ম কামজগতের সূক্ষ্ম উপাদানে (astral matter দ্বারা) গঠিত। জীবিতাবস্থায় সাধকেরা স্বেচ্ছায় এই কাম মানসিকদেহ স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া বাহির করিতে পারেন। ইহার চিন্তা ও বোধ শক্তি আছে। ইহা অনেক দূরে গমনাগমন করিয়া যে সকল সংস্কার সংগ্রহ করে, তাহা সাধকের মস্তিষ্কে আরোপ করিয়া পরে স্মৃতিপথারূঢ় করিতে পারে। স্বপ্ন বা তন্দ্রাবস্থায় সময় সময় কাহারও কাহারও কাম মানসিক দেহ বাহির হইয়া দূর দেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বা তন্দ্রা অপনোদিত হইলে অনভ্যস্ত গতিকে তাহারা সংস্কার সমূহ স্মরণ করিতে অসমর্থ হয়।

দূরদেশে বা যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আত্মীয় যদি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এই সময়ে যদি মৃত ব্যক্তির আসক্তি বা প্রণয় বিশেষ বলবতী থাকে এবং

তবে মুমূর্ষু ব্যক্তি কামমানসিক দেহে সেই আত্মীয়কে দেখা দিয়া থাকেন। কোন গুহ্য বিষয় বলিবার জন্য যদি সেই সময় তাহার মনে উৎকণ্ঠা থাকে, বাহেন্দ্রিয় ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই কামমানসিকরূপ স্থূল দেহ হইতে এইরূপে বাহির হইয়া দূর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়।

মায়াবি-রূপ উচ্চ সাধক ভিন্ন কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা উৰ্দ্ধ লোকের অতি স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম উপাদানে সাধকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে গঠন ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। উক্ত রূপ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় দেহেরই যে প্রতিরূপ হইবে, এমন কিছু নহে। তাঁহারা যখন যে রূপে কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেইরূপ ধারণ করিয়া অপরের নয়নগোচর হইতে পারেন। এই মায়াবী-রূপে সাধক অনায়াসে যথা তথা পরিভ্রমণ করিয়া যখন তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতে পারেন। * সমগ্র ঐশ্বর্য্যশা মহাপুরুষও অন্যান্য উত্তমাধিকারী সাধক ব্যতীত এবং অপর সাধকের পক্ষে সদ্‌গুরূপদেশ ব্যতীত এইরূপ মায়াবী-দেহ ধারণ করিতে অন্য কেহ সক্ষম নহেন।

ক্রম পরিণতিতে মানবজাতি বর্ত্তমান যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে স্থূলজগতে মনস্‌ কদাচিৎ প্রকাশমান হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় কেহ কেহ দৈবাৎ তাহার ক্ষীণালোক সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অন্তর্ম্মুখী মন মনসের অংশবিশেষ হইলেও স্থূলদেহের সংযোগে ইহা নিতান্ত সঙ্কুচিত ও সংবদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ইহার বিদ্যমানতার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

স্বাধীনেচ্ছা প্রকৃত পক্ষে মনসেই বিরাজিত। দেহধারী জীবের অন্তর্ম্মুখী মনেই ইহা অবস্থিত; এই অন্তর্ম্মুখী মন মনসের অংশ; আবার মনস্তত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মনস্‌ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের অংশমাত্র। বাসনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেমন আমরা মনসের সঙ্গে একীভূত হই, অমনি কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু আমাদের পদানত ও বশীভূত হইয়া যায়; তখনই আমরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হই। নতুবা আপামর সাধারণ মানবগণ কথিত ষড়রিপুর দাস হইয়া নিতান্ত ঘৃণিত জঘন্য পশু জীবন যাপন করিয়া থাকে। যে বাসনার দাস,

---

* এ সম্বন্ধে ছেলেবেলার পাঠ্য "শিশুবোধক" নামক পুস্তকের "দাতাকর্ণ" প্রবন্ধের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বিষয়টি উল্লেখ যোগ্য। এই মায়াবী-রূপ ধারণের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারতাদিতে আছে।

[illegible] বশীভূত, সে কিরূপে [illegible] ([illegible]) [illegible] করিতে সমর্থ হইতে পারে? তবে লোক যে অনবরত "স্বাধীন" "স্বাধীন" "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া চিৎকার এবং তর্জন গর্জন করে, তাহারা যে নিতান্ত অন্তঃসারবিহীন ও উপহাসের অথচ দয়ার পাত্র তাহাতে [illegible] সন্দেহ নাই। যিনি প্রকৃতির (স্বভাবের) নিয়ম জ্ঞাত থাকিয়া, সেই নিয়মের অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করেন, তিনি অচিরেই বাসনার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইতে পারেন। যিনি বাসনামুক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, তিনিই প্রকৃত স্বাধীন! ইহা ব্যতীত যথেচ্ছাচারীদিগকে কিরূপে স্বাধীন বলা যাইতে পারে? অধিকন্তু যথেচ্ছাচারিগণ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার প্রতিফল স্বরূপ পরিণামে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

মনসের মধ্যে অপর এক বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, তাহাকে ক্রিয়া-শক্তি কহে। যাহারা মনসের সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন, তাহারা নিজ ক্রিয়া-শক্তি বা ইচ্ছাশক্তির বলে মানসিক চিন্তা ও ভাবনাবিশেষকে অবয়ববিশিষ্ট করিয়া বাহ্য জগতে প্রকাশ করিতে পারেন। অর্থাৎ, কোনও এক বিষয়ের চিন্তায় মনকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করিলে সেই চিন্তাটী স্থূল জগতে একটী নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞানও এই মনস্তত্ত্বেই সমাহিত থাকে। এই জ্ঞানবলে গতজীবনের ও ভবিষ্যজ্জীবনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রকৃত ধীশক্তি, প্রতিভা, প্রজ্ঞা (Intuition) এবং বিবেকবাণী (Voice of the Conscience) এই মনসে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক ব্যক্তিগণ যে "বিবেকবাণী" "বিবেকবাণী" বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া থাকে, তাহা কেবল অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় নিতান্ত অলীক। কঠোর সাধন ও আত্ম সংযম বলে দেহ, মন, আত্মা পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইলে পর যখন মনস্তত্ত্বের সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সঙ্গে একাত্মভাব জ্ঞান জন্মে, তখনই বিবেকবাণীলাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সচরাচর যে বিবেকবাণীর কথা কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তাহা ভ্রান্ত মনের অলীক কল্পনা মাত্র, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যুক্তি, তর্ক, মীমাংসা ও বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ বস্তু দর্শনে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সত্তা অনুমান করা জ্ঞানাদি ও মনসের কার্য্য। মনের উৎকর্ষলাভ করা চাই। সংসারের কোলাহল হইতে একান্তে, দূরে গিয়া শান্তভাবে উপবেশন করতঃ একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানযোগে মনকে প্রকৃতিস্থ ও

নিশ্চল করিয়া যখন এই বাহ্যজগতের যাবদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে মন সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ও বিযুক্ত হয়, তখন মনের এই অনির্ব্বচনীয় শান্ত-ভাবকে যোগিগণ সমাধি ও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া থাকেন। এই সমাধির অবস্থায় যোগী সেই মনসরাজ্যে উপনীত হইয়া নিত্য বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনস্থ ধীর সমীরে সেই নিকুঞ্জবিহারী বংশীধারী হরির মধুর মুরলীর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিঝুম নিস্তব্ধভাবে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। এই সমাধি অবস্থা ভাষা, চিন্তা ও ভাবের অতীত, তাহা বাক্যে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না, যিনি তদবস্থ হইয়াছেন তিনিই তাহার মাধুর্য্য অবগত আছেন।

যুগল-সেবক।

ঈশ্বরোপাসনা।

ছাত্র। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে সেই সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মতে ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায়-বিশেষের মতানুযায়ী উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিকে প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে এবং কি উপাসনা-পদ্ধতি কোন্ স্থলে প্রশস্ত, সেই সম্বন্ধে আপনার মত শুনিতে ইচ্ছা করি।

শিক্ষক। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে সকলেরই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য; এ সম্বন্ধে আমার যে মত তাহা আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে আমি যে সকল কথা বলিতে চাই সে সমস্ত কথা নিতান্ত সহজ নহে, সুতরাং তোমাকে একটু নিবিষ্টচিত্ত হইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আস্তিকগণ সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের মূল কারণ এবং সেই কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু শুদ্ধ এই বিশ্বাস বা জানা থাকিলেই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলা যায়, তাহা নহে। কিম্বা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য অব্যক্ত ইত্যাদি বলিতে পারিলেই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে, তাহা নহে। সেক্ষপীয়র একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের সহিত অন্য

কাহারও কাব্যের তুলনা হয় না। ইহা জানিলেই কবি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তবে যিনি সেক্ষপীয়রের কাব্যসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহার রসগ্রাহী হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, কবিত্ব বিষয়ে সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার তিনি যদি সেক্ষ-পীয়রের বাসস্থান, চরিত্র আদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তবে চরিত্রাদি বিষয়ে সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে বলা যায়। ঈশ্বর জগৎ-রচয়িতা বলিলেই যে ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিয়া লইলাম, তাহা নহে। সেই রচনা-কৌশল মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ভাবগ্রাহী হইতে পারি, তবে জগৎ রচনা বিষয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিব। যেমন সেক্ষপীয়রনামা কবিকে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন ও রসগ্রহণ প্রয়োজন, সেইরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টি বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাবগ্রহণ প্রয়োজন। সৃষ্টি কি—কাহার সৃষ্টি—সৃষ্টির উপাদান বা কিরূপ—সৃষ্টির অন্যান্য কারণ ও প্রয়ো-জন এ সমস্ত জানা আবশ্যক। কেবলমাত্র সৃজধাতু+ক্তি বলিলেই হইবে না। প্রলয়কর্ত্তাকে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং পালনকর্ত্তাকে বুঝিতে হইলে পালন-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এবং যখন একমাত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া জানিতে চাহিব, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান রক্ষাকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান এবং সংহারকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান, যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয়, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গুটিকত বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক সেই জগৎকারণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বস্তুতঃ আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। De Quincey নামক ইংরাজী লেখক একটী স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিয়াছেন,—সে Mesopotamia শব্দটী শুনিলেই বড়ই আকুল হইত ও এমন কি সময়ে সময়ে কাঁদিয়া ফেলিত। পরে জানা গেল যে ঐ শব্দে তাহার মনে Mess এবং Pottage শব্দের ভাব উদয় হইয়া তাহার চিত্তে Mess of Pottage (এক প্রকার খাদ্য) প্রতিকৃতি আনয়ন করিত, তাই জন্য তাহার উদরের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে তাহার এরূপ ভাব হইত। আমরাও কতকটা ঈশ্বর সম্বন্ধে ঐরূপ করি। গাল ভরা কথা হইলেই হইল। যতটা আমরা বুঝিতে না পারি ততটা বেশী যেন ভাবের উদয় হয়। সেই অজ্ঞতা যথাসাধ্য দূর

করিবার চেষ্টাই আমার মতে ঈশ্বরোপাসনা। যিনি এই অজ্ঞতায় অসন্তুষ্ট, জ্ঞানলালসা-বৃত্তিবশতঃ তিনি সেই জগৎ-কারণ তত্ত্ব-অন্বেষী হন এবং তিনিই আমার মতে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক। অর্থাৎ আগ্রহচিত্তে সেই আদিকারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই প্রথমতঃ তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে লালসা না থাকে, গির্জ্জায় গিয়া নিজের জন্য প্রার্থনা কর বা মন্দিরে বসিয়া কোন দেবমূর্ত্তি ভাবনা কর, তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে।

এই জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির খেলা দেখিতে পাই, যে শক্তি বশে সূর্য্য প্রত্যহ একটী নিয়মানুযায়ী পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, যে শক্তি বশতঃ শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর নিয়মিত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যে শক্তি বশতঃ একটী জড় কণার সহিত অন্য জড় কণার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যে শক্তি বশতঃ জীবের মনে ভালবাসা বৃত্তির উদয় হইয়া জীবে জীবে বাঁধন ঘটিতেছে, যে শক্তি বশতঃ আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা লজ্জা ভয় ইত্যাদি জন্মিতেছে, যে শক্তি বশতঃ আমি আজ তোমার সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইতেছি, এক কথায় যে সমস্ত অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির বশে এই সংসার চলিতেছে, তাহারা সমস্তই ঈশ্বরের এক আদিশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটী নিয়মের বাঁধন আছে, যে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও ঘটিবে না, এইরূপ কথা জ্ঞানী লোকেরা বলেন। এই কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন অর্থাৎ এই বিশ্বসংসার এক জ্ঞানময়ী আদিশক্তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে চলিতেছে, এই কথা যাঁহাদের মনে লাগে আমি তাঁহাদিগকে আস্তিক বলি। এই এক আদিশক্তিরই অন্য নাম ঐশ্বরিক-শক্তি। যাঁহারা এই ব্যাপার সকলের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন জড়শক্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। এই সমস্ত জড়শক্তির সহিত চেতন-শক্তির সম্বন্ধ যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই নাস্তিক।

ছা। আপনি চেতনশক্তি এবং জড়শক্তি কাহাকে বলিতেছেন তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইলেই ঠিক বুঝিতে পারি।

শি। লোহার সহিত গন্ধকের এমনি একটী সম্বন্ধ আছে যে উভয়ে মিলিলে একটী নূতন রকমের পদার্থ হিঙ্গুল উৎপন্ন হয় এইরূপ সম্বন্ধকে রাসায়নিক শক্তি বলে, ইহা জড়শক্তি কিন্তু হিঙ্গুল নির্ম্মাণকরিব বলিয়া লোহা আর গন্ধককে যখন একত্র করি তখন আমার ভিতরে একটী ইচ্ছাশক্তি

একটী বুদ্ধিশক্তির কার্য্য দেখিতে পাই ; ইহারা চেতনশক্তি এই ; চেতনশক্তিকে ইংরাজীতে Intelligence বলিয়া থাকে।

এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন জড়শক্তির কার্য্য এবং ভিন্ন ভিন্ন চেতনশক্তির কার্য্য দেখিতে পাই ; এই সমস্ত জড়শক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন চেতনশক্তির একটী সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ হইতেই জগতের যতকিছু ঘটনা ঘটিতেছে এবং সেই সম্বন্ধটী একটী আদিশক্তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন ; এই আদিকারণকেই ঈশ্বর বলা যায় ; ঈশ্বরবাদীরা এইরূপ কথা বলেন। এই সকল কথা যাঁহাদের মনে লাগে তাঁহারাই আস্তিক। এইরূপ আস্তিকগণ সকলেই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; কিন্তু এই আদিকারণকে একদল আস্তিক যে ভাবে ভাবেন অন্যদল আস্তিক সে ভাবে ভাবেন না এবং ইহা হইতেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সেই জন্য কেহ বা এক রকম প্রক্রিয়াকে ঈশ্বরোপাসনা বলেন কেহ বা অন্য রকম প্রক্রিয়াকে ঈশ্বরোপাসনা বলেন ; কিন্তু আমি এই কথা বলিতে চাই যে, যে আদিকারণকে ঈশ্বর বলিতেছি সেই আদিকারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাকেই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা বলা যাইতে পারে। আমি ঈশ্বরোপাসনার ভিতর এই কয়টী অঙ্গ দেখিতে পাই। ১ম, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ; ২য়, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, এই জ্ঞান ; ৩য়, সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য জ্ঞান-লালসা ; এবং ৪র্থ, সেই জ্ঞান-লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া।

ছা। আপনি, আমার যেরূপ বিশ্বাস থাকিলে আমাকে আস্তিক বলিতে পারেন আমার সেইরূপ বিশ্বাস আছে এবং ঈশ্বরোপাসনার পথে চলিতে ইচ্ছাও আছে। এক্ষণে প্রথমে আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে সাকার উপাসনা আর নিরাকার উপাসনা ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ত। সাধারণ জনগণ কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যে যে পদ্ধতিতে উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কাহাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি ? সাকার উপাসনাকেই বা কোন্ সময়ে ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি এবং নিরাকার উপাসনাকেই বা কখন ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারিনা ?

শি। দেখ গাভী একটী সাকার পদার্থ। গাভীগণ দ্বারা আমরা এই সংসারে অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। সে উপকার ভুলিবার নয়। সেই জন্য যদি আমি একটী গাভীকে ভক্তিসহকারে পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

অগ্নির অসীম ক্ষমতা। অগ্নি না থাকিলে আমরা মনুষ্যত্ব পাইতাম না। আবার অগ্নি বড় ভয়ের জিনিষ। অগ্নি সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধা ও ভয় বিমিশ্রিত হওয়ায়, যদি আমি অগ্নির পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

সূর্য্য এই সৌর জগতের সকল ঘটনার আদি। সূর্য্যের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে উহার মাহাত্ম্যে মন পুরিয়া যায়। এমন অবস্থায় যদি আমি সূর্য্যকে স্তব করি, তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা নহে।

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, প্রলয়ঙ্করী কালীদেবীর অসীম ক্ষমতা; ভক্তিভাবে তাঁর উপাসনা করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়। সেই বিশ্বাসে যদি কালীমূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া কালীর উপাসনা করি, তবে তাহা কালীদেবীর উপাসনা বটে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা নহে।

কিন্তু যদি আমি ঐ গাভী, ঐ অগ্নি, ঐ সূর্য কে উপলক্ষ করিয়া জগৎকারণ সেই অনাদি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করি, ঐ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশ্বরের যে মহিমা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায় ইহা বুঝিয়া, সেই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধায়ী হই, এবং সেই মহিমা মাহাত্ম্যে ভাবগ্রাহী হইয়া, ঐ অগ্নি সূর্য্যাদিকেই ভক্তিভাবে প্রণাম করি, তবে আমি ঈশ্বরোপাসনা করিলাম বলিতে হইবে।

যদি কোন দেবতার উপর অশেষ শুভফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস থাকে এবং সেই জন্য সেই দেব দেবীর পূজা করি, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে, কিন্তু দেব-দেবীর চিন্তা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের পথ বুঝিয়া যদি দেব-দেবীর উপাসনা করি, তবে ইহা ঈশ্বরোপাসনা।

এরূপ উপাসনায় কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করিতেছি না; কেবল সাকার পদার্থ বিষয়ক চিন্তার সাহায্যে আদিকারণ-তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ উপাসনাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহা সাকার পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করা যে সাকার উপাসনা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? এ সম্বন্ধে সকল আস্তিকই স্বীকার করেন যে তিনি নিরাকার। সুতরাং কোন সাকার পদার্থকে একমাত্র (Exclusive) ঈশ্বরজ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমার খর্ব্ব করা হয়। শুধু তাহাই কেন, উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কালীরূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি, তবে যখন কালীরূপ অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই

আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়াছি এই বোধ হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতাজ্ঞান আর থাকিবে না, সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা সেইখানেই শান্ত হইবে ও অন্যান্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতে প্রত্যেক পরমাণুতে তাহার রূপ দেখিতে পাইব না। প্রত্যেক জীবে তাঁহার যে প্রতিকৃতিআদি আছে তাহা বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রকারগণ যখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন, তখন নিরাকার অর্থে— কোন বিশিষ্ঠ পরিচ্ছিন্ন (Limited) আকার (Form) বিশিষ্ট নহে এই বুঝা যায়। পরিচ্ছিন্নতা (Limitation) জ্ঞান থাকিলে পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়। সেই জন্যই তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া উক্তি ও সেই জন্যই কোন আকার বিশেষকে তাহার একমাত্র রূপ (Exclusive form) জ্ঞান করা ভ্রমপ্রদায়ক।

এরূপ সাকার উপাসনায় যে কোন ফল নাই, তাহা আমি বলি না। তবে এরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না, ইহা নিশ্চিত।

যদি কেহ স্ফটিককে হীরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং হীরকলাভে চারি দিক্ অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে তিনি স্ফটিক পাইয়াই হীরক পাইয়াছি জ্ঞান করিবেন এবং উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই স্ফটিক তাঁহার অনেক উপকারে আসিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ হীরকলাভে বঞ্চিত রহিলেন। কেবল সাকারকে কেন, কোন সগুণ পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত নির্গুণব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিব। ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি কেবল রূপের অতীত নহেন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি গুণ এবং ভক্তি দয়া আদি গুণেরও অতীত। অর্থাৎ ঐ সকল গুণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলি না যে, আজকাল যাঁহারা নিরাকার উপাসক নামে খ্যাত, তাঁহারা সকলেই নিরাকারের উপাসনায় ঠিক পথে চলিতেছেন। ঈশ্বর নিরাকার দয়াময়, ইহা বিশ্বাস থাকাতে কোন কামনাসিদ্ধি জন্য সেই নিরাকারকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেই ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে কোন উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা নহে। ভক্তিবৃত্তির চর্চ্চায় মানসিক উপকার যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপাসক সেই উপকার পাইবেন। ফলে ইহার বেশী আর কিছুই হইবে না।

তবে যখন ইহা বুঝিব, নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ জন্য আমাদের ভক্তি আদি মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান-লাভে কোন সাকার অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তি স্ফুরণের চেষ্টা করি, তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা। কিন্তু সাকার অবলম্বন ব্যতীত আভ্যন্তরিক বৃত্তি স্ফুরণ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। আজকাল যাহাকে সাধারণতঃ নিরাকার উপাসনা বলে প্রকৃতপক্ষে তাহা নিরাকার উপাসনা নহে, ইহা আমি তোমাকে পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রূপচিন্তা দ্বারা যে উপাসনা এবং কতকগুলি স্তোত্র পাঠ দ্বারা যে উপাসনা এই উভয় প্রকার পদ্ধতিই এক জাতীয় প্রথমটকে যদি সাকার উপাসনা বলা যায় তবে দ্বিতীয়-টিকেও সাকার উপাসনা বলিতে পারা যায়। দেখ, পুতুলকে ঈশ্বরজ্ঞানে যে উপাসনা তাহাকে আমি ঈশ্বরোপাসনা বলি না ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। বিশেষতঃ চিন্তারও আকার আছে। আজকাল মনন প্রভৃতি বৃত্তি-গণের ও যে আকার (Thought form) থাকে ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, পদ্ধতিভেদে দুই প্রকার নামে বিভক্ত। যখন সেই ঈশ্বরকে নিরাকার জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান জন্য কোন সাকার চিন্তারূপ পথ অব-লম্বন করা যায়, তখন তাহাকে সাকার উপাসনা বলে এবং যখন কোন সাকার চিন্তাব্যতিরেকে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়, তখন তাহাকে নিরাকার উপাসনা বলে। আমি যাহাকে সাকার উপাসনা বলিতেছি হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে ব্যক্ত উপাসনা বলে এবং হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে অব্যক্ত উপাসনা বলে তাহারই নাম নিরাকার উপাসনা। বাস্তবিক-পক্ষে সাকার ও নিরাকার শব্দ-গুলি Relative terms।

ছাত্র।—তবে সাকার কাহাকে বলে।

শিক্ষক।—কোন বিশিষ্ট তত্ত্ব বা প্রপঞ্চ দ্বারা জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা ভাবকেই আকার বলে। যেমন যতক্ষণ আমাদের স্থূল শরীরে আত্মজ্ঞান থাকে ততক্ষণ আমরা "আমি" পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূল শরীরের আকার আপনাতে আরোপ করিয়া ভাবি আমার আকার এই। কিন্তু যখন স্থূল শরীরের উপরের কোন শরীরে অহংজ্ঞান ন্যস্ত হয় তখন এই আকারকে আর জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নকারী বলিয়া প্রতীতি হয় না। তখন আর স্থূল দেহের অভিমান আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না ও আমি স্থূল দেহে কার্য্য করিলেও দেহ আমার শক্তির কোন

প্রকার পরিচ্ছিন্নতা ঘটাইতে পারে না। সেইরূপ আমরা মায়া দ্বারা ঈশ্বরের আকার কল্পনা করি, কিন্তু মায়াতীত হইলে দেখিব তিনি সর্ব্বভূতস্থ;—সুতরাং সকল আকারই তাঁহার বিকাশের উপাধি মাত্র। উপাধি ও আকার দুটী শব্দ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। আমি যদি কোন কার্য্যের জন্য সাহেবি পোষাক পরি তাহা হইলে একটী অজ্ঞ শিশু আমাকে সাহেব জ্ঞান করিতে পারে কিন্তু বাস্তবিক আমি যে, সেই ই আছি। সেইরূপ উপাধি বিশেষ দ্বারা শক্তির বিকাশ হইলে শক্তির কোন হ্রাস বা ন্যূনতা হয় না। তবে প্রকাশের সুবিধা ও আমাদের বুঝিবার সুবিধা মাত্র। নিরাকার অর্থে আকার বা উপাধি হীন নহে—কেবল উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এই ভাব বুঝায়।

ছাত্র।—তবে আকার শব্দের কি অর্থ ঠিক বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক।—আভ্যন্তরিক বৃত্তির বাহিরে স্ফুরনের নাম আকার। একজন জন্মান্ধ কখনও রূপ কল্পনা করিতে পারে না। চক্ষে নেবা (Jaundice) হইলে সকল পদার্থই হলুদে দেখায়। বিশিষ্ট বর্ণান্ধ (Color-blind) ব্যক্তিগণ এই সকল বর্ণ (Color) দেখিতে পায় না। সেইরূপ জাতিগত ও ব্যক্তিগত বৃত্তি অনুযায়িক রূপ কল্পনা হয়। Bibleএর Old Testamentএর ঈশ্বর ও New Testamentএর ঈশ্বরের পার্থক্য বুঝিয়া দেখ। আর দেখ আমাদের আকারে আকার জ্ঞানের তিনটী বিশিষ্ট গুণ আছে। আকার বুঝিলেই আমরা বুঝি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চ এই তিনটী গুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন একটী রূপ। যাহার মন বৃত্তি এই তিন দ্বারা বদ্ধ নয় সে ব্যক্তি একটী স্থূল মূর্ত্তিতে আমাদের মত পরিচ্ছিন্ন মনে করেন না। সে ব্যক্তিকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিলে সে অনায়াসে অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়া বাহির হইতে পারে। যোগ-সিদ্ধি মনের ঐরূপ প্রসরণের ফল।

ছাত্র।—আর একটু ভাল করিয়া বলুন বুঝিতে পারিতেছি না।

শিক্ষক।—তোমাকে একটী চলিত গল্প বলি। কোন এক পাড়া-গেঁয়ে লোক তাহার সহরবাসী এক আত্মীয়কে একটী Shirt গায়ে দিতে দেখিয়া বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে কিরূপে ঐ জামাটি গায়ে দেওয়া যায়। যখন খুলিয়া তাহার গায়ে দিয়া দেখান হইল তখন সে বুঝিতে পারিল। সেইরূপ আমাদের রূপ বা আকার জ্ঞান। যতদিন দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রভৃতি গুণ দ্বারা আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে ততদিন আমরা আকার অর্থে পরিচ্ছিন্ন বা বদ্ধ ভাব দেখি। যেমন জামা গায়ে দিলে আমরা বদ্ধ হই না

কারণ জামা গায়ে দিব'র উপায় আমরা জানি সেইরূপ তত্ত্বদর্শী অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি সাধকের নিকট কোন রূপ দ্বারা ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন হন না। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার তুরীয় ভাব দেখিতে সমর্থ হন। তিনি কোন বস্তুবিশেষে কোন আকারে ঈশ্বরকে আবদ্ধ জানেন না বরং ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বারা ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও অপরিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। এখন বুঝ আকার চিন্তা আমাদের অবস্থানুসারে মনোবৃত্তির পরিস্ফুটনের উপায় মাত্র। নিরাকার ও নির্গুণ শব্দের অর্থ সর্ব্ব আকার ও সর্ব্ব গুণের আধার ও কারণ।

[ক্রমশঃ]

অনন্তরামের গুরু ভাই।

কাল পরিণাম
ও
যুগান্তর।

উনবিংশ শতাব্দী অনাদি অতীতের ক্রোড়ে চির নিদ্রায় নিমগ্ন হইবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বিদায় দিয়া বিংশ শতাব্দীকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে অনেকেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কত দিনের পর দিন গিয়াছে, কত বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়াছে, কত কোটী কোটী শতাব্দী কালের অনন্ত প্রবাহের মধ্য দিয়া অতীতের অন্ধকারাবৃতগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তাহা কে ধারণা করিতে পারে।

কাল অনন্ত—কালের অনন্ত প্রবাহ। তাহার আরম্ভ নাই, অবধি নাই—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আমাদের কাল পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, কালের অধিকারের বাহিরে যাইতে পারে না। আমাদের জ্ঞান কালের অধীন,—কাল আমাদের জ্ঞানের অধীন নহে। কাল—আমাদের দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের কল্পনা নহে। দিক্ কাল—আমাদের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না, আমাদের ইচ্ছায় লয় হয় না। দিক্ কাল আমাদের জ্ঞানের অধীন নহে।

কাল—প্রবাহ, কাল—আবর্ত্ত, কাল—চক্র, কাল ক্রিয়া। কাল আমাদের অহংজ্ঞানকে (জ্ঞাতাকে) ও ইদং জ্ঞানকে (জ্ঞেয়—বিষয়কে) অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যায়। যখন আমাদের জ্ঞানের বিরাম বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা অথবা এক প্রত্যয় সার অবস্থা তখন—কাল জ্ঞান থাকে না—তখন কোন ব্যবহারিক জ্ঞান থাকে না। এ জন্য সুনিদ্রায় বা সমাধিতে অথবা এক মনে কোন এক বিষয় ভাবনা কালে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। আর সে কালাতীত মোক্ষাবস্থার কথা এ স্থলে উল্লেখ করিয়া কাজ নাই।

কিন্তু জ্ঞানের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাল জ্ঞান আমাদের না থাক্—কাল থাকে। কাল ব্রহ্ম। মহাদেব স্বয়ং মহাকাল। চিদানন্দময়ী প্রকৃতি মহাকাল বক্ষে মা কালী রূপে নিয়ত সৃষ্টিসংহার ক্রিয়া নিরতা। মহাকালীর মহা নৃত্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর বা নক্ষত্রমণ্ডল সকলেই সেই মহানৃত্যে নিত্য-নিরত। সেই মহাকালীর মহানৃত্যের মহা তাল লয় মিলনের সঙ্গে যে মহা-ধ্বনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া নিত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সেই মহা ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী সৃষ্টি লয় লীলাময়ী মহা নৃত্যগীত আমরা ধারণা করিতে অক্ষম।

মানব জ্ঞানেই—কালের ধারণা। অতীত—আমাদের স্মৃতি; ভবিষ্যৎ আমাদের—অনুমান, আকাঙ্ক্ষা, আশা আর বর্ত্তমান—সেত প্রত্যক্ষ। যেখানে স্মৃতি নাই—অনুমান বা আকাঙ্ক্ষা নাই—যেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই—সেখানে আমাদের ক্রম জ্ঞান নাই জ্ঞানের বা বিষয়ের অবস্থান্তর জ্ঞান নাই। সেখানে কাল জ্ঞান নাই। বুঝি কালও নাই!

কাল নাই কেন বলি? ধরিলাম তোমার আমার জ্ঞান লোপ হইতে পারে—সহস্র মানবজাতি লোপ হইতে পারে—আব্রহ্ম সমুদায় জীব জ্ঞান লোপ হইতে পারে। কিন্তু সহস্র জীব জ্ঞান লোপ হইলেও যে অনাদি অনন্ত জ্ঞানে কাল জ্ঞান প্রতিভাত, তাহা লোপ হয় না। যদি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়—সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ না থাকিতেন, তবে ব্যষ্টি, বিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ ক্ষয় বৃদ্ধির অধীন জীব জ্ঞানের উপর কাল, ও জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিত। কালের অসীমত্ব, অনন্তত্ব কিছুই থাকিত না। কাল জন্য—সব শূন্য, আশ্রয় বিহীন, বিজ্ঞান মাত্র সার হইত। তাই বলিতেছি ব্রহ্মই সৃষ্টি প্রসঙ্গে কাল-রূপে নিজ জ্ঞান স্বরূপে প্রতিভাত।

দেশ কালেই জগৎ ধারণা। পট যেমন চিত্রের আশ্রয়—স্থান, কালও সেই-রূপ জগতের আশ্রয়। জগৎরূপে যিনি ব্যক্ত তিনিই দিক্ কাল রূপে প্রথমে বিবর্ত্তিত। তাই বলিয়াছি কাল ব্রহ্ম।

কাল—ক্রিয়া। যে ক্রিয়া দ্বারা এক বিষয় বিষয়ান্তরে বা অবস্থান্তরে পরিণত হইয়া আমাদের স্মৃতিতে তাহার চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া যায়—তাহা কাল। কাল, আমাদের জ্ঞানপটে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া দিয়া যায়। এই নিত্য গতিশীল জগতে যে অনন্ত ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে তাহা কাল। অথবা তাহা সেই মহাকালের মহা ক্রিয়া। (গত্যর্থক) 'কলন' হইতে কাল। এই নিত্য পরিবর্ত্তন, এই বিষয়ের ক্রম বিকাশ ও বিনাশ মধ্যে যে মহা সঙ্কলন ও ব্যবকলন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা কাল।

কাল ক্রিয়া—কাল গতি। আর যে মহাশক্তি বলে সেই ক্রিয়া বা গতি সাধিত হয়, তাহাও কাল। যাহা ক্রিয়ার মূল, যাহা গতির মূল তাহা কাল। তাই মহাশক্তিময়ী প্রকৃতি—কালরূপে বিবর্ত্তিত। আর এই মহাশক্তি যাঁহার, যিনি এই মহাশক্তিরূপে জগতে বিবর্ত্তিত তিনিও কাল। শক্তি শক্তিমানে প্রভেদ নাই। আধার আধেয়ে প্রভেদ নাই। তাই যিনি কাল পুরুষ, কাল ভৈরব, মহাকাল—তিনিই মহাকালী।

ব্রহ্মের নির্গুণ, সংসারাতীত, প্রপঞ্চোপশম, তুরীয় (Transcendental) অবস্থা কি, তাহা আমরা জানি না—তাহা জানিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত জগৎস্রষ্টা, পিতা সংহর্ত্তা—সচল—'জন্মাদ্যস্য' যতঃ 'তজ্জলান্' ব্রহ্মের ধারণা, বিশেষ সাধনা বলে করিতে পারি মাত্র। সৃষ্টি কল্পে জ্ঞান ও গতিরূপে তাঁহার প্রথম বিবর্ত্তন আমারা আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অনুমান করিতে পারি। তাহার প্রথম জ্ঞান ক্রিয়ায় 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' এই দ্বৈতরূপে ব্রহ্মকে আমরা প্রথমে ধারণা করিতে পারি। ব্রহ্মের যেই রূপ জ্ঞাতা—তিনিই পরমপুরুষ; আর তাঁহার যেই রূপ জ্ঞেয় তাহা পরম প্রকৃতি বা মায়া। এই জ্ঞেয় দিক্ কাল রূপ পটে, ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। এই জন্য স্থান ও কাল জ্ঞেয় রূপে জ্ঞানে প্রথম বিকাশ হয়।

এই জ্ঞেয়—জ্ঞানের কল্পনা (Ideas) কিন্তু ইহা আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের কল্পনা নহে। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান যাহা কল্পনা করে, তাহা সত্য হয় না। কল্পনাকে সত্যে পরিণত করিবার শক্তি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাই। ব্রহ্মের সে শক্তি আছে। সেই শক্তি, প্রকৃতি। সেই শক্তিই ব্রহ্মের ইচ্ছায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থ কাল্পনিক বা মায়িক জগৎকে প্রাকৃত সত্য জগতে পরিণত করে, বিবর্ত্তিত করে। ব্রহ্মেই কাল্পনিক জ্ঞেয় বিষয় (Ideas) সৎরূপে পরিবর্ত্তিত (realized) হয়। এই জন্য ব্রহ্মের জ্ঞানে thought ও 'being' একই।

বলিয়াছি অদ্বয় জ্ঞাতারূপ ব্রহ্ম, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতরূপে বিবর্ত্তিত। এইরূপে জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞেয়রূপ আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। বিচ্ছিন্ন হইলেও যেমন আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহার একত্ব ধারণা হয় না, 'অহং' ও ইদং বা 'ত্বং' এক—এরূপ ধারণা হয় না, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ নহে। সে অনন্ত জ্ঞানে এ উভয়ের একত্ব ধারণা আছে। কিন্তু সে সকল বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্ম জ্ঞেয়ের আধার স্বরূপে, জ্ঞানে আপনাকে দেশ কাল রূপে প্রথম কল্পনা করেন। তাহার পর যে অনন্ত ব্রহ্মশক্তি বলে, কাল্পনিক জ্ঞেয় সদ্রূপে পরিণত হয়, এবং জ্ঞেয় বিষয় প্রবাহ জ্ঞানে নিয়ত প্রতিফলিত হইতে থাকে, কাল সেই মহাশক্তি রূপে মহাকালী রূপে বিবর্ত্তিত। যিনি অনন্ত জ্ঞান রূপে মহাকাল, যে বিরাটরূপী পরম পুরুষ আপনাকে "কালোঽস্মি" বলিয়াছেন, তিনিই অনন্ত শক্তিরূপে মহাকালী। যে মহাশক্তি বলে জগতের সকল বস্তুরই জন্ম বৃদ্ধি লয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়—সেই ক্রিয়াই কালের ক্রিয়া—সেই ক্রিয়াই কাল। কাল ভূত সকল সৃষ্টি করেন কালই সকল প্রজার সংহার করেন। সেই লোক সৃষ্টিকারী, লোক ক্ষয়কারী কালকে আমরা কিরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে! দিব্য চক্ষু ব্যতীত যে তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না?

আকাশ হইতে সেই কালের সৃষ্টি সে কথার অর্থ কি? এই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর বা অনুমানাসিদ্ধ যে আকাশ তাহা হইতে ত কালের সৃষ্টি হইতে পারে না। আমাদের যে চিদাকাশ তাহা হইতেও ত কালের সৃষ্টি হয় না। বলিয়াছি ত কাল আমাদের জ্ঞানের কল্পনা নহে। সুতরাং আমাদের অন্তরস্থ আকাশ—বা কোন বিষয়কে অন্তর প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, যে আকাশের অস্তিত্ব আমরা অন্তরে অনুভব করি তাহা ত দিক্ কালের স্রষ্টা নহে। তবে যে মহাকাশকে চিদাকাশ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রথম বিবর্ত্তিত - হয় যাহা ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞেয়ের প্রথম বিকাশ যিনি ব্যোমকেশ—দেশ বা স্থানরূপে (Space) প্রথম "ইদং" বা জ্ঞেয় রূপ বিবর্ত্তনের আধার, তাহাতেই মহাকালের প্রথম অভিব্যক্তি। দিক সেই ব্যোমকেশের বিভূতি। এই জন্য বুঝি "দিক্ কালা বাকাশাদেভ্যঃ"। এই জন্য বুঝি বিভূতি ভূষিত নিষ্ক্রিয় ব্যোমকেশের বিশাল বক্ষে—মহাকালীর মহানৃত্য!

সেই মহানৃত্যের মহাতরঙ্গ! তাহাতে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে, এক তরঙ্গের লয় হইতেছে, আর এক তরঙ্গের

সৃষ্টি হইতেছে! একত্রে কত কোটী কোটী তরঙ্গের লীলা কি অদ্ভুত ঘাত প্রতিঘাত! সেই মহা তরঙ্গে কত সৃষ্টি লয় ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে! সেই মহাকালের বক্ষে মহাকালীর মহা ক্রিয়া কে বুঝিতে পারে!

বলিয়াছি ব্রহ্ম জ্ঞানরূপে মহাকাশে মহাকাল; ব্রহ্ম মহাশক্তিরূপে মহাকালী; ব্রহ্ম ক্রিয়া রূপে মহানৃত্যময়ী নৃত্যকালী। তাই কাল নিত্য, কাল এক, কাল অনাদি অনন্ত, অচ্ছেদ্য।

তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে কালের ত্রিমূর্ত্তি। কাল অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত। ইহার মধ্যে অতীত—লয় হইয়াছে। অতীতের অস্তিত্ব নাই। কেবল আমাদের জ্ঞানে তাহার অতি সামান্য চিহ্ন স্মৃতিরূপে রহিয়া গিয়াছে। তবে যিনি অনন্ত জ্ঞানরূপ তাঁহার জ্ঞানে অতীত পূর্ণরূপে প্রতিভাত। সেখানে অতীত—বর্ত্তমান। মহাকাশে যে অতীতের, ছাপ, চির অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানেই অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে। বর্ত্তমান সমস্ত অতীতের সমষ্টি। অতীতের একটি কড়া ক্রান্তিও বাদ যায় নাই। সমস্তই বর্ত্তমানে আসিয়া জমা হইয়াছে। যে শক্তির উপর অতীত সংস্থাপিত ছিল সে মহাশক্তি নিত্য অনন্ত অক্ষয়। সে শক্তি একরূপ কর্ম্মরূপে অতীতে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অন্যরূপ কর্ম্মরূপে তাহাই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম অতীতে কৃত হইয়াছিল—বর্ত্তমান সেই সমগ্র কর্ম্মেরই সঞ্চিত ফল।

অতীতে অনন্তবার সৃষ্টি হইয়াছে অনন্তবার লয় হইয়াছে। সৃষ্টি লয় ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে কতবার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কে কল্পনা করিতে পারে! সৃষ্টিতে শক্তি কার্য্যময়ী ক্রীয়াশীল (Kinetic) আর লয়কালে শক্তি কার্য্যবিমুখ শান্ত (Potential)। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বুঝিলে সৃষ্টি লয় সম্বন্ধে সেই একই নিয়ম। প্রত্যেক পরবর্ত্তী সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির প্রায় অনুরূপ। পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায়ই পরসৃষ্টিতেও ব্রহ্মজ্ঞানে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা (ঈক্ষণ) হয়, এবং তদনুসারে ব্রহ্মশক্তি বলে পূর্ব সৃষ্টির ন্যায় পরসৃষ্টি বিবর্ত্তিত হয়। তাই শ্রুতিতে আছে 'সূর্য্য চন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

অতীত সম্বন্ধে যে কথা যে নিয়ম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেই কথা সেই নিয়ম। ভবিষ্যত বর্ত্তমানেরই বিকাশ। অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে সমস্ত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতিভাত। প্রতিভাত কেন? সেখানে ভবিষ্যতও বর্ত্তমান। পূর্ণ

জ্ঞানে কালের তিন বিভাগ নাই। সেখানে সকলই বর্ত্তমান। অতীত, ভবিষ্যৎ সেখানে বর্ত্তমানের সহিত একীভূত। কিন্তু আমাদের অপূর্ণ জ্ঞান কাল পরিচ্ছিন্ন। পশু জ্ঞানে বর্ত্তমান, মুহূর্ত্তব্যাপী—তাহার অতীতের স্মৃতি-বড় সঙ্কীর্ণ ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আমাদের জ্ঞানে বর্ত্তমানের আরও একটু বেশী বিস্তার আছে। আমাদের অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের অনুমান আরও একটু বিস্তৃত। যত আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় ততই অতীতের স্মৃতি আরও প্রস্ফুটিত, আরও সুদূরব্যাপী হয়, ভবিষ্যত আরও স্পষ্টীকৃত হয়। সাধনা বলে জ্ঞান কাল বন্ধন মুক্ত হইতে পারে তখন জ্ঞান ত্রিকালব্যাপী হয়, যোগী ত্রিকালজ্ঞ হন। তখন বুঝি ব্রহ্মজ্ঞানে ও জীবজ্ঞানে বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

সে যাহা হউক, জীব জ্ঞান শুধু কাল পরিচ্ছিন্ন নহে। সে জ্ঞান স্থান পরিচ্ছিন্ন বটে। সেই স্থান পরিচ্ছিন্ন হেতু ও আমাদের কাল জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়। দূরে যে কর্ম্ম সাধিত হয় তাহার বিষয় আমরা পরে জানিতে পারি। সুতরাং দূরে যাহা অতীত তাহা এখন আমার নিকট বর্ত্তমান। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই—একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সে কথা বুঝিতে পারিব। ঐ দূরস্থ নক্ষত্র জগতের কিঞ্চিৎ সংবাদ আমাদের আলোক দূত আনিয়া দেয়। আলোক তরঙ্গ আসিতে সময় লাগে। কোন কোন সুদূরস্থ নক্ষত্রের সংবাদ আসিতে তিন চারি শত বা তিন চারি সহস্র বৎসরও অতীত হইয়া যায়। কাল অনন্ত, স্থান অনন্ত। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি, যে কোন কোন নক্ষত্রের আলোক এখানে আসিতে কোটী কোটী বৎসরও অতিবাহিত হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে আজ ঐ যে সুদূর নক্ষত্রের ঘটনা আমার নিকট বর্ত্তমান, তাহা কত সহস্র বা কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। এই কাল মধ্যে হয়ত সে নক্ষত্র জগতের ধ্বংশ হইয়াছে কিন্তু সে সংবাদ পাইতে সে নক্ষত্র জগতের আলোক আমাদের চক্ষে নির্ব্বাণ হইয়া যাইতে—আরও কত সহস্র বৎসর বিলম্ব আছে, তাহা কে বলিতে পারে! সুতরাং আমার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যাহা সুদূরে অতীত তাহা বর্ত্তমান রূপে প্রতিভাত। অতএব আমার বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যত জ্ঞানের উপর কালের বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যত নির্ভর করে না।

বলিয়াছি কাল এক অনাদি অনন্ত অচ্ছেদ্য। কালের গর্ভে সমগ্র জগৎ অবস্থিত। কাল গর্ভে বস্তু সকলের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। আর সেই পরিবর্ত্তনের স্মৃতি আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। আমরা সেই

পরিবর্ত্তন হইতে কালের পরিমাণ করি। কাল অপরিমিত অচ্ছেদ্য। কালরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিমাণ হয় না, কালরূপ মহাশক্তির পরিমাণ নাই। কালাভিমানী দেবতারও পরিমাণ নাই। কেবল আমাদের জ্ঞানে যে সীমাবদ্ধ কালজ্ঞান— তাহারই পরিমাণ আছে। আমরা জ্ঞানে অতীত ও ভবিষ্যৎ যে পরিমাণে ধারণা করিতে পারি, জ্ঞান বলে সাধনা বলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রাজ্য হইতে আমরা যে অংশটুকু জয় করিয়া আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া লইতে পারি, কেবল তাহারই পরিমাণ আছে। সেই পরিমিত কাল— ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের পরিমাণ। তাহা সেই ক্রিয়ার শক্তির পরিমাণ নহে। আর যিনি অক্ষয় কাল (গীতা ১০।৩৩) যিনি ব্রহ্ম তাঁহার আবার পরিমাণ কি? (১)

---

(১) কাল ব্রহ্ম, একথা শ্রুতিতে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যঃ কালং ব্রহ্মেত্যুপাসীত
কাল স্তস্যাতিদূরমপসরতি।"
(মৈত্রায়ণী ৬।১৪)

"কালাৎ স্রবন্তি ভূতানি কালাৎ বৃদ্ধিং প্রযান্তি চ।" ঐ
"কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং।" (গৌড়পাদকারিকা।)
"কালঃ পচতি ভূতানাং।" (মৈত্রায়ণী ৪.১৪)
"দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে কালশ্চাকালশ্চ।"
(মৈত্রায়ণী ৬।১৫)

"নারায়ণাত্মকঃ কালঃ।" (নারায়ণ উপনিষদ)
"অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালঃ ব্যাপক উচ্যতে।"
(অথর্ব্বশিরস উপনিষদ্।)

"য আদিত্যাত্মঃ স কালঃ * * তস্মাৎ
সংবৎসরো বৈ কালঃ।" (মৈত্রায়ণী ৬।১৫)।
"কালো যঃ প্রাণঃ।" (ঐ ৪।৫)।

শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

"গুণ ব্যতিরেকা কারো নির্ব্বিশেষোহ প্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানাং আত্মানাং লীলয়াহ সৃজৎ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতমাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্ত মূর্ত্তিনা॥"
৩।১০।১১-১২

অর্থাৎ "গুণ সকলের মহত্ত্বাদি রূপ পরিণামে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল। ঐ কাল আদ্যন্তশূন্য। ভগবান পরম পুরুষ লীলাবশতঃ সেই কালকেই নিমিত্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন।"

অথবা যিনি ব্রহ্মশক্তি, যিনি পরমা প্রকৃতি যিনি স্বভাব নিয়তি (কালঃ স্বাভাবোনিয়তঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।২) যিনি সর্ব্ব কারণ (কারণে কালঃ বৈশেষিক দর্শন ৭।১।২৫) তাঁহারই বা পরিণাম সম্ভব কোথায়? অতএব আমরা সেই

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

বলিয়া সেই নারায়ণী কালীকে নমস্কার পূর্ব্বক কর্ম্মরূপী পরিচ্ছিন্ন কালের পরিচ্ছেদ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

[২]

নৈসর্গিক ক্রিয়া ত্রয়ের অনুভূতি ও তাহার স্মৃতি হইতে আমাদের কালের ধারণা হয়। সেই অনুভূতি ভৌতিক কালকে স্থূল কাল বা মহা কালও বলা যায়। "সতেহ বিশেষতুলজন্ম স কালঃ পরোমমহান্।" পরমাণুভুক্ত সূক্ষ্ম কালতত্ত্ব এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কাল পরিমাণ জন্য যে অর্থ প্রধান নৈসর্গিক অবস্থা পরিবর্ত্তন, আমাদের জ্ঞানে প্রথমেই প্রতিভাত হয় সে সূর্য্যের উদয়াস্ত গতি। যে ভগবান উর্ণময় জগৎ চক্ষু সবিতাদেব জগৎকে আলোক বসনে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করিয়া আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ করেন, তিনি যখন পৃথিবীকে অন্ধকারাবরণে আবরিত করিয়া, তাহাকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দিয়া স্বয়ং আমাদের নয়নের অন্তরালে গমন করেন, তখন আমাদের বুদ্ধি অভিভূত

শ্রীমদ্ ভাগবতে অন্যত্র আছে—

এবং কালোহপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম।
সংস্থান ভুক্ত্যা ভগবান ব্যক্তো ব্যক্ত ভুগ্ বিভুঃ॥
৩।১১।৩

অর্থাৎ "ঐ কাল ভগবান হরির শক্তি এবং অব্যক্ত হইয়াও" ব্যক্ত পাদর্থের পরিচ্ছেদ করে। ইহা বিভু।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,—

তব রূপং মহাকালো জগৎ-সংহার-কারকঃ।
* * *
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥ ৪।৩০-৩১

হয়, জ্ঞান প্রভাহীণ হয়, ঘোর তামসিকতা আসিয়া আমাদের আচ্ছন্ন করে আমরা তখন ঘোর অভাব বোধ করি আমাদের কবি বলিয়াছেন "ভাবে ও অভাবেই কালের পরিমাণ হয়।" এ কথা সত্য। কিন্তু সূর্য্যের ভাবে ও অভাবে যে আমাদের কালের পরিমাণ হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি।

শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

"যঃ সৃজ্যশক্তি মুরুধোদ্ধসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূত ভেদঃ।
কামায় যা গুণময়) ক্রতুভির্বিতন্বং
তস্মৈ বলিং হরত বৎসর পঞ্চকায় ॥"

৩।১১।১৫

অর্থাৎ "যে ভূতভেদ (অর্থাৎ মহাভূত বিশেষ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য,) পুরুষদের মোহনিবৃত্তি করণার্থ (কার্য্যাস্ফুরণাদি রূপ) বীজাদি শক্তিকে স্বশক্তি দ্বারা বহু প্রকারে কার্য্যাভিমুখী করিতেছেন, এবং যাঁহা হইতে সকাম পুরুষদিগের গুণময় অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে, তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান আছেন, অতএব পঞ্চবিধ বৎসর প্রবর্ত্তক তাঁহারই পূজা কর।"

শ্রুতিতে আছে, (মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ৬।১৫)

"য আদিত্যাত্মঃ স কালঃ......তস্মাৎ
সংবৎসরো বৈ কালঃ।"

অতএব সূর্য্যের দৈনিক বা আহ্নিক গতি হইতে আমরা দিন রাত্রির ধারণা করি, আর বার্ষিক গতি হইতে—এক অয়ন হইতে অয়নান্তরে গতি হইতে আমরা বর্ষ ও উত্তর দক্ষিণায়ণ ছয় মাস গণনা করি। চন্দ্রের গতি হইতে আমরা পক্ষ মাস গণনা করি। সকল দেশেই এই সূর্য্য চন্দ্রের গতি হইতে, অথবা রাশি চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি হইতে (Sidereal Year) স্থূল কালের পরিমাণ দণ্ড (Unit of time) স্থির করিয়া লয়। তাহার পর এই দিনের ভগ্নাংশ বিভাগ—ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড বা দণ্ড পল বিপল বিভাগ কাল্পনিক; অর্থাৎ কোন নৈসর্গিক ক্রিয়া ক্রমের উপর স্থাপিত নহে। কেবল আমাদের দেশে সূক্ষ্মকাল পরিমাণের একটা নৈসর্গিক নিয়ম ছিল ও দণ্ড বিভাগ সেই পরিমাণ দণ্ডের উপর স্থাপিত ছিল। পরমাণু নিরাকার। ত্রসরেণু রূপে তাহার স্থান অধিকার অবস্থা (extension) আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে

পারে। সূর্য্যের তিন ত্র্যসরেণু পরিমিত স্থানব্যাপী দৈনিক গতি পরিমিত কালকে 'ক্রটী' বলে। ১০০ ক্রটীতে ১ 'বেধ', ৩ বেধে এক 'লব', ৩ লবে এক 'নিমেষ' ৩ নিমেষে ১ 'ক্ষণ', ৫ ক্ষণে এক 'কাষ্ঠা', ১৫ কাষ্ঠায় এক 'লঘু' (৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা) ১৫ লঘুতে এক "নাড়ী" বা দণ্ড হয়। (আর দুই দণ্ডে এক 'মুহূর্ত্ত')। অতএব ১৮ কোটী, ২৩ লক্ষ, ১০ সহস্র ক্রটীতে এক অহোরাত্র। আমাদের যেমন কালের ক্ষুদ্রতম অংশ পরিমাণের ব্যবস্থা আছে, সেরূপ অন্য কোন দেশে নাই বা ছিল না। এইরূপ ক্ষুদ্রতম কালাংশ পরিমাণের ন্যায়, স্থূলতম কালাংশ পরিমাণেরও ব্যবস্থা আছে। ৩৬০ মানুষ বৎসরে ১ দেব বৎসর।

৪০০০ দেব বৎসরে——১ সত্যযুগ।
৩০০০ ঐ ——১ ত্রেতাযুগ।
২০০০ ঐ ——১ দ্বাপরযুগ।
১০০০ ঐ ——১ কলিযুগ।
২০০০ ঐ ——১ যুগসন্ধি।

অতএব ১২০০০ দেব বৎসরে—১ পূর্ণযুগ বা চতুর্যুগ। ১০০০ পূর্ণযুগে বা ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন (৪৩২ কোটী মানুষ বৎসরে)। এবং ১০০০ যুগ ব্যাপী ব্রহ্মার রাত্রি। ৩৬০ ব্রহ্মার অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ শত বর্ষ-ব্যাপী ব্রহ্মার পরমায়ু—বা 'পর'। এই 'পর'—পরম পুরুষের এক নিমেষ মাত্র। প্রায় 'তিন কোটী গুণিত কোটী' মানুষ বৎসর এক 'পর' হয়। অহোরাত্রবিদ্ জ্ঞানীগণ এই পরম কালতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। আমরা তাহা কিরূপে ধারণা করিব!

[৩]

সে যাহা হউক আমরা ইহার মধ্যে এই যুগতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। যুগ কালের কাল্পনিক বিভাগ নহে। আমরা যুগধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইতে যুগের পরিবর্ত্তন হয়। কথিত আছে, সত্যযুগে ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব থাকে তখন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ধর্ম্ম ত্রিপাদ, দ্বাপরে ধর্ম্ম দ্বিপাদ ও কলিতে ধর্ম্ম একপাদ। কলির পর আবার যখন সত্যযুগ আসে তখন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ হয়। এইরূপে যুগের পর যুগ আসে। ৭১ চতুর্যুগ বা পূর্ণযুগ পরে এক মন্বন্তর হয়, ১৪ মন্বন্তর পরে ব্রহ্মার দিন শেষ হয় তখন দৈনন্দিন প্রলয় হয়। কল্পান্ত উপস্থিত হয়।

বন্ধনার্থক 'যু' ধাতু হইতে যুগ। যে কাল ধর্ম্মবিশেষ প্রভাবে একত্র সম্বন্ধ তাহা যুগ। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সহিত যুগান্তর হয়। আমরা এ স্থলে সত্য প্রভৃতি যুগের কথা বলিব না। যে মহা ধর্ম্মের সহিত সেই সকল যুগ সম্বন্ধ, যে মহা যুগধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সহিত সত্যাদি যুগান্তর হয়, সে মহা ধর্ম্মতত্ত্ব আমরা বুঝি না। এজন্য আমরা এ স্থলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাল বিভাগের কথা বলিব। এক এক কালে এক এক রূপ ধর্ম্মের প্রভাব থাকে। সেই কালের অবসানে সেই ধর্ম্মপ্রভাবেরও লোপ হয়, অন্যরূপ ধর্ম্মের প্রভাব হয়। এইরূপ যখনই ধর্ম্মবিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তখনই একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হয়।

ধর্ম্ম সনাতন। সেই নিত্যধর্ম্মের আবার পরিবর্ত্তন কি? সেই পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে, ধর্ম্ম কি তাহা অতি সংক্ষেপে বুঝিতে হয়। যে শক্তির বলে মনুষ্যত্বের উৎপত্তি স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। সেই শক্তির ক্রিয়া নানারূপ, কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের উপর মানবের মানবত্ব স্থাপিত। মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি (বা সুখ দুঃখ অনুভব শক্তি) এই তিন বৃত্তির উপর নির্ভর করে। মানুষ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। অতএব যাহাতে মানবের জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া অবশেষে আমাদের পরমাদর্শ সেই সচ্চিদানন্দঘন, অনন্ত জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তার আনন্দময়ের স্বরূপে বা সমীপে লইয়া যায়; তাহাই আমাদের ধর্ম্ম।

সকল মানুষের এই সকল বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির সম্ভব নহে। আমরা দেখিতে পাই কাহারও জ্ঞানবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলিত; তিনি মহা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত; কাহারও কর্ম্মবৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত। যাউক সে সকল কথা এ স্থলে বলিবার আবশ্যক নাই।

সমগ্র মানবজাতি এক মহা সমাজ। মানব সমষ্টি ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি— এই পৃথিবীতে সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের বিশেষ বিকাশ। সেই মানবসমষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত। সেই সকল ক্ষুদ্র সমাজও একত্র গ্রথিত, মানবসমষ্টির বিভিন্ন অংশ বা এক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গরূপে অবস্থিত। পরার্থতা সেই বিরাট মানবশরীরের প্রাণ। তাহাই সমাজের জীবনীশক্তি। মানুষ আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করে—পরের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। মানুষ আপনার জন্য কর্ম্ম করে, পরের জন্যও কর্ম্ম করে। মনুষ্য নিজের সুখ লাভ ও দুঃখ দূর করিবার জন্য এক কথায় আনন্দ ভোগ জন্য চেষ্টা ও যত্ন করে, পরের সুখ

বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করে। সেই পরার্থ চেষ্টা হইতেই সমাজের উন্নতি ও বৃদ্ধি হয়—স্বার্থ চেষ্টা হইতে সমাজের ক্ষয় হয়।

কর্ম্ম ও আনন্দ লাভ সকলই জ্ঞান বিকাশের ফল। আমাদের জ্ঞান ক্রম বিকাশশীল। জ্ঞানের যতই পরিণতি হয় ততই আমরা উন্নত হইতে থাকি। জ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপিত করে আমরা কর্ম্ম দ্বারা সেই আদর্শে পঁহুছিতে চেষ্টা করি—আর সেই আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হইতে পারি ততই আনন্দ লাভ করি। যাহাতে সেই আদর্শের দিকে যাইবার পথে আমরা বাধা পাই তাহাতে দুঃখ অনুভব করি ও সেই দুঃখ দুর করিতেও সে বাধা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করি। অতএব এই আদর্শের ক্রমঃবিকাশ ও এই আদর্শ লাভ জন্য সমাজের চেষ্টা ইহারই উপর কর্ম্ম সংস্থাপিত। এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় বুঝিবার জন্য আমরা এই কয়েকটী তত্ত্বের সংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম মাত্র, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বুঝা সহজ নহে।

আমরা এতক্ষণ আমাদের আদর্শের কথা বলিতেছিলাম। এই আদর্শের যে ক্রমোন্নতি বরাবর হয় তাহা নহে। সে আদর্শের কখন উন্নতি কখন অবনতি, কখন অন্যরূপে পরিবর্ত্তন হয়। এই আদর্শ—ব্রহ্ম, তিনি বাসুদেব, তিনিই ধর্ম্ম। আমাদের মুক্তি চেষ্টা, ব্রহ্মত্ব লাভ চেষ্টা, বা পরমপুরুষ শ্রীহরির সামীপ্য বা সাযুজ্য লাভ চেষ্টা, এক কথায় ধর্ম্মার্জ্জন চেষ্টা—সকলই সেই আদর্শ লাভের চেষ্টা মাত্র। মানুষ সে আদর্শ ভুলিয়া যায়। ক্ষুদ্র আদর্শ আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কেহ ইহকালের সুখময় জীবনকেই আপনার পরমাদর্শ, আপনার পূর্ণ উন্নতির অবস্থা কল্পনা করে; কেহ না পরকালের সুখময় জীবনকেই পূর্ণসুখ ভোক্তার অবস্থাকেই—পরমাদর্শ মনে করে। সমাজবিশেষে কখন ইহকালের সুখ ও উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য হয়; কখন কোন সমাজে পরকালের সুখ বা উন্নতি মূল লক্ষ্য হয়। কদাচিৎ কখন মুক্তি বা পূর্ণত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভই সমাজবিশেষের মূল লক্ষ্য হয়।

এইরূপ আদর্শ পরিবর্ত্তনই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন। তাহাই আমাদের আলোচিত ক্ষুদ্র যুগান্তরের কারণ। যখন মানবের আদর্শের অবনতি হয়—সে মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাহার অভিমুখে অগ্রসর হয় তখনই ধর্ম্মের অবনতি হয়। যখনই আদর্শের উন্নতি হয়—মূল আদর্শের দিকে মানবের লক্ষ্য স্থাপিত হয়—তখনই ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়।

এই আদর্শের কথা আমরা অন্যদিক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করি। এই আদর্শ আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ideal বা চরম—প্রকর্ষ ধারণা। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানও এক অর্থে আমাদের নহে। ইহা আমাদের চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞানের ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। চিত্ত কলুষিত বা মলাবৃত হইলে—এই জ্ঞানও কলুষিত হয়। একেত সেই জ্ঞান আমাদের চিত্তরূপ-সীমায় আবদ্ধ তাহার উপর তাহা চিত্ত-মলায় কলুষিত কাজেই আমাদের জ্ঞানে সেই আদর্শে ধারণা বড় অপূর্ণ থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টিকল্পে ব্রহ্মের জ্ঞানরূপে প্রথম বিকাশ। এই জ্ঞানে যিনি জ্ঞাতারূপে বিবর্ত্তিত, তিনিই পরমপুরুষ, আর যিনি জ্ঞেয় তিনি তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তি পরমা—মায়া। ব্রহ্মরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানে যাহা কল্পনা (ideas logos Words) বা ঈক্ষণ,—ব্রহ্মরূপ জ্ঞেয়ে কর্ম্মশক্তি বশে বা সংকল্প বলে, তাহাকেই জগৎরূপে বা সৎরূপে বিবর্ত্তিত করেন। জগতে তাহার ক্রম বিকাশ হয়, অর্থাৎ কালে তাহার স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বা পরিবর্ত্তন হয়। পরমপুরুষের কালশক্তি বলে, সেই কল্পনার বা সেই আদর্শের ক্রম বিকাশ হয়।

পরম বিরাটরূপ ব্রহ্মের মানবরূপ মহাবিকাশে, তাঁহার যে পরমাদর্শ (ideal) সেই পরমাদর্শের দিকে মানবজাতি সৃষ্টিকল্পে বিরাটরূপে মহাশক্তি বলে পরিচালিত। কালবশে বা যুগধর্ম্ম প্রভাবে মানবজ্ঞানে সেই আদর্শের বিশেষ বিকাশ হয়। আর কালশক্তি বশে মানব সেই আদর্শের দিকে নীত হয়। যখন সেই আদর্শ হীনপ্রভ হয় তখন ধর্ম্মের অবনতি হয়।

এক্ষণে বোধ হয় আমরা শ্রীভগবানের সেই মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিব—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বলিয়াছি আমাদের প্রকৃত আদর্শ যখন মলিন হয়, তখন আমরা অন্য অপকৃষ্ট আদর্শ অনুসরণ করি—তখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। যখন সমগ্র মানব সমাজের এই অবস্থা তখনই যুগান্তর সময়ে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রকৃত আদর্শ আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে রাখিবার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন—স্বয়ং সেই মহা-আদর্শ হইয়া আমাদের সেই আদর্শের দিকে লইয়া যান। পূর্ণ যুগান্তরে ভগবানের বুঝি পূর্ণ অবতার হয়, আংশিক যুগান্তরে তাঁহার আংশিক

অবতার। ভগবানের সেই অবতার নানারূপে হয়। কখন কোন বিশেষ মানবের অন্তর জ্ঞান রূপে তাঁহার অবতার হয়। কখন একাধিক মানব জ্ঞানে সেই আদর্শের বিকাশ হয়। তখন সমাজের অন্য লোক সেই আদর্শ হয় স্বতঃই অনুসরণ করে, নতুবা নিষ্কাম কর্ম্মপর মনষীগণ সাধারণকে সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে শিক্ষা দেন। তাহাতেই আবার ধর্ম্মরক্ষা হয়—অধর্ম্মের বিনাশ হয়। অতএব যুগান্তর সময়ে ভগবানের অবতার জ্ঞানে আদর্শ রূপে (logos, idea বা word রূপে) হয়। উৎকট সাধনা বলে মলিনতা বিহীন মানব বিশেষের চিত্তেও সেই আদর্শের আংশিক বিকাশ হইতে পারে। সেরূপ বিকাশেও কখন কখন ক্ষুদ্র যুগান্তর হয়।

[৪]

আমরা এস্থলে বর্ত্তমান কালের সামান্য যুগান্তরের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সম্প্রতি উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে। বৎসর কালের মূল বিভাগ— প্রধান নৈসর্গিক বিভাগ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শতাব্দী মানবের কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। সুতরাং শতাব্দী গতে কোনরূপ যুগান্তর হওয়ার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে একটি যুগান্তর হইয়াছিল। আর সেই উনবিংশ শতাব্দীর অবসানেও সেই যুগান্তরের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আমরা সেই যুগান্তরের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

আমরা সত্য যুগের কথা জানিনা। একালে সমগ্র মানব জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিণতি—পূর্ণ আদর্শের দিকে তাহার গতি, আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। মানব জাতির বিভিন্ন সমাজ উন্নতির বিভিন্ন স্তর দিয়া অগ্রসর হয়। বলিয়াছি মানুষ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। যে সাত্ত্বিক সে জ্ঞান প্রধান, যে রাজসিক সে কর্ম্ম প্রধান, আর যে তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন সে আত্মসুখ দুঃখানুভূতি প্রধান। ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে যে কথা—সমষ্টি ভাবে কোন বিশেষ সমাজ অথবা সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন সমাজ জ্ঞান (বা ব্রাহ্মণ) প্রধান —সে সমাজে দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়। কোন সমাজ জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রধান (ক্ষত্রিয় প্রধান)—সে সমাজে রাজশক্তির উন্নতি হয়। কোন সমাজ কর্ম্ম ও ভোগবৃত্তি প্রধান (বৈশ্য প্রকৃতি সম্পন্ন)—সে সমাজে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

বর্ত্তমান কালে ইউরোপ সকল সমাজের অগ্রণী। ইউরোপ যে আদর্শ

ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে, প্রায় সকল দেশের লোকই অল্লাধিক পরিমাণে সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপ ধর্ম্মবলে বলীয়াণ হইয়া, কতকটা খ্রীষ্টের আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। মুসলমান সমাজও ধর্ম্মবলে অগ্রসর হইয়াছিল। এখন একযুগ গিয়াছে। যখন অনেক সমাজই, কেবল ধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। তখন মানুষ ধার্ম্মিককে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইত। ধর্ম্মময় জীবন লাভ করাই তখন অধিকাংশ লোক পরমপুরুষার্থ মনে করিত। মানুষ জ্ঞানে যে আদর্শ লাভ করে, কর্ম্মের দ্বারা সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে। আর পরার্থবৃত্তি প্রধান সমাজে প্রধান লোক সাধারণকে সেই সমাজের আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপে সেই সমাজ একই প্রধান আদর্শ দ্বারা সংগঠিত ও সমুন্নত হয়।

এই ধর্ম্মের আদর্শ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপ একটা নূতন আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীজাতি সমগ্র ইউরোপকে একটা নূতন আদর্শ আনিয়া দেয়। তাহারা সমাজ সম্বন্ধে এক অভিনব আদর্শ ধারণা করে। রুসো লা কণ্ট্রাক্ট সোসিয়াল (La Contract Social) নামক গ্রন্থে সেই আদর্শ বুঝি প্রথম দেখাইয়া দেন। ইহা কালে ব্যক্তিগত সাম্য ও স্বাধীনতা সেই আদর্শের মূল। রাজায়-প্রজায়, ধনী-দরিদ্রে; পণ্ডিত-মূর্খে, ধার্ম্মিকে-অধার্ম্মিকে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে —যে বৈষম্য সেই বৈষম্যই সামাজিক উন্নতির এবং ব্যক্তিগত উন্নতির অন্তরায়। মানুষের ইহকালের সুখ ও ভোগের পথ পূর্ণমুক্ত করিয়া দিয়া—আমরণ যথাসম্ভব সুখ ও ভোগময় জীবন আদর্শ করিয়া সেই আদর্শ করিয়া সেই আদর্শ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ও কর্ম্ম করাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া তখন সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

ফরাসী সমাধিগণ এই আদর্শ প্রচার করেন। সমগ্র ইউরোপই অল্লাধিক পরিমাণে সেই আদর্শের আপাত মাধুর্য্য ও চাক্‌চিক্য দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অর্থ কামই মানবের প্রধান সাধন বলিয়া সর্ব্বত্র স্থিরী-কৃত হয়। মানব সেই অর্থকাম লাভের জন্য তখন কেবল চেষ্টা করিতে থাকে। ধর্ম্ম ও মোক্ষের কথা ভুলিয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই নূতন আদর্শ লাভ চেষ্টার ফল—ফরাসী রাজ বিপ্লব। ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেই সেই মহাবিপ্লবের কথা অবগত আছেন। সেই মহাবিপ্লবে ইউরোপে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হয়। যে আদর্শের ধারণা যে idea বা logoi বা word (sophia) হইতে এই যুগান্তর

উপস্থিত হয়, যেই idea কোন ব্যক্তি বিশেষ রূপে অবতীর্ণ হয় নাই বটে। সমাজ মধ্যে নানা ব্যক্তির অন্তরে তাহা যুগপৎ আবিভূর্ত হইয়াছিল। তবে যদি কাহারও নাম করিতে হয় তবে সে রুসো। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিওঁ দ্বারা তাহা ইউরোপে প্রসারিত ও বদ্ধমূল হয়। ইহার দ্বারা সাধারণ তন্ত্র-ভাব-ব্যক্তিগত ঐহিক সাম্য ও স্বাধীনতাভাব সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ ভুলিয়া রুসোর আধিভৌতিক বা তামসিক সাম্যবাদ সমাজের মূলমন্ত্র হয়।

এই আংশিক আদর্শ গ্রহণের ফল বড় বিষময়। ইহাতে সমাজের ঐহিক উন্নতি হইলেও—প্রকৃত উন্নতি হয় না। বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্য প্রধান বিদ্যাপ্রকৃতি সম্পন্ন ইউরোপীয় সমাজে—এই বিকৃতি আদর্শ অবলম্বন করিবার ফলে, যেমন এক দিকে ইউরোপের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমরা এই উন্নতি সম্বন্ধে প্রথমে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব। আজ কাল অনেকেই এই উন্নতির কথা আলোচনা করিতেছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

প্রথম উন্নতি হইয়াছে—বিজ্ঞানে। এই নবযুগে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই বিজ্ঞান। পূর্ব্বে বিজ্ঞানালোচনার—বিজ্ঞান-তত্ত্ব আবিষ্কারের যে নূতন পন্থা বেকন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথ না পাইলে বুঝি বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইত না। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞানালোচনায় যে ফল হয় নাই—গত শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়াছে। কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। রাসায়ন-শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান কেবল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই জড়জগতের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। জড় বা প্রাকৃত শক্তিতত্ত্ব আয়ত্ব করিয়া সেই সকল মহাশক্তিকে তাপ, তাড়িত, তেজঃ প্রভৃতিকে স্ববশে আনিয়া মানব তাহা দ্বারা ইহকালের সুখের পথ নানাদিকে বিস্তার করিয়া লইয়াছে। বাণিজ্যের অদ্ভুত উন্নতিও বিস্তার হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীটা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমার নিত্য প্রয়োজন বা বিলাসের উপকরণ আমেরিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, আশিয়া, সকল দেশই আনিয়া দিতেছে। তাড়িত বার্ত্তাবহ মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর

প্রান্তে অতি নগণ্য নগরেও লইয়া যাইতেছে। রেলপথ সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেষ্টন করিয়া আছে; সমুদ্রে দ্রুতগামী নিরাপদ অর্ণবপোত পৃথিবীর চারিদিকে যাতায়াত করিতেছে। এখন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে আমার ভাবনা নাই। সহজেই "ছয় দণ্ডে ছয়মাসের পথ" যাইতে পারি। দেশ কালবন্ধন—ক্রমে শিথিল হইয়া—জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তরের দূরতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার যে কষ্ট ছিল এখন বুঝি দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে সে কষ্ট পাইতে হয় না। তখন আমি এক ক্ষুদ্র গ্রামের লোক ছিলাম, বড় অধিক দেশে বিদেশের লোক ছিলাম, এখন বুঝি এই সমগ্র পৃথিবীর লোক হইয়াছি। ক্ষুদ্র দেশজ্ঞান—বিস্তৃত হইয়া সারা পৃথিবীর জ্ঞান আমার আয়ত্ত হইয়াছে। সহানুভূতির গভীরতার পরিবর্ত্তে পরিসর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষা চারিদিকে বিস্তার হইতেছে। সংবাদপত্র ঘরে ঘরে প্রতিদিন পৃথিবীর সংবাদ আনিয়া দিতেছে। এই মুহূর্ত্তে বুয়ার যুদ্ধে যে ঘটনা হইল—তাহার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে সে সংবাদ আসিয়া পড়িতেছে। বুয়ার ইংরাজ তোমার যেন ঘরের লোক হইয়াছে। তাহাদের যুদ্ধসংবাদ প্রতিদিন জানিবার জন্য তুমি উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছ। ইহাতে জ্ঞানের প্রসার হইয়াছে, আমিত্বের প্রসার হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, সহানুভূতির সীমাচক্রের বৃদ্ধি হইবার অবসর হইয়াছে।

বিজ্ঞান যেমন একদিকে দেশকাল বাধা সংকীর্ণ করিয়া দিয়া জ্ঞান বৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—তেমনি অদ্ভুতরূপে কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam Engine) আমাদের কর্ম্মশক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীতে প্রায় দেড়শত কোটী লোকের বাস। বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় পনের হাজার কোটী লোকের বল একীভূত হইয়া কার্য্যকরী হইয়াছে। এই কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধিতে সমগ্র মানবজাতির অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্র এই অদ্ভুত উন্নতির পনের আনা কারণ। যে জ্ঞান বা idea—Logoii বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের মূল সেই জ্ঞান যে মহাপুরুষের (Stephenson) অন্তরে প্রথম প্রতিফলিত হয়—তিনিই এই নবযুগের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা মানবের সমগ্র কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধির ফল পর্য্যালোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মানুষ জীবন রক্ষার জন্য যে

কর্ম্ম করে তাহা জীবন রক্ষা করে ব্যয় হয়। তাহার অধিক যে কর্ম্ম করে সে কর্ম্ম সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি (potential energy) অর্থ (Capital) রূপে সমাজে কার্য্য করে। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধির ফল জাতীয় অর্থ বৃদ্ধি। ইউরোপে এই সঞ্চিত কর্ম্মশক্তির অথবা অর্থের উৎকট বৃদ্ধি হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডের সঞ্চিত অর্থশক্তি অধিক। এজন্য ইংলণ্ডের শক্তি ইংলণ্ডের গতি অপ্রতিহত। যাউক, সে কথা এ স্থলে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে উনবিংশ শতাব্দীতে যুগান্তর হইয়াছে। এই নবযুগে, এই হুজুগের যুগে, এই ভোগের যুগে ; এই একাকারের যুগে—এই কর্ম্মশক্তির বিশেষ বিকাশের যুগে এই বাণিজ্য বিস্তারের যুগে, এই জড় বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির যুগে নানাদিকে মানবজাতীর উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদায় উন্নতিই ঐহিক। বর্ত্তমান সভ্যতার আপাতত মনোহর হৃদয় আকর্ষক বাহ্য চাকচিক্যে আমরা মোহিত হইয়াছি। সেই মোহে আমরা আমাদের প্রকৃত আদর্শ ভুলিয়াছি। আসল ফেলিয়া মেকি ধরিয়াছি। ভবিষ্যৎ ভুলিয়া বর্ত্তমানকে সার করিয়াছি। পরকাল ভুলিয়া ইহকালকে সর্ব্বস্ব করিয়াছি। ইহকালের উন্নতি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। আমরা ধর্ম্ম ভুলিয়াছি। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। ধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিকতার ভান করিয়া জ্বলন্ত বিশ্বাসকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারে বলি দিয়াছি। আমাদের সমাজে একাকার, ধর্ম্মে একাকার, জ্ঞানে একাকার। উচ্চ নীচ ভূমি ত্যাগ করিয়া আমরা সকলে এক নিম্ন সমতলক্ষেত্রে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছি। কর্ম্ম করিয়া উচ্চ প্রাকৃত শক্তি—নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়, Energy dissipated হয়, অবশেষে সমুদায় তাপ-তড়িতাদি শক্তি নিম্নতম এক ভাবাপন্ন তাপরূপে পরিণত হইয়া সৃষ্টির প্রলয় কাল উপস্থিত করে, বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা এ সত্য জানিয়াছি। তাই এই একাকারের যুগে মনে হয় আমার বুঝি সেইরূপ কোন নৈসর্গিক প্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের শাস্ত্র মতে বর্ত্তমান কলিযুগ একাকারের যুগ। গত শতাব্দীতে মানবজাতির সেই একাকারের দিকে গতি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আরও এক কথা আছে। বর্ত্তমান যুগে এই ভয়ঙ্কর উন্নতির দিনেও সমাজ ধ্বংসকরী শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। পরার্থতা সমাজের প্রাণ। স্বার্থপরতা—সমাজ ধ্বংসকারী শক্তি। বর্ত্তমান যুগ পরার্থ ভুলিয়া

স্বার্থের দিকে বরং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাই এই ঘোর একাকারের দিনেও বৈষম্যের বিকৃত বীভৎস বিকাশ আমরা চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। মানবের অর্থশক্তি ও অর্থের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে কয়েকজন কোটীপতি বা লক্ষপতিই সে অর্থের অধিকারী হইয়াছে। সাধারণ লোকের দারিদ্রতা আরও বাড়িয়াছে। জীবন সংগ্রাম (struggle for existence) বড় বিভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। একদিকে ধনীর বিকট তাণ্ডব ঐহিক সুখলালসা চরিতার্থ করিবার উৎকট আবেগ, অন্যদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন দরিদ্রের মর্ম্মভেদী রোদন—অদ্ভুত একাকারের পৈশাচিক আলিঙ্গন দেখাইয়া দিতেছে।

মানবের জ্ঞানচেষ্টা কেবল জড়তত্ব পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত, বিদ্যা—অর্থার্জ্জনের জন্য অধীত, বিজ্ঞান—প্রাকৃত বিজ্ঞানে পরিণত, দর্শন—জড়বাদ ও চার্ব্বাকবাদের উপর সংস্থাপিত, ধর্ম্ম—ইহকালের সুখার্জ্জন বৃত্তিতে পরিণত, কর্ম্ম—কাম ও অর্থার্জ্জন জন্য কৃত ও শক্তি—পরকে দলিত করিয়া নিজ সুখ ও ভোগ লালসা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত। জ্ঞান চিত্ত ও কর্ম্মবৃত্তির পূর্ণ পরিণতিতে যে পূর্ণ মানবের আদর্শ ধরিয়া মনুষ্য অগ্রসর হয়—বর্ত্তমান যুগে সে আদর্শ কত মলিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তিও বুঝি আমাদের লোপ হইয়াছে! বর্ত্তমান যুগে বুঝি আমরা মনুষত্ব ভুলিয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিতেছি। দেবাচার, বীরাচার ভুলিয়া আমরা পশ্বাচার অবলম্বন করিয়াছি। আমরা Spirituality ত্যাগ করিয়া Materiality অবলম্বন করিতেছি। আমরা জাতি-ধর্ম্ম সমাজ-ধর্ম্ম সকলই স্বার্থের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা সাত্বিকতা ত্যাগ করিয়া তামসিকতা অবলম্বন করিয়াছি।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে মানবত্বের অবনতির উৎকট দৃষ্টান্ত আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। এ স্থলে সে বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যত্বের আর কতদূর অবনত হইবে জানি না। বর্ত্তমান যুগে যে কর্ম্ম শক্তির মহাবিকাশ আমরা দেখিয়াছি, হায়! সেই শক্তি যদি মানবের ঐহিক অবস্থা উন্নতিতে সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হইয়া—তাহার কতকাংশ ও আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে নিযুক্ত হইত, ধর্ম্ম প্রচারের অসার ভান ত্যাগ করিয়া যদি প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টায় পরিণত হইত তাহা হইলে বুঝি এ নবযুগ সত্য যুগের আরম্ভের দিকে অগ্রসর হইত।

যখনই ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ত যুগ পরিবর্ত্তন

জন্য—সেই পরম পুরুষের অবতার হয়, সেই শব্দ ব্রহ্ম Logos, Sophia বা Wordএর বিশেষ আবির্ভাব হয়—অধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট হয়, তখন মানুষ আবার প্রকৃত আদর্শ পাইয়া সেই আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। হায়! সেই ধর্ম্মের অবনতির চরম অবস্থা কি এখনও আসে নাই? এখনও কি প্রতিক্রিয়ার সময় হয় নাই?

আমরা যে কাল-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছি, সেই মহাকালী—সর্ব্বশক্তি-রূপিণী মহামায়া ত যখনই আসুর বা রাক্ষস শক্তি অধিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হইয়া দেব-শক্তিকে অভিভূত করে, তখনই ত দেব শক্তির জয় ও আসুর—রাক্ষস গতির বিনাশ জন্য চেষ্টা করেন। এখনও কি সে মহাসুর সংগ্রামের সময় আসে নাই? আইস, আমরা সকলে সেই মহাকাল মহাকালীকে প্রণাম করিয়া, সেই অবতারের দিকে, সেই মহাদেবাসুর সংগ্রামের দিকে চাহিয়া থাকি। এই জড় ঐহিক উন্নতির যুগ যাহাতে আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক উন্নতির দিকে নীত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করি।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পাগলের প্রলাপ।

(৮ম সংখ্যা ৩১৪ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(৬১)

যেখানে সাপের ভয় বা বাঘের ভয় সেখানে যাইতে হইলে আলো লইয়া যাইতে হয় ইহা কি তাই জান না? তাই বলি ভাই! হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল সংসার-কাননে সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমপ্রদীপ হস্তে লইয়া চলিও নতুবা পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সে আলো দেখিলে পাপ, প্রলোভন, বিপদ, বিভীষিকা তোমার কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

(৬২)

খড়য়ের বনে জন্মাইলেও গোলাপের সুরভি নষ্ট হয় না, আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে থাকিলেও সুবর্ণের সৌন্দর্য্য হ্রাস হয় না; সেইরূপ সংসারের পাপতাপে সাধুহৃদয়ের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও প্রসন্নতা হ্রাস বা নষ্ট হয় না।

(৬৩)

অত্যুজ্জ্বল আলোকের ঠিক নীচে একটী ছায়া (Shadow or penumbra) পড়ে, ঐ ছায়ার অন্তর্বর্ত্তী দ্রব্যগুলি অতি নিকটে থাকিলেও সহজে দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ যাঁহারা সেই জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের পাদপদ্মের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তাদৃশ সাধুগণ সহসা লোকের নয়নগোচর হয় না; যাঁহারা ভগবান হইতে কিছু দূরে আছেন তাঁহারাই জগতে সাধু বলিয়া পরিচিত ও পূজিত হন। ভৃঙ্গগণ যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণই তাহাদের গুণ গুণ করিতে দেখা যায় কিন্তু ফুলে বসিলে আর তাহাদের দেখা যায় না; সেইরূপ যে সকল ভক্তগণ ভগবানের শ্রীচরণকমলে বিমল মধুপানে অচৈতন্য আছেন তাঁহাদের কেহ দেখিতে পায় না, জগতসম্বন্ধে তাঁহারা অস্তিত্ব রহিত। যত সব সাধু বাবাজী পরমহংস দেখ তাঁরা সব ভেন্ ভেনে মাছি, কেবল ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

(৬৪)

সকলে বলে প্রথমে সাকার উপাসনা করিলে নিরাকার ধারণার শক্তি জন্মে কিন্তু আমি বলি সাধকের প্রথমাবস্থায় সাকার চিন্তা নিতান্ত অসম্ভব কারণ প্রথমে সে ঈশ্বর যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধিই করিতে পারে না তার আবার আকার জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে। যিনি যত বড় সাধক হউন না কেন প্রথমে তিনি নয়ন মুদিয়া কখনই সেই অব্যক্ত অরূপ অগুণ ভগবানকে ভাবিতে পারিবেন না, তিনি যতই নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ধারণা করুন না কেন তাহা একপ্রকার অস্পষ্ট অনির্দ্ধারিত ভাসা ভাসা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু যত তিনি সাধনপথে অগ্রসর হইবেন তত তাঁহার ভগবান বিষয়ে জ্ঞান স্ফুটতর ও অপেক্ষাকৃত নির্দ্ধারিত হইয়া আসিবে ততই তাহার ভগবৎস্বরূপ ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে ও তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও পূর্ণাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হইবে। ঈশ্বরের আকার নাই ইহা ভ্রম, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সুমধুর সমুজ্জ্বল মূরতি হেরিয়া ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া যান তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যায় তিনি তাহা আর কিরূপে ব্যক্ত করিবেন তাই বলেন তিনি নিরাকার। এ স্থলে

"নিরাকার" অর্থে অসীম অব্যক্ত অনির্বচনীয় ও অপূর্ব্ব রূপবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে, যেমন "অমূল্য" বলিলে "বহুমূল্য" বা "যাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না এরূপ সামগ্রী" বুঝায়, "নিরাকার" শব্দেরও সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬৫)

পূজোপকরণের সামগ্রীর অগ্রভাগ অন্য কাহাকেও দিলে তাহা উচ্ছিষ্ট হয় ও তাহাতে আর দেবতার পূজা হয় না। তাই বলি ভাই! হৃদয়ের পবিত্র। প্রেম প্রথমেই প্রেমময়ের পূজার জন্য উৎসর্গ করিও নতুবা তাহা সংসারের উচ্ছিষ্ট হইলে তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইবে ও তাহা আর প্রেমময়ের পূজার উপযোগী হইবে না।

(৬৬)

আঁম যতদিন কাঁচা থাকে ততদিন টক থাকে, সময় হইলেই তাহা পাকে ও সুমধুর হয়, তখন তাহা দেবতাদের দেওয়া যায়। সেইরূপ মনের অপরিপক্কতাবস্থায় তাহার অম্লত্ব ঘুচে না, কালক্রমে তাহা পরিপক্ক ও মধুর হইলে তাহা ভগবানের সেবার উপযোগী হয়। কোনও কৃত্রিম উপায়ে (ফুকা দিয়া) আম পাকাইলে তাহার অম্লত্ব কথঞ্চিত দূর হয় বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত মধুরতা জন্মে না। সেইরূপ এই সংসার-সন্তাপের তুষানলে মন শীঘ্র পক্কপ্রায় হইয়া উঠে বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত পক্কতা জনিত মধুরতা হয় না ও সেই কারণে তাহা ভগবৎসেবার উপযুক্ত হয় না।

(৬৭)

কুসুমের সুরভি, লতার লাবণ্য, কিশলয়ের কোমলতা, শিশুর সরলতা, ফলের মাধুর্য্য, সতীর সৌন্দর্য্য, সমীরণের সুখস্পর্শ, বিহঙ্গের কুজন, সুধাংশুর কিরণ ও ভক্তের প্রেম—এ সমস্তই নৈসর্গিক।

(৬৮)

প্রণবের "অ" "উ" "ম" এই তিন অক্ষরে ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি, সংহারকারিণী শক্তির সম্মিলন, কিন্তু "মা" শব্দে ভগবাণের (ম+অ) শুদ্ধ সৃষ্টি ও পালনশক্তির সুমধুর সমাহার। ভগবান তাঁহার সংহারশক্তি পরিত্যাগ করিয়া মাতৃরূপে জগজ্জীবনকে সৃজন ও পালন করেন।

(৬৯)

বিষয় তোমাকে ভোগ করে করুক, দেখিও তুমি যেন বিষয় ভোগ করিও না।

(৭০)

স্রোতস্বিনী নদীবক্ষে যতই মলমূত্র আবর্জ্জনারাশি আসিয়া পড়ুক না কেন স্রোতে সে সকলি ভাসিয়া যায়, নদীর জল তাহাতে কখনই কলুষিত হয় না; সেইরূপ যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমনদী প্রবলবেগে প্রবাহিতা সংসারের কলুষ-রাশি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সমস্তই ভাসিয়া যায়; মলিনতা তাঁহার হৃদকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(৭১)

অন্ধকারে লাল নীল হলদে সবুজ প্রভৃতি নানারঙ্গের বর্ণগত বৈষম্য ঘুচিয়া সব এক হইয়া যায়, তখন আর তাহাদের যেমন পৃথক করা যায় না সেইরূপ সাধু হউক পাপী হউক, জ্ঞানী হউক বা মূর্খ হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক ভক্ত হউক পাষণ্ড হউক, বলবান হউক দুর্ব্বল হউক, সুন্দর হউক বা কুৎসিত হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা চণ্ডাল হউক, যে যেমন হউক না কেন আমার সেই তিমিরময়ী কালোমায়ের কোলে যাইলে আর কাহারও জাতিগত, ব গত, স্বভাবগত, অবস্থাগত বিভিন্নতা থাকে না; তাঁহার কাছে সবই সমান।

(৭২)

চন্দ্র ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মূর্ত্তি, ইহাতে তাঁহার সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণেরই আভাষ পাওয়া যায়। ইহার শুভ্রজ্যোতিঃ তাঁহার সত্ত্বগুণের, ইহার রমণীয় রূপ তাঁহার রজঃগুণের ও ইহার কলঙ্করেখা তাঁহার তমোগুণের নিদর্শন! একাধরে ত্রিগুণাত্মকের এরূপ সুন্দর ও মধুর ও উজ্জ্বল অভিব্যক্তি জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

(৭৩)

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বশতঃই বিকাশ পায়, উহা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা রাখে না, ইহার প্রভাবে জাতিভেদ অবস্থাভেদ ঘুচিয়া যায়। গোলাপ ফুলের গাছ প্রস্তরখচিত পাত্রে যত্নে রক্ষিত হইলেও যেরূপ সুন্দর সুগন্ধ ফুল দিবে, অরণ্যে অযত্নে অলক্ষিতে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তেমনি সুপুষ্প প্রদান করিবে; রূপে গুণে তাহার ফুলের বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না। রাজকন্যা সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরিপালিত হইয়া, কত উত্তম উপাদেয় খাদ্যে দেহ পুষ্টি করিয়া, কত সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, কত সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া, কত সুচারু কেশ বিন্যাস করিয়া, সর্ব্বদা সযত্নে সন্তর্পণে যৌবনের রূপলাবণ্য রক্ষা করিলেও

অতি দীনহীনা মলিন বসনা আলুলায়িতকেশা ধুলিধুসরিতা অন্নক্লিষ্টা ভিখারিণীর যৌবনবিকাশের সৌন্দর্য্যছটার সহিত তুলনায় একতিলও বেশী সুন্দরী হইতে পারে না। যৌবনের নৈসর্গিক লাবণ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ, চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম, সকলেতেই সমভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির এরূপ সর্ব্বজনীন প্রেম না হইলে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হইত না।

(৭৪)

বালি, সুরকি, টালি, ইট প্রভৃতি সকল মসলা সত্বেও চূন না থাকিলে যেমন ইমারত হয় না সেইরূপ ফুল চন্দন ধূপ ধুনা গঙ্গাজল সকল উপকরণ সত্বেও সেই সাত্ত্বিকী বিমল ভক্তি না থাকিলে পূজা হয় না।

(৭৫)

আকাশে আগে একটী তারা দেখা দেয় ক্রমে দেখিতে দেখিতে আকাশ তারা-ময় হইয়া উঠে ; সেইরূপ সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধকের হৃদয়াকাশে এক দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়রূপ দর্শন হয় ক্রমশঃ তাদৃশ অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাহার হৃদয়-আকাশ ভরিয়া যায় তখন সে সেই দিব্যজ্যোতির্ম্ময়রূপে জগৎ পরিপূর্ণ দেখে আর সে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলে না, তখন তাহার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান হয়। তাই বলি ভাই একেশ্বর বাদ (Monotheism) সাধনার প্রথম অবস্থায় আর সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) সাধনার চরম।

(৭৬)

সেতারের পাঁচটী তারের মধ্যে একটী পাকা তার না থাকিলে সুস্বর নির্গত হয় না সেইরূপ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীর পাঁচটী তারের মধ্যে অন্ততঃ একটী পাকা তার থাকা চাই না হইলে তাহা কোন মতেই বাজিবে না।

(৭৭)

প্রদীপের আলো, লণ্ঠনের আলো, মোমবাতীর আলো, গ্যাসের আলো, বৈদ্যুতিক আলো, চন্দ্রের আলো, সূর্য্যের আলো—যে কোন প্রকারের আলো হউক না কেন, সাদা আলো, লাল আলো, হল্‌দে আলো, সবুজ আলো, নীল আলো—যে কোন রঙ্গের আলো হউক না কেন, সকল আলোরই অন্ধকার নাশ করিবার ক্ষমতা আছে। সেইরূপ ঈশ্বরকে যে কোনরূপে চিন্তা কর না কেন, সকল প্রকার ঈশ্বর-চিন্তাই মানব মনের অন্ধকার দূর করিবে।

৪র্থ ভাগ। { ফাল্গুন ১৩০৭ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

স্তুতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

মাতৃস্তুতিঃ।

(১)

মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মদয়া সতী।
দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষাঃ সর্ব্বদুঃখহা॥

মাতৃদেবী মর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি মমতার
ব্রহ্মদয়া সতী সর্ব্ব জগত আধার,
দোষবিবর্জ্জিতা সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী —
রমণীর শিরোমণি জীবনদায়িনী॥ ১॥

(২)

আরাধ্যা মায়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥

পরম আরাধ্যা মাতা পরমা প্রকৃতি
দয়ামায়া শান্তি ক্ষমা অগতির গতি.
স্বাহা স্বধা স্বরূপিণী দুর্গতিহারিণী
গৌরী পদ্মাবতী জয়া বিজয়ারূপিণী ॥ ২ ॥

(৩)

দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুরেবৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥

মাতৃনাম এই পঞ্চবিংশতি প্রকার
ভক্তিভরে উচ্চারিলে নিত্য একবার,
অবহিত চিত্তে কিম্বা করিলে শ্রবণ
সকল দুর্গতি দুঃখ হয় বিমোচন ॥ ৩ ॥

(৪)

দুঃখবান্ সুখবান বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীং।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে।

দুঃখী হোক সুখী হোক করিলে দর্শন
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃরূপ অতুলন,
অতুল আনন্দে পূর্ণ হয় তার প্রাণ
নিত্য দরশনে অন্তে লভে সে নির্ব্বাণ ॥ ৪ ॥

(৫)

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণং
পরাশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ।

পরাশর মুখজাত মহাগুণাকর
তোমারে কহিনু মাতৃস্তোত্র বিপ্রবর !
মাতৃভক্ত সুসন্তান যে আছে যেখানে
সবাই শুনিবে ইহা ভক্তিপূর্ণ প্রাণে ॥ ৫ ॥

(৬)

যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ॥

প্রণমি সাক্ষাৎ মাতৃচরণ কমলে
ভক্তিভরে এই স্তোত্র প্রত্যহ পড়িলে,
পাতকীর সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত হয়
দুঃখী হয় চিরসুখী জানিবে নিশ্চয় ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্তা মাতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা ।

প্রণাম ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

প্রণমি প্রণমি তাঁরে নমি অগণিত
সর্ব্বভূতে যিনি মাতৃদেবীরূপে স্থিতঃ ॥

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সাধনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আত্মার বিনাশ নাই, আত্মা গমনশীলও নহেন, সুতরাং মৃত্যুতে আতিবাহিক দেহে কেবল মাত্র অহংকার পতন স্বীকার করিতে হইবে। আতিবাহিক দেহ সাধারণ চক্ষে দৃশ্য নহে। যদি বল মৃত্যুতে, অন্যকোন দেহে অহংকার পতিত হয় না, জীব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে স্থিত হয়েন, তাহাহইলে আমার বক্তব্য এই যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান না হইলে অহংকার তিরোহিত হইতে পারে না, যাহার জ্ঞান হইয়াছে যে আমি নিরাকার নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় চৈতন্য, তাহারই মৃত্যুকালে আতিবাহিকদেহে অহংকার পতন না ঘটিতে পারে যেহেতু মৃত্যুকালে যে ভাব মনে থাকে মৃত্যুর পর সেই ভাবই পাইতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টতঃ ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ;
তং তমে বৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥"

শেষোক্ত শ্লোকে "মদ্ভাবং" শব্দে ব্রহ্ম বা আত্মভাবং এবং "মামেব" শব্দে আত্মস্বরূপং বুঝিতে হইবে। যাহার জ্ঞান হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্ম বা নিরাকার অসীম সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চৈতন্যপদার্থ তাহার এ জ্ঞান মৃত্যুকালে তিরোহিত হইতে পারে না। কেহ কোন বিষয় যদি কেবল লোকমুখে শ্রুত থাকে তাহাহইলে তাহা মৃত্যুকালে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু যিনি আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি যথার্থই আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন বলিতে হইবে। আত্মস্বরূপ একবার জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে এ জ্ঞান মৃত্যুকালে তিরোহিত হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝা যাইতে পারে। কোন বিষয় লোকমুখে শুনিয়া স্মরণ রাখা এক কথা আর কোন বিষয় জ্ঞানে উপলব্ধি করা অন্য কথা। উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের সারমর্ম্ম গুরু

কৃপায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাহইতে আমার এই বিশ্বাস যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিও গুরূপদেশেই হউক আর লোকমুখে শুনিয়াই হউক আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া জ্ঞানে উপলব্ধি না করিয়াও যদি তাহা মৃত্যুকালে স্মরণ রাখিতে পারেন তাহা হইলেই তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন; আর যিনি আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার আত্মস্বরূপ মৃত্যুকালে স্মরণ থাকুক বা নাই থাকুক, তাঁহার নির্ব্বাণ হইবেই হইবে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে তিনি দেহমধ্যে স্থিত নহেন বরং দেহই তাঁহার মধ্যে স্থিত, এজন্য দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য দেহে যাইতে হইবে এরূপ ভাব তাঁহার মনে থাকে না কারণ প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন না যেহেতু আত্মা নিরাকার নিরবয়ব অসীম সর্ব্বজগদ্ব্যাপী একমাত্র চৈতন্য। বিশেষতঃ এক দেহ হইতে অন্যদেহে অহংকার পতন সময়েও পূর্ব্ব দেহের অহংকার অগ্রে দূরীকৃত হয়, এজন্য মৃত্যুকালে জ্ঞানীব্যক্তি মৃত্যুযন্ত্রনায় যদি অস্থিরও হয়েন তাহাহইলেও যেই মাত্র পূর্ব্বদেহের অহংকার দূরীকৃত হয় অমনি তৎক্ষণাৎই তাঁহার পূর্ব্ব জ্ঞান স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে, যেহেতু যাঁহার জ্ঞানে আত্মস্বরূপোপলব্ধি হইয়াছে তাঁহার আত্মস্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান নষ্ট হইতে পারে না। এজন্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার, দেহান্তে, অন্যদেহ গ্রহণ অসম্ভব কারণ তিনি জানেন যে দেহের সহিত আত্মার প্রকৃত কোনওই সম্বন্ধ নাই। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, যাহাদের কেবল বাগাড়ম্বরই সার যে আত্মা এইরূপ কি ঐরূপ অথচ আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহাদের মৃত্যুকালে আত্মস্বরূপ মনে নাও থাকিতে পারে। আত্মস্বরূপ লোকমুখে শুনিয়া কি শাস্ত্রে অবগত হইয়া বাগাড়ম্বর করা এক কথা আর আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। যাহাহউক আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে মৃত্যুতে আতিবাহিক দেহে অহংকার পড়িতে পারে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তবে যাহাদের এবিশ্বাস হয় নাই তাহারা আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধিও করেন নাই, যেহেতু আত্মজ্ঞানীর পক্ষে ইহার বিপরীত বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন এই যে, আমি মৃত্যু ভাল বাসি না, কেবল তারামায়ের ক্রোড়ে চিরদিন থাকিতেই অভিলাষ করি, কিন্তু কেবল মৃত্যুতেই যে নির্ব্বাণ

মুক্তি হইতে পারে এমন নহে, অন্য প্রকারেও ত নির্ব্বাণ সম্ভব, ভূতশুদ্ধি করিতে করিতে ভূতশুদ্ধির পরাকাষ্ঠাতে দেহের এমনই পরিবর্ত্তন হইতে পারে যে, দেহ ও জগতের জ্ঞান একেবারেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, ভূতশুদ্ধিতে পাঞ্চভৌতিক দেহের ক্রমশঃ সূক্ষ্মতরাবস্থা ঘটিতে থাকে এবং অন্তঃকরণের অবস্থা দেহানুযায়ী বলিয়াই ভূতশুদ্ধিতে ক্রমশঃ অন্তঃকরণের অবস্থানুযায়ী উত্তরোত্তর জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, শেষে কোন সময়ে সর্ব্ব ভূতের লয় দৃষ্ট এবং জীব আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া নিরুপাধি ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, আমি অমরত্বের পক্ষপাতী, বলিতেছি, কিন্তু যখন গুরুপদেশানুযায়ী সাধন প্রণালী অবলম্বনে ভূতশুদ্ধি করিতেছি, তখন ভূতশুদ্ধি করিতে করিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্তিত ঘটিতে পারে? এভাবে নির্ব্বাণ অসম্ভব নহে সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মনে কোনও প্রকার কামনা থাকে সে পর্য্যন্ত উক্তাবস্থা প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। মন হইতে যদি সর্ব্বপ্রকার কামনাই তিরোহিত হইয়া যায় তাহা হইলে নির্ব্বাণ এবং অনির্ব্বাণ উভয়ের কামানাই থাকিবে না, এবং কামনারহিতাবস্থায় নির্ব্বাণ হইলে ক্ষতি বৃদ্ধিই বা কি? তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মুক্তি নাও ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম জ্ঞানীর মৃত্যু যে কেন ঘটিতে পারে না তাহা এখন বিশেষ আলোচ্য। স্থূল দেহ হইতে আতিবাহিক দেহে অহংকার পতনই প্রকৃত মৃত্যু শব্দবাচ্য এবং এইরূপ মৃত্যু ঘটিলে পুনর্জ্জন্মও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্য এক প্রকার মৃত্যু আছে তাহাতে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং মৃত্যুযন্ত্রনাও ভোগ করিতে হয় না। এবম্বিধ মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু দেহেই বিলীন হইয়া যায়, এজন্য এ মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যু বলা যায় না। যে মৃত্যু পুনর্জন্মের কারণ তাহাই যথার্থ মৃত্যু।

শিবগীতায় উক্ত আছে;—

শুদ্ধব্রহ্মরতো যস্তু ন স যাত্যেব কুত্রচিৎ।
তস্য প্রাণাঃ বিলীয়ন্তে জলে সৈন্ধবপিণ্ডবৎ।”

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হয় না, দেহেই বিলীন হইয়া যায়। এই ভাবের একটী শ্লোক দেবীগীতায়ও দৃষ্ট হয়;—

"ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাৎ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ।
মসসম্বিদ্পরতনোঃ তস্য প্রাণাঃ ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবেদ যঃ॥"

এখন বিবেচ্য যে, প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত নাই হউক, কিন্তু যখন দেহে বিলীন হইতে পারে, তখন এরূপ মৃত্যুরত আশঙ্কা রহিল? এরূপ মৃত্যু কাহার ঘটিবার সম্ভাবনা? যাহার অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে কামনা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার পক্ষেই এরূপ মৃত্যু সম্ভব; কামনা থাকিতে নির্ব্বাণ অসম্ভব। মন হইতে কামনাই যদি দুরীকৃত হয়, তাহাহইলে বাঁচিয়া থাকিবারও কামনা থাকিবেনা সুতরাং এরূপ মৃত্যুর ভয়ও থাকিবে না।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুতে আতিবাহিকদেহে অহংকার পতন অসম্ভব এবং যতদিন কামনা থাকে ততদিন নির্ব্বাণও অসম্ভব, এজন্যই স্বীকার্য্য যে যতদিন ব্রহ্মজ্ঞানীর বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ থাকিবে ততদিন তিনি বাঁচিয়াই—থাকিবেন; ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুই ইচ্ছামৃত্যুসংজ্ঞাপ্রাপ্ত। শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী জানেন যে, তারামায়ের ইচ্ছাতেই তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা, এজন্য তিনি যে বাঁচিয়া থাকিবেন, ইহা ধ্রুব; তবে মা তারার ইচ্ছায় যখন বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা তিরোহিত হইবে তখন ইচ্ছামৃত্যু হইলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে যদি পরলোক প্রাপ্তি কামনা ও নির্ব্বাণেচ্ছাই না থাকে, তবে তাঁহার মনে মৃত্যুর ইচ্ছাই বা কেন হইবে? সকল ঘটনাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত হওয়া চাই। শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের অন্তঃকরণে সকল সময়ই আনন্দ থাকে অর্থাৎ সকল সময়েই তিনি আনন্দময়কোষে স্থিত থাকেন তাঁহার অন্তঃকরণে মৃত্যুর ইচ্ছা হওয়া অসম্ভব। ক্রমশঃ।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

ঈশ্বরোপাসনা।

———:+:———

ছাত্র। মনোবৃত্তি স্ফুরণ কিরূপে হয়। নির্গুণ ও সত্বগুণে কি প্রভেদ বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক। মনে কর তোমার মনের সম্যক বিকাশ হয় নাই। তুমি সকাম ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিতে পার না ও নিষ্কাম কর্ম্মের উপলব্ধি করিবার

সামর্থ নাই। সে ক্ষেত্রে তোমাকে নিষ্কাম আদর্শ দিলে তোমার মনের বৃত্তি-গণের পরিস্ফুরণ একেবারে অসম্ভব। তোমাকে সকামের সঙ্গে একটু একটু করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম শেখান আবশ্যক তাহাহইলে পরে এক দিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার সামর্থ উদ্ভূত হইবে—সেইরূপ যে ব্যক্তির মনোবৃত্তি স্থূল দেহা-ভিমানে আবিষ্ট তাহাকে সূক্ষ্ম বা স্থূল ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বা তৈজস অভিমানী ঈশ্বরের কথা বলিলে তাহার হৃদয় একেবারে আকর্ষিত হইবে না। সুতরাং সেরূপ ঈশ্বরের সাধনায় তাহার কোন ফল হইবে না। এই জন্যই উপনিষদে বলে যে ব্রহ্ম ধনাকাঙ্খীর ধনরূপে কামাকাঙ্খীর কামরূপে সকল জীবেরই বৃত্তি-নিচয় পরিস্ফুরণ করিয়া উন্নত করিতেছেন। এখন বুঝ তিনি নিরাকার অর্থাৎ প্রকৃতির আকার দ্বারা বদ্ধ না হইয়াও সাকার অর্থাৎ প্রত্যেক আকা-রের অধিযজ্ঞ রূপে বিরাজমান। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ত্রয়ের অতীত হইয়াও প্রকৃতির গুণ সাহায্যে আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। আধুনিক নিরাকারবাদীগণ ভুল করেন যে, যে তিনি কেবল মহান কিন্তু তিনি যে প্রত্যেক অণুতে বিরাজমান তাহা ভুলিয়া যান। আকার মায়া মাত্র আকারে ঈশ্বর বা তাহার শক্তিকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। বস্তুত জগতের বাহিরে কোন এক প্রদেশে জগতের সম্বন্ধ ছাড়া এক অদ্ভূত জীবভাবে যাহারা ঈশ্বরকে ভাবনা করেন তাহাদের পক্ষে আকার দোষনীয় বটে কিন্তু হিন্দু-মাত্রেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি ছাড়া বলিয়া ভাবেন না। তাঁহার পক্ষে এই বিরাট রূপের প্রতি অংশে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত। ঈশ্বর আকারে নন তবে ঈশ্বরে প্রত্যেক আকার আছে।

ছাত্র। আমি আকার ও আকারে ঈশ্বর এটী ভাল বুঝিতে পারিতে-ছিনা।

শিক্ষক। একটী উদাহরণ দিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে। আমরা যাহাকে 'আমি' বলি সেটী যে এই শরীর নয় তাহা বুঝিতে পার। কারণ স্বপ্নের সময় এ দেহ না থাকিলেও আমার আমিত্ব নষ্ট হয় না। অথচ জাগ্রদাবস্থায় আমার 'আমি' কি শরীরের প্রত্যেক অংশে নাই? শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণু আমাতে আছে বলিয়াইত শরীর কার্য্য করিতে পারে ও আমার উপাধি-রূপে থাকে। শরীরের কোন অংশ যদি স্পর্শ কর তবে সে জ্ঞান 'আমিতে'

পৌঁছায় সেইরূপ ঈশ্বরও বিরাটরূপে সকল বস্তু ও আকারে ওতঃ প্রোতভাবে আছেন। এই বিরাটরূপের প্রত্যেক অংশে তিনি বিরাজমান। এমন অংশ নাই যেখানে তিনি নাই। আবার যখন আমি স্থূলদেহে অবস্থান করি তখন সাধারণ লোকে স্থূলদেহের গুণ সকল আমাতে আরোপ করে। সেইজন্য আমরা বলি আমি কৃশ আমি দুর্ব্বল, আমি পুষ্ট। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি শরীরের স্থূলতা দুর্ব্বলতা প্রভৃতি গুণের অতীত। তবে এই সকল গুণ না থাকিলে স্থূলদর্শীগণ আমাকে বুঝিতে পারিত না। সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতির গুণাতীত হইলেও জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতির গুণ দ্বারা আপনাকে প্রতিফলিত করেন। না করিলে আমাদের অন্য গতি নাই ও ছিল না। কিন্তু আমার যেমন নিজের শক্তি অনুসারে অন্য পদার্থ বুঝি সেইরূপ আমাদের পরিচ্ছন্নতা ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাতে স্থূল বা মনোময় বা বিজ্ঞানঘনরূপে একমাত্র (Exclusively) বিরাজমান মনে করি। আকারে বাস্তবিক দোষগুণ নাই দোষগুণ আমাদের মনের অপরিসরতায়। কোন বন্ধুর ফটোগ্রাফ দেখিয়া ত আমরা তাহাকে বন্ধু স্বয়ং বলিয়া ভাবি না কিন্তু ফটোগ্রাফ বন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দেয় ও ভাবনার সুবিধা করে। ঈশ্বরে আকারও তদ্রূপ মনে কর।

যত দিন আমরা মায়ার অধীন থাকিব যত দিন ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তত দিন নির্গুণ ঈশ্বরসম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে সক্ষম নহি; কেন না ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না। আজকালকার নিরাকার-উপাসকগণ যে সগুণ উপাসক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাকার-উপাসক রূপের সাহায্যে ভক্তিভাব উদ্রেক করেন। নিরাকার-উপাসক না হয় কতক গুলি স্তোত্র গান দ্বারা তাঁহাদের ভক্তি ভাব উত্তেজিত করেন। রূপ ও শব্দ দুইই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়। একটি দর্শনেন্দ্রিয়ের অপরটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের। প্রভেদ ত এই। তবে নিরাকার-উপাসক দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপের সাহায্য লইয়া উপাসনা করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন?

ইহার এক কারণ আছে। হিন্দুসমাজের আজকালকার অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সাকার উপাসনা দ্বারা নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার পদ্ধতি

প্রচলিত থাকায় সমাজের অবনতির সহিত সাধারণ জনের সাকার পদার্থকেই (Exclusive) ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রার্থনীয় নহে। এইজন্য ধর্ম্মসংস্কারগণের মধ্যে মধ্যে ইহা উপদেশ দিতে হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য যদিও রূপাদি ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর নিরাকার। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের প্রধান কারণ আসক্তি। ছোট ছেলে যেমন পুতুলকে পুতুল জ্ঞানে খেলা করিতে করিতে তাহাতে ভিতরের বৃত্তি সকল আরোপ করিয়া নিজের বৃত্তির পরিস্ফুরণ করে। কিন্তু পরে আসক্তি জন্মিলে পুতুলটী ভাঙ্গিলে কাঁদে, সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে আমাদের আসক্তি জন্মিয়া যাইলে ঈশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। সেটী আমাদের দোষ আমাদের যত দিন কাম বা আত্মইন্দ্রিয়প্রীতি থাকিবে তত দিন আসক্তি ও ভ্রান্তির স্থান আছে। কিন্তু আমি যাহাকে সাকারোপাসনা বলিতেছি, তাহা যে নিন্দনীয়, তাহা কেহ বলিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। সাকারকে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে না ইত্যাদি উপদেশের ফল এবার ইহা দাঁড়াইয়াছে যে একেবারে সাকার কথাতেই অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে। উপাসনা কালে কোনরূপ চিন্তা করা আর উপাসনা ভ্রষ্ট করা অনেকের কাছে এক কথাই দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক গোঁড়ামী সকল সময়ই খারাপ; গোঁড়ামী থাকিলে বিচারশক্তির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। আজকাল যাহারা আপনাদিগকে নিরাকার উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা গোঁড়ামী ছাড়িয়া যদি ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি স্তোত্র পাঠ দ্বারা যে উপাসনা করেন তাহা রূপ শব্দ বাক্যের সাহায্যে সেই নির্গুণকারণের যে উপাসনা, তাহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অন্তরে একটি পবিত্র সুন্দর ভাব উত্তেজিত করিয়া মানবকে ক্রমে ক্রমে মায়াবন্ধনের বাহিরে লইয়া যাওয়া সকল প্রকার উপাসনারই উদ্দেশ্য; কেননা অন্তর যত পবিত্র ও নির্ম্মল হইবে ততই ঈশ্বরজ্ঞান পরিষ্কার হইতে থাকিবে সেইজন্য কেহ কেহ কোন বিশেষ রূপের সহিত কেহ বা কোন বিশেষ বাক্যের সহিত (যেমন মন্ত্রজপ বা স্তোত্র পাঠ) কেহ বা কোন বিশেষ সঙ্গীতের সুরের সহিত এক প্রকার পবিত্র ভাব যোজনা করিয়া রাখিয়া

বেন এবং উপাসনা কালে সেই রূপ বা সেই বাক্য বা সেই সঙ্গীত মনে থাকিয়া তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পবিত্র ভাবটি মনে উদিত করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং খ্রীষ্টিয়ানরা যেরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা করেন আর হিন্দু শিবের পবিত্রমূর্ত্তি ধ্যান দ্বারা যে ঈশ্বরোপাসনা করেন ইহাদের মধ্যে আসলে কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না।

তবে যিনি এত দূর উন্নত হইয়াছেন যে তাঁহার অন্তরে পবিত্রভাব ও নিষ্পাপ জ্ঞান সদাই বিরাজমান, কোন বিশেষ রূপ বা শব্দের সাহায্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য পবিত্রভাব ও জ্ঞান আনয়ন করিবার তাঁহার প্রয়োজন নাই। রূপে যাঁহার অন্তরের বিকার জন্মে তাঁহার অন্তরে পবিত্রভাব আনয়ন জন্য কোন বিশেষ পবিত্র রূপ সতত অন্তরে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কোন শব্দ বা কোন বাক্যে যাঁহার অন্তরে মন্দভাব আসিতে পারে সতত পবিত্র শব্দ বা পবিত্র বাক্য আলোচনা দ্বারা পবিত্র ভাব রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহার কিছুতেই বিকার হয় না কোন বিশেষ রূপ ধ্যান বা বিশেষ মন্ত্রজপের তাঁহার দরকার নাই।

(ক্রমশঃ।)

অনন্তরামের গুরুভাই।

একটি অদ্ভুত গল্প।

:×:

(৯ম সংখ্যার ৩৫৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

আমার সেই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহ, বহিরাঙ্গলোক জনের সম্মুখে আনাদৃত ভাবে পতিত রহিল, আত্মীয় স্বজনের চির পরিচিত মুখাবলোকন বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল, মন স্বচ্ছন্দে স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইল, অচিরে আমাদিগের বাটীর দৃশ্য দৃষ্টি পথে নিপতিত হইল, পিতৃদেব তাহার

ভজন প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্কটমোচন স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, মাতাঠাকুরাণী আগ্রহ সহকারে অবহিত চিত্তে তাহা শুনিতেছেন।

আমি, আমার চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেলাম; বহুদিনের পর জননীকে দর্শন করিয়া আগ্রহ ভরে মা বলিয়া সম্বোধন করিলাম, মা কিন্তু আমার আগ্রহ পূর্ণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন না; অমনি আমার তাৎকালিক অবস্থা মনে পড়িল, ভাবিলাম—আমি যে মরিয়াছি মরা মানুষের কথা, মরা মানুষে শুনিতে পায়, জীয়ন্ত মানুষ বুঝি তাহা শুনিতে পায় না—না, তাহা কখনই হইতে পারে না—আমি আমার ভালবাসার সামগ্রীকে অকপট আগ্রহ ভরে ডাকিব, আর তিনি আমার ডাক শুনিতে পাইবেন না - এও কি কখন হয়? তবে আগ্রহের তারতম্য থাকিতে পারে, —আগ্রহ সম্পন্ন পক্ষে বাধা বিঘ্ন থাকিতে পারে। আগ্রহের অপেক্ষা বাধা বিঘ্নের বল বেশী হইলে, আগ্রহ বিফল হইবে কিন্তু আগ্রহের বল বাধা বিঘ্নের শক্তি অপেক্ষা অধিকতর হইলে উহা সফল না হইবে কেন? এখন আমাকে আগ্রহের বল বৃদ্ধি করিতে হইবে।

অভাবের সঙ্গে আছে পূরণের পথ।
ইচ্ছা হ'তে জন্মে চেষ্টা পূরে মনোরথ।
অবশ্যই অভাবের হয় তিরোধান।
আছে কোন উপযুক্ত এমন বিধান॥

একাগ্র চিত্তে চিন্তা শক্তির প্রেরণা দ্বারা আমার আকাঙ্খাটী জননীর গোচর করিবার নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ জননীর মুখ খানি বিবর্ণ হইয়া পড়িল, ছল ছল নেত্রে পিতার মুখ পানে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ এখনও সে তারে খবর আসিল না?" পিতা বলিলেন "আমার স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অস্ত্র চিকিৎসা নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে আর সতীশের ভিতর দিয়া ভগবানের করুণা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, বোধ করি তাহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকায় সতীশ এখনও খবর পাঠাইতে পারে নাই, তুমি সতীশের ভ·········কল্যাণ কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর" জননী বলিলেন "দেখ আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না, প্রাণ আমার ছট ফট

করিতেছে, চক্ষু কর্ণ দিয়া যেন আগুনের শিখা বাহির হইতেছে” পিতা বলিলেন “স্নেহেই গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা—“এটী স্নেহেরই স্বভাব, ভয়ের কারণ নয়, আমি নিশ্চয় বলিতেছি বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর” জননী সাশ্রু নেত্রে পিতার উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমার মন বড়ই চঞ্চল হইল, ভাবিতে লাগিলাম, আমার মৃত্যু সংবাদ না জানি ইহাঁদের কি সর্ব্বনাশই ঘটাইবে। হঠাৎ আমার ভ্রাতাকে মনে পড়িল; কি আশ্চর্য্য—তৎক্ষণাৎ দেখিলাম, দাদা পদ্মাগর্ভে একখানি জাহাজে একটী সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। ক্রমে আমিও বুঝিতে পারিলাম যে স্থানের দূরত্ব আমার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেছে না; কোনরূপ চিন্তার উদয় হইবা মাত্র বিদ্যুৎ বেগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। সাহেবটী কথা বার্ত্তার পর, উপরের ঘরে চলিয়া গেলেন দাদা একাকী ঢাকার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া আকাশ পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, আমার সত্বাটী তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহার দৃষ্টি যেন অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, হঠাৎ তিনি কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন, তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—না তাহা কখনই হইতে পারে না, মাথাটা গরম হইয়াছে, বলিয়া পাঠাতনের উপর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন জন্য পদচারণা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ ঘণ্টা বাজিল, তিনি ত্বরিত পাদ বিক্ষেপে পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এখন সতীশ বাবুকে দেখিবার জন্য লালসা প্রবল হইল, হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল দেখিলাম অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি মণ্ডলের অভ্যন্তরে আমার সর্ব্বস্ব সতীশ বাবু ধ্যান নিবিষ্ট চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইচ্ছা হইল তাহার পদ প্রান্তে লুটাইয়া পড়ি কিন্তু সেই অদ্ভুত জ্যোতি মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না; তখন তাঁহার সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইতে লাগিলাম, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোকে জ্যোতিরিঙ্গণ স্বীয় জ্যোতি মহিমা পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে; মক্ষিকা, স্বীয় শুণ্ড সাহায্যে হিমাচলের ধৈর্য্য বিচলিত করিতে আসিয়াছে। সম্মান ও প্রীতির যুগপৎ আবির্ভাবে আমার চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল, আমি দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিলাম, শুধু

প্রণাম করিয়া প্রাণ তৃপ্ত হইল না, মনে মনে আলিঙ্গন করিলাম, আমার সর্ব্বস্ব একাকী আমার সম্মুখে থাকিতেও মনে মনে আলিঙ্গন করিলাম; হঠাৎ যেন তাঁহার মধুর আশ্বাসে আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার পার্থিব বিষয়ের স্পৃহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা দেখিতে দেখিতে তিরোহিত হইল, পলে পলে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, ক্রমে পরিত্যক্ত জগতের প্রতি স্নেহ, মমতা, ও অভিমান চির কালের মত চলিয়া গেল। এখন আমি একাকী, এ জগতের জন প্রাণীর সহিত আমার পরিচয় হয় নাই, একাকী থাকা বড়ই কষ্টকর বোধ হইল, ভাবিলাম এখানকার লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করি কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না; এইরূপে নির্জ্জন ও নিস্তব্ধতা পূর্ণ জগতে আমাকে একাকী থাকিতে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে বিচলিত হইলাম, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, বুঝিলাম মরিলেও জীবের শান্তি নাই, কষ্টের অবসান বুঝি কিছুতেই হইবার নয়। হায় অবলম্বন শূন্য হইয়া, এই নিস্তব্ধতা পূর্ণ, অনন্ত বিস্তীর্ণ জগতে আমাকে থাকিতে হইবে! এখন আর মরিতে পারিব না, আত্মহত্যারও উপায় নাই, হায় আমার কি হইবে, কে আমার পরিত্রাণ করিবে। মৃত্যুর পর সকলে ফুরাইয়া যায় হায় কেন এ ভুল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল হায় কেন আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি নাই। হায় আমি অনন্ত বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা পূর্ণ নির্জ্জন প্রদেশে পলাইয়া আসিয়াছি, এখানে আমাকে কেহ ধরিতে আসিবে না তথাপি উদ্বেগ বাড়িতেছে কেন? বুঝিলাম—পলায়িতের যন্ত্রণার তুলনায় বন্ধের যন্ত্রণা কোটী গুণে বাঞ্ছনীয়; হায় আমি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা মৃত্যুর ভীষণ অত্যাচার এড়াইয়া মৃত্যু হীন জগতে আগমন করিয়াছি, এখন আমার মৃত্যু ভয় নাই, তথাপি উদ্বেগ বাড়িতেছে কেন? বুঝিলাম এরূপ অমরের যন্ত্রণার তুলনায় মরণ ধর্ম্মশীলের যন্ত্রণা কোটী গুণে বাঞ্ছনীয়। হায় আমি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে আসক্তি শূন্য হইয়া, কাম ক্রোধ, লোভ শোকাদির মর্ম্মান্তিক পীড়ন মুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ হইয়াছি, তথাপি উদ্বেগ বাড়িতেছে কেন? বুঝিলাম—নিঃসঙ্গের যন্ত্রণার তুলনায় সঙ্গ যুক্তের যন্ত্রণা কোটী গুণে বাঞ্ছনীয়। হায় পূর্ব্ব জীবনে জীব যে সকল যন্ত্রণার বিষয় কখন কল্পনা

করে নাই আমি পুরা জীবনে তাহাই ভোগ করিতেছি। একবার মনে হইল কোনরূপ চিন্তা করিব না, মন স্থির করিয়া বসিয়া থাকি, চেষ্টা দ্বারায় বুঝিলাম চিত্ত স্থির করিবার শক্তি আমায় নাই। মনে হইল কোন সহৃদয় দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান কেহ কি নাই, যিনি (সতীশ বাবুর মত নিজগুণে) আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন? আবার মনে হইল, আমার পূর্ব্বের ধারণা সকল তবে কি ভ্রম প্রমাদ দ্বারা গঠিত? বাল্যকালে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম তাহাই কি তবে সত্য? যে সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চ্চায় আনন্দের সহিত চিরজীবন অতিবাহিত করিলাম, হায় আমার এজীবনে তাহারা বিন্দুমাত্র উপকার করিল না; হায় আমি কেন তাহাদের জড় যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে অনাস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল—আমি পাপী, আমি শাস্ত্রাদিতে অশ্রদ্ধাবান, দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই ভীষণ শাস্তি প্রয়োগ করিতেছেন; আমার মত অবিশ্বাসী হতভাগ্য ব্যতিত, অন্য পাপীর পক্ষে এরূপ যন্ত্রণার ব্যবস্থা হয় না। আবার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ভরে, উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম হঠাৎ সতীশ বাবুর সেই জ্যোতি পূর্ণ বদন মণ্ডলের প্রফুল্লতায় আমার অবসন্ন হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হইয়া উঠিল আমি তাঁহার চরণ তলে দণ্ডবৎ লুটাইয়া পড়িলাম, আমার হৃদয় মন প্রাণ আনন্দে শীথিল হইয়া পড়িল, কি এক প্রকার মত্ততায় বিহ্বল হইয়া আমিও নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে—"পিচ্‌কারী কোথায় আর একবার ঔষধ প্রয়োগ কর" দূর হইতে উক্ত কয়েকটী কথা আমার কর্ণ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। পরক্ষণেই কে যেন আমার চক্ষের পাতা উত্তোলন করিলেন, আমি অস্পষ্ট দৃষ্টিতে আমার ডাক্তার ও বড় সাহেবকে দেখিতে পাইলাম, আমার মস্তক ঘুরিতে ছিল, সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছিল, বিশদরূপে সকল বিষয় বুঝিতে পারিতে ছিলাম না। জন্মের মত ধরাধাম পরিত্যাগের অবস্থা এরূপ ভাবে আমার ধারণায় বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে পুনরায় আমি এ জগতে প্রত্যাগত হইয়াছি, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও দৃঢ় প্রতীতি হইতে ছিল না; ধীরে ধীরে পূর্ব্ব স্মৃতির আবির্ভাব হইতে লাগিল; বিনয় নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "Operation হইয়াছে কি?" সহকারী ডাক্তার বলিলেন,

"হাঁ, শীঘ্র সারিয়া উঠিবে ভয় নাই, ঘুমাও"। ক্রমশঃ চেতনা শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পার্শ্ববেদনাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিল, চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল; ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না, বড়ই যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু পর জগতের অভিজ্ঞতা লাভের চিন্তায় আমার দৈহিক কষ্টের প্রবলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িল অতি অল্পদিন পরে আমি সম্পূর্ণরূপে আরগ্যলাভ করিলাম। সেই ঘটনা, সেই দিন, সেই যন্ত্রণা, সেই নাস্তিকতা, সেই অহঙ্কার একে একে সমস্তই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরজীবনের সেই নীরব ভীষণতা পূর্ণ ঘটনারাজী আজিও আমার চক্ষের উপর তরঙ্গ মালার ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর আমার প্রাণের দেবতা— জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই সতীশ চন্দ্রের স্বর্গীয় মধুর আশ্বাস, এখনও আমার আত্মার অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সমুদ্র মন্থনে হলাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল।

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দোঁহামৃতলহরী।

:+:

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২১)

জৌলোঁ ঘট মে সাঁস হৈ হোয় রহো হরিদাস।

পূরে আশ নিরাশ কী বাসুদেব উর বাস॥

যতদিন এই দেহ ঘটে শ্বাস থাকিবে, হে মানব! শ্রীহরির চরণে দাস হইয়া থাক; হৃদয়ে বাসুদেবের অধিষ্ঠান হইলে নিরাশেরও সকল আশা পূর্ণ হয়।

(২২)

মান মুণ্ডমালী কহো নরক কুণ্ড নহি জায়।

কোটি ঝুণ্ড পাপী তরে পুণ্ডরীক গুণ গায়॥

স্বয়ং মুণ্ডমালী (মহাদেব) যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ ও বিশ্বাস করিও যে পুণ্ডরীকাক্ষের মহিমা কীর্ত্তন করিলে জীবকে নরককুণ্ডে পতিত হইতে হয় না; অসংখ্য কোটী মহাপাপী তাঁহার নাম গান করিয়া উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

(২৩)

ভাব সরস সমঝত সবৈ ভলে লগে ইহ ভায়।
জৈসে ঔসর কী কহী বাণী সুনত সুহায়॥

উৎকৃষ্ট ভাবের কথা সকলেই বুঝিতে পারে ও বোধ হয় সকলেরই ভাল লাগে, অবসর মত উক্ত হইলে ঐরূপ কথা শুনিতে বড়ই সুমধুর ও সন্তোষ জনক হয়।

(২৪)

নীকী পৈ ফীকী লগৈ বিন ঔসর কীবাত।
জৈসে বরণত যুদ্ধ মেঁ রস সিঙ্গার ন সুহাত॥

পরন্তু যতই উত্তম ভাবের কথা হউক না কেন অবসর মত কথিত না হইলে তাহা নীরস বোধ হয়, যেমন যুদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে শৃঙ্গার রসের অবতরণ কখনই কাহারও চিত্ত বিনোদন করে না।

(২৫)

ফীকী পৈ নীকী লগৈ কহিয়ে সমৈঁ বিচার।
সব কে মন হর্ষিত করৈ জ্যোঁ বিবাহ মে গার॥

পরন্তু যতই লঘু বিরস বচন হউক না কেন সময় বুঝিয়া কহিতে পারিলে বড়ই সুন্দর ও মধুর বলিয়া সমাদৃত হয়, যেমন বিবাহ বাসরে গালাগালিও সকলের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

(২৬)

জাহী তেঁ কছু পাইয়ে করিয়ে তা কী আস।
রীতে সরবর পৈ গয়ে কৈসে বুঝত পিয়াস॥

যাহার নিকট হইতে কিছু পাইতে পার তাহারই প্রত্যাশা করিও, নচেৎ শুষ্ক সরোবরের নিকট যাইলে পিপাসা কিরূপে নিবৃত্তি হইবে

(২৭)

স্বাতি বুঁদ হৈ সঘন মেঁ চাতক মরত পিয়াস।
জো জাহীকে হ্বৈ রহৈ সো তিঁহিঁ পুরে আস॥

স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু মেঘের ভিতর থাকে, চাতক পিপাসায় মরিয়া যায় (তথাপি অন্যজল পান করে না) যে যাহার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া থাকে সে তাহার আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ করে।

(২৮)

ভলে বুরে সব এক সে জৌলোঁ বোলত নাহিঁ।
জান পরত হৈঁ কাক পিক ঋতু বসন্ত কে মাহিঁ॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কথা কয় ততক্ষণ ভাল মন্দ সবই এক সমান বোধ হয়, যেমন কাক ও কোকিলের প্রভেদ বসন্ত ঋতুর সমাগমেই (অর্থাৎ যখন কোকিলের স্বরস্ফূর্ত্তি হয় তখনই) জানা যায়।

(২৯)

মধুর বচন তেঁ জাত মিট উত্তম জন অভিমান।
তনক শীত জল সোঁ মিটে জৈসে দূধ উফান্॥

সাধু সজ্জনের রোষ অভিমান একটী মিষ্ট কথাতেই মিটিয়া যায়; যেমন দুগ্ধ উথলিয়া উঠিলে একবিন্দু শীতল জল প্রক্ষেপেই তাহা প্রশমিত হয়।

(৩০)

সবৈ সহায়ক সবলকে কোই ন নিবল সহায়।
পবন জগায়ত আগ কৌ দীপহিঁ দেত বুঝায়॥

বলবানের সহায়তা সকলেই করিয়া থাকে, দুর্ব্বলের সহায় কেহই হয় না; যেমন পবন অগ্নিকে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলে, পরন্তু প্রদীপকে নিবাইয়া দেয়।

(৩১)

কছু বসায় নহিঁ সবল সোঁ করৈ নিবল সোঁ জোর।
চলৈ ন অচল উখার তরু ডারত পবন ঝকোর॥

বলবানের উপর কাহারও কিছু আধিপত্য চলে না, দুর্ব্বলের উপরেই সকলে বিক্রম প্রকাশ করে; প্রবল প্রভঞ্জন পর্ব্বতকে একপদও বিচলিত করিতে পারে না, অসার বৃক্ষকেই সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে।

(৩২)

জো জাহী সোঁ রচি রহ্যৌ তিহিঁ তাহী সোঁ কাম।
জৈসে কিরবী আক বা কো কহা করৈ বস আম॥

যে যাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রীতি লাভ করে তাহারই সঙ্গে তাহার প্রয়োজন; আকন্দের কীট আম্রের ভিতর কি করিতে বাস করিবে.

(৩৩)

প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ অনমিল তেঁ ন মিলায়।
দূধ দহী তেঁ জমত হৈ কাঁজী সে ফট জায়॥

প্রকৃতির মিল হইলে মনের মিল হয়, প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকিলে মনের মিল কথনই হয় না; যেমন দুগ্ধ দধির সম্মিলনে জমিয়া যায় কিন্তু কাঁজীর সংস্পর্শে ফাটিয়া যায়।

(৩৪)

পর ঘর কবহুঁ ন জাইয়ে গয়ে ঘটত হৈ জ্যোতি।
রবি মণ্ডল মেঁ জাত শশী ছীন কলা ছবি হোতি॥

পরগৃহে কখনও যাইও না, যাইলে নিজ জ্যোতিঃ (গৌরব) হ্রাস প্রাপ্ত হয়; শশধর সূর্য্যমণ্ডলের যতই নিকটবর্ত্তী হন ততই তিনি ক্ষীণ ও মলিন হইতে থাকেন।

(৩৫)

ব্রহ্ম বনায়ে বন রহে তে ফির ঔর বনৈ ন।
কান কহত নহিঁ বৈন জো জীভ সুনত নহিঁ বৈন॥

বিধাতা যাহাকে যেরূপ গড়িয়াছেন সে চিরদিন সেইরূপই থাকিবে সে আর পুনরায় অন্য প্রকার গঠিত হইতে পারে না; (যতই চেষ্টা কর) কর্ণ কখনও কথা কহিতে পারে না অথবা জিহ্বাও কখনও কথা শুনিতে পায় না।

(৩৬)

মূরুখ গুণ সমঝৈ নহী তৌ ন গুণী মেঁ চুকা।
কহা ভয়ো দিন কো বিভৌ দেখী জৌন উলুক॥

মূর্খ যদি গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয় তাহাতে গুণীর কোনও দোষ নাই; পেচক যদি তাঁহার কিরণের প্রতি চাহিতে না পারে তাহাতে দিনমণির কি দোষ হইল?

(৩৭)

মূঢ় তহাঁ হী মানিয়ে জহাঁ ন পণ্ডিত হোয়।
দীপক কী রবিকে উদয় বাত ন বূঝৈ কোয়॥

মূর্খ সেই স্থানেই সম্মানিত হয় যে স্থানে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকেন; রবির উদয়ে প্রদীপের কথা কেহই মনে করে না।

(৩৮)

নিপট অবুধ সমঝৈ কহা বুধ জন বচন বিলাস।
কবহুঁ ভেক ন জানহী অনল কমল কী বাস।

অত্যন্ত অবোধ ব্যক্তি বুধজনের বচন মাধুরি কি রূপে উপলব্ধি করিবে? ভেক কথনও অমল কমলের সুরভির আঘ্রাণ পায় না।

(৩৯)

সাঁচ ঝুঁঠ নির্ণয় করৈ নীতি নিপুণ জো হোয়।
রাজহংস বিন কো করৈ ক্ষীর নীর কো দোয়॥

যে ব্যক্তি নীতি নিপুণ হয় সেই সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়, রাজহংস বিনা কে আর ক্ষীর নীরকে পৃথক করিতে পারে?

(৪০)

দোষহি কো উমহৈ গহৈ গুণ ন গহৈ খল লোক।
পিয়ৈ রুধির পয় না পিয়ৈ লগী পয়োধর জোক॥

খল লোক বাছিয়া বাছিয়া পরের দোষই গ্রহণ করে, গুণ কখনও গ্রহণ করে না; যেমন পয়োধরে জোঁক বসিলে সে রুধির পান করে, কখনই পীযূষ পান করে না।

(৪১)

কারজ ধীরে হোত হৈ কাহে হোত অধীর।
সময় পায় তরবর ফরৈ কেতিক সীঁচো নীর॥

সকল কার্য্যই ধীরে হয়, অধীর হও কেন? সময় হইলেই তরুবর ফলিবে নতুবা কতই জল সিঞ্চন কর কিছুতেই কিছু হইবে না।

(৪২)

কোঁ কীজৈ ঐসো জতন জাতেঁ কাজ ন হোয়।
পরবত পৈ খোদৈ কুআ কৈসে নিকসে তোয়॥

কি জন্য সেরূপ প্রয়াস কর যাহা হইতে কার্য্য সফল না হয়, পর্ব্বতের উপর কূপ খনন করিলে কিরূপে তাহা হইতে জল নির্গত হইবে।

(৪৩)

জো চাহৈঁ সো করৈঁ বড়ে অসংকিত অঙ্গ।
সব কে দেখত নগন হর ধরও গৌর অরধঙ্গ॥

মহৎ ব্যক্তির যাহা ইচ্ছা হয় নিঃশঙ্কিত ভাবে তিনি তাহাই করিয়া থাকেন (তাহার নিদর্শন দেখ) সকলের সমক্ষে দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব উলঙ্গ হইয়া নিজ অর্দ্ধাঙ্গিনী গৌরীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(৪৪)

বড়ে সহজ হী বাত সোঁ রীঝ দেত বকসীস।
তুলসী দল তেঁ বিষ্ণু জ্যোঁ আক ধতূরে ঈশ॥

মহৎ ব্যক্তিগণ সামান্য কথাতেই পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকে; (তাহার নিদর্শন দেখ) সামান্য তুলসী পত্রে নারায়ণ এবং আকন্দ ও ধুতুরা ফুলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া (অভিলষিত বর প্রদান করেন)।

(৪৫)

সুধরী বিগরৈ বেগ হী বিগরী ফির সুধরৈ ন।
দুধ ফটৈ কাঁজী পরৈ সো ফির দুধ বনে ন॥

ভাল দ্রব্য শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যায়, একবার বিকৃত হইলে পুনরায় আর

তাহা সংশোধন হয় না; একবিন্দু কাঁজী পড়িলেই দুগ্ধ কাটিয়া যায় পুনরায় তাহাকে আর কোন উপায়ে দুগ্ধ করা যায় না।

(৪৬)

ছোটে নর তেঁ রহত হৈঁ সোভাযুত সিরতাজ।
নির্ম্মল রাখৈ চাঁদনী জৈসে পায়ন্দাজ॥

ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাই রাজ মুকুট শোভাযুক্ত থাকে; যেমন পাপোসই শুভ্র আস্তরণকে নির্ম্মল রাখে।

(৪৭)

সহজ রসীলো হোয় সো করৈ অহিত পর হেত।
জৈসে পীড়িত কীজিয়ে ঈখ তউ রস দেত॥

যিনি স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি হন তিনি অহিতকারীও প্রতি হিত আচরণ করিয়া থাকেন, যেমন ইক্ষুকে যতই পীড়ন কর তবু তোমাকে সুমধুর রস প্রদান করিবে!

(৪৮)

কবহূঁ কুসঙ্গ ন কীজিয়ে কিয়ে প্রকৃতি কী হানি।
গূঙ্গে কো সমঝায় বো গূঙ্গে কী গতি আনি॥

কখনও কুসঙ্গ করিও না কারণ কুসংসর্গ সুন্দর প্রকৃতিকে নষ্ট করে; মূককে বুঝাইতে হইলে স্বয়ং মূকত্ব স্বীকার করিতে হয়।

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বসন্ত ও ললিতা।

ঋতুর মধ্যে তিনি বসন্ত। সেই শ্রীমুখের বাণী গীতায় শুনিয়াছি।

তিনি বসন্ত রাগে রঞ্জিত। তাঁহার চিৎশক্তি রাগ। সখি ললিতা। তাঁহার রাগ বসন্ত। ললিতা রাগিণী। বসন্ত এবং ললিতার ঠাট একপ্রকার।

স রে গ ম ম ধ নি। প্রভেদ এই যে ললিতা দ্বিতীয় স্তরে অতিক্ষীণা,

১ স্তর　২ স্তর

কিন্তু প্রথম স্তরে "রে গ ম" লইয়া দোদুল্যমানা। উষাকিরণ শোভিতা (Orange) পীতবসনা (Yellow) শ্যামলাঙ্গা (Green)। সম্পূর্ণ বসন্তের উষার ছবি। পুরাতন সঙ্গীত শাস্ত্রে অনেক স্থানে ললিতা ভৈরবের সহচরী বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইহার কারণ যে প্রথম স্তরে ললিতা ও ভৈরবের ঠাট একই সম্পূর্ণ প্রভাতের ছবি। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের সুরগুলি সম্পূর্ণ ভৈরবের বিরোধী। ভৈরবের সহচরী যে বসন্তের সহচরী হইবে না এমন কোন কথা নাই, সুতরাং এ স্থলে উভয়ের রূপের মীমাংসা করিলেই তর্ক ঘুচিয়া যাইবে। মধ্যম হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত শ্যামল হইতে গাঢ় নীলের ক্ষেত্র। শ্রীমতী ব্লাভাটস্কি Secret Doctrine গ্রন্থে তাহাদিগের নিম্ন লিখিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

Green	...	ম	বসন্তে পঞ্চম বর্জ্জিত।
Indigo	...	ধ	
Violet	...	নি	

Sir William Crookes মহোদয়ের Table of Vibrations হইতে এই মতের সাপক্ষে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও বিজ্ঞান জগতে অনেক মত ভেদ আছে। যাহাই হউক যখন গায়ক ও চিত্রকর উভয়েই স্বীকার করিবেন "ম" মধ্যম সুর (স রে গ ম প ধ নি) এবং শ্যামল (Green) মধ্যম বর্ণ (Violet. Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red), সুতরাং উভয়ই এক স্থানীয়, তখন অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে সময়ের অপলাপ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার তারতম্য কেবল ঠাট (Scale) প্রভেদে হয়, তাহা অন্যবারে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই শ্যামল ক্ষেত্রই বসন্তের রাগ। বসন্তকালে প্রকৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিতা হয় তন্মধ্যে শ্যামল বর্ণই প্রধান এই কারণে মধ্যম বসন্তের "জান" (প্রাণ) বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বসন্ত ঋতু কেবল নয়নমুগ্ধকারী তাহাই নয়। নব বসন্তে নবীন ভাব সকল নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় জীবনের সন্ধিস্থানে আসিয়া উদিত হয়। চিৎশক্তি সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পায়। কত স্মৃতি, কত আশা ভরসা নূতন বল পাইয়া দেহক্ষেত্রকে উত্তেজিত করে। প্রাণ যেন কাহাকে চায় (বিরহ?) এ সব ভাব কোথা হইতে আসে? হৃদয়ের কোন্ স্থানে তাহারা এত দিন লুকাইয়া থাকে? কোন প্রদেশ হইতে আবার নববাণী জগতে প্রচারিত হয়? বিখ্যাত গায়ক সদারঙ্গ গাহিয়াছেন "কোয়েলিয়া বোলিরে পিউ কোন দেশ কি বাঁতিয়া? যবসে দৃষ্টপড়ি লালন পর উন বিনে রহিল ন যায়" অর্থাৎ "রে প্রিয়সখি কোকিলা কোন দেশের কথা বলিতেছে? যে দিন হইতে (কৃষ্ণ) তিনি নয়ন পথে উদিত হইয়াছেন তাঁহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।" কোকিল পঞ্চম স্বরে কোন দেশের কথা বলে তাহা ভক্তগণ বিচার করুন। কোকিল যে দেশের কথা বলে তথায় এই ভাবরাজ্যের অধীশ্বর লুক্কায়িত আছেন। এই জন্য বসন্তে পঞ্চম লুপ্ত। কিন্তু লুপ্ত হইলে কি হয়? গায়কগণ সাবধানে সেই রাজ্যে মনকে লয় করিয়া সুররূপী ফুলেরসাজি হস্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যান। গায়ক অতি চিন্তাকুল, যদি বসন্তে পঞ্চম সুর লাগে তবেইত সর্ব্বনাশ! অতি স্পষ্ট সুমধুর স্বরে শ্যামল রাগে হৃদয় রঞ্জিত করিয়া, উষায় প্রস্ফুটিত, ললিতা রাগসিক্ত নানাবর্ণের ফুল সযত্নে আহরণ করিয়া, সেই পঞ্চমে লুক্কায়িত দেবতাকে কি করিয়া হৃদয়ে পূজা করিতে হয় তাহার কারিকুরি বসন্ত রাগে বিদ্যমান, বসন্তের ছবিতে প্রতিফলিত এবং বসন্তের জীবন হিল্লোলে ব্যাপ্ত।

এখন লয় শব্দের অর্থ কি বিচার করা যাউক। যেমন চিত্রবিদ্যার Vanishing point বলিয়া একটা কথা আছে, তেমনি সঙ্গীত শাস্ত্রে "লয়" শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। যেখানে বর্ণ কিম্বা সুর Vanish করে অর্থাৎ লুপ্ত হয় সেই স্থান লয় স্থান বলিয়া অভিহিত।—সৌরজগতে লয় স্থান প্রলয়ের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাগ্রত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল অবস্থায় মনের লয় হইলে যোগীগণ চৈতন্য সমাধির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। এবম্বিধ লয়ের স্থানকে "অন্তঃকরণ" কহে। কতকগুলি বর্ণ লইয়া স্তরে স্তরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

করিয়া অবশেষে অদৃশ্য অবস্থায় পরিণত করিতে পারিলে চিত্রপটের লয় স্থান দেখাইতে পারা যায়। ইহা বিবাদী। অর্থাৎ ইহার Contrast, তুলনায় চতুর্দ্দিকের বর্ণগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। বসন্তের আকাশ প্রান্তরে অতি ধীরে লুপ্তপ্রায় নীলবর্ণ ক্ষীণভাবে চিত্রিত করিলে যে স্থানে সে নীল আর দেখা যায় না এবং যে স্থলে চিত্রক্ষেত্রের সজীব বর্ণগুলি বড় হইতে ক্ষুদ্র, এবং ক্ষুদ্র হইতে আরও ক্ষুদ্র (দূরত্ব অনুসারে) পদার্থগুলিকে রঞ্জিত করিয়া শেষে আকাশের সঙ্গে মিশাইয়া যায় তাহাই Perspective অনুসারে লয় স্থান। এই স্থান আছে বলিয়া চিত্রপটের সম্মুখের বর্ণগুলি অত্যন্ত সতেজ ও মনোহারী হয়। লয় স্থান বিবাদী সংবাদী উভয়ের সন্ধিস্থল। বসন্তরাগে পঞ্চম বিবাদী ও মধ্যম সংবাদী. কড়ি মধ্যম হইতে পঞ্চম পর্যান্ত লয়ের স্থান

সুর ও লয়ের সম্বন্ধ অতীব রহস্য পূর্ণ। চৈতন্য (Consciousness) কোন বিষয় গত (Subject) না হইয়া স্বীয় শক্তিতে অধিষ্ঠান করিলে তাহাকে আত্ম চৈতন্য কহে। কোন বিষয় একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে যখন কালের জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় এবং অন্তঃকরণ লয়ের অবস্থায় আসিয়া পড়ে তখন সে ভাবনার বিষয়টী পর্য্যন্ত অপসৃত হইয়া একটী আত্মবিস্মৃত উপস্থিত হয়। এই আত্মবিস্মৃতি আত্মচৈতন্যের ক্ষেত্র। কিন্তু এ অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না, কেননা আমরা সাধনায় রত নহি। সহসা মানবদেহের সমুদায় ক্ষেত্র গুলি বিলোড়িত হইয়া পড়ে, যেন তাহারা প্রাণ শূন্য হয়। তখন নিম্ন প্রকৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণকে টানিয়া স্বীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের লয় বহির্মুখী শক্তির সঙ্কোচন মাত্র। কিন্তু এ শক্তি পুনঃ পুনঃ প্রসারণ ও আকুঞ্চন করিয়া যত লয়স্থানে সঞ্চিত করিতে পারা যায় ততই মানব মনস্বী ও যোগী হয়। পরযোগে ইহাকে মধ্যশক্তি কহে। মধ্যশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব গুলিকে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করা যায়, এমন কি সে ভাব গুলির রূপ দর্শন হয়, এবং সাধক তাহার মধ্যে ভাবের উৎসও দেখিতে পান।

যখন চৈতন্য চিত্রপটে থাকে তখন শক্তির গতি দূরত্ব (Space) নামক ভাব অবলম্বন করে। নয়ন, ত্বক প্রভৃতি দূরত্বের ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ তাহার বিচার করিয়া ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িলে বিষয়ের রূপ ক্রমশঃ অন্তর্ধান হইতে

থাকে, এদিকে লয়স্থানে মধ্যশক্তি প্রবুদ্ধ হয়। যখন চৈতন্য সুরে থাকে তখন শক্তির গতি কাল (Time) অবলম্বন করিয়া শেষে এমন স্থানে আসিয়া পড়ে যেখানে ক্রিয়াক্ষেত্রের সুরগুলি বাহ্যেন্দ্রিয় কর্ণকুহর পরিত্যাগ করিয়া আপনিই লয় পায়। এই মধ্য অর্থাৎ লয়স্থান হইতে চৈতন্য আবার নবশক্তি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বিষয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং পুনরায় লয় পায়। যাহার যত শক্তি তাহারা ততক্ষণ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন এবং লয়স্থানে অধিক শক্তি সংগ্রহ করেন। এক লয় স্থান হইতে অন্য লয় স্থান পর্য্যন্ত যে কাল তাহাকে বিভাগ করিলে 'মাত্রা' হয় এই মাত্রার উপর ছন্দ নির্ভর করে। দুইটী লয়ের মধ্যবর্ত্তী কালকে চারি বিভাগ সমান করিয়া দেখাইতে পারিলে তেতালা, তিন বিভাগ করিলে একতালা, ৩॥০ বিভাগ করিলে তেওরা, তাহার দ্বিগুণ ধামার, ছয় বিভাগ করিলে চৌতাল ইত্যাদি। প্রত্যেক সমে লয় স্থান দেখান হয়। যাঁহারা প্রসিদ্ধ গায়ক তাঁহারা সুরের লয় স্থানে সম দেখাইয়া নিজের ওস্তাদীর পরিচয় দেন।

মাত্রা যত দুরন্ত ব্যাপক অর্থাৎ বিলম্বিত ততই গায়কের শক্তিপ্রকাশক। যখন সৌর জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, তারকার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তখন বোধ হয় বিশ্বনাথ ধ্রুপদ গাহিতেছেন। তাঁহার মহাশক্তি প্রকৃতির অসীম ক্ষেত্রে বিচরণ পূর্ব্বক কত যুগ ধরিয়া প্রসারিত হইয়া আবার প্রলয় কালীন লয় পাইতেছে! ইহার কাল নিরূপণ করা জীবচৈতন্যের অসাধ্য। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী। অতি ক্ষমতাশালী হইলেও দ্বাদশ মুহূর্ত্ত একটা সুরে একাগ্রচিত্তে চৈতন্য স্থাপন করিতে পারি কি না সন্দেহ। যাঁহারা বহু দুর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা সাধনার অভ্যাস ক্রমে মাত্রা উপেক্ষা করিয়া অতি সুন্দর বক্রগতি (Curves) অবলম্বন পূর্ব্বক লয় স্থানে আসিয়া পড়েন। আমি স্বীকার করি যে মাত্রা অতি কদর্য্য পদার্থ, কিন্তু কালকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ কালের সাহায্য লইতে হয়। যে সোপান হইয়া তারকামণ্ডলী হইতে পৃথিবীর কুৎসিত ক্ষেত্রে মানব আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সোপান আবার মাত্রায় মাত্রায় আরোহণ করিতে হইবে, নচেৎ পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

বসন্ত, ললিতা প্রভৃতি রাগিণীতে ধামারই প্রশস্ত তাল। কেন না, যে সব রাগে মধ্যমের নিকটবর্ত্তী স্থানে সুর লয় হয় সেখান ধামার উপযোগী।

ইহার কোন আইন নাই, তবে গাহিলে দেখিতে পাইবেন যে ভাল লাগে। "ভাল লাগা" হৃদয়ের সহানুভূতি মাত্র। বসন্তকালে, বসন্ত রাগে, ধামার তালে হোরির গান ভাল লাগে। যদি না লাগে তবে আমার দুর্ভাগ্য। মধুমাসে অঙ্কক্ষেত্র অবলম্বন না করিয়া, সুরে চৈতন্য স্থাপন করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার করা হয়, প্রকৃতির নবসাজে নয়ন রঞ্জিত করিলে একগ্রতা হয়, ইহাদের সহিত প্রেম সংযোগ করিয়া সুগন্ধিযুক্ত মাল্যে বিভূষিত হইয়া, একবার হৃদয় দর্পনে আত্মদর্শন করিলে জানিবেন যে সুরও নাই, লয়ও নাই, প্রকৃতির নবসাজও নাই, অন্তরের হা হুতাশ ও বিরহও নাই, কেবল কালের প্রহেলিকা মাত্র; এইরূপ বারংবার দেখিলে জীবনে নব বল পাইবেন, এবং বোধহয় তদ্দ্বারা অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে, অনেক ব্যথিত হৃদয়ের হৃদয়ে ব্যথা দূর করিতে এবং সহধর্ম্মিণীকে স্তম্ভিত করিতে পারিবেন। 　　ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মানবীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু প্রকার আলোচনা ও পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও তাহার কার্য্যাবলীর বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময় সাগরে ভাসিতে হয়। সামান্য সামান্য কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেও আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্ম জগতের অদ্ভুত তথ্যের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। মনে করুণ আপনি একটী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন। এই বক্তৃতা স্বকর্ণে শ্রবণ করিলে মনের যে রূপ ভাব হয় এবং বক্তার চিন্তা স্রোতে দ্বারা আমরা যেরূপে ভাসিয়া যাই, ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া পাঠ করিলে কি আমাদের মনের ভাব

সেরূপ হয়? কখনই না। এরূপ হইবার কারণ এই যে বক্তৃতা কালীন বক্তার চিন্তা দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরে একটী বিশেষ প্রকার স্পন্দন উপস্থিত হয়, এই স্পন্দন সূক্ষ্ম জগৎ (Astral Plane) অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া বক্তৃতার স্থানের সমস্ত সূক্ষ্ম জগতেই ঐ স্পন্দন প্রবাহ সংক্রামিত হয়। পরে ঐ স্পন্দন প্রবাহ প্রত্যেক শ্রোতার সূক্ষ্ম শরীরেও অনুরূপ স্পন্দনপ্রবাহ উৎপন্ন করিয়া প্রত্যেক শ্রোতাকেই বক্তার অনুরূপ চিন্তা স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং এই জন্যই বক্তৃতা কালীন বক্তা যে প্রকার চিন্তা করেন শ্রোতারাও সেই প্রকার চিন্তা করিতে বাধ্য হন। সূক্ষ্ম জগতের উপরোক্ত রূপ অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারাই চিকিৎসালয়ের একটী রোগীর কোন প্রকার স্নায়বীয় বিকার উপস্থিত হইলেই চিকিৎসালয়স্থিত সমস্ত রোগীই ঐ বিকারে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং এই নিমিত্তই এক চিকিৎসালয়স্থিত সমস্ত রোগীর এক কালে রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। মোট কথা এই যে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উপরোক্ত রূপ অদ্ভুত কার্য্য বহির্জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে সম্প্রতি নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষা করিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই আমাদের উপরোক্ত সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। বিলাতী মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কেবল মাত্র জাগ্রত অবস্থায় সংবিদের (Consciousness এর) বিষয় অবগত হইয়া সন্তোষলাভ করিতে পারিতেছেন না। সিজ্‌ইক (Sidgwick) সলী (Sully) বেন (Bain) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আমাদের নিদ্রিত অবস্থার সংবিদের কার্য্যাবলীর বিষয় পরীক্ষা করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছেন। নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের সংবিদ্ সূক্ষ্ম জগৎ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের নিকট ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

যে সকল পরীক্ষার দ্বারা আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহার দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে পাঠক বর্গকে সাবধান করিয়া দিই যেন তাঁহারা স্বয়ং এ বিষয়ে কোনও রূপ পরীক্ষা করিতে অগ্রসর না হন, কারণ এ বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব

অবগত না হইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে নানা প্রকার বিপদ হইবার সম্ভাবনা এবং এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা আইন সঙ্গতও নহে।

(১) আমি কোনও ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা অচেতন করিলাম, এবং তাহাকে বলিলাম "এখন হইতে দুই ঘণ্টার পর তোমার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভব করিবে, এই বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উত্তপ্ত লৌহশলাকা স্পর্শে যে রূপ বেদনা উপস্থিত হয় তুমি সেইরূপ বেদনা অনুভব করিবে, কিছুক্ষণ পরে তোমার বাহুর ঐ স্থান রক্তবর্ণ হইবে, এবং উহাতে ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত উৎপন্ন হইবে।" ইহার পর ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হইল। উহার নিদ্রিত অবস্থায় কি হইয়াছে এবং উহাকেই বা কি বলা হইয়াছে সে তাহার কিছুই অবগত নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ঠিক দুই ঘণ্টা পরে উহার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভূত হইল এবং কিছু পরে উত্তপ্ত লৌহশলাকা স্পর্শে যেরূপ বেদনা, ফোস্কা ও ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাই হইল!! ফ্রান্সের প্যারী নগরীর Salpetriere নামক স্থানে উপরোক্তরূপে উৎপন্ন ক্ষতের অনেক আলোক চিত্র রক্ষিত আছে। যে সকল ব্যক্তিগণ ঐ সকল ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

(২) জনৈক ব্যক্তির চৈতন্য হরণ করা হইল। কতকগুলি সাদা কাগজ খণ্ড তাহার সম্মুখে রাখিয়া একটী তাসের মাপে একখানি কাগজের উপর একটু কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা একটী কৃত্রিম চতুষ্কোণ রেখা টানিলাম। পরে এই কাগজ খানী অবশিষ্ট কাগজগুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিলাম। ঐ ব্যক্তির চেতনা হইবার পর উহার হস্তে সাদা কাগজ গুলী দিয়া উহার কোনটীতে রেখা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় ঐ ব্যক্তি বাছিয়া বাছিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিল "আমি এই কাগজে তাসের আকারের একটী চতুষ্কোণ রেখা দেখিতে পাইতেছি"। রেখায় রেখায় কাগজখানী মুড়িতে বলায় সে ঐ কাগজখানি মুড়িল, পরে তাসখানি লইয়া উহার উপর রাখায় দেখা গেল যে কাগজটী ঠিক তাসের আকারেই মোড়া হইয়াছে, একটুও কম বেশী নাই!!

(৩) এইবার যে পরীক্ষাটীর উল্লেখ করিব তাহা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং পরীক্ষক বিশেষ দক্ষ ও শিক্ষিত না হইলে কোনই ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমি এক ব্যক্তিকে অচেতন করিয়া উহার সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড রাখিয়া দিলাম। পরে আমি একাগ্র চিত্তে একটী ঘড়ির (Watchএর) বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলাম। আমার পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আমি এরূপ প্রগাঢ়ভাবে ঘড়িটীর বিষয় ভাবিতে লাগিলাম যে আমার মানস চক্ষে ঐ ঘড়ি ব্যতীত আর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞান রহিল না। আমি ঐ ঘড়িটী জড় পদার্থরূপে দেখিতে লাগিলাম এবং আমর ঘড়ির ঐ মানসিক চিত্রটী হৃত-চৈতন্য ব্যক্তির সম্মুখস্থিত একটী কাগজ খণ্ডের উপর পাতিত করিলাম। আমি ঐ ব্যক্তিকে স্পর্শও করিলাম না কিম্বা উহাকে সম্বোধন করিয়া কোনও কথাও বলিলাম না। ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ কাগজ খণ্ড উহাকে দেখাইবামাত্র ঐ ব্যক্তি বলিল "আমি এই কাগজের উপর একটী ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি" ! ! ঘড়িটীর বর্ণনা করিতে বলায় ঐ ব্যক্তি আমার চিন্তিত ঘড়িটীর অবিকল বর্ণনা করিল ! !

আমাদের মানসিক চিন্তা দ্বারা উপরোক্ত রূপ জড় পদার্থের উৎপত্তি বিস্ময়াবহ হইলেও অসম্ভব নহে। নিম্ন লিখিত প্রকারে ঐরূপ পদার্থের উৎ-পত্তি হইতে পারে। আমাদের কেন্দ্রীভূত প্রগাঢ় চিন্তার দ্বারা সূক্ষ্ম জগতে একটী বিশেষ স্পন্দন উপস্থিত হয় এবং ঐ স্পন্দনের প্রভাবে সূক্ষ্ম জগতে চিন্তিত দ্রব্যের একটী সূক্ষ্ম চিত্র (Astral Image) উৎপন্ন হইয়া থাকে। দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance) দ্বারা ঐরূপ চিত্র অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। কোনও ব্যক্তির চৈতন্য হরণ করিলে উহার সংবিদ (Consciousness) সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করিতে থাকে„ এই সময় ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সূক্ষ্মচিত্র (Astral Image) দেখিতে পায় এবং উহার সূক্ষ্ম জগৎস্থিত ঐ জ্ঞান স্থূল জগতে এবং স্থূল চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। তখন ঐ ব্যক্তি বাস্তবিকই স্থূল জগতে মানসিক চিন্তার দ্বারা উৎপন্ন স্থূল পদার্থ দেখিতে পায়। মোট কথা এই যে আমাদের মানসিক চিন্তা দ্বারা জড় পদার্থের উৎপন্ন হইতেপারে। বিখ্যাত বিলাতী পণ্ডিত প্রফেসর লজ্ (Professor Lodge) বহু পরীক্ষান্তে স্থির করিয়াছেন যে কোনও প্রকার বাহ্য সংশ্রব ব্যতীত একটী মানসিক ভাব এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে সংক্রামিত হইতে পারে, এবং আমাদের প্রগাঢ় মানসিক চিন্তা দ্বারা জড় পদার্থের উৎপত্তিও অসম্ভব নহে।

মানসিক ব্যাপার দ্বারা জড় বস্তুর উৎপাদনরূপ বিস্ময়কর ঘটনার দৃষ্টান্ত আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নহে। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। কি প্রণালীতে মানসিক চিন্তা জড় বস্তুতে পরিণত হয় এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

আমরা যখন কোনও জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করি তখন আমাদের চিত্ত দর্পণে ঐ বস্তুর একটী অবিকল প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। প্রতিকৃতি সূক্ষ্ম ভূতের (Astral matter) সংঘাতে গঠিত। প্রগাঢ় চিন্তা পুনঃ পুনঃ ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র হইলে ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রতিকৃতিটী স্থূল জগতে (Physical Planeএ) ব্যক্ত হইয়া পড়ে। দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায় যে অব্যক্ত কারণ রূপ হইতে ব্যক্ত জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে মহাপুরুষদিগের চিন্তা প্রসূত বহু সংখ্যক পত্র এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরাবিদ্যার্থীর নিকট উপরোক্ত সংবাদ নূতন নহে।

আমাদের মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের একাগ্র মানসিক ব্যাপার দ্বারা কত অদ্ভুত রহস্য উৎপন্ন হয় তাহা ভাবিলে বিস্ময়সাগরে ভাসমান হইতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল বিস্ময়কর অদ্ভুত তত্ত্বের কথা বলিয়াছি তাহা সমস্তই আমাদের মস্তিষ্ক ও আমাদের একাগ্র মানসিক চেষ্টার ফল মাত্র। এক্ষণে হয়ত কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে "যদি মানসিক চিন্তার দ্বারা জড়বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তুমি আমি সাধারণ লোকে উহা করিতে সমর্থ হই না কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমরা আমাদের চিন্তা এবং ইচ্ছা শক্তিকে কখনও একাগ্র ও কেন্দ্রভূত করিতে অভ্যাস করি নাই বলিয়াই আমরা উপরোক্তরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার উৎপন্ন করিতে সমর্থ হই না। অনেকে শুনিয়া হয়ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই প্রকৃত পক্ষে চিন্তা করিতে সমর্থ নহেন!!

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রতীয়মান হইবে। আমি যদি আপনাকে একমনে একটী বস্তুর বিষয় ভাবিতে বলি আপনি কিছুতেই একমনে ঐ বস্তু ভাবিতে পারিবেন না। মনে করুন আমি কেবল মাত্র আপনাকে একটী ঘড়ি দেখাইয়া উহার বিষয় চিন্তা করিতে

করিলাম। আপনি কেবল ঐ ঘড়ির বিষয় চিন্তা করিবেন স্থির করিয়া তাহাতে মনে নিবেশ করিলেন, কিন্তু দেখিবেন অর্দ্ধ মিনিট কাল ঘড়ির কথা না ভাবিতে ভাবিতে অন্য অসংখ্য প্রকার চিন্তা আসিয়া আপনার মানসরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিবে। আপনি হয়ত মনে করিবেন "আমি এক্ষণে ঘড়ির কথা ভাবিতেছি কিন্তু আমার পার্শ্বস্থ ভ্রাতা এক্ষণে অন্য কথা ভাবিতেছেন। আমি এইগৃহে প্রবেশ করিবার পরে অনেক লোক এই গৃহে আসিয়াছে, আমাকে যে ঘড়িটী দেখান হইয়াছে উহার অপেক্ষা আমার শ্বশুর আমাকে যে ঘড়িটী দিয়াছে তাহা দেখিতে খুব ভাল ও ঠিক সময় রাখে। যে ব্যক্তি আমাকে ঘড়িটী দেখাইল উহার জামায় মোটেই বক্ নাই!" ইত্যাদি বহুসংখ্যক চিন্তা আপনার মনোমধ্যে উদয় হইবে। আপনি সকল কথাই ভাবিবেন কেবল একমাত্র ঘড়ির কথাটিই ভাবিতে সমর্থ হইবেন না।।

মনে করুন কল্য আপনার একটী প্রয়োজনীয় মোকদ্দমা আছে। ঐ মোকদ্দমার চিন্তায় অদ্য রাত্রে আপনার কিছুতেই নিদ্রা আসিবে না, সমস্ত রাত্রি কেবল মাত্র মোকদ্দমার কথা তোলাপাড়া করিয়া কাটাইতে হইবে। আপনি মোকদ্দমার কথা এবং উহার ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া মোকদ্দমার ফলাফলের কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। বৃথা মোকদ্দমার কথা না ভাবিয়া সেই সময় অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। অথচ আপনি কিছুতেই মোকদ্দমার চিন্তা হইতে আপনার মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছেন না। এরূপ হইবার কারণ কি? এইরূপ হইবার এক মাত্র কারণ এই যে আপনি মোটে চিন্তা করিতে জানেন না এবং চিন্তার উপর আপনার নিজের কোন ও ক্ষমতা নাই। নিজের মনের উপর ক্ষমতা নাই বলিয়াই ত আমরা কোনও বিষয়ের প্রগাঢ় চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি না, এবং এই জন্যই মানস রাজ্যের বহুসংখ্যক স্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া মনকে নিজবশে রাখিতে পারিলে আমাদের অনেক অশান্তি দূরে পলায়ন করে। কেবল মাত্র উপস্থিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা করা আমাদের উচিত নহে। যদি কোনও অপকর্ম্ম করিয়া থাকি তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে আর কখনও সেরূপ

অপকর্ম্ম না করি॰ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিলেই হইবে। নতুবা অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্মটী নিজ জ্ঞান ও শক্তিমত সুসম্পন্ন করিয়া এই কর্ম্মের কথা একবারে ভুলিয়া পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করিব এই নিয়ম করিয়া রাখা উচিত। অতীত কর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অনুতাপে ম্রিয়মাণ থাকা কিম্বা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করা কর্ত্তব্য নহে। অতীত কর্ম্মের উপরোক্তরূপ বৃথা অনুতাপ বা আনন্দোত্থাপনে বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। সুতরাং গত কর্ম্মের চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং এই রূপে কর্ত্তব্য পরম্পরা সম্পাদনই মানসিক শান্তি প্রাপ্তির অমোঘ উপায়। আমরা সুনিয়মিত চিন্তা করিতে পারিলে আমাদের চিন্তা হইতে অনেক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে অনিয়মিত চিন্তা করিলে তাহা হইতে অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভবনা আছে। মোট কথা আমরা যে ভাবেই চিন্তা করিনা কেন আমাদের চিন্তার ফল বহুকাল স্থায়ী এবং বহুফল প্রসূ। চিন্তা-রাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব এই যে আমাদের চিন্তা সকল মূর্ত্তি (Forms) বিশিষ্ট। অন্য কোনও ব্যক্তি এই সকল চিন্তামূর্ত্তির (Thought forms এর) সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার চিন্তাও ক্রমে এই সকল চিন্তামূর্ত্তির সমভাবাপন্ন চিন্তার সহিত সংযুক্ত হইয়া সুফলোৎপাদনে সমর্থ হইবে এবং আমাদের চিন্তামূর্ত্তি কুভাবাপন্ন হইলে অন্যের কুভাবোৎপন্ন চিন্তার সহিত সংযুক্ত হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করিবে কিম্বা অন্যের সচ্চিন্তার ব্যাঘাত উৎপন্ন করিয়া * আমাদের চিন্তা সমূহের উক্ত রূপ ফল করিবার জন্যই আমাদের দায়িত্ব এবং এই জন্যই আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকার্য্যে সংযম আবশ্যক। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে এই প্রকার অসংখ্য [illegible] সৃষ্টি করিয়া হয় সাধারণের উপকার না হয় অপকার সাধন করিতেছি। সুতরাং যাহাতে আমরা কেবল মাত্র সচ্চিন্তাশীল হইয়া আমাদের নিজ ভবিষ্যতের ও অপর সাধারণের মঙ্গলের হেতু হইতে পারি সে বিষয়ে চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

---

* এসম্বন্ধে "পন্থার" দ্বিতীয় বর্ষের ভাদ্র মাসের সংখ্যার পূজনীয় শ্রীযুক্ত অনন্তরাম লিখিত "কর্ম্ম" নামক সারগর্ভ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক

মনে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সুখভোগের আশা প্রবল থাকিলে কখনই সচ্চিন্তার উদ্রেক হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সকলেরই তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখভোগের লালসা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্মার দ্বারা আস্বাদ্য পরমানন্দ রূপ সাত্ত্বিক সুখেই মগ্ন থাকা উচিত। কামনার দ্বারা মন সতত চঞ্চল থাকিলে সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস না করিলে কখনই হৃদয়ে শান্তির উদয় হয় না এবং সাত্ত্বিক সুখের ও আস্বাদন পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষণভঙ্গুর সংসার সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে আমাদের শাস্ত্রকারগণ পদে পদে উপদেশ দিতেছেন। ঐ শুনুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কি বলিতেছেন—

"আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি

অর্থাৎ যেমন নানা নদীকর্ত্তৃক আপূর্য্যমাণ হইয়াও অচঞ্চল সমুদ্রে অন্য নদীর জল স্রোত প্রবেশ করিয়া সমুদ্রেই মিশাইয়া যায়, সেইরূপ যাঁহাতে কামনা সকল লীন হয় তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সমুদায় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ নিরহঙ্কার ও ভোগ সাধনে মমতাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

সংসারে থাকিয়া অহংকার ও মোহের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে, সংসার সুখভোগের তুচ্ছ আসক্তি হইতে নিজকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে, ভগবানের পরম পদ লাভের জন্য সততই আত্মাকে উদ্‌যুক্ত রাখিতে হইবে। বহুকাল ব্যাপিয়া এইরূপ কঠোর চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে অহিঙ্কার।

নাশ হইয়া জ্ঞানজ্যোতির স্ফুরণ হইলে নিশ্চয়ই ভগবানের পরম অক্ষয় পদে স্থান লাভ করা যায়। কারণ—

"নির্ম্মান মোহা জিত সঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্ত কামা!
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তা সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ॥"

(সমাপ্ত।)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

ভবিষ্যপুরাণোক্ত

আদম হব্যবতীর বংশ বিস্তার।

আমাদের দেশের শাস্ত্র সমূহের মধ্যে পুরাণগুলি ইতিহাস স্থানীয়। পুরাণে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে উহা দেখিয়া অনেকে ইহাকে ইতিহাস বলিতে সম্মত নহেন, কারণ ঘটনার যথাযথ বর্ণনাই ইতিহাস কিন্তু কি য়ুরোপে কি ভারতবর্ষের ওরূপ ইতিহাস দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে যে সকল ইতিহাস লিখিত হইয়াছে সে গুলিও কল্পনার চিত্রে চিত্রিত। অতএব ইতিহাসমাত্রই যখন কল্পনামুক্ত নহে সুতরাং আমাদের পুরাণগুলিকে পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস বলায় ক্ষতি কি?

পুরাণের মধ্যে ১৮ শ খানি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সকল উপপুরাণ। এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভবিষ্য পুরাণ অতি বিখ্যাত। ভবিষ্যপুরাণে কল্পিত বৃত্তান্ত অপেক্ষা সত্য বৃত্তান্তের বর্ণনাই অধিক লক্ষিত হয়। ইহাতে দ্বাপর ও কলিযুগের অনেক বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমি কয়েক বৎসরপূর্ব্বে কোন একটি বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে ভবিষ্যপুরাণ * পাঠ করি এবং

---

* এই ভবিষ্যপুরাণ খানি অতি প্রামাণিক। বিগত ১৮৯৮ শকে মুম্বা-নগরীয় প্রসিদ্ধ বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রাযন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। আটখানি অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত পুস্তক মিলাইয়া ইহার মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।

উহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সংবাদ পাই। এতদ্ভিন্ন আদম হব্যবতীর বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল পাঠ করি নাই সুতরাং উহাতে আদম হব্যবতীর বংশের কি প্রকার বর্ণনা আছে তাহা অবগত নহি। ভবিষ্যপুরাণে যাহা আছে এখানে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

সূত বলিতেছেন ;—"দ্বাপর যুগের শেষে আর্য্যভূমি বহুবিধ কীর্ত্তিশালিনী হইয়াছিল কোনস্থানে ব্রাহ্মণ, কোথায়ও বা ক্ষত্রিয় কুত্রাপি বৈশ্য কোথাও শূদ্র কুত্রাপি বা বর্ণসঙ্করেরা রাজত্ব করিয়াছিল। তাহার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ম্লেচ্ছভূমি নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপে বিখ্যাত হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহের দমনকারী আত্মধ্যাননিরত আদম নামা এক পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী হব্যবতী *। ঈশ্বর প্রদান-নগরের পূর্ব্বভাগে একটি রমণীয় উদ্যান নির্ম্মাণ করিলেন, উহার আয়তন চারিক্রোশ। একদা কলি সর্পরূপ ধারণ করিয়া সেই আদম ও হব্য-বতীকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। আদম পত্নীর অনুরোধে পাপবৃক্ষের ফল ভোজন করিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে বিষ্ণুর আজ্ঞা ভঙ্গ হইল। ইহাতে সেই দম্পতী লৌকিক চরিত্র প্রাপ্ত অথবা পাপে লিপ্ত হইল। সেই দম্পতী হইতে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সকলেই ম্লেচ্ছ হইলেন। তাহার পর সেই দম্পতী স্বর্গে গমন করেন। ইহাদের পুত্র শ্বেত নামে বিখ্যাত হইল। তাঁহার পুত্র অনুহ, অনুহের পুত্র কীনাশ। কীনাশ হইতে মহল্লল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহা হইতে বিরদ উৎপন্ন হন তিনি স্বীয় নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হনুক তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ। তিনি ম্লেচ্ছধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াও স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আচার, বিবেক, দেবপূজা, এই সকল ম্লেচ্ছগণের ধর্ম্মরূপে অভিহিত। হনুকের পুত্র মতোচ্ছিল এবং মতোচ্ছিলের পুত্র লোমক। তাঁহার পুত্র ন্যূহ এবং তুহ। ন্যূহের পুত্র সীমশম এবং ভাব। ন্যূহ অত্যন্ত ভক্ত সোঽহংধ্যানপরায়ণ ছিলেন।*

---

* ইন্দ্রিয়াণি দমিত্বা যো হ্যাত্মধ্যানপরায়ণঃ।
তস্মাদাদমনামাসৌ পত্নী হব্যবতী স্মৃতা॥

† ন্যূহঃস্মৃতো বিষ্ণুভক্তঃ সোঽহংধ্যানপরায়ণঃ।

ইঁহাদের মধ্যে কে কোন স্থানে কোন দেশও নগরস্থাপন করেন এবং কে কত কাল জীবিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন ভগবান্ বিষ্ণু নূহকে স্বপ্নে বলিলেন বৎস নূহ! শুন সপ্তমদিবসে প্রলয় হইবে অতএব স্বজনের সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা কর। তুমি আমার প্রধান ভক্ত তাহা হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। নূহ তথাস্তু বলিয়া এক নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ নৌকা তিনশত হস্ত দীর্ঘ ও পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত। নূহ স্বকুলের সহিত উহাতে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুধ্যান পরায়ণ হইলেন ও জলমধ্যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া উহাতে বাস করিতে লাগিলেন *।

ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

* নূহস্তত্রস্থিতো নাবমারুহ্য স্বকুলৈঃ সহ।
জলান্তে ভূমি মাগত্য তত্র বাসং করোতি সঃ॥
ইতি শ্রীভবিষ্য মহপুরাণে প্রতিসর্গপর্ব্বণি চতুর্যুগখণ্ডা।
পরপর্য্যায়ে দ্বাপরনৃপোপাখ্যানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

"আমি" কে ?

অনিবার্য্য-গতি　জীবনের দিন
ধীরি ধীরি চলি　অনন্তে মিশায়।
আসিয়া ধরায়　কিছুকাল থাকি
না জানি সে জীব　কোথা চলি যায়॥

ছিল সে কোথায়,　কেন বা সে আসে
আসে বা কিরূপে　কিকাজের তরে।
কি রূপে কোথায়　পুনঃ যায় চলি,
ক্ষুদ্র দ্রব্য যথা　যাদুকর-করে॥

জানি না কে 'আমি',　তবু ভ্রমে পড়ি,
'আমি' 'আমি' করি　বেড়াই ভুবন।
'আমার' বনিতা,　বিভব, সুখ্যাতি,
'আমার' সন্তান,　মান, পরিজন॥

পঞ্চভূতে গড়া দেহে আত্মজ্ঞান,
মূর্খতার শেষ সীমা কিবা আর।
মুকুরে নেহারি দেহ প্রতিবিম্ব
তাই বুঝি ভাব রূপ 'আপনার'॥
হের মৃতদেহ সম্মুখে তোমার,
কেন নাহি উঠি 'আমি' 'আমি' বলে।
যতনে সোহাগে রেখেছিল যাহা,
'আমার' বলিয়া নাহি লয় কোলে॥
কি যে এক ছিল গেল দেহ ছাড়ি,
এক নাই বলে 'আমিত্ব' ঘুচিল।
সত্য বলি যত এতদিন ভাবি,
একাভাবে সব শূন্যেতে মিশিল॥
'আমি' আছি তাই আছে এ জগৎ
'আমি' না থাকিলে জগৎ রবে না।
কিবা সত্য তবে 'আমি' কি 'জগৎ'
অথবা উভয়ে কেহ কি থাকে না?।
এ মর জগতে সকলি নশ্বর,
সকলি অলীক ছায়া বাজী প্রায়।
সুখের কাঙ্গাল জগতের লোক
ছায়া লক্ষ্যকরি সুখ আশে ধায়॥
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন গুণ ধরে,
ভিন্নরূপ সুখ তাদের বিধান।
কিবা সুখ তার সুশ্রাব্য সঙ্গীতে,
ক্ষুধায় যাহার আকুল পরাণ॥
রূপ রসাদিতে যে সুখ উপজে,
দেহেন্দ্রিয় তাহে পরিতৃপ্ত হয়।
'আমি' দেহ নই তাই নাহি চাই
সেই সুখে সুখী ইন্দ্রিয় নিচয়॥

নশ্বর দ্রব্যেতে ইন্দ্রিয়জ সুখ,
ক্ষণিক, অলীক, না বসে মরমে।
তাই সুখ নাই রমণীর প্রেমে
অনধ্যাত্মজ্ঞান, ধন, পরাক্রমে ॥
সেই 'আমি' কেবা আগে জানা চাই,
তবে তো 'আমি'র সুখ নিরূপণ ;
নতুবা জীবন ফুরাইয়া যাবে,
সুখ লাভ তবু না হবে কখন ॥
সুখলাভ আশে চলেছি বিপথে
ওরা পিছে আসে অনুচিকীর্ষায়।
দেখেনা শিখেনা বুঝেনা ভাবেনা.
অধীর হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় ॥
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তুমি সুদূর খগণে
গ্রহাদির গতি কর আবিষ্কার।
দেখেছ কি 'আমি' চলে কোন পথে,
জ্যোতিষ্কের ন্যায় ফিরে কি আবার ?
তোমারি প্রভাবে প্রকৃতি সুন্দরী
কত গুপ্ত স্থান স্বদেহে দেখায়।
পার কি বলিতে দেখেছ সে স্থান,
হে সুধীন্দ্র ! 'আমি' বিরাজে যথায় ॥?
সে নিগূঢ় তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক ভাব,
খুজিয়া না পাই প্রতীচ্য বিদ্যায়।
তাই গুরুদেব ! করুণা নিধান !
ছুটি তব কাছে প্রাণের জ্বালায় ॥
তব পদ প্রান্তে বসি কত দিন
শুনি গূঢ় কথা জুড়াইল প্রাণ।
উপনিষদের অপূর্ব্ব ভারতী
হিন্দুর গৌরব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ॥

"আমি" "আমি" করি ঘুরি হেথা সেথা
চল চিত্তে, 'আমি' জানা নাহি যায়।
স্থির হয়ে দেখ দেহের মাঝার,
'সোঽহম্' রব করি ইঙ্গিতে জানায়॥
কর্ম্মযোগ ধরি কর চিত্তস্থির
আসক্তিকে কর দূরে পরিহার।
চিদাকাশে শুন প্রণয়ের ধ্বনি
কূটস্থেতে হের রূপ 'আপনার'॥
হেরি নিজরূপ আপনা পাশরে
অতীন্দ্রিয় সুখ করি আস্বাদন।
তাই 'আমি' কেবা নিজবোধ গম্য,
বাক্য নাহি পারে করিতে বর্ণন॥
হবে অনুভূতি সনাতন, স্থির,
অক্ষর অজর স্বরূপ 'আমার'।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একা 'আমি' আছি
কিন্তু নাই কেহ 'আমি' বলিবার॥
স্নেহভরে মাতা কর আশীর্ব্বাদ,
রাজেশ্বর হও সন্তান আমার।
সত্য মাতা 'আমি' রাজরাজেশ্বর
পথ ভ্রষ্ট ভ্রমি মরুর মাঝার॥
'আমার' আলয় বিচিত্র সে ধাম,
নাহি তথা কোন ইন্দ্রিয়-তাড়ন।
নাহি রোগ শোক, পাপ তাপ নাই,
নাহি সুখ হাসি ব্যথিত-ক্রন্দন॥
অতীন্দ্রিয় স্থান 'আমার' আলয়
নাহি অন্ধকার আলোর বিকাশ।
শীত গ্রীষ্ম নাই মান অপমান,
কিছু নাই আছে সুধু পরকাশ॥

শ্রীভবেন্দ্রনাথ বসু বি,এল্।

৪র্থ ভাগ। { চৈত্র, ১৩০৭ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

স্তুতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

পিতৃস্তুতিঃ।

(১)

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥

নমি সর্ব্বদেবময় পিতার চরণে
যাঁহার প্রসাদে জন্ম লভেছি ভুবনে,
সুখদ সুপ্রীত যিনি সন্তুষ্ট সতত
সেই মহাত্মার পদে হইনু প্রণত॥ ১॥

(২)

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণা সাগরায় চ ॥

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর পরব্রহ্মের সমান
স্বর্গসম যিনি সর্ব্বসুখের নিদান,
সর্ব্বতীর্থ তুল্য ফল যাঁর দরশনে
নমি সে করুণাসিন্ধু পিতার চরণে ॥ ২ ॥

(৩)

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ ॥

সদানন্দ আশুতোষ শিবের মতন
শত অপরাধ সদা ক্ষমেন যেজন,
শুভদাতা সেই পিতৃদেবের চরণে
সতত প্রণাম করি প্রীতিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

দুর্লভং মানুষ মিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥

যাঁহা হ'তে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন সহায়
দুর্লভ এ নর দেহ লভেছি ধরায়,
নমি সে পরম গুরু পিতার চরণে
প্রণাম করিনু পুনঃ ভক্তি পূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৫)

তীর্থস্নানং তপো হোম জপাদি যস্য দর্শনং।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥

তীর্থস্নান জপ তপ যাগ যজ্ঞ আর
সর্ব্বপুণ্য ফল হয় দরশনে যাঁর,

পরম গুরুর পূজ্য গুরু যেই জন
সেই পিতৃদেব পদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥

(৬)

যস্য প্রণামস্তবণং কোটিশঃ পিতৃ তর্পণং।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥

যাঁহারে ভকতি ভরে প্রণাম করিলে
কোটি পিতৃ তর্পণের তুল্য ফল মিলে,
শত অশ্বমেধ ফল যাঁহার বন্দনে
পুনঃ পুনঃ নমি সেই পিতার চরণে ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্তা পিতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা।

প্রণাম।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম তপ আরাধন
পিতা তুষ্ট হ'লে প্রীত হন দেবগণ ॥

শ্রীগোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়বাদ-বিরোধী।

মানব সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য লালায়িত। সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারীই হউক বা অতি দীন দরিদ্রই হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতে ভাসমান বা অসভ্য উলঙ্গ পর্ব্বত-গুহা-

বাসী বর্ব্বর হউক না কেন সে সর্ব্বদাই জ্ঞানের জন্য লালায়িত ও জ্ঞানলাভে কৃতার্থ। কারণ মানবের যাহা শ্রেষ্ঠতম অংশ, যাহা এই রক্ত মাংস গঠিত দেহকে নিরন্তর পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা নির্ব্বিকার, নিত্য ও অবিনশ্বর। "Rank is but the guinean stamp
Man is the gold for a' that"

এই অনন্ত আত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য, এবং সেই জগদ্ব্যাপী চৈতন্যের সহিত মিলনই ইহার উচ্চতম আশা। অতএব যে সত্য এই মিলন প্রণালী ও সেই অভাবনীয় প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করে সেই জ্ঞান, সেই সত্যই সকল জ্ঞান ও সকল সত্য হইতে গরীয়ান্। সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে মানব কেবল এই সত্যের অনুসন্ধানেই নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান এবং ভারতই ইহার প্রধান আকর। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনালোক এখনও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। যে আলোকের জন্য জগৎ লালায়িত ভারতে এখনও সেই আলোকের ক্ষীণ আভা নিবিড়ান্ধকারেও দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ব ধর্ম্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এখনও সেই ক্ষীণালোক দীপ্ত বহ্নিতে পরিণত হইতে পারে এবং সেই আলোক সমগ্র জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারে। এই জন্যই জগতের ভবিষ্যৎ ভারতের ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে, এই জন্যই ভারতবাসীর নাস্তিকতা এতই ভয়াবহ। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে জগতের উন্নতি দিবা স্বপ্ন মাত্র।

অধিকন্তু বঙ্গদেশই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন স্বরূপ। মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ প্রদেশ সমূহে হিন্দু জীবনের বাহ্য প্রকৃতি অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়, নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরে ও পাঞ্জাবে শারীরিক বল, বীর্য্য ও শৌর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। বঙ্গদেশে কিন্তু বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের সেরূপ আড়ম্বর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা-জ্বরে বঙ্গদেশের বাহ্য জীবন আক্রান্ত বটে, কিন্তু বাস্তবিক বঙ্গহৃদয়ের অন্তস্থলে সেই পুরাতন নির্ব্বাণোন্মুখ আধ্যাত্ম জীবনের ক্ষীণালোক এখনও জ্বলিতেছে। ভারত জগতের জীবন, ভারতের জীবন বঙ্গদেশ। বঙ্গবাসীগণের দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর।

জড়বাদ ভারতবর্ষের হৃদয়-শোণিত পান করিতেছে। ভারতবাসীর উদার পরদুঃখকাতর পবিত্র হৃদয় খানি পাশ্চাত্য জড়বাদ-বিষে এখন জর্জ্জরিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়বাদ প্রচার করে এবং এই বিজ্ঞানই ভারতবাসীকে জড়বাদী করিয়া তুলিতেছে। এই জড়বাদের উচ্ছেদ ব্যতিরেকে ভারতের মেঘাচ্ছন্ন গগনে আধ্যাত্মিক অরুণোদয় দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

প্রথমে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে বিজ্ঞান ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী কেন? বিজ্ঞান জড়বাদ ভক্ত কেন? বিজ্ঞানের যতই উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে মানব মনের উপর ধর্ম্মের আধিপত্য ততই কেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে?

কিন্তু আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে কৈশোরে যে বিজ্ঞান যতনে জড়বাদ-বৃক্ষতলে জীবন বারি সেচন করে সেই বিজ্ঞান বার্দ্ধক্যে ও প্রৌঢ়াবস্থায় সযতন-পোষিত জড়বাদ মহীরুহের উচ্ছেদ সাধন করে। Bacon বলিয়াছেন। "A little learning inclineth men to atheism, but deeper knowledge brings them back to religion" কথাটি বড়ই সত্য।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের বিরোধী কেন? উভয়েই ত সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত, উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র ত একই; তবে তাহাদিগের মধ্যে শত্রুতা কেন? কেন? কারণ এই রহস্যোদ্ভেদের পন্থা দুইটী। একটী সেই অদ্বিতীয় উৎপত্তিস্থান হইতে এই সৃষ্টির যাবতীয় মায়াচ্ছাদিত অনৈক্যের প্রতি অগ্রসর হয়; ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এই পন্থা অবলম্বনে সৃষ্টি রহস্য উদ্ভেদ করে। অপরটী এই সংখ্যাতীত অনৈক্য হইতে সেই এক মাত্র উৎপত্তি স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইটীই বিজ্ঞানের পথ। কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম পথের পথিক দেখেন যে একমাত্র শক্তি হইতে সংখ্যাতীত শক্তি পরিধির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং এই সমস্ত বিভিন্ন অস্তিত্ব সেই এক মহান কেন্দ্রাবস্থিত অস্তিত্ব হইতে উদ্ভূত। তিনি এই পার্থক্যের ভিতরেও ঐক্য দেখিতে পান এবং সকলই যে সেই এক চৈতন্য হইতে অগ্রসর হইতেছে তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। বিজ্ঞান পরিধি হইতে দেখিতেছে অসংখ্য অনন্ত অনৈক্য। ধীরে ধীরে একটীর পর আর একটী করিয়া বিজ্ঞান সে গুলিকে শিক্ষা করিতেছে। ইহার লক্ষ্য অনৈক্যের

প্রতি, ঐক্য ইহার দৃষ্টির অতীত। বিজ্ঞান কেবল বাহিরের প্রভেদ, আকারের প্রভেদ দেখিতেছে, গূঢ় ঐক্য ভুলিয়া গিয়াছে। মনে কর একটী শ্বেত (বৈদ্যুতিক) আলোকের নিকট তুমি দণ্ডায়মান রহিয়াছ। সেই আলোকের রশ্মি-নিচয় সকলদিকে বিস্তারিত হইতেছে। মনে কর তিনটী নল এই আলোককেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে অবস্থিত অর্থাৎ এই নল গুলির ভিতর দিয়া দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই আলোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই নলগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচ যোজিত হইয়াছে। এখন, একটী নলের ভিতর দিয়া দেখিলে ওই শ্বেত আলোকটী লাল দেখাইবে, অপরটীতে নীল ও অন্যটীতে হরিদ্রা বর্ণের দেখাইবে। এইরূপে বাহ্য পার্থক্যের ভিতর গূঢ় ঐক্য আমা-দিগের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িবে। এইরূপে সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ হইতে শ্বেতালোক বহির্গত হইয়া তিনটী গুণের ভিতর দিয়া আসিতে যেন তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণের আলোকে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সংখ্যাতীত রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞান কিন্তু যতই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইবে ততই দেখিতে পাইবে যে পার্থক্যের পরিমান হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং এক সর্ব্বব্যাপী ঐক্য এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সাগরে পার্থক্য সকল একে একে বিলীন হইয়া যাইতেছে। তখন বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে আর শত্রুতা থাকিবে না এবং বিজ্ঞান ধর্ম্মের প্রিয় সহচরী রূপে তাহার সেবায় রত হইবে। এক্ষণে বিজ্ঞানের বর্ত্ত-মান অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক Prof-Huxley ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান যাজক বলিয়া পরিচিত এবং বৈজ্ঞানিক নাস্তিকদিগের তিনি প্রধান গুরু। কয়েক বৎসর অতীত হইল Huxley ইউরোপের সভ্য সমাজ সমক্ষে তিনটী সত্য প্রচার করিয়াছেন এবং সেগুলি সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথমতঃ তিনি দেখাইয়াছেন যে মানবপ্রকৃতির উত্তরোত্তর উন্নতি প্রণালী (evolution of virtue in man) জড় জগতের উন্নতি প্রণালীর ঠিক বিপ-রীত। দয়া দাক্ষিণ্য কোমলতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে মানবকে জড়জগতের নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। জড়-জগতের নিয়ম স্বার্থস্থাপন (Self-assetion), উন্নত মানবপ্রকৃতির নিয়ম স্বার্থত্যাগ (Self-Sacrifice), কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া মানব জড় জগতের

নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়? সেই অবিনশ্বর চৈতন্যকেন্দ্র হইতে মায়া-পরিধির দিকে সৃষ্টি অগ্রসর হইতেছে এবং এই মায়া-পরিধি হইতে সেই বিশ্বকেন্দ্র দিকে পুনরাগমনই মানবপ্রকৃতির উন্নতির একমাত্র পন্থা। একটী মার্গ অপরটীর ঠিক বিপরীত ও এই জন্যই একটীর নিয়মাদি অন্যটীর নিয়মের বিপরীত। ঐশ্বরিক প্রকৃতিই মানব প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য এবং মানব যতই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হন ততই তাঁহার জীবন ত্যাগময় হয়—সে পরের অশ্রুজলে অকপটে দুই ফোঁটা অশ্রু মিশাইতে শিখে, পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের সম্পদ, পরের বিপদ সে নিজের সুখ, নিজের দুঃখ, নিজের সম্পদ নিজের বিপদ মনে করে। কারণ ত্যাগই ঐশ্বরিক প্রকৃতি। "The life of God is in giving and not in taking: the life of God is in pouring at and not in grasping." ত্যাগেই সৃষ্টির জন্ম। মানবপ্রকৃতির সৃষ্টি ত্যাগময় সৃষ্টির জন্য সেই অনাদি পুরুষকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ Huxley বলেন যে সমুদয় প্রকৃতি ব্যাপিয়া যে চৈতন্য বিরাজ করিতেছে সেই চৈতন্য মানবে আছে বলিয়াই মানব জড়জগতের নিয়মাদি উপেক্ষা করিতে সমর্থ। ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রের উপদেশ এবং Huxley বোধ হয় ইহার জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। 'প্রত্যেক মনুষ্যই ব্রহ্মণ্' এই মহা সত্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইলে বাহ্য জগত মানব মনের আজ্ঞাধীন হয়।

তৃতীয়তঃ Huxley বলেন যে বাহ্যপ্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সকল বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের উপর এক সর্ব্বোচ্চ চৈতন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই চৈতন্যই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিপরীত মার্গ অবলম্বন করিয়াও এইস্থলে মিলিত হইয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

প্রণব, ছবি, ও গান।

(১১শ সংখ্যার পৃষ্ঠার পর হইতে)

আলোক এবং আঁধার চিত্রের ভিত্তি স্বরূপ। চিত্রের বর্ণ কেবল জাতি-বাচক। একটী গোলাপ ফুল গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত না করিয়াও কেবল Light এবং Shade দ্বারা চিত্রিত করা যায়, কিন্তু ইহাতে কি জাতীয় গোলাপ তাহা বুঝা যায় না। দুইটী সম-জাতীয় পদার্থ পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলে তাহাদিগের পার্থক্য কেবল আলোকের তারতম্য দ্বারা দেখাইতে পারা যায় না। অনেক স্থলে এরূপ হয় যে Intensity of Light উভয়েরই একরূপ, তথায় বর্ণ বিন্যাসের আশ্রয় লইয়া চিত্রকর নিজের কারিকুরী প্রকাশ করেন। এই প্রকার, সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুরেরও তারতম্য আছে। একটী সুরের Intensity কণ্ঠস্বরে বিশেষরূপে দেখাইতে পারা যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রে দুইটী সুরের মধ্যে মোটামুটী তিনখানি করিয়া শ্রুতি আছে। কিন্তু শ্রুতি grade মাত্র। Intensity সম্পূর্ণ পৃথক গুণ। মনে করুন একই সুরে আপনি কোন ব্যক্তিকে কোমল এবং কড়া সম্ভাষণ করিতে পারেন। ইহাতে যে সুর বিভিন্ন হয় তাহা নয় অথচ শব্দের Intensityর তারতম্যে ভাবের বিভিন্নতা হয়। বর্ণ এবং সুরের Intensity লইয়া ছবি ও গানে অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত Spirit শব্দ ও বর্ণ মধ্যে অবস্থিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধন করেন। কোন চিত্রে Expression সম্পূর্ণ না দেখাইতে পারিলে চিত্রকরের নিপুণতা প্রকাশ পায় না। সুবিখ্যাত Titian's daughter ছবি খানিতে বালিকার সরলতা অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময় চিত্রকরের মনের উচ্চ ভাব, তাঁহার স্বভাবের দোষে, বিকৃত হইয়া ছবি খানিকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। John Ruskin ইহার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। তেমনিই, আভ্যন্তরিক চরিত্র দোষে অনেক গায়কের গানে পবিত্রভাব চেষ্টা করিলেও

আসেনা। চিত্র ও সঙ্গীত বিজ্ঞানের মূলে অনুসন্ধান যাঁহারা করেন নাই তাঁহারা যে টামুটী বলিয়া থাকেন যে অমুকের গান ভাল লাগেনা কেননা তাহার গলার স্বরে কোমলতা নাই, অমুকের চিত্র কদর্য্য কেননা সে বর্ণগুলি বিষদরূপে রঞ্জিত করিতে পারে নাই, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গায়ক ও চিত্রকরের যে সুর বিন্যাস, কিম্বা বর্ণ বিন্যাসের দোষ হইয়াছে তাহা নহে। যে দোষ ঘটিয়াছে হৃদয়ের কোন গূঢ়তম ভাবের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। Theosophist সম্প্রদায় তাহাকে Aura বলিয়া থাকেন। এই আভ্যন্তরিক auraতে যে যে ভাব প্রতিফলিত হয় তদনুসারে বর্ণগুলিও নিজের নিজের Intensity এবং Tone অনুসারে গান ও ছবির Expression প্রকাশিত করে। মানবহৃদয়ের ভাবগুলি শক্তির বিকাশ মাত্র। তালের ও লয়ের তারতম্য, বর্ণের তারতম্যে, Intensity এবং Toneএর তারতম্যে ও জ্যোতির তারতম্যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথে ঐ ভাব সকল আলোড়িত হইয়া Nerve racks সৃষ্টি করে, অবশেষে তাহারই স্পন্দনে এক একটি ভাবের এক একটী ছবি হয়। ইহা প্রকৃতির অতি আশ্চর্য্য বিধান এবং সেই বিধানানুসারে আমরা নিজের নিজের মনের ভাব জড়জগতে, মানুষের মুখে, নিবিড় কাননে, গিরিগুহায়, পাখীর গানে, রমণীর প্রেমে, কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। যাঁহার যতদূর মনের আবর্ত্তন হইয়াছে তিনি সেই পর্য্যন্ত স্বীয় হৃদয়ের ভাব প্রকৃতির Expression হইতে বাছিয়া লন। অন্যদিকেও প্রকৃতি সেই ভাবগুলির ছাপ (impression) অতি যত্নে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাতৃস্বরূপা হইয়া শব্দ, বর্ণ, প্রভৃতি তন্মাত্রা গুলি যোগাইতে থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আভ্যন্তরিক auraর মূলে এমন কি আছে যাহাতে দুইটী কিম্বা তদোধিক জীব পরস্পর আকৃষ্ট হয়। প্রভাত-বায়ু কম্পিত নীহার, জলপ্রপাতের ইন্দ্রধনুবৎ ছবি, সুদূরগগণের ঈষৎকম্পিত তারকাজ্যোতি, সকলই সুন্দর সন্দেহ নাই। কোমলকণ্ঠে সুললিত গান, বিহঙ্গের কলরব উভয়ই মধুর। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য ও মধুরতার আধার কি ? ইহার standard কোথায় ? জগদ্বিখ্যাত John Ruskin তাঁহার Modern Painters নামক গ্রন্থে ইহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। "There is yet a light which the eye invariably seeks with a deeper feeling of the beautiful * * a deeper feeling I say, not

perhaps more acute, but having more of Spiritual hope and longing, less of animal and present life ··· Assuredly in the blue of the rainy sky, in many tints of morning flowers, in the sunlight of summer foliage and field, there are more sources of sensual color-pleasure than in the single streak of wan and dying light. It is not then by nobler form, it is not by positiveness of hue, it is not by intensity of light (for the Sun itself at noonday is effectless upon the feelings) that this strange distance possesses its attractive power. But there is one thing that it has, or suggests, which no other object of sight suggests in equal degree and that is Impunity (Vol II., Part III—Modern Painters). চিত্র বিগ্তায় Perspective একটী অসীমত্ব দেখাইবার সুন্দর উপায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে প্রকৃতির চিত্রে নীলবর্ণ অসীমত্বজ্ঞাপক। আকাশের বর্ণ নাই, জলধিজলেরও বর্ণ নাই, কিন্তু কোন গূঢ় নিয়মানুসারে নীল সীমা ভেদ করিয়া চক্ষু আর দূরে যা য় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যেখানে গগনপ্রান্তর শেষ হইয়াছে সেখানে চিত্রকরগণ এই নীলবর্ণকে ক্রমে ক্ষীণতর করিয়া অবশেষে Horizonএর সহিত মিশাইয়া দেন। সমুদ্রবক্ষে অতি দূরে এই প্রান্তরটী একটী ঈষৎ উজ্জ্বল শ্বেত রেখায় উপর রঞ্জিত করিলে এমন Vanishing point অর্থাৎ লয়ের সৃষ্টি করা যাইতে পারে যাহাতে অনন্তের অনেকটা আভাষ কেবল দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত চিত্রে পাওয়া যায়। এই লয় একটী বিন্দু মাত্র। চিত্রে যেমন দূরত্বের (Span) সাহায্য লইতে হয়, গানে তেমনিই কালের (Time) সাহায্য লইতে হয়। বর্ণবিন্যাশ, Intensity ও Tone, প্রভৃতি উভয় স্থানেই একই নিয়মাবদ্ধ। ছবি ও গানে প্রভেদ এই যে গানে লয় পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া অনেকবার একটী বা তদোধিক ভাব ব্যক্ত করা যায় এবং গায়ক ক্রমে সুরে মগ্ন হইয়া অবশেষে (যতদূর তাঁহার সীমাবদ্ধ auraতে সম্ভব) একটী General Effect সৃষ্টি করেন। সন্ধ্যার একটী গানে কেবল সন্ধ্যার ভাব যে ব্যক্ত হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে নিরাশা, জীবনের বিপদ, কিম্বা প্রেমও ব্যক্ত করা যায়। কবি কথার দ্বারা মানব-হৃদয়কে আকর্ষণ

করেন, চিত্রকর বর্ণ দ্বারা এবং গায়ক সুর দ্বারা তাহা সাধিয়া লন। সুরের সঙ্গে কথা থাকিলে সোনায় সোহাগা হয়। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে এই সব Natural Signs (প্রাকৃতিক সঙ্কেত) সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষের (Nature and Spirit) সন্ধিস্থান রূপ, বর্ণ প্রভৃতি সীমার বহির্ভূত ছিল। লয় বিন্দুর এক পারে দৃশ্যমান ক্ষেত্র কিন্তু অপর পারে কালরহিত স্তব্ধ অনন্তচৈতন্য, তাহা কিরূপ বুঝিয়া উঠা যায় না। অনুধাবনা করিয়া দেখিতে পাইবেন অনন্তের দুইটী রূপ আছে। একটী বর্ণহীন নিবিড় ঘোর অমানিশার রূপ। এস্থলে Spirit (পুরুষ) সুষুপ্ত। পুরুষের কোন Expression পাওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ থাকে। ক্রমে এই লয়ের অবস্থা হইতে মহাপুরুষের কল্পনাজ্যোতি বিকাশিত হয়। চিত্রকরদিগের মধ্যে Rembrandt এই পথের প্রদর্শক। একটী ঘোর অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তরে একটী জ্যোতিকণা কোন বিন্দুস্থলে ফেলিয়া স্বীয় অভিপ্সীত চিত্র সেই জ্যোতির সাহায্যে Shade এবং Light দ্বারা দর্শাইতে পারিলে Rembrandt মহোদয়ের মতে যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এরূপ চিত্রে বর্ণগত আনন্দময় Expression নাই। যেমন শিশুগণ অন্ধকারে ছায়া দেখিলে মাতৃকোলে লুকায়, তেমনিই Rembrandt-এর Jesus Christ দেখিলে সামান্য দর্শকগণের ভূত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তবে অনন্তের প্রলয়কালীন ঘোর কালরূপ যে একটা মহাভাবের কল্পনা তাহার সন্দেহ নাই। এ মূর্ত্তি সংহার মূর্ত্তি। এ চিত্রে কালের সংজ্ঞা থাকে না, দূরত্বের সংজ্ঞা থাকে না—শক্তি কেন্দ্রাকৃষ্ট হইয়া আত্মচৈতন্যে লোপ পায়। কিন্তু John Ruskin যে অনন্তের ছবি কথা বলিয়াছেন তাহা জ্যোতির্ম্ময়। অলক্ষ্যভাবে জড়জগতের আধার স্বরূপ হইয়া একটী নিগূঢ় উপায় দ্বারা মানব-প্রকৃতিকে এই জ্যোতি ধীরে ধীরে লক্ষ্যস্থানে লইয়া যাইতেছে। জাগ্রত এবং চৈতন্যাবস্থায় অন্তর্নিহিত জ্যোতিতে মগ্ন হইলে যে ভাব হয় তাহা অসীম আনন্দের ভাব। এ জ্যোতির প্রকৃতি দৈবী বা পরা তাহা অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু "জ্যোতি" বলিলেই যে জলন্ত একটা কিছু বুঝায় ইহা তাহা নহে। ইহার রূপ চঞ্চলার ন্যায়, কখনও অতি মলিন, কখনও স্তিমিত প্রায়, কখনও অতি প্রফুল্ল সুন্দর, কিন্তু কোনও সীমাবদ্ধ নহে। ইহা

দূরেও আছে, নিকটেও আছে। গগণে সেই জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া দূরত্ব প্রচার করে, হৃদয়ে সেই জ্যোতি প্রাণ স্বরূপ হইয়া কালবিভাগ করে। জড়ের কঠিন নিয়মে বদ্ধ থাকিয়াও অতি অল্পকালে, অতি অল্প এবং সংকীর্ণ স্থানে সেই জ্যোতি স্বীয় মহিমা প্রভাবে মানব-হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করাইয়া দেয়। জলধির গভীর গর্জ্জন যেখানে নীরবতার সহিত মিশাইয়া যায়, সুনীল গগণ-প্রান্তর যেখানে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল আলিঙ্গন করিয়া সন্ধ্যার নিবিড় শয্যায় ঢলিয়া পড়ে, যেখানে সসীম-জগতের লীলার অবসান হইয়া রূপ শব্দ বর্ণ বিন্দুতে মিশাইয়া যায় এমন স্থানে মিটি মিটি করিয়া সেই জ্যোতি অনন্ত-ধামের দ্বার দেখাইয়া দেয় "ঐ দেখা যায় অনন্তধাম ভবজলধির পারে"। সেখান হইতে নূতন আশা, নূতন বল ঘনীভূত হইয়া পুনর্ব্বার বিন্দু হইতে নবীন সূর্য্য লইয়া জীবনের প্রভাত প্রচার করে। John Ruskin পুনর্ব্বার বলিয়াছেন "It is of all the visible things the least material the least finite, the farthest withdrawn from the Earth prison house, the most typical of the nature of God, the most suggestive of the glory of His dwelling place. For the sky of night, though one may know it boundless, is dark ; it is a studded vault, a roof that seems to shut us in and down, but the bright distance has no limit, we feel its infinity, as we rejoice in its purity of light." কোন ইতালীর চিত্রকরের জীবন পাঠ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার কৃত একটী চিত্রের কোন স্থানে অস্তগত সূর্য্যের স্তিমিত জ্যোতি সমুদ্রসৈকতে অতি দূরে এমন সুন্দর ভাবে অনন্তে লীন হইয়াছিল যে তিনি বলিতেন "it is the home of God" যখন সংসারের চঞ্চলতা বিরক্তিজনক হইয়া প্রাণে অবসাদ ঘটায় তখন ভাবুক অতি সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে লয়বিন্দুতে লীন হন। "ভবের বেলা গেল" বলিয়াই লালাবাবুর Vanishing pointএ অর্থাৎ লয়ে চেতনা হইল। ইহা মনসক্ষেত্রের একটা সামান্য Perspective মাত্র। অতি সহজে এই ভাবের ছবি টানা যায় ও গান গাহিতে পারা যায়। কবি বলেন "অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু নাই"। চিত্রকর পিঙ্গলবর্ণে (Dark grey) দ্বারা এই ভাব চিত্রিত করেন গায়ক Sharp ও Flatএর কম্পনে অতি মৃদুভাবে যে

মূর্চ্ছনা উৎপাদন করেন তাহাতে বিজনতার ভাব আসে। সন্ধ্যাকালের বিজনতা ঝিল্লীরবে আরও ঘনীভূত হয়। তিনটা উপর্যুপরি Sharp ও Flat একত্রে হারমোনিয়মে চাপিয়া ধরিয়া ঐ Scaleএর গান্ধার ও পঞ্চমের chord দিলে ঝিল্লীরবের নকল করা যায়। সন্ধ্যাকালে একাকী অন্ধকার ঘরে বসিয়া এইরূপ অনেকক্ষণ করিলে মধ্যে মধ্যে মনের লয় হয়। বাস্তবিক জীব-প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ঝিল্লীগণ মধ্যে মধ্যে থামে এবং সেই বিশ্রাম স্থলে অর্থাৎ লয় স্থলে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার দ্বিতীয় তরঙ্গে আনন্দময় জীবনতরী ভাসাইয়া দেয়। এই ঝিল্লীদলের মধ্যে অনেক সময় ভেকশিশু নিজের কণ্ঠস্বর যোগ করিয়া একটী ঐক্যতান-কনসার্টের সৃষ্টি করে। আমি অনেক সময় ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি যে ভেকজাতি বেতালা, কিন্তু কিছুদিন ঝিল্লীজাতির (crichets) একত্রে কণ্ঠ মিলাইয়া শেষে লয় মাফিক দস্তুরমত গান করিতে পারে। নির্জ্জন স্থলে জড় প্রকৃতি হইতে একটী সুরের কম্পন ক্ষীণভাবে তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতে থাকে, সেইটা ঝিল্লী ও ভেকদিগের পক্ষে তানপুরার সুর "Voice of the Silence" উভয় কর্ণরন্ধ্র অঙ্গুলি দিয়া বন্ধ করিলে যে স্পন্দন শুনা যায় (রাবণের চিতা) অনেকটা সেই মত। মোটকথা Laws of Persp·ctive এবং Time ছবি ও গানে যেমন অনন্ত প্রভৃতি ভাব ব্যক্ত করে সেই প্রকার মনক্ষেত্রেও একই নিয়মাবদ্ধ থাকায় analogous effectsএর সৃষ্টি করে। দুঃখের বিষয় আমার মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না কেন না প্রথমতঃ চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যার ভাষা বড় জটিল এবং থাকিলেও আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ব হয় নাই। "Beats" এই শব্দটীর বাঙ্গালা জানি না। দুইটী পাশাপাশি সুর একত্র সংবাদিত হইলে যে স্পন্দন হয় তাহাকে "Beats" কহে। এই "Beats" যেমন বিরক্তিজনক তেমনিই সময় বিশেষে অতি সুন্দর Effect সৃজন করে। একটী প্রদীপ কিম্বা ল্যাম্প ক্রমাগত দপ্ দপ্ করিয়া নির্ব্বানোন্মুখ হইলে যেরূপ হয় "Beats" অনেকটা সেই প্রকার। ইহা সচরাচর আমরা ভাল বাসি না। হৃদয়ে এই প্রকার হইলে আমরা "palpitation of the heart" বলি। Mental planeএ এইরূপ হইলে অর্থাৎ কতকগুলি (অসামঞ্জস্য) বিরোধী ভাব কিম্বা কল্পনা একত্রিত হইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিলে auraতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখের

ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন আমরা যে মানুষটাকে দু চক্ষে দেখিতে পারি না। ঘরকন্না করিতে হইলে aura সম্বন্ধে একটু শিখিয়া রাখা উচিত, অনেক সময় পুত্র পরিবারের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া একটু auraটাকে Tune করিয়া দিলে শ্রমের লাঘবতা ও মানবজীবনের সার্থকতা হয়। ঈশ্বরের এই দৈবী জ্যোতি এত সত্য, এত বিজ্ঞান অনুমোদিত, এত পরিষ্কার ভাবে জগতে ব্যপ্ত যে "ঈশ্বর নাই" বলিলে একটু হাসি পায়। ঈশ্বর নাই একথাটী মস্তিষ্ক-জাত, হৃদয়-জাত নহে। অনেক দিন পরে হৃদয় ও মস্তিষ্ক কতকগুলি নাড়ী দ্বারা দৃঢ়তররূপে সংবদ্ধ হইলে পরে জীব "ঈশ্বর" আছেন কি না আছেন এ ভাবের বড় ধার ধারে না, নিজে বিশ্বপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকে। যাঁহাদের মস্তিষ্ক একটু বিকৃত সে স্থলে Pneumo Jastreic Nevre trackএর উপর একখানি বেলাডোনা Plaster দিলে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সম্বন্ধ অনেকটা স্থাপনা করা যাইতে পারে। এরূপ অবিশ্বাসের ভাব কেবল Light ও Shadeএর বিকৃতি মাত্র। সন্দেহ একটা "Beats" এই সকল অন্ধকারের ভাবগুলি মাত্রা বদ্ধ করিয়া তাল দিয়া গুণ করিলে পুনরায় তাহারা দৈবী জ্যোতির সাহায্যে প্রকৃতিস্থ হয়। এবং Palpitation স্বরূপ হৃদয়কে কষ্ট না দিয়া লয়মাফিক Systoles এবং Diastolesএর নিয়মানুসারে হৃদয়ে ছবি ও গান উৎপাদন করে। ঘন ঘন Beats হইলে প্রলয় সন্নিকট বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ বেসুরা ও বেতালা প্রলয়ের পক্ষপাতী John Ruskin নহেন এবং আমরাও নহি। Beats ভাঙ্গিয়া সুরে ও তালে আনা দৈবী প্রকৃতির কার্য্য এবং তাহাই জ্যোতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অনর্থক দর্শন-শাস্ত্রের জঞ্জালের মধ্যে না পড়িয়া যদি আমার সহিত নীরপেক্ষভাবে সুর ও তালের আলোচনা করেন তবে অনেক Psychological বিষয় Experimentally বুঝান যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে গায়ক চিত্রকর প্রভৃতি এই দৈবী জ্যোতিকে কি করিয়া আবাহন করেন। কি করিয়া আদিম অবস্থায় মানসপুত্রগণ এই জ্যোতির সাহায্যে জড়-প্রকৃতিতে মনরূপী মহাক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহার উত্তর যে প্রণবই এ জ্যোতির যন্ত্র। পূর্ব্বোক্ত লয়বিন্দু স্থানে প্রণবের বসতি। প্রত্যেক লোকের লয়স্থানে প্রণবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রণবের এক অর্থ নাই। "ওঁ" এই শব্দে অনন্ত বুঝায়, বিন্দুও

বুঝায়। ইহা অসীম ও সসীম। ইহার অনেক অর্থ অনেকে করিয়াছেন কিন্তু ইহার অর্থ করিলে অর্থ থাকে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ত্রিপিটক

গ্রন্থ।

বৌদ্ধদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত। কেবল ত্রিপিটক নহে, বৌদ্ধদিগের অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থও পালি ভাষায় লিখিত। ভারতে বহু শতাব্দ ব্যাপী ইতিহাস, পুরাতত্ব, প্রত্নতত্ব, দর্শন বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ইহার মধ্যে নিহিত। আশা করা যায় যে পালি ভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার হইবে। অনেকের সংস্কার আছে যে পালি ভাষা বৈদেশিক ভাষা, বলা বাহুল্য যে ইহা ভ্রম মাত্র। ইহা প্রাচিন মগধের ভাষা; আমাদের মাতৃভূমিতেই এই ভাষার উৎপত্তি। ভগবান বুদ্ধদেব এই ভাষাতেই সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। এই ত্রিপিটক গ্রন্থ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে রাজগৃহে বৌদ্ধভিক্ষুকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রথম সংগৃহিত হয় ও তাহার একশত বৎসর পরে বৈশালির দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। এই ত্রিপিটক গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত,—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম। নীতিবিষয়ক উপদেশ ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা সূত্রপিটকে সুবৃহৎ বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র বিনয়পিটকে ও মনোবিজ্ঞান অভিধর্ম্মপিটকে বর্ণিত আছে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ত্রিপিটকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলাম।

সূত্রপিটক :—

১। দীঘ নিকায়, ২। মধ্যম নিকায়, ৩। সংযুক্ত নিকায়, ৪।

অঙ্গুত্তত নিকায়, ৫। ক্ষুদ্দক নিকায়—(ক) ক্ষুদ্দক পাঠ, (খ) ধর্ম্ম-পদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবুত্তক, (ঙ) সুত্রনিপাত, (চ) বিমানবত্থু, (ছ) পেতবত্থু, (জ) থেরাগাথা, (ঝ) থেরিগাথা (ঞ) জাতক (ট) নিদ্দেপ (ঠ) পতিসম্ভিদামগ্গ (ড) অবদান (ঢ) বুদ্ধ বংশ (ণ) করিয্যা পিটক।

বিনয়পিটক :—

১। বিভাঙ্গ, (ক) পারাজিকা (খ) পাকিত্তিয়া ; ২। খন্দক (ক) মহাবগ্‌গ (খ) কুলবগ্‌গ ; ৩। পরিচার পাঠ।

অভিধর্ম্মপিটক :—

১। ধর্ম্ম সঙ্গানি, ২। বিভাঙ্গ, ৩। কথা বত্ত প্রকরণ, ৪। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, ৫। ধাতু কথা ৬। যমক ৭। পঠ্‌ঠান প্রকরণ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

গত অগ্রহায়ণ মাসের "পন্থায়" "ধর্ম্মের হাট" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি কিরূপে লোকে নানাভাবে ও নানারূপে একই পরমদেবতার উপাসনা করে ; কিরূপে একই অনাহত শব্দ নানা শব্দে ও নানারূপে পরিণত হইয়া জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা এবং সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্র এই অনাহত ধ্বনির মহিমা কীর্ত্তন করেন ; এই শব্দই সমস্ত সৃষ্টির মূল ; ইনিই পরা প্রকৃতি; ইনিই মহাশক্তি। এই অনাহত শব্দই শ্রীকৃষ্ণের বংশীতে, মহাদেবের ডমরুতে; সরস্বতীর বীণায় এবং গণেশের মৃদঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই শব্দের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বাইবেলে আছেঃ—"In the beginning there was the Word and the Word was God and the Word was with God." মুসলমানদিগের মধ্যে স্থফিরা এই শব্দতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত আছেন। লামা যোগীরাও ইহার মাহাত্ম্য জানেন। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শব্দতত্ত্ব বিষয়ে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা অচিরাৎ এই সত্যবস্তু উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই মহাশব্দই ব্রহ্মবাণী, ইনিই বেদমাতা, জগতে নিত্য বিরাজমানা আছেন। ইহার অতীত বস্তু কি তাহা মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। বেদ তাঁহাকে পরব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। একমাত্র "সৎ—আছেন" এই পর্যান্ত জানা যায়। তিনি বাক্য মনের অগোচর; বেদে তাঁহার অন্ত পায় নাই, অথচ তিনি আছেন,—"তৎসৎ"। তিনি পরব্রহ্ম নামে অভিহিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার কোন নাম নাই, তিনি নামরূপের অতীত। এই পরব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, পরমশ্রেয়ঃ। ইনি অনন্ত জ্ঞান, ইনি অনন্তপ্রেম। ইহাঁকে জানিতে পারিলে অনন্তজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায় এবং ইহাঁতে প্রীতি জন্মিলে বিশ্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই বিশ্বজনীন প্রেমই শতধা হইয়া নানাভাবে জগতে বিচরণ করিতেছে। পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, অপত্য স্নেহ, সৌহৃদ্য ভাব, দয়া, করুণা, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি এই বিশ্বজনীন প্রেমের অন্তর্গত। ভগবৎপ্রেম সমস্ত পার্থিব ও পরিমিত প্রেমের অতীত। সামান্য মানুষীপ্রেমের সহিত সে অনন্তপ্রেমের তুলনা হয় না।

জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষ অনুভূতি। পুস্তকাদি পাঠ জনিত যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষজ্ঞান; সেটি বাহিরের বস্তু। অন্তর্দৃষ্টি বলে যে আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় তাহাকে অপরোক্ষ অনুভূতি বলে; এটি সাধন সাপেক্ষ। ইহাকেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবানে পরাঅনুরক্তির নাম ভক্তি এবং আসক্তিরহিত অবস্থার নাম মুক্তি। এইগুলির মধ্যে কেহ কাহারও সহিত দাস-দাসীত্ব সম্বন্ধ নাই। তিনটিই পরম পদার্থ। অন্তর্দৃষ্টিযোগে যে অপরোক্ষ অনুভূতি জন্মে তাহা দেবদুর্লভ বস্তু এবং যে আকর্ষণী শক্তি জীবকে পরমেশ্বরসদনে লইয়া যায় তাহা অমূল্য, অতুলনীয়। এই দুইয়ের মধ্যে লোকে অজ্ঞানবশতঃ কেন বিরোধ ঘটায় তাহা

বুঝা যায় না। দুইটি ভগিনী যেন দুইটি সপত্নী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অথবা লোকে করিয়া তুলিয়াছে। পরাভক্তি ও পরাজ্ঞান দুইটিই অপূর্ব্ব বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে পুরাণে যে স্থান দিয়াছেন তন্ত্রে সেই স্থান মহাদেবকে দেওয়া হইয়াছে এবং রামায়ণে রামচন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে বিষ্ণু ও শক্তির উপাসনাই প্রবল, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে শিবের উপাসনা এবং অযোধ্যা অঞ্চলে রামের উপাসনাই প্রবল। সকল উপাসকেরা আপন আপন ইষ্ট-দেবতাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন; সুতরাং এই পরব্রহ্মত্ব কাহারও একচেটে নহে। শ্রীগৌরাঙ্গকে যেমন তাঁহার উপাসকেরা পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন সেইরূপ নানকপন্থীরা নানককে পরব্রহ্ম বলেন। তাঁহারা বলেন কত কত ব্রহ্মা কত কত বিষ্ণু তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া আছেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে সকলেই আপনার ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে পরব্রহ্ম স্বরূপ জানেন। সাধন সৌকর্য্যার্থে ইহা জানাও আবশ্যক, তবে পরস্পর দ্বেশ করা ভাল নয়। হা পরব্রহ্ম! তোমার স্বরূপ একবার আমাদিগকে জানাইয়া দাও, যাহাতে জগতে বিরোধ দ্বন্দ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং চিরশান্তি বিরাজিত হয়।

পরব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত, কিন্তু তিনি সাধকের নিকট তাঁহার প্রিয়রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে যে ভাবে যে চায় তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হন। সেই ভাবই সাধকের রসবোধ হয়; ইহাতে তারতম্য কিছুই নাই। সকল রসের আকার সহস্রার; সেই মধুচক্র হইতে মধুক্ষরণ কৃষ্ণ নামেও হয়; কালী নামেও হয়। ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিতে নাই। ভিতরের তত্ত্ব জানিতে পারিলে সকল ধাঁদা কাটিয়া যায়।

প্রতিমা পূজা ভাল, তবে সেই প্রতিমার অন্তরালে যে অপূর্ব্বতত্ত্ব লুক্কায়িত আছে তাহাও কিছু অবগত হওয়া ভাল। পন্থার পাঠকগণের মধ্যে বোধহয় অনেকে সাধক গোবিন্দের নাম শ্রুত হন নাই। তাঁহাকে দ্বিতীয় রামপ্রসাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচিত একটী সঙ্গীত নীচে উদ্ধৃত করিলাম:—

গীত।

"ও কার মূরতি মন চেন না কি উহাঁরে।
ঐ যে করেছে সৃষ্টি হেন দৃশ্য বর্ণিতে আর কে পারে।

দশভুজা দেখে বুঝি ভেবেছ রূপেরি শেষ,
অন্তরে দেখিলে উহাঁর দেখিবে অনন্তবেশ,
কদাচিৎ চিৎ-স্বরূপা, কদাচিৎ সৎস্বরূপা,
সে যে ক্ষণিক আকাশ, ক্ষণিক প্রকাশ, অনন্ত জগদাধারে ॥
আজ দেখ্‌বে দুর্গারূপে গোবিন্দের ঘরে এসেছে,
কাল দেখ্‌বে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে,
তাইত বলি এসব কায়া কিছু নয়ত কেবল মায়া,
ধর্‌লে পরে জ্ঞানের আলো, লুকায় সবে ওঁকারে ॥"

উল্লিখিত সঙ্গীতটিতে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

দোঁহামৃত লহরী।

(১১শ সংখ্যার ৪৪২ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

[৪৯]

কহা করৈ কোউ জতন প্রকৃতি ঔর কী ঔর।
বিষমাহিঁ জ্যাবৈ সুধা উপজে একহি ঠৌর ॥

যতই কেহ যত্ন করুক না কেন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্নই থাকিবে; বিষ জীবের প্রাণ নাশ করে এবং সুধা জীবনদান করে, এই দুই বস্তুই এক স্থান হইতে (সমুদ্র হইতে) উৎপন্ন হয়।

[৫০]

ডরৈ ন কাহূঁ দুষ্ট সোঁ জাহি প্রেমকী বান।
ভম্বর ন ছাঁড়ে কেতকী হিয়ে কণ্টক জান ॥

যাহার স্বভাব প্রেমময় সে কোনও দুর্জ্জনের ভয় করে না। তাহার নিদর্শন

দেখ) তীক্ষ্ণ কণ্টক আছে জানিয়াও ভ্রমর কেতকী পুষ্পকে পরিত্যাগ করে না।

[৫১]

ধন বাঢ়ে মন বড় গয়ো নাহিঁন মন ঘট হোয়।
জ্যোঁ জলসঙ্গ বাঢ়ৈ জলজ জল ঘট ঘটৈ ন সোয়॥

ধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় (পরন্তু ধন হ্রাস হইলে) আকাঙ্ক্ষার আর কখনও হ্রাস হয় না ; যেমন জলের বৃদ্ধির সহিত পদ্মও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু জল হ্রাস হইলে তাহা আর ছোট হয় না।

[৫২]

সব তেঁ লঘু হৈ মাঙ্গবো যা মেঁ করেন সার।
বলি পৈ যাচত হী ভয়ে বাবন তন করতার॥

যাচ্ঞা করা সর্ব্বাপেক্ষা হীন কার্য্য, ইহাতে একবার গৌরব নষ্ট হইলে আর তাহা কখনও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না , বলিরাজার নিকট যাচঞা করিতে বিশ্বকর্ত্তার বামন তনু হইয়াছিল।

[৫৩]

সবৈ একসে হোত নহিঁ হোত সবন মেঁ ফের।
কাপরা থাদী বাফতৌ লোহ তবা সমশের॥

সকলেই এক সমান হয় না, সকলের মধ্যেই বিভিন্নতা থাকে ; কাপড়ের মধ্যে কোনটাও বা মোটা গুণচট কোনটাও বা মিহি মস্‌লিন (বাফতা) হয় এবং লৌহের মধ্যেও কোনটাতে বা (রাঁধিবার) চাটু কোনটাতে বা তীক্ষ্ণ তরবারি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

[৫৪]

জৈসে কী সেবা করৈ তৈসী আশা পুর।
রত্নাকর সেবৈ রতন সর সেবৈ শালুর॥

যেরূপ ব্যক্তির সেবা করিবে সেইরূপই আশা পূর্ণ হইবে ; রত্নাকরের সেবা করিলে রত্ন (মণি-মুক্তা) মিলিবে, সরোবরের সেবা করিলে সামুক পাইবে।

[৫৫]

হোত সুসঙ্গতি সহজ সুখ-দুখ কুসঙ্গকে থান।
গন্ধী ঔর লুহার কী বৈঠো দৈখ দুকান॥

সৎসংসর্গে স্বভাবতঃই সুখলাভ হইয়া থাকে, কুসঙ্গ সর্ব্বদুঃখের আধার; সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রেতার (আতরওয়ালার) এবং লৌহকারের (কামারের) দোকানে বসিলেই ইহার মর্ম্ম বিশেষ বুঝিতে পারিবে।

[৫৬]

ঠৌর ছুটে তেঁ মীত হূ হৈব অমীত সতরাত।

রবি জল উথরে কমল কৌ জারত গারত জাত॥

স্থানভ্রষ্ট হইলে মিত্রও কুপিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করে; কমলকে জল হইতে তুলিলে তপন তাহাকে বিশুষ্ক ও দগ্ধ করিয়া ফেলে।

[৫৭]

জাত গুণী জাত ন তঁহা আড়ম্বরযুক্ত সোয়।

পহুঁচে চঙ্গ আকাশ লোঁ যো গুণ সংযুক্ত হোয়॥

বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত গর্ব্বিত ব্যক্তি যে স্থানে না যাইতে পারে গুণী ব্যক্তি তথায় অনায়াসে যাইয়া থাকেন; গুণসংযুক্ত (অর্থাৎ সূত্রবদ্ধ) হইলে ঘুঁড়িও দেখ আকাশলোকে গমন করিয়া থাকে।

[৫৮]

গুণবারো সম্পতি লহৈ লহৈ ন গুণ বিন কোয়।

কাঢ়ৈ নীর পাতাল তেঁ জো গুণযুত ঘট হোয়॥

গুণবান ব্যক্তিই সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, গুণহীন হইলে কেহ কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হয় না; (তাহার নিদর্শন দেখ) ঘট যদি গুণযুক্ত (রজ্জুবদ্ধ) হয় তাহা হইলে তাহা পাতাল হইতেও নীর নিষ্কাসিত করিতে পারে।

[৫৯]

অরি ছোটো গনিয়ৈ নহীঁ জাতেঁ হোত বিগার।

তৃণ সমূহ কো ছিনক সেঁ জারত তনক অঙ্গার॥

যাহা হইতে অনিষ্ট হইতে পারে তাদৃশ শত্রুকে কখনও ক্ষুদ্র বলিয়া গণনা করিও না; কণপরিমাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্ষণমাত্রে তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

[৬০]

পণ্ডিত জন কৌ শ্রম মরম জানত জে মতিধীর।

কবহূ বাঁঝ ন জানহী তন প্রসূতকী পীর॥

ধীরমতি ব্যক্তিই পণ্ডিত জনের পরিশ্রমের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন বন্ধ্যানারী কখনও প্রসূতির বেদনা অনুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

[৬১]

ধীর পরাক্রম না করৈ তা সোঁ ডরত ন কোয়।
বালক হূকে চিত্র কো বাঘ খিলৌনা হোয়॥

বীর যদি পরাক্রম প্রকাশ না করে তাহা হইলে তাহা হইতে কেহই ভীত হয় না; (তাহার নিদর্শন দেখ) চিত্রের ব্যাঘ্রশিশুরও ক্রীড়নক হইয়া থাকে।

[৬২]

নৃপ প্রতাপ তেঁ দেশ মেঁ রহৈ দুষ্ট নহিঁ কোয়।
প্রকটৈ তেজ দিনেশ কৌ তহাঁ তিমির নহিঁ হোয়॥

নৃপতির প্রতাপ থাকিলে দেশে কোনও দুষ্ট লোক থাকিতে পারে না; দিননাথের দিপ্তী প্রকটিত হইলে তথায় তিমির কখনই থাকিতে পারে না।

[৬৩]

কারজ তাহী কৌ সরৈ করৈ জো সময় নিহায়।
কবহুঁ ন হারৈ খেল জো খেলৈ দাঁব বিচার॥

তাহারই কার্য্য সিদ্ধ হয় যে ব্যক্তি সময় বুঝিয়া কার্য্য করে; যে দাঁও (সুযোগ) বুঝিয়া খেলিতে জানে খেলাতে সে কখনই হারে না।

[৬৪]

কোউ দূর ন কর সকৈ উলটৈ বিধিকে অঙ্ক।
উদধি পিতা তউ চন্দ কো ধোয় ন সক্যো কলঙ্ক।

বিধির লিখন কেহই খণ্ডন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; সমুদ্র পিতা তথাপি চন্দ্রের কলঙ্ক ধৌত করিতে সক্ষম হয় না।

[৬৫]

গাহক সবৈ সপূত কে সারৈ কাজ সপূত।
সব কো স্পেন হোত হৈ জৈসে বনকো সূত।

সকলেই সুপুত্রের প্রার্থনা করে কারণ সুপুত্রেই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে; যেমন অরণ্যজাত কার্পাস সূত্র সকলেরই দেহের আবরণ হইয়া থাকে, (সেইরূপ সুপুত্র বংশের আবরণ স্বরূপ)।

[৬৬]

করত করত অভ্যাসকে জড়মতি হোত সুজান।
রসরী আবত জাত তেঁ সিলপর পরত নিশান॥

অভ্যাস করিতে করিতে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিও সুপণ্ডিত হইয়া উঠে; দড়ির গমনাগমন (ঘর্ষণ) দ্বারা শিলার উপরেও চিহ্ন পড়ে।

[৬৭]

কো সুখ কো দুখ দেত হৈ দেত কর্ম্ম অকঝোর
উরঝৈ সুরঝৈ আপহী ধ্বজা পবনকে জোর॥

সুখই বা কে দেয়, দুঃখই বা কে দেয়? সুখ-দুঃখ সকলই কর্ম্মের ফেরে হইয়া থাকে; পবনের বেগে ধ্বজা আপনিই মুড়িয়া যায় আবার আপনিই খুলিয়া যায়।

[৬৮]

ভলী করত লাগৈ বিলম্ব বিলম্ব ন বুরে বিচার।
ভবন বনাবত দিন লগৈ ঢাহত লগৈ ন বার॥

ভাল কার্য্য করিতে বিলম্ব লাগে পরন্তু মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে বিলম্ব লাগে না, একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনেক দিন লাগে কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বিলম্ব হয় না।

[৬৯]

সোই আপনৌ আপনৌ রহৈ নিরন্তর সাথ।
হোত পরায়ৌ আপনো শাস্ত্র পরায়ে হাথ॥

সেই প্রকৃত আপনার যে নিরন্তর আপনার সঙ্গে থাকে; আপনারই অস্ত্র পরের হস্তে গেলে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

[৭০]

কহা রস মেঁ কহা রোষ মে' অরি সোঁ জিন পতিয়ার।
জৈসে শীতল তপ্ত জল ডারত অগ্নি বুঝায়॥

সরস কথাই বলুক আর রোষের কথাই বলুক শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করিও না; যেমন জল শীতলই হউক আর উষ্ণই হউক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা নির্ব্বাপিত করিবেই করিবে।

[৭১]

অন্তর অঙ্গুরী চারকো সাঁচ ঝুট মেঁ হোয়।

সব মানে দেখী কহী সুনী ন মানে কোয় ॥

সত্য আর মিথ্যার মধ্যে চারি অঙ্গুলি মাত্র ব্যবধান; চক্ষে দেখিলে সকলেই বিশ্বাস করে শুনা কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না। (দর্শনেন্দ্রিয়ের ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলি মাত্র ব্যবধানকে লক্ষ্য করিয়াই এই দোঁহাতে সত্য মিথ্যার ব্যবধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।

[৭২]

হোয় ভলে কে সুত বুরো ভলো বুরে কৈ হোয়।

দীপক সোঁ কাজল প্রগট কমল কীচ তেঁ জোয় ॥

সজ্জনের সন্তানও মন্দ হইতে পারে এবং দুর্জ্জনের সন্তানও ভাল (হইতে বিচিত্র নাই; তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ) উজ্জ্বল প্রদীপ হইতে কজ্জল জন্মে এবং পূতিগন্ধ পঙ্ক হইতে সুরভি কমল উৎপন্ন হয়।

[৭৩]

হোয় ভাল চাকরণ তেঁ ভলো ধনী কো কাম।

জ্যোঁ অঙ্গদ হনুমান তেঁ সীতা পাই রাম ॥

সৎপ্রভুর কার্য্য সৎভৃত্যদের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে; (তাহার নিদর্শন দেখ) অঙ্গদ ও হনুমান হইতেই রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[৭৪]

সুখ সজ্জনকে মিলনকো দুর্জ্জন মিলে জনায়।

জানৈ উখ মিঠাস কৌ জব মুখনীম চবায় ॥

সজ্জনের সহিত মিলনে যে কি অপূর্ব্ব সুখ একবার দুর্জ্জনের সহিত মিলিত হইলেই তাহা সবিশেষ বুঝা যায়; মুখ যদি একবার নিম চিবায় তবেই তাহা ইক্ষুর মধুরাস্বাদনের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

[৭৫]

জাহি মিলে সুখ হোতু হৈ তিহি বিছুয়ে দুখ হোয়।

সুর উদৈ ফুলৈ কমল তা বিন সকুচৈ সোয় ॥

যাহার সহিত মিলনে সুখোদয় হয় তাহারই বিচ্ছেদে দুঃখ হইয়া থাকে ; সূর্য্যের উদয়ে কমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠে এবং তাহারই বিরহে সে সঙ্কুচিত হইয়া ধরাশায়ী হয় ।

[৭৬]

ঝুঠে হু করিয়ে জতন কারজ বিগরৈ নাহিঁ ।

কপট পুরুষ ধন খেত পর দেখত মৃগ ফির জাহিঁ ॥

চেষ্টা যত্ন যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন তাহার দ্বারা কখনও কার্য্য হানি হয় না ; (তাহার নিদর্শন দেখ) ধান্যক্ষেত্রে একটি কৃত্রিম মানুষ দাঁড়-করাইয়া রাখিলেও তাহা দেখিয়া মৃগ ফিরিয়া যায় ।

[৭৭]

কারজ সোই সুধরিহৈ জো করিয়ে সমভায় ।

অতি বরসে বরসে বিনা জোঁ করিসন কুম্ভিলায় ॥

সেই ব্যক্তিই কার্য্যে সফলতা লাভ করে যে সমভাবে কার্য্য করে ; অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি দুয়েতেই কার্য্যহানি হয় ।

[৭৮]

রহৈ প্রজাধন যত্ন সোঁ তঁহা বাঁকী তরবার ।

সো ফল কোউ ন লে সকৈ জহাঁ কটীলী ডার ॥

প্রজা ও ধন যত্নের দ্বারাই রক্ষা হয় এবং তাহা রক্ষা করিতে তরবারি সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ রাখিতে হয় ; যে বৃক্ষের ডালে কাঁটা থাকে তাহার ফল কেহই লইতে সক্ষম হয় না ।

[৭৯]

পণ্ডিত অরু বনিতা লতা শোভিত আশ্রয় পায় ।

হৈ মাণিক বহুমোল কো হেম জটিত ছবিছায় ॥

পণ্ডিত, বনিতা এবং লতা আশ্রয় পাইলেই সুন্দর শোভা প্রাপ্ত হয়; মাণিক্য স্বভাবতঃ বহুমূল্য হইলেও কাঞ্চন সংযোগে তাহার জ্যোতিঃ সমধিকতর স্ফূর্ত্তি পায় ।

আপনী প্রভুতা কোঁ সবৈ বোলত ঝুট বনায় ।

বেশ্যা বরষ ঘটাবহী জোগী বরষ বঢ়ায় ॥

সকলেই আপনার গৌরব মিথ্যা রচনা করিয়া বলে ; (তাহার নিদর্শন দেখ) বেশ্যা আপনার বয়স কমাইয়া বলে এবং যোগী নিজবয়স বাড়াইয়া বলিয়া থাকে।

ভবিষ্য পুরাণোক্ত

আদম হব্যবতীর বংশ-বিস্তরর।

(১১শ সংখ্যার ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

শৌনক বলিলেন; হে মুনীশ্বর! প্রলয়ান্তে সংপ্রতি যিনি বিদ্যমান আছেন আপনি দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিষয় বলুন।

সূত বলিলেন;—তাহার পর ন্যূহনামা ম্লেচ্ছ বিষ্ণুকে মোহিত করায় ভগবান বিষ্ণু তাহার বংশ বৃদ্ধি করিলেন। এবং বেদবাক্য পরাঙ্মুখী ম্লেচ্ছভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বয়ং সেই বুদ্ধিগম্য ভগবান কলির বৃদ্ধির নিমিত্ত অপশব্দগা ভাষা প্রণয়ন করিয়া ন্যূহকে প্রদান করিলেন। ন্যূহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যথা ;—সিম, হাম, যাকূত। যাকূতের সপ্ত পুত্র। যথা ;—জুম্র, মাজুজ, মাদী, যূনান, তূবল, মসক, তীরূস। ইহাঁদের স্ব স্ব নামে এক একটী দেশের নামকরণ হইয়াছে। জুম্র হইতে দশকনাজ, রিকত, তজরূম উৎপন্ন হন। তাঁহাদের নামেও কতিপয় দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাকূতের যূনান নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার ঔরসে ইলীশ, তরলীশ, কিত্তী, হূদানি এই চারি পুত্র উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহাদের চারিজনের নামেও চারিটি দেশ বিশ্রুত হইয়াছে। ন্যূহের হাম নামক যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার কুশ, মিশ্র, কুজ্জ, কনয়ান্ এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নামেও কতিপয় ম্লেচ্ছদেশ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। কুশের ছয় পুত্র যথা ;—সবা, বহবীল, সর্বত, উরগম, সবতিক, নিমরূহ। তাঁহাদের পুত্রগণ যথা :—কলন, সিনার, উরক, অকদ, বাবুন, রসনাদ, দেশক।

সূতমুণি ঋষিদিগকে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, সংপ্রতি আমি সিম-বংশ বর্ণন করিব। সিমই জ্যেষ্ঠ ভূপতি। তিনি ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া ৫০০ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অর্কনৃসদ ৪৩৪ বৎসর রাজ্য করেন। সিহল নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হন। তিনিও ৪৬০ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইব্রত তিনি পিতার তুল্য সময় রাজ্য করেন। তাঁহার পুত্র কলজ তিনি ২৪০ বর্ষ রাজ্য করেন। কলজের রহু নামে যে পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহার রাজ্যকাল ২৪৭ বর্ষব্যাপী ছিল। তাঁহা হইতে জুজ উৎপন্ন হন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময় পিতার সমান। তাঁহার তনয় নহুর। তিনি ১৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র তছর, তিনি পিতার তুল্য সময় রাজ্যভোগ করেন। তছরের তিন পুত্র উৎপন্ন হন। যথা;—অধিরাম, নহুর ও হারণ। ইহাদের সুবিস্তৃত বংশ সকল স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ।

সরস্বতীর অভিশাপে ম্লেচ্ছ ভাষা অতীব অধম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। † অনন্তর ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অন্য খণ্ডে ম্লেচ্ছভাষা বিস্তৃত লাভ করিল। ইহাতে ম্লেচ্ছগণ নিতান্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিযুগের তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে ম্লেচ্ছবংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমুদয় ভূমিই ম্লেচ্ছময়ী এবং নানাপথাবলম্বী লোক সকল দৃষ্ট হইয়াছিল। সরস্বতীর তটবর্ত্তী ব্রহ্মবর্ত্ত প্রভৃতি কতিপয় দেশ ব্যতীত সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছগুরু মূষানামক কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কলিযুগ সমাগত হওয়াতে দেবার্চ্চনা ও বেদভাষা সমুদয়ই নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে সাতটি মহাপুরী (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তি) তহাতেও হিংসা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। দস্যু, শবর, ভিল্ল, মূর্খ, আর্য্য সকলেই ম্লেচ্ছদেশে অবস্থান করিতেছে। ম্লেচ্ছদেশে ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরাই বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসিত। সমুদয় গুণই ম্লেচ্ছের অধীন। অন্য সকল অপগুণ বলিয়া

† সংস্কৃতাচৈব বাণীতু ভারতেহএপ্রবর্ত্ততে।
অন্যখণ্ডে গতা সৈব ম্লেচ্ছা হ্যানন্দিনোঽভবন্ ॥
(ভবিষ্য পুরাণ)

হেয়। ভারতে ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপ সমূহেও "ম্লেচ্ছরাজ্য"। হে ঋষিগণ এই সকল জানিয়া এখন হরিকে ভজনা কর। ইহা শুনিয়া মুনিগণ বহু রোদন করিলেন। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বর্ষ-বিদায়।

হে অনন্ত! মহাকাল! সহস্র সহস্র যুগ ধরি'
একচ্ছত্র বিরাজিছ বিরাট এ পৃথিবী উপরি।
বিরাট তোমার মূর্ত্তি—অন্তহীন পরিচ্ছেদ হীন,—
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলেরই তোমাতে বিলীন।
দৃপ্ত নিত্য থাকি তুমি জীর্ণ কর যতেক নূতন;
তোমার বিস্তৃত বক্ষে পিষ্টনব হয় পুরাতন।

এমনি উদ্দামশক্তি হে অনন্ত! লোভেছ কোথায়,
(অতীত তাহার নাম—জগতের নিত্যগতি তায)
সেই শক্তি বলে তুমি লহ যত মাধুরী হরিয়া,
আশার রঙ্গিল ছবি চক্ষে ধর উলঙ্গ করিয়া।

---

* ম্লেচ্ছদেশে বুদ্ধিমন্তো নরাবৈ ম্লেচ্ছধর্ম্মিণঃ।
ম্লেচ্ছাধীনাঃ গুণাঃ সর্ব্বেঽবগুণাশ্চান্যথা চন্তে॥
ম্লেচ্ছরাজ্যং ভারতে চ তদ্দ্বিপেষু স্মৃতংতথা।
এবং জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠা হরিং ভজত সুব্রতাঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে রোদনং চক্রিরে বহু।
ইতি শ্রীভবিষ্যে মহাপুরাণে প্রতিসর্গ পর্বণি
চতুর্যুগখণ্ডাপরপর্য্যায়ে কলিযুগভূপ-
বর্ণনো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

সেখায়ে যথার্থ দ্রব্য কর নিত্য অতৃপ্তি বিনাশ ,
ক্লিষ্ট দুঃখে পথভ্রষ্ট নর তবু নাহি ত্যজে আশ ।

এইত' তোমার কার্য্য দেখি সারা বৎসর ধরিয়া—
ঘুচাও মনের ভ্রান্তি দিব্যছবি সম্মুখে রাখিয়া ।
"অতি অপদার্থ নর কামনার দ্রব্য তোমাদের,—
জ্ঞাননেত্র রাখিয়াছে অন্ধ করি শুধু গ্রহফের ।
যে ধন থাকিবে নিত্য নাহি কভু বিকৃতি তাহার"
নিত্য এই আজ্ঞা তুমি জগজনে করহ প্রচার ।

"হেতায় যতেক বস্তু তোমাদের ধন কামনার,—
নিত্য নিত্য ঘটিতেছে দেখ কত বিকৃতি তাহার।
আজি যে অক্লিষ্টকান্তি রমণীর মুখ নিরখিয়া,
ভেবেছ সে রূপ নিত্য লাবণ্য-প্লাবনে মুগ্ধ হিয়া ;—
দিন গেল, মাস গেল, অতীতের কুহরে আমার,
সে লাবণ্য ক্ষীণতর—নাহি তাহে সে মাধুরী আর।

"ধন মান যশোলিপ্সা যখনি দেখিবে দূর হ'তে,
তখনি গৌরব আসি' প্রবেশিবে অন্তরজগতে ।
অতীত হইলে কাল সে গুরুত্ব রহিবে না আর"—
নিত্য এই নীতি তুমি বিশ্বহিতে করহ প্রচার ।
জগতের কর্ণ ভেদি' নিত্য উচ্চে কহ এই কথা—
জগতের নবদ্রব্যে হর তুমি মাধুরী সর্ব্বথা ।

অনন্ত ! অনন্ত-জ্ঞান বিতরিতে মহাগ্রন্থ তুমি,
প্রতিদিন প্রতিপত্র তার ;
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত দণ্ড অনুপল আদি ভাগচয়
প্রতি ছত্র বিভাগ কথার।
দীর্ঘ-পরিচ্ছেদ তাহে বর্ষ যত তূর্ণ ভ্রাম্যমান
প্রত্যেকেই জ্ঞান-রত্নাকর ;

মহান্ অঙ্গুলী-ভরে প্রতি পত্র উলটিছ তায়
কোন্ মহা পুরুষ ভাস্কর!
ঈঙ্গিতে তোমার প্রভো পুরাতন বর্ষ আজি
লইল বিদায়;
এ চিত্তে নূতন জ্ঞান রোপন করহ, মম
মিনতি তোমায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ঈশ্বরোপাসনা।

(১১শ সংখ্যার ৪৪১ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

শিক্ষক।—আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার চেষ্টার নামই ঈশ্বরোপাসনা। তাহা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ।

ছাত্র।—একাগ্রচিত্ত কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ও জানিবার ইচ্ছার অর্থ কি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শি।—প্রথমে জানিবার ইচ্ছা কি ও জ্ঞান কাহাকে বলে ভাল করিয়া বুঝ। বেদ কি পুরাণ হইতে ঈশ্বরসম্বন্ধে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলেই জ্ঞান হয় না। চিত্তবৃত্তির তদ্ভাবে ভাবিত হইলে জ্ঞান হয়। যতক্ষণ চিত্তবৃত্তির সহিত বাহিরের পদার্থের ঐক্যতা (Harmony) না স্থাপন হয় ততক্ষণ চিত্ত ঐ বিষয়াকার গঠিত হয় না, সুতরাং কোন জ্ঞানের বিকাশ হয় না। চিত্ত (Consciousness) যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্ভাবে ভাবিত না হয় ততক্ষণ আমাদের জ্ঞান সম্ভবে না। এই জন্যই দেখা যায় যে যে সকল বিষয়ে আমাদের বদ্ধ চিত্ত আকৃষ্ট না হয় সেই সেই বিষয়ে আমরা অজ্ঞ।

চিত্তবৃত্তি বিকাশ হইতে গেলে একটি কেন্দ্র (Ceure) লইয়া প্রকাশ হইতে হয় ঐ কেন্দ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডাণ্ডে (Microcosm) জীব বলিয়া ও ব্রহ্মাণ্ডে (Macrocosm ঈশ্বর বলিয়া খ্যাত।

ছা।—চিত্তের বিকাশ কি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

শি।—ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ। শাস্ত্রে আছে যে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কোন মহান্ চিত্তের খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই Consciousness যখন সত্ত্বগুণ দ্বারা আবৃত হয় তখন তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। যখন রজোগুণ দ্বারা আবৃত হয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও যখন তমোগুণাবৃত হয় তখন ভূত সকল উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র (ঈশ্বর) স্বপ্রকাশ হন তখন তাঁহার চিত্তের (Consciousness) ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাসে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থনিচয় উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব কল্পের স্মৃতি সকল যখন তাঁহার চিত্তের উপর প্রতিফলিত হয় তখন তাঁহার বিশাল চিত্তক্ষেত্রে (চিদাকাশে) স্মৃতিমূলক এক একটি তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। তন্মাত্র অর্থে তাঁহার চিত্তের স্বকল্পিত মাত্রা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব। এই সকল তন্মাত্রের স্থূলভাব বা তমোগুণ হইতে ভূতাদি উৎপন্ন হয়। তাহাদের কার্য্যকরী ভাব বা রজোগুণ হইতে দেবসৃষ্টি হয় ও জ্ঞানময় ভাব বা সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা মন প্রভৃতির দেব সৃষ্টি হয়। তাঁহার চিত্ত এইরূপে স্বকল্পিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়া বাহ্যজগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে।

ছা।—আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।

শি।—তুমি বোধহয় mesmerism বিদ্যার কার্য্যপ্রণালী অবগত আছ। mesmerised ব্যক্তির চিত্তে যে প্রকারে mesmeriser কার্য্য করেন তাহা বুঝিয়া দেখ। মনেকর যেন রামকে আমি mesmerise করিয়া তাহার মনোবৃত্তিগুলিকে নিজবশ করিয়া লইয়াছি। রামকে যদি আমি বলি যে তুমি রাম নহ তুমি একজন স্ত্রীলোক ও তোমার নাম কমলা। রাম প্রথমে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয় কারণ তাহার এতদিনের চিত্তের ধারণা যে আমি রাম ও পুরুষ আমার আদেশে একেবারে উল্টাইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় রামের চিত্তপটে আমার আদেশের মনোময় প্রতিকৃতি পড়িয়াছে কিন্তু সে এই প্রতিকৃতিটী গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। এই প্রথম অবস্থা। তৎপরে আমার আদেশের শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া যখন রামের চিত্ত "আমি কমলা" এই ভাবে আবিষ্ট হইল অমনি "আমি রাম" এই জ্ঞানটি "আমি কমলা" এই ভাবে লোপ হইল। এইটী দ্বিতীয় অবস্থা। পরে রামের যখন "আমি কমলা" এই

জ্ঞান স্থিরিকৃত হইল তখন রাম একেবারে কমলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই ভাবে সে একেবারে পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এমন কি তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ তখন কমলাভাবে পরিপূর্ণ। এইটি ৪র্থ অবস্থা। পরে রাম কমলাভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে এই অবস্থায় তাহাকে যদি তাহার স্বামী ও সন্তানাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে রাম নিজ ইচ্ছায় আমি কোন প্রকার শক্তি ব্যবহার না করিলেও আপনাকে স্ত্রীভাবে দেখিয়া স্ত্রীভাবের অবশিষ্ট ভাবগুলি নিজেই আপনাতে আরোপ করিবে। এই অবস্থায় তাহার নিজের কল্পনাশক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া আপনাকে কমলা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। এইটী পঞ্চম অবস্থা।

তাহার পর রামের কমলা জ্ঞান উক্ত প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও মনকে বশ করিয়া স্থূলভাবে প্রকটিত হইবে রাম তখন আপনার পুরুষ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া কমলাভাবের অনুযায়ী বেশ-ভূষা হাব-ভাবাদি অবলম্ব নকরিবে।

এখন বুঝ কিরূপে চিত্তের কার্য্য দ্বারা রাম কমলারূপে পরিণত হইল। প্রত্যহ অমরা ঐরূপে স্বকল্পিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতেছি।

জগতের কেন্দ্র ঈশ্বরও সেইরূপে পরবশ না হইয়া জীব সকলের প্রকাশ জন্য আপনাতে ভিন্ন ভিন্নরূপ কল্পনা দ্বারা প্রথমে তত্ত্ব তৎপরে তন্মাত্ররূপে—ইত্যাদি পরে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বশেষ স্থূলজগতে পরিস্ফুট হইয়া আছেন। তাঁহার অসীম চিদাকাশে সমস্ত জগত কল্পিত হইয়া আছে তা বলিয়া তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন।

প্রত্যেক ভুত মহাভুত তন্মাত্র প্রভৃতিতে তাঁহার শক্তির বিকাশ করিতেছে ও তিনি এই সমস্ত পদার্থনিচয়কে নিজ চিদাকাশে এক অংশে ধারণা করিয়া আছেন। তাহা বলিয়া তিনি যে ব্যক্তজগত দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ গীতায় তিনি বলিতেছেনঃ——

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্। ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্ত বিভূতে র্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তে জোহংশসম্ভবম্॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন ন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

গীতা—১০ম অধ্যায়।

ঐ সকল রূপ তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না বরং তাঁহার জ্যোতি প্রকাশ করে।

এইরূপে তিনি বাহ্যজগতে ভূতস্বরূপে আপনাকে পরিস্ফুট করেন ও মানবের অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিৎ অহঙ্কার রূপে বিরাজমান আছেন।

শাস্ত্রে আছে ব্রহ্ম এইরূপে তাঁহার চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করত মানবের হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই অনুপ্রবিষ্ট পুরুষকে আমরা "আমি" বলি, যদিও তাঁহার স্বরূপ "সোহং" মহাবাক্য উপলব্ধিকালে প্রকাশিত হয়।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কল্পয়িতা ভগবানের চিদাকাশে কল্পিত রূপ সকল দ্বারা আমরা পরিচ্ছিন্ন থাকি। ইহাকেই বলে বদ্ধভাব এবং যখন ঐ সকল রূপের দ্বারা পরিস্ফুট আত্মজ্ঞান সাহায্যে এই সকল রূপকে মায়িক বা আত্মার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বলিয়া জানিতে পারি তখনই আমরা মায়ামুক্ত। এই মুক্তি জীবের চিত্তের প্রসারণতা বা জ্ঞান দ্বারা লভ্য। এইরূপ ... ... প্রসবিণী শক্তির নাম ঈশ্বরের প্রকৃতি বা মায়া। যতদিন মানব দেহ মন আদিতে মমতা বা "আমার" ইত্যাকার জ্ঞান রাখে ততদিন সে বদ্ধ। আর যখন ঐ সকলকে প্রকৃতির দ্বারা কল্পিত বলিয়া মানিতে পারেন তখনই তিনি এই মায়াপাশ হইতে মুক্ত। তিনি প্রকৃতিকে জানিতে পারিলেই প্রকৃতি লজ্জাশীলা মহিলার ন্যায় তাহার দৃষ্টি হইতে অপসরণ করেন। তখন প্রকৃতির খেলা তাহার দৃষ্টিকে আর পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

এই চিত্তবৃত্তি প্রসারণের উপায়ের নাম উপাসনা ও তদ্দ্বারা আমাদের আত্মজ্ঞান ঐ সকলের ..... দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হইয়া আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিতে পারি। তিনি প্রত্যেক রূপে আপনাকে বিম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কোন রূপ নাই যাহাতে তাঁহার সত্ত্বার প্রতিবিম্ব নাই। চিত্ত প্রসরণের দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রূপ সকলকে

মায়িক জ্ঞান করিয়া ভিতরের সত্বার অনুভূতি হয়। সেই একত্বতেই এক সৎ পদার্থই এই মায়িকজগতকে অনুপ্রাণীত করিয়া আছে বলিয়াই রূপের স্বতন্ত্র সত্বা আছে বলিয়া বোধ হয়। সচ্চিদানন্দ ভগবান প্রত্যেক মায়িকরূপে প্রতিবিম্বিত আছেন বলিয়াই প্রত্যেক মায়িকরূপকে আমাদের সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়। উপাসনা চিত্তকে প্রসরণ করিয়া রূপাতীত করিয়া জগতের একমাত্র সত্তা ভগবানকে দেখাইয়া দেয়।

কূপ, তড়াগ ও সমুদ্রের জল আপাততঃ ভিন্ন রসান্বিত বলিয়া আমাদের প্রতীত হয়। কিন্তু ক্ষার কটু তিক্ত প্রভৃতি গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে সর্ব্বপ্রকার জলই স্বরূপতঃ এক বলিয়া প্রতীত হয়। বিশ্লেষণ (analysis) ও একত্ব (unity) জ্ঞান দ্বারা জলকে জানিতে পারিলে যেমন আর দেশকাল অবস্থাদি ভেদে জলের এক রস জ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চশীল জগতের একমাত্র সত্বা উপলব্ধি হইলে আর ভেদজ্ঞান দ্বারা চিত্তের ভ্রম জন্মাইতে পারে না। উপাসনা দ্বারা মানবের প্রত্যেক তত্বের ও জগতের প্রত্যেক তত্বে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

অনন্তরামের গুরু ভাই।

সাধুতা।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য সাধন করা সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্য। সংসারে প্রত্যেকেই যদি সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন তবে শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রতারণা প্রভৃতি উপপ্‌তি হইয়া সংসার জ্বালাময় হইতে পারে না। সাধুতা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইতে পারে না।

সাধুতার ফলে মানব ইহলোকে ও পরলোকে পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। পরলোক অর্থে মৃত্যুর পর মানবের যেখানে গতি হয় সাধারণে তাহাই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন পরলোক অর্থ আর একটী আছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানবের পর তাঁহার বংশপরম্পরার সমবর্ত্তী কালকে পরলোক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। নিজের কর্ম্মফল আপনাকে অতিক্রম করিয়া সন্তান-সন্ততির উপর সমধিক প্রভুত্ব করে তাহা আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই। পিতা পিতামহের মান, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য, ব্যাধি প্রভৃতি যেমন বংশধরগণের উপর আধিপত্য করে তাঁহাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মফলও তদ্রূপ সন্তান-সন্ততিগণের উপর সম্বেষ্টিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব-পুরুষগণের মান, সম্ভ্রম অর্থ প্রভৃতিতে যখন বর্ত্তমান-বংশধরগণ অধিকারী হইতে পারেন তখন তাঁহাদের অর্জ্জিত অসৎকর্ম্মের ফল বর্ত্তমান বংশধরগণকে ভোগ করিতে হইবে না, এ কথা হইতে পারে না। মানবের কর্ম্মফল যখন বংশপরম্পরায় সম্বেষ্টিত হয় তখন সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা অবশ্যই মানবের উচিত।

মাতার কর্ম্ম দূষিত হইলে তাহার ফলে সন্তানকে জর্জ্জরিভূত হইতে হয়।

মা হওয়া কি কথার কথা,
কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা।

রামপ্রসাদ।

বস্তুত মা হওয়া মুখের কথা নহে মাতার দায়িত্ব বড়ই অধিক। মাতার প্রকৃতি সৎ না হইলে সমাজে সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। অতএব সাধুতাচরণ নারীজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুতারত্নে ভূষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চরিত্রতা প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন,——

শীলং প্রধানং পুরুষেভদযস্যেহ প্রণশ্যতি।
নতস্য জীবিতে নার্থো নধনেন নবন্ধুভিঃ॥

উদ্যোগ পর্ব্ব। ৩৩—১১৪২।

অর্থাৎ মানবের পক্ষে চরিত্রতাই প্রধান গুণ, চরিত্রহীন ব্যক্তির ধন-বন্ধু প্রভৃতি সমস্তই বিফল, চরিত্রহীন ব্যক্তির মনুষ্যত্ব থাকে না।

সন্তানের চরিত্র গঠিত করিবার পক্ষে মাতাই প্রধান সহায়। সেই মাতা যদি নিজে অসৎপ্রকৃতি হয়েন তবে সন্তান সৎ হইবার আশা বড়ই ক্ষীণ অতএব

নারীজাতি যাহাতে সাধুতা হইতে একপদও বিচ্যুত না হয় তদ্বিষয়ে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পবিত্র চরিত্রতার উপর সাধুভাব ভিত্তি গঠিত হয়। যিনি আত্মাভিমান রহিত পরের হিতার্থে যাঁহার প্রাণমন উৎসর্গীকৃত তিনিই সাধু নামে অভিহিত হন। সাধুতাবলম্বন করিতে হইলে সংসারের সহিত বিযুক্ত-সম্বন্ধ হইতে হইবে এরূপ নহে, সংসারে অশেষ ভোগলালসার মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার কার্য্য সৎ হয় তিনিই সাধু। অরণ্যবাসী সাধু অপেক্ষা গৃহীসাধুর মাহাত্ম্য অধিক। কারণ সংসারের সহিত যাঁহারা বিযুক্ত-সম্বন্ধ কোন আকর্ষণীয় বস্তু—কোন তীব্র প্রলোভনীয় বস্তু তাঁহাদিগের নয়নপথে পতীত হয় না, কিন্তু গৃহী ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বস্তুর সংঘর্ষণে পেষমান হইতে হয়। সেই সকল বস্তুর সহিত অহরহ বাস করিয়াও যিনি তাহাদের সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন সুতরাং তিনিই প্রকৃত সাধু। অতএব সংসারাবদ্ধা রমণীগণের পক্ষে সাধুতাচরণ অসম্ভব হইতে পারে না, ইচ্ছা থাকিলেই মানুষ সৎগুণ লাভ করিতে পারে।

লোভ, মোহ, কামাদি প্রভৃতি বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন করিয়া সমদর্শীতাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই সাধুতার কার্য্য।

মানুষ একদিনে সাধুতার চরমসীমায় উন্নীত হইতে পারে না আজীবনই ইহার অনুশীলন করিতে হয় তবেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মানবজীবনে মধুর ফল ফলিতে থাকে।

মানুষ দুর্ব্বল প্রতিনিয়তই তাহাদের পদস্খলন হইবার সম্ভব এই জন্যই এক গাছি সুদৃঢ় রজ্জু ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে হয়। সেই রজ্জু হইতেছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রাণতা ব্যতীত সাধুতা রক্ষা হইতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারাই ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্মই মানুষের অধোগতির কারণ আবার কর্ম্মই উর্দ্ধগতির সোপান।

যাত্য ধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরিব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রকার সেবা কারক॥

হিতোপদেশ। ২০৫।

অর্থাৎ কূপখননকারী যেমন ক্রমে নিম্নে যায় এবং প্রাচীর গাঁথক উচ্চদেশারোহণ করে মানুষ সেইরূপ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উচ্চতা বা নীচতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই সৎকর্ম্মানুশীলনই প্রয়োজন।

স্ত্রীজাতি সৎকর্ম্মনিষ্ঠ হইলে প্রত্যেক পুরুষজাতিতে সেই গুণরাশি প্রসারিত হয়। এক সময় জেনারেল বুথ তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি যাহা তাহা হইতে পারিতাম না যদ্যপি মিসেস্‌বুথ আমার পত্নী না হইতেন।"

পূর্ব্বজন্ম কৃতকার্য্য সকলই পণ্ডিতগণের মতে কর্ম্মফল নামে উক্ত হয়। এমতে সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কর্ম্মফল সকল যন্ত্রনাদায়ক না হইয়া, শান্তিময় হইয়া থাকে। কোনরূপ দুঃখযন্ত্রণায় পতিত হইলে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "ভগবান যাহা করিবেন তাহা হইবে" এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে না খাটিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকা অলসতার কার্য্য। ঐরূপ অলসতা হইতে সমাজিকগণের মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠতা হ্রাস হইয়া সমাজকে যন্ত্রনাময় করিয়া তুলে। সমাজকে এইরূপ অলসতা স্ত্রীজাতিই শিক্ষা দিয়া থাকেন ভগবন্নিষ্ঠা মন্দ জানিষ তাহা বলিনা পরন্তু ভগবন্নিষ্ঠা ব্যতীত সাধুতা রক্ষা হয় না কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাওয়া চাই, জগত কর্ম্মক্ষেত্র—এখানে কর্ম্মত্যাগ করিলে অন্যায় করা হয়, ভগবৎ আদেশের প্রত্যবায় করা হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "যদি তোমার কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য কর্ম্ম কর"। তবেই দেখ কোন অবস্থাতে কর্ম্ম পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। এক চক্রে যেমন রথ চলিতে পারে না তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈববল কোন কার্য্যকর নহে। পুরুষকারের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাও। পুরুষকার ব্যর্থ বা অব্যর্থ যাই হোক না কেন তাহা দেখিবার তোমার প্রয়োজন নাই তুমি তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে খাটিতে থাক। কার্য্যের ফল তোমার হাতে নহে কিন্তু কার্য্য করিতে তুমি বাধ্য। যদি তুমি কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে খাটীতে পরাঙ্মুখ হও তবে তুমি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবে, তোমার কর্ম্ম ফলের বোঝা আরও বর্দ্ধিত হইয়া তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকিবে। এই জন্যই সাধুগন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাইবার উপদেশই প্রদান করেন অলসও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার উপদেশ

দেন না। যিনি এই নীতি পালন করিতে পা রন তিনিই সাধু। কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া বিফল মনোরথ হইলে ব্যথিত হওয়া সাধুতার কার্য্য নহে। কারণ,—
"Man proposes but God disposes" অর্থাৎ মানুষ বাসনা করে ভগবান তদিচ্ছানুযায়ী ফল প্রদান করেন। যদিও তুমি আজ ব্যর্থ মনোরথ লইলে কিন্তু একদিন না একদিন এই কর্ত্তব্যানুশীলন তোমাকে সুখের অমৃত স্রোতে ভাসাইয়া দিবে। যখন কর্ম্ম দ্বারা তোমার কর্ম্ম বন্ধন খণ্ড হইবে তখন তোমার অভিপ্সিত দ্রব্য লাভ করিয়া হৃদয়ে স্বর্গ-সুখানুভব করিবে সন্দেহ নাই। যতক্ষণ এই অবস্থা প্রাপ্ত না হও ততক্ষণ বুঝিতে হইবে তোমার কর্ম্মফল আজও ক্ষয় হয় নাই সুতরাং কর্ম্ম-বন্ধন খণ্ডনের জন্য অবিষাদিত চিত্তে কর্ত্তব্যানুশীলন করাই তোমার কর্ত্তব্য। দীনবন্ধু গাইয়াছেন,——

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।
বারেক বিফল হ'লে কে কোথায় মরে।
আজ না সফল হ'ল হতে পারে কাল।

নবীন তপস্বিনী।

বস্তুতঃ কথাটা মিথ্যা নহে। যে বিষ প্রাণ সংহার করে আবার প্রয়োগ গুণে সেই বিষই অমৃত হইয়া একদিন মানবকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। এই সকল বুঝিয়া সহস্র দুঃখ ক্লেশ ভোগ সত্ত্বেও কর্ত্তব্যানুশীলন হইতেছে সাধুতার কার্য্য। সংবৃত্তি সকল অনুশীলন করিতে করিতে মানব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়, সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইলেই মহান্ ভাব সমূহের দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। যখন হৃদয়ের এই অবস্থা ঘটে তখন শত্রু মিত্র আত্মপর ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন তিনি বিশ্বেরও বিশ্ব তাঁহার হইয়া পড়ে। এই অবস্থা লাভ হইতেছে সাধুতার চরম ফল। শাস্ত্র মতে,—

বৈরাগ্য পূর্ণতা মেতি নাশাব শানুগম।

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তির অনুশীলনে হৃদয় পূর্ণত্বা প্রাপ্ত হয়। বিষয়াবদ্ধ-চিত্ত কদাচ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাঁহাদিগের কেবল নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ হয় মাত্র।

ইহাতে অনেকেরই ধারণা সংসারে থাকিয়া সাধুতা লাভ হয় না কিন্তু তাহা নহে এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভোগ-লালসায় যে চিত্ত একান্ত সংবদ্ধ, ভোগ

বাসনা ব্যতীত যে হৃদয়ে অন্য কিছুই স্থান পায় না, তাঁহার জীবনই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন একথা তাঁহাদের জন্য নহে। কর্ত্তব্য পরায়ন ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। জনকরাজ গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়াও ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ মানবের জন্য অরণ্য বাসই বৈরাগ্যের যোগ্যস্থল নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সেই বাক্য সকলের মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাঁহারা মানবকে চুটাইয়া সংসার করিয়া লইয়া তবে বৈরাগ্য বৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে সময়কে শাস্ত্র বৈরাগ্য কাল বলিয়া নিরুপিত করিয়াছেন তখন মানবের জীবন উৎসাহ উদ্যম শূন্য হইয়া আইসে, পরলোক চিন্তা আসিয়া আপনা হইতেই হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সে সময় একমাত্র আধ্যাত্ম-চিন্তা ব্যতীত পার্থিব কোনরূপ কার্য্যই তাঁহাদ্বারা সুসাধিত হয় না। মানবের ঐ ভগ্ন নিরুৎসাহ-ময় জীবনই আর্য্যমতে বৈরাগ্য কাল। এই বৈরাগ্যযোগ্য কালে যাঁহারা সংসার সম্বন্ধে শিথিলতা শক্তি হন তখন পুত্র পৌত্রাদিতে তাঁহাদের গৃহ পরিপূর্ণ হয়। সাংসারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যের ভার সেই পুত্র পৌত্রাদির উদ্যম-শীলতাময় নবীন জীবনের প্রতি উৎসর্গ করিয়া যান সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতেছি শাস্ত্রকারগণের বৈরাগ্যোপদেশ ও সমাজে ইষ্ট ব্যতীত কোনরূপ অনিষ্টোৎপাদন করে না। কিন্তু যাঁহারা অকালে বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া সংসার বা পরিবার অথবা সমাজেরপ্রতি উদাসীন হন তাঁহারা সাধারণের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সংসারিগণের পক্ষে যে নিয়ম সকলের ব্যবস্থা আছে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলেই সাধুতা রক্ষা হইয়া থাকে। মানুষ স্বীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যদিও সাধুতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তথাচ অসৎ সঙ্গে বাস করিলে সহজেই অবনতি ঘটিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য পুনপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষা হীনতা হইতেই মানুষ অসৎ হইয়া পড়ে। মানবের মাতা ও স্ত্রী যেরূপ সঙ্গী এরূপ আর কেহই নহে ইহাঁদের সহিত মানবকে অহরহঃ বাস করিতে হয় সুতরাং ইহাঁদের প্রকৃতি দূষিত হইলে প্রত্যেক মানবের অবনতি ঘটিবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্ত্রী জাতির প্রকৃতিকে উন্নত করিবার জন্য যত্নপর হওয়া

সকলের প্রয়োজন। অধুনা স্ত্রী শিক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে সত্য কিন্তু সেই শিক্ষা স্ত্রী-জাতিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সম্যক উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে পারিতেছে না। ৺রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন,—

"স্ত্রীলোক দিগের অল্প বিদ্যা হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল। আমি বলি হয় স্ত্রীলোক দিগকে রীতিমত শিক্ষা দাও নয় শিক্ষা দিয়া কাজ নাই"। আমরাও তাঁহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বস্তুতঃ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি।

অল্প বিদ্যায় জ্ঞানের উন্মেষ হয় না অথচ অন্যে নির্ভরতাও থাকে না সুতরাং এরূপ শিক্ষা সমাজের অশান্তির কারণ। অধুনা স্ত্রী জাতির অল্প চিন্তার জন্যই সমাজে দয়া ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতেছে, সংপ্রণোদিত কর্ম্ম সকল অপসারিত হইতে বসিয়াছে। স্ত্রী-জাতি প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইলে সমাজ হইতে বিষম অশান্তিময় কারণ সকল অপনীত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

সঙ্গীত।

(মূঢ় মন আমার) কার হিংসা কর অকারণ,
ও যে সর্ব্বজীবে সমানভাবে আছেন নারয়ণ।
আদিতে একমাত্র নর,
বিশ্বময় তাঁহার বংশধর,
ভেবে দেখ কেহ না পর, পরস্পরে সব আপন।
কত মাতা কত পিতা,
নিরখিছ যথা তথা,
আশি লক্ষ জন্মের কথা, কে করে নিরাকরণ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।